রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ | কার্তিক ১৩৪৬ | প্রথম সংখ্যা

দুগ্‌গা এলেন ঘরে

ভোর না হতে আজকে ঢাকে কে দিল রে কাঠি ?
হারু কুমোর ফেরায় বুঝি রঙের তুলিকাটি !
দুগ্‌গা ঠাকুর হেসে দিলেন হলুদ-মাটি রঙে,
দিব্যি ঠাকুর, মাটির ঠাকুর, নয়তো জবরজং এ।
দুগ্‌গা ঠাকুর ! দুগ্‌গা ঠাকুর ! কোন্ দেশেতে ঘর ?
কোথায় তুমি ছিলে আপন ! কোথায় হলে পর ?

তোমার বুঝি ছিল আপন ছোট্ট খেলাঘর,
খেলার পুতুল সাজতো কনে, পুতুল হত বর,
পুতুল খেলায় কনে-পুতুল যেত শ্বশুর বাড়ি,
বরের বুঝি ছিল পুতুল খেলার জুরি গাড়ি !
পুতুল-কনে বিদায় দিয়ে কাঁদতে বসে বুঝি,
মা বলতেন, 'দুগ্‌গা কোথায় ? পাইনে বাছা খুঁজি !'

তারপরেতে—তারপরেতে ব্যাপার হল কি ?
কার মালা কে গলায় পেলে বাজে রসুন চোকি ।
দুগ্‌গা ঠাকুর ! দুগ্‌গা ঠাকুর ! সঙ্গে গেল কে ?
পাল্‌কি কাঁধে চলল হেলে আটটি বাহকে !

যার ঘরে নেই ক্ষুদের কণা, যার ঘরে নেই আলো,
যার ঘরেতে তিনটি চোখে চোখ ধাঁধানো আলো ;
যার ঘরে নেই রঙীন সাড়ী, সোনার অলঙ্কার
শাস্ত্র-উজোড় বিদ্যে শুধু মনের অলঙ্কার ;
হিমালয়ের চুড়োয় ক্ষ্যাপা আছেন বাসা বেঁধে,
তার ঘরে কোন্‌ কনে এলো, ‘মা কই’ বলে কেঁদে,
‘দুগ্‌গা মা কই’ ‘দুগ্‌গা কোথা’ মায়ের ডাকে হায়
অনেক দূরে কনের মেয়ের কান্না মিশে যায় ।
দুগ্‌গা ঠাকুর ! দুগ্‌গা ঠাকুর ! সন্ন্যিসিটা কে ?
কেমন করে রইলে বলো, বাসলে ভালো তাকে !

সন্ন্যিসিটার ছিল বুঝি মনের অহঙ্কার,
তার মত বর কোথায় কারো জুটতে পারে আর !
যেমন রাজা, রাজ্যি তেমন, রাজ্য শ্মশান পাট,
মরার খুলি বাসন বুঝি, পাথর হল খাট ।
ভাঁড়ার আছে জগৎজোড়া সবার ঘরে ঘরে,
সন্ন্যিসিটা ভিক্ষা করে’ আনতো ঝুলি ভরে ।
ছাই মেখে সে থাকতো বসে, বলত মুখে, ‘ব্যোম্‌ !’
রাত জেগে সে করত বসে সৃষ্টিছাড়া হোম ।
দুগ্‌গা ঠাকুর ! দুগ্‌গা ঠাকুর ! ছাইমাখাটা কে ?
পূজো যোগায় সবাই ভয়ে এই ক্ষ্যাপাটাকে !

যার আছে সব, তার কিছুতে নাইরে প্রয়োজন,
জগৎজোড়া ফাঁকিতে তার উদাস সারা মন,

মাটি তো তার ঘরের মেঝে, শ্মশান যে তার ঘর,
আলো বাতাস নিত্য সাথী, সঙ্গী চরাচর,
ভূতেরা তার বন্ধু বুঝি, ভূষণ হল ছাই,
চাইলে যে পায় পাওয়াতে তার মনটা বুঝি নাই ।
দুগ্‌গা ঠাকুর দুগ্‌গা ঠাকুর ! বুকটি কি তার ফাঁকা ?
ক্ষ্যাপার বুকে নামটা তোমার মিষ্টি রঙে আঁকা ?

আজ সকালে কে দিলরে নতুন ঢাকে কাঠি !
দুগ্‌গা এলেন ঘরে ফিরে হাসলো সবুজ মাটি,
ছিলেন কোথায়, ছিলেন কেমন, সন্ন্যিসিটার ঘরে,
সন্ন্যিসিটার তরে বুঝি মনটা কেমন করে !
আকাশেতে কড় কড়া কড় সন্ন্যিসি কি ডাক ডাকে !
ভয়েই বুঝি ফিরিয়ে দেব নতুন পাওয়া মাকে !
এই পৃথিবীর মাটিটা তার ছিল বাপের বাড়ি,
এই বাড়িতে এলেন চেপে সিংহ-টানা গাড়ি ।
বিসর্জ্জনের বাঁশী যখন ফিরবে কেঁদে হায়,
ফিরিয়ে দেব সন্ন্যিসিকে দুগ্‌গা প্রতিমায় ।

‘আনন্দময়ীর আগমনে’

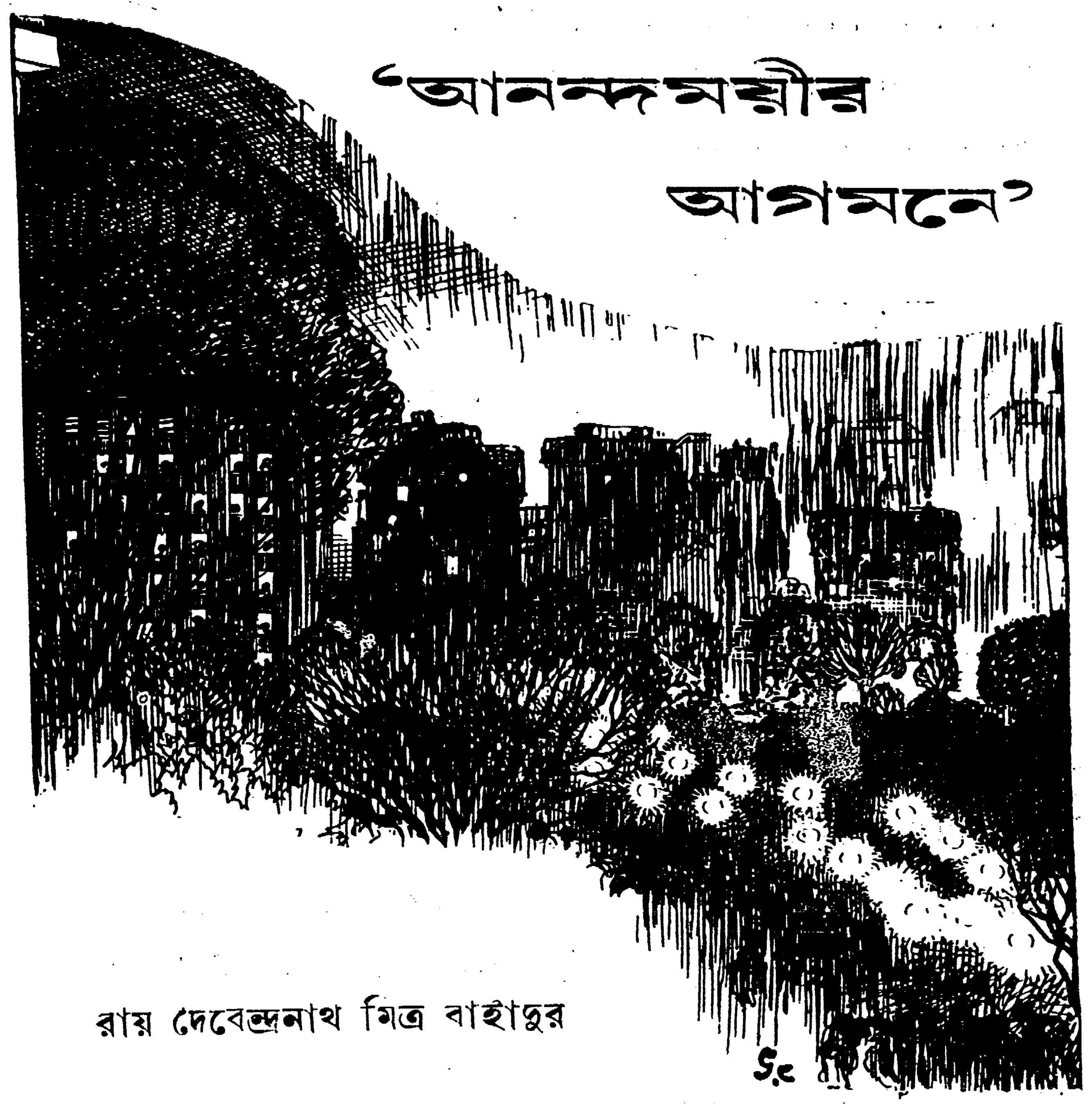

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

“আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।” তাই সম্পাদকমশাই তোমাদের জন্যে এক বিরাট ভোজের আয়োজন ক’রেছেন। ভোজের কথা শুনে, তোমাদের অনেকের মনের-মেজেতে হয়তো পাতা-গেলাস-খুরি বিছানো হ’য়ে গেল, শাক-বেগুন ভাজার সঙ্গে হাতে-গরম লুচিও হয়তো পাতে প’ড়েছে, আর কপিরকালিয়া, মুড়ি-ঘণ্ট নিয়ে পরিবেশকেরা একপাশে খাড়া রয়েছে—তোমাদের মুখ চল্‌লেই তাদের হাতও চল্‌বে, অর্থাৎ পরিবেশন সুরু ক’রে দেবে। একটা জাঁকালো নিমন্ত্রণ বাড়ীর ছবি তোমরা অনেকে হয়তো মনে মনে এঁকে ফেল্‌লে। কিন্তু সম্পাদকমশাই যে-ভোজের আয়োজন ক’রেছেন তাতে কলাপাতা গেলাস-খুরীর বিন্দু-বিসর্গও নাই—সেখানে কেবল কাগজের পাতায় কালির আঁচড় বা ছাপ। এই আনন্দ-ভোজের ব্যাপারে আমার উপরও

কিছু একটা রকম পরিবেশন করবার অনুরোধ এলো। অনুরোধের বায়না নিয়ে ফেলেছি, বায়না ফেরৎ-দেওয়া যারপর নাই অশোভন; অথচ, আমি ভীম নাগ নই যে তোমাদের পাতে দই-সন্দেশ-রাবড়ি পরিবেশন ক’রবো। এখন উপায়? কি নিয়ে কাকে নিয়ে লিখি? মন মহারাজ হুকুম দিলেন লেখো মাটিকে নিয়ে, মাটির সন্তান কৃষককে নিয়ে।

আমি আমাদের দেশের কৃষকদের নিয়েই থাকি কাজেই আমিও তাদের একজন। তোমরা আমাকে নির্ভয়ে চাষা বলতে পার, তাতে আমি আদৌ রাগ করি না। অনেকদিন আগে, চাষবাস সম্বন্ধে আমার লেখা একটা বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে “প্রবাসী” আমাকে ‘চাষা’ আখ্যা দিয়েছিলেন। আমি তাতে গৌরবই অনুভব করি: কারণ কৃষকই বাংলার মেরুদণ্ড। ওদের পরিশ্রমের ফলেই বাংলা শস্যশ্যামলা, সুফলা। ওদের অক্লান্ত যত্নের ফলেই বাংলায় শরৎকাল এত সুন্দর, এত শোভাময়, যা দেখে আত্মহারা কবি বলেছেন শরৎকে—

“শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল
ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।”

ওদের আপ্রাণ চেষ্টাতেই শারদপ্রভাতে বঙ্গমাতার

“শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।”

ওরাই মাকে অন্নপূর্ণা ক’রেছে তাই—

“কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া।” কেন না—
“ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।”

ওদের জন্যেই আমরা শুধু বঙ্গমাতাকে কেন, ভারতমাতাকে মুগ্ধচিত্তে বলি—

“চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন!”

চাষীরাই বাংলার মুখে হাসি ফোটায়; তারাইতো এই শারোদোৎসবের ভাণ্ডারী সুতরাং আমাদের এই পবিত্র আনন্দ উৎসবে তাদের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে করা উচিত। আর মনে রেখো, কৃষকই বঙ্গজননীর সেবা ক’রছে; তারা মাটির পূজা করে, মানুষের দাসত্ব করে না। কারুর দাসত্ব ক’রে কেউ বড় হ’য়েছে এমন উদাহরণ বোধহয় বিরল। দাসত্ব মানুষকে

হীন ক'রে, মনকে উদার হ'তে দেয় না, সঙ্কীর্ণ ক'রে আনে। সেবা মনকে উন্নত করে। সকল পূজার মূলমন্ত্র হ'চ্ছে সেবা তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে 'সেবা পরম ধর্ম্ম'। যে-কোনো বিষয়ে কৃতকার্য্য হ'তে হ'লে চাই নিরলস সাধনা, সাধনার মূলে কঠোর সেবাব্রত। বাণীর অকুণ্ঠ সেবা ক'রে যেমন আমরা পাই তাঁর জ্ঞানরূপ প্রসাদ ; মাটির সেবা ক'রে আমরা অন্ন-বস্ত্রতো পাইই সেই সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থেরও সংস্থান হয়। এ-ছাড়া মাটির পূজার ভিতর একটা তৃপ্তি আছে। কি রকম তৃপ্তি জান ? তোমরা নিজে নিজে একটা কিছু ক'রে, ছবি এঁকে বা কিছু লিখে যেমন আনন্দ পাও, তেমনি ; সৃষ্টির আনন্দ। তোমাদের অনেকের বাড়ীতে হয়তো বাগান আছে বা ছাদে কিম্বা উঠানে নানা রকম ফুল গাছের টব আছে ; তোমরা পরখ ক'রে দেখ্‌তে পার, নিজের হাতে একটা চারাগাছ পুঁতে, নিজের হাতে রোজ তাতে জল ঢেলে, যত্ন করে বড়ো করবার পর সেটাতে যখন ফুল ফোটে ফল ধরে তখন কী আনন্দ হয় ! নিজের হাতে লালন করা গাছটা যখন ফল-ফুলের সাজে আর সুন্দর সৌরভে হাস্‌তে থাকে, তোমাদের মন তখন যে কী খুসিতে ভ'রে উঠ্‌বে তা তোমরা কথায় কাউকে বোঝাতে পারবে না। তখন তোমাদের মনে হবে যে, কবিদের ফুলের কবিতা বা গানগুলো আদৌ মিথ্যে নয়, এতটুকুও অতিবাদ তাতে নাই। বাগানের সরু কাঁকুরে-পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে তোমরা দেখ্‌তে পাবে সত্যিই তোমাদের—

"পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি',
বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি।"

শুধু তাই নয়, তোমাদের নজরে প'ড়বে

"অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকর গুঞ্জিত
কিশলয় পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।"

নিজে হাতে কিছু সৃষ্টি করার মত আনন্দ লক্ষ টাকার বিনিময়েও মেলে কিনা সন্দেহ। কৃষক যখন দেখে যে, তার রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা পরিশ্রমের ফলে ক্ষেত সোনার ধানে ভ'রে উঠেছে তখন তার যে তৃপ্তি—তা তুমি আমি বুঝতে পারবো না। কৃষক পেটের জন্যেই কৃষিকর্ম্ম নিয়ে থাকে এ-কথা সত্যি, কিন্তু তা-ছাড়া যে ওর থেকে সৃষ্টির আনন্দ পায়, মনের স্বাধীনতা উপলব্ধি করে সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। আরও একটা কথা, কৃষির মত পবিত্র কর্ম্ম আর নাই ব'ল্‌লেও চলে। প্রসিদ্ধ রোমীয় কবি

ভার্জ্জিল ঈশ্বরের কাছে দু'টি প্রার্থনা ক'রেছিলেন। প্রথম—তিনি যেন দার্শনিক হন ; দ্বিতীয়—তিনি যেন কৃষক হ'তে পারেন। কারণ দার্শনিকেরা মুক্ত পুরুষ, জগতের মায়াবন্ধনের অনেক ঊর্দ্ধে তাঁরা ; আর কৃষকেরা সহরের বিলাস প্রতিযোগিতা, হিংসা-দ্বেষ, কলহ-কচ্‌কচির বাইরে, পল্লীর বুকে অনাড়ম্বর আশ্রম জীবন যাপন করে, শান্ত প্রকৃতির প্রতিবেশে।

লেখক

তোমাদের মনে হ'তে পারে, কেবল-মাত্র চাষবাস ক'রে কি কোনো জাতি বেঁচে থাক্‌তে পারে—এই দুর্দ্দান্ত যন্ত্র-যুগে ? কিন্তু তাই, জাতি যদি কোথাও বেঁচে থাকে তো এই প্রকৃতির কোলেই বেঁচে রয়েছে। জাতি জন্মলাভ ক'রেছে পল্লীতে, সমাজ গড়ে উঠেছে ঐ পল্লীতে, তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব'লেছেন, জাতির জীবন পর্ণ কুটীরে ('Nation lives in cottages'), গগনচুম্বি চিম্‌নিওয়ালা কলকারখানায় নয়, বা মার্ব্বেলে-মোড়া অট্টালিকায় অথবা বিজলী আলোকে আলোকিত, রাজপথ শোভিত, পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রাজধানীতে নয় ; পাতার কুঁড়েতেই তার প্রাণ-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক য়্যাব্রাহম্ কাউলে ব'লেছেন যে, কোনো প্রকার শিল্পকর্ম্ম না ক'রেও কেবল মাত্র কৃষিকে পেষা ক'রে জগতে অনেক জাতিই এখনও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাক্‌তে পারে। কেন জানো ? তাদের মধ্যে হানাহানি নাই ব'লে, শান্তি বিরাজ করে ব'লে। তোমরা একটু বড় হ'য়ে ভাব্‌তে শিখ্‌লে বুঝ্‌তে পারবে যে, আধুনিক যন্ত্র-জীবন এবং যন্ত্র-রাজত্ব মানুষের সুবিধার অছিলায় কী নিদারুণ দুঃখ এনে দিয়েছে। সেই দেখেই বোধহয় আমাদের বিশ্বকবি এক জায়গায় যন্ত্রকে ব'লেছেন—

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র !
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ

ধ্বংস-বিকট দন্ত !

............নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র !"

ঐ যে বিরাট ভীষণকায় লোহার দানবগুলো আজকাল সভ্য জগতের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওগুলোর কাজ হচ্ছে—মানুষের সৃষ্টি করবার ক্ষমতাকে সমূলে নষ্ট করা, শান্ত জীবন-যাত্রাকে দম দিয়ে চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করা, চারিদিক থেকে সুবিধা ক'রে দিয়ে তাকে অসুবিধার প্যাঁচে ফেলা। যন্ত্রদানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোনো দেশেই এত হাহাকার ছিল ব'লে মনে হয় না। মানুষ এখন নিজের ফাঁদে নিজে প'ড়েছে। ভেবেছিল যন্ত্রকে ক্রীতদাসের মত খাটিয়ে নেবে কিন্তু হ'য়ে গেল উল্‌টো! যন্ত্রই তাকে ক্রীতদাস করে ফেল্‌লে। যন্ত্রের একহাতে রয়েছে টাকার লাগাম, একহাতে ঘড়ির চাবুক ; মানুষ ঠিক ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত, ঘড়ির কাঁটার খোঁচায় পড়ি-তো-মরি ক'রে ছুটেছে—কোথায় ? জানে না! যন্ত্রকে তোমরা যদি গোলাম ক'রতে পারো তাহ'লে যান্ত্রিক হ'য়ো—যন্ত্র-গোলাম হ'য়ো না।

কৃষির পক্ষে বলবার সবচেয়ে বড়কথা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র যন্ত্রের উপর বেঁচে থাকা যায় না। বেঁচে থাক্‌তে হ'লে মাটি চাই। মাটি থেকেই আমাদের দেহ তৈরী হ'য়েছে, মাটিই আহার্য্য জুগিয়ে সেই দেহের পুষ্টির উপায় ক'রে দেয় এবং মাটিতেই আমাদের দেহরক্ষা করি, কাজেই মাটি আমাদের মা, মাটিই আমাদের পালনকর্ত্রী, মাটিই আমাদের জীবনের লীলাস্থল এবং অন্তিম-শয্যা ; সেই মাটির সেবা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিশেষ ক'রে, বাংলা কৃষকের দেশ। এদেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক। বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হ'লে চাষীকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে, তাদের শিক্ষিত ক'রতে হবে এবং তাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। আজ বাংলার কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায় ; অভাবের তাড়নায় তারা অতিষ্ঠ ; এ-শুধু আমাদের দোষেই। তাদের এতদিন আপনার জন ব'লে মনে করি নি, তাঁদের দিকে ফিরে চাইনি, বরং অবহেলা ক'রে এসেছি যন্ত্রের মোহে ; তাই তাদের এই দুর্দ্দশা এবং সেইজন্যেই দেশেরও সর্ব্বত্র হাহাকার। অভাবের টানে এতদিনে আমাদের চোখ ফুটেছে যে, কৃষককে বাদ দিয়ে দেশকে বাঁচান যায় না। তোমরা যদি বাস্তবিক দেশকে ভালোবাসো এবং দেশের উন্নতি চাও তবে, বড়ো হ'য়ে দেশের গরীব চাষীদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা ক'রো—তাহ'লেই তোমাদের দেশ-সেবা হবে।

কৃষিকর্ম্মটা নেহাৎ খেলো কথা নয় একথা তোমরা নিশ্চয় জানো! রাজা জনক স্বয়ং লাঙ্গল দিতেন এবং জমিতে লাঙ্গল দিতে দিতেই সীতাকে পেয়েছিলেন। তোমরা

অনেকে হয়তো সীতাকে দেখবার জন্যে বায়স্কোপ থিয়েটারে গিয়ে থাক। আমি বলি, তোমরা মাঠে লাঙ্গল ধ'রে দেখ্‌তে পার আসল সীতা মেলে কি না! বায়স্কোপ থিয়েটারের সীতা তো নকল সীতা! তোমরা যদি সরস্বতীর উপাসনা শেষ করবার পর, যাদের সুবিধা আছে, গ্রামে গিয়ে কৃষকদের পাশে লাঙ্গল ধরতে পার, আমার মনে হয়, সীতার দেখা পাবেই ; সীতাতো আর কেউ নন, স্বয়ং লক্ষ্মী যে—তোমাদের ভাণ্ডারে নিশ্চয় বিরাজ ক'রবেন।

আমরা কৃষিকাজকে ঘৃণা করি, কিন্তু ইংরাজ জাতি উন্নত হয়েও কৃষিকাজকে অবজ্ঞা করে না, ভালোবাসে। ইংরাজদের অনেক কিছুই আমরা অনুকরণ করি কিন্তু ওদের কৃষিপ্রীতি আমাদের নজরেই পড়ে না। কত ধনী ইংরাজ' যাদের কোনোই অভাব নাই তারাও কেবলমাত্র কৃষিকর্ম্মকে ভালবাসে ব'লেই চাষবাস করে। আমার এক বিশিষ্ট ইংরাজ বন্ধু আছেন তাঁর নাম মিঃ থিও এইচ্ থর্ণ, তিনি সাংবাদিক, কলিকাতায় তাঁর অফিস আছে। কলিকাতা থেকে প্রায় বার মাইল দূরে মধ্যমগ্রামে তিনি থাকেন। তিনি নিজ হাতে লাঙ্গল দেন। তিনি বলেন—'আমার যদি আফিস না যেতে হ'তো, আমি সারাদিন এই নীল আকাশের তলায়, মুক্ত বাতাসে, উদার মাঠে কেবল লাঙ্গল দিতুম। বীজ বপন করতুম। আমি তাহ'লে প্রাণভরে ভগবানের সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি ক'রে ধন্য হতুম। পরজন্মে যেন চাষার ঘরে আমার জন্ম হয়—তাহ'লে শিশুকাল থেকে আমরণ লাঙ্গলকে আমার নিত্য-সাথীরূপে পেতে পারবো!' আমরা এ-কামনা ভুলেও করি না কারণ কৃষক আমাদের নিদারুণ অবজ্ঞার পাত্র। আশা করি তোমরা ভবিষ্যতে অবজ্ঞা ক'রবে না।

পরিশেষে তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কয়েকমাস পূর্ব্বে "ভুলের ফল" প্রবন্ধে সম্পাদকমশাই জান্‌তে চেয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে বড় হ'য়ে কে কে লাঙ্গল ধ'রতে রাজী আছ! কিন্তু তোমাদের তো কোন সাড়া পাওয়া গেল না! তবে কি বুঝবো তোমরা কৃষকদের ভালোবাসো না। উত্তর দিও।

সম্পাদকমশায়ের অনুরোধের বায়না এড়াতে না পেরে তোমাদের পাতে আমি যাতো উচ্ছে-ভাজা বা শুক্‌তো পরিবেশন ক'রে গেলুম, মজাদার কিছু নয়। কিন্তু এটা জানবে, উচ্ছে-ভাজা বা শুক্‌তো খেতে তেঁতো হ'লেও উপকারী। তাই আমাদের নিত্য আহারের আয়োজনে ওদের দশশালা বন্দোবস্ত।

—চট জল্‌দী কবিতা—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—তিন—

—"কি চাও, বলে ফেল চট করি!"
—"না হলেই নয় মশায়, একটা টেঁক-ঘড়ি;
কোনটা সকাল, কোনটা বৈকাল
চিন্তে আজকাল গোলে পড়ি:
কখন ভাত দিই, কখন চায়ের কাপ্‌ দিই
ঠিক পাইনা কিছুতেই,
গাল খেয়ে মরি
না হলেই নয় মশায়,—একটা টেঁক ঘড়ি!"

—"ভালো, আর কি কি দরকার, চল বল্লি,
আমি ফর্দ্দ ধরি!"
—"যেতে হয় হাট করতে শেয়ালদয়,
একটি পকেট-কম্পাশ্‌ না হলেই নয়—
কোন দিকে যাই চিনে উত্তরে না দক্ষিণে
পূর্বে না পশ্চিমে—ভারি গোলে পড়ি;
যাবো শিবতলা—নিমতলা গিয়ে ফিরতে হয়।
যায় বৃথা সময়
টেঁকঘড়ি একটি, পকেট-কম্পাস একটি নইলেই নয়
—কি করি?"

—"ঘড়ি হলে তো চেন ও চাই?"
—"তাই তো টেঁকঘড়ি চাইচি মশাই!"
—"পকেট চাইতো রাখতে পকেট কম্পাস্‌?
কম্পাস্‌ দেখতে চাই আইগ্লাস্‌
বলতো ফর্দ্দ ধরি??"
"ওমাসে ওগুলো দেবেন ফরমাস্‌
আপাতঃ না হলেই নয় একটী টেঁক-ঘড়ি!"
—"কোম্পানি বাহাদুরকে বল্লে হয় না
তোপ দাগতে ঘড়ি ঘড়ি
বলতো, চট্‌জল্‌দী কৌন্‌চিলে মুভ্‌ করি!"

নিরক্ষরতা দূর করো

বুদ্ধদেব বসু

দুপুরবেলা, সমস্ত পাড়া যখন চুপচাপ, বাবা আপিসে, মা ঘুমিয়ে, ঠাকুমা কোণের ঘরটিতে কাঁথা সেলাইয়ে ব্যস্ত, মণ্টুর তখন সময়। টুকুর কথা কিছু বললুম না, কেননা তার বয়েস মাত্র ছ' মাস; এখনো সে আদ্ধেক দিন দোলনায় শুয়ে গ্যাঁ গোঁ করে আর বুড়ো আঙ্গুল চোষে। মণ্টু দস্তুরমতো বড়ো হ'য়ে গেছে— সামনের জন্মদিনে তার ছ' বছর পুরবে।

বাড়িতে কারো যখন সাড়া-শব্দ নেই, বেলা একটা-দুটোর মাঝামাঝি, তখন মণ্টু পা টিপে টিপে বারান্দায় চলে এলো। মা বলেছিলেন ঘুমোতে—রোজই বলেন—অনেকদিন জোর ক'রে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে মণ্টুর চোখে ব্যথা হ'য়ে যায়। মা শুয়েই একটি বই চোখের সামনে খুলে ধরেন, খানিক পরেই চোখ বুজে আসে, বই খ'সে পড়ে হাত থেকে। চারটে পর্যন্ত মণ্টু নিশ্চিন্ত। দিনের বেলায় পড়ে পড়ে ঘুমোবার সময় কোথায় তার—কত কাজ!

বারান্দায় এসে মণ্টু ছাখে, ঠিক জায়গাটিতে মাদুরটি পাতা আছে, সেলেট পেনসিল ও একখানি আদর্শলিপিও আছে, নেই শুধু আসল মানুষটি। ভারি রাগ হ'লো মণ্টুর। রোজ এ সময়ে রামচরণকে সে লেখাপড়া শেখায়—আজ কোথায় গেলো সে? ও, আজ বুঝি কামাই করবার মৎলব! একবার আসুক না, দেবে সপাসপ কয়েক ঘা।

মণ্টু সিঁড়ির ধারে এসে এদিক-ওদিক তাকালো। একবার ভাবলে, রাস্তায় নেমে বৈরাগীর পানের দোকানটা দেখে আসে—ওখানেই তো ওরা সব আড্ডা ছায়। কিন্তু মা-র কড়া হুকুম তার মনে পড়লো—কক্ষণো একা রাস্তায় যাবে না। তাই সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগলো (এ বদভ্যাসটা তার কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না), আর মনে মনে বৈরাগীর মুণ্ডপাত করতে লাগলো। ঐ লোকটার জন্যেই পাড়ার চাকররা সব উচ্ছন্ন যাচ্ছে—দুপুরবেলা বসে কোথায় একটু পড়াশুনো করবে—তা তো নয়, বসে বসে তাস পেটানো!

অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মণ্টু রাগে ফুলতে লাগলো।

কিন্তু একটু পরেই রামচরণকে দেখা গেলো রাস্তা পার হয়ে বাড়ির দিকে আসছে। তাকে দেখেই মণ্টু চেঁচিয়ে হাঁক দিলে, 'এ—ই রামচরণ!'

'এই যে, আসছি।'

রামচরণ কাছে আসতেই মণ্টু চড়া গলায় বলে উঠলো, 'কোথায় গিয়েছিলে এই তুপুর বেলায়? আজ পড়তে শুনতে হবে না?'

রামচরণ মাথা চুলকিয়ে বললে, 'বেতটা ভেঙ্গে গিয়েছিলো, তাই—'

'দেখি, এনেছো বুঝি নতুন বেত?'

'হোঃ—সে কি এখানে! মজবুত একটা কচি ডাল জোগার করতে প্রায় লেকের ধারে চলে গিয়েছিলুম। তাইতে যা দেরী হলো।'

রামচরণের হাত থেকে নতুন বেতখানা নিয়ে মণ্টু প্রথমে নেড়ে-চেড়ে দেখলে, তারপরে হাওয়ায় সপাং সপাং ক'রে কয়েকটা বাড়ি দিলে। মনে মনে সে খুব খুসী হলো, কিন্তু সে জানে মাষ্টার মশাইরা একবার চটলে সহজে আর খুসী হন না। তাই সে বেশ গম্ভীরভাবেই বললে, 'আর দেরি না। বোসো গিয়ে নিজের জায়গায়।'

রামচরণ বারান্দায় তার ছেঁড়া মাহুরটিতে গিয়ে বসলো। ছাত্র ও মাষ্টারে বয়েসের তফাৎ কম-সে-কম পঞ্চাশ বছর। রামচরণ বুড়োমানুষ। মুখের চামড়া কুঁকড়োনো, মাথার চুল কালোর চেয়ে সাদাই বেশি। মাষ্টার মশাইর জন্য ছোট্ট জলচৌকি ঠিক জায়গায় পেতে দিয়ে রামচরণ বই খুলে বসলো।

মণ্টু কিন্তু বসলো না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে নতুন বেতটি দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ এক ঘা বসিয়ে দিলে রামচরণের পিঠে।

রামচরণ ব'লে উঠলো, 'উঃ!'

'উঃ আবার কী! লেখাপড়া শিখতে হলে বেত খেতেই হয়।'

রামচরণ একগাল হেসে বললে, 'তা কি আর জানিনে! রোদ্দুরে ঘুরে এই কঞ্চি জোগাড় করে আনলুম খামোকা বুঝি?'

মণ্টু গম্ভীরভাবে বললে, 'হ্যাঁ, বেশ করেছো এনে।' তারপর চট্ করে রামচরণের পিঠে আর-এক ঘা বসিয়ে বললে, 'কেমন বেতটা? লাগে?'

'খুব লাগে খোকাবাবু।'

'এই—খোকাবাবু বোলো না। মাষ্টার মশাই বলবে।'

'আজ্ঞে তাই বলবো। মিছিমিছি আর মারবেন না মাষ্টার মশাই, আগে পড়া নিন, পড়া ভুল হোক্, তবে তো মারবেন।'

মণ্টু জলচৌকিতে ব'সে বললে, 'বার করো পড়া। অজ আম শেষ করেছো?'

'ওই যে—ক-এ আকারে কা—'

মণ্টু মেঝেটাকেই বেত দিয়ে ঠুকে বললে, 'নাঃ রামচরণ, তোমার কিছু হবে না। এতদিনে ক-খগুলোও শিখলে না! কবে আর শিখবে?'

'তাই তো ভাবছি, খোকা—মাষ্টার মশাই, লেখাপড়া শেখবার আগে না জানি ম'রেই যাই। বয়েস তো হ'লো।'

'কত বয়েস হ'লো তোমার?'

রামচরণ একটু ভেবে বললে, 'তা তিন কুড়ি হবে।'

'তিন কুড়ি? ও, ষাট! ষাট কাকে বলে জানো না?'

রামচরণ ঘোলাটে চোখ তুলে মিটমিট ক'রে তাকালে।

'একশো অবধি গুনতেও শেখাতে হবে তোমাকে। উঃ, কী করছো এতদিন—কিচ্ছু শেখোনি!'

'এই তো এবারে শিখছি।'

'আচ্ছা, দেখি কেমন শিখেছ।' আদর্শলিপির একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে মণ্টু বললে, 'ঘ বার করো তো?'

প্রায় মিনিট খানেক পরে রামচরণ ম-এর উপরে আঙ্গুল রেখে বললে, 'এই যে।'

'ছাই শিখেছো।' সপাং ক'রে পড়লো বেত।

'প বার করো।'

'এই যে প।'

'বেশ। এবার ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, সেলেট পেনসিল নাও। লেখো তো—ফল—।'

আঙ্গুল কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অনেক চেষ্টায় রামচরণ একটা বিশ্রী চেহারার ফ লিখলে। তারপর ল লিখতে যাবে—কিন্তু প্রথম পুঁটুলিটার উপরে পেন্সিলটা কেবলই ঘুরতে লাগলো—সেখান থেকে যেন আর বেরতেই পারবে না।

মাষ্টারির গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মণ্টু হেসে উঠলো।—'নাঃ, এখনো তোমার অনেক দেরি! দ্যাখো তো আমি কেমন লিখতে পারি!' পেনসিলটা নিয়ে মণ্টু লিখলে—ফল, জল, তরল, অনল। —'দেখলে কতগুলো কথা লিখলুম!'

রামচরণ মুগ্ধ হ'য়ে মণ্টুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়ো হয়েছি—চোখে কিছু দেখতে পাইনে—আর কিছুদিন আগে আরম্ভ করলে মরবার আগে নিজের হাতে একখানা চিঠি লিখতে পারতুম ছেলেকে।'

মণ্টু বললে, 'আরো লিখবো। দেখবে?'

'হ্যাঁ, লিখুন।'

BLEED THROUGH.

'তুমিই বলো কী লিখবো।'

'আমাদের গ্রামের নাম লিখুন।'

'কী তোমাদের গ্রামের নাম ?'

'বিরিঞ্চিপুর।'

বি আর রি লিখে মণ্টু দেখলে ঞ-য়-চ অক্ষরটা কী করে লেখে ঠিক মনে পড়ছে না। ভারি বিশ্রী ওটা, যা-ই বলো! যাক্‌গে, রামচরণ তো আর ওটা চেনে না, তাই সে আন্দাজিরকম গোটা কয় দাগ কেটে দিলে।

'এই ছ্যাখো, বিরিঞ্চিপুর লিখেছি।'

'আমার ছেলের নাম লিখুন—মদনেশ্বর পাল।'

'নাঃ—বাংলা আর না। জানো, আমি ইংরিজিও জানি। এই ছ্যাখো, B-A-T bat। আদর্শলিপি হয়ে গেলে তোমাকে এ-বি-সি-ডি ধরাবো।'

রামচরণ রোমাঞ্চিত হয়ে বললে, 'এ জীবনে কি আর হবে! ক-খই শিখতে পারলুম না এতদিনে!'

মণ্টু বললে, 'হ্যাঁ, এবারে তাড়াতাড়ি যা শেখার শিখে নাও। সামনের বছর আমি ইস্কুলে ভর্তি হবো জানো তো। তখন তো তুপুরবেলা তোমাকে পড়াতে পারবো না—এক সেই রবিবার। ততদিনে টুকুটা একটা বড়ো হবে - ওকেও তোমার সঙ্গে বসিয়ে দেবো—কী বলো?'

'কে, খুকুমণি? খুকুমণি পড়তে শিখবে!'

'শিখবে না তো কি মুখ্যু হ'য়ে থাকবে নাকি? তুমি ভেবো না—এক মাসে হয়ে যাবে তোমার। আচ্ছা, এ—পাতাটা পড়ো তো।'

রামচরণ খুব মন দিয়ে দেখে-দেখে পড়তে লাগলো, 'অ-জ, জ-ল, ব-ন—' কিন্তু তারপরে আর এগুতে পারলে না। এইটুকুতেই তার চোখের ও মাথার এত পরিশ্রম হয় যে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

'তারপর?'

'ব—ব—ব—ব—এটা কী?'

'ড—এ শূন্য ড়। ব—ড়, বড়। বুঝেছো?'

একগাল হেসে রামচরণ বললে, 'ঠিক হয়েছে। তা পড়া আটকে গেলুম, বেত তো মারলেন না।'

'বেশি মারতে নেই।'

'বেশি তো প্রথমেই তু' ঘা মেরে নিলেন। এখন ভুল করলুম, এখন বুঝি তাই ব'লে মারবেন না? ঐ যে একটা বাড়ি কম হলো, তাতে বিদ্যেও কম হবে—হবে না?'

'আচ্ছা, এই নাও।' মণ্টু আস্তে একটা বেতের বাড়ি দিয়ে বললে, 'আচ্ছা, এখন ব'সে ব'সে পড়ো। একটা বেড়াল ছানাকে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলুম...দেখি সেটা আছে না পালিয়ে গেছে। ম্যাও ম্যাও ক'রে আবার মা-কে না জাগায়।'

মণ্টু উঠলো।

রামচরণ বললে, 'হেঁই খোকাবাবু, পায়ে পড়ি, এখনই যাবেন না। আমাকে খ-টা একটু লিখতে শিখিয়ে দিন—ওটা ভারি শক্ত।'

মণ্টু শ্লেটের উল্টো পিঠে প্রকাণ্ড এক খ লিখে বললে, 'এটার উপর বসে বসে মক্সো করো। আমি আসছি।'

বেত দোলাতে দোলাতে মণ্টু গেলো চ'লে। রামচরণ ব'সে ব'সে খ-এর উপরে দাগা বোলাতে লাগলো। হাত কাঁপে চোখে ভালো দেখতে পায় না। ক—খ—প—চ—হ—ত সব তার মাথার মধ্যে কিল্‌বিল্ করতে থাকে। এত সে মনে রাখবে কী ক'রে? কতদিনে পড়তে শিখবে? লিখতে শিখবে কতদিনে? একবার চোখ তুলে রোদে ভরা রাস্তার দিকে তাকায়, আবার খ-এর উপর মক্সো করে।

* * *

বেড়ালছানাকে মুক্তি দিয়ে ফিরে এসে মণ্টু ছাখে, তার ছাত্র শেলেটের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

পট্‌পট্‌ গোটাচারেক বেতের বাড়ি মেরে রামচরণকে সে জাগিয়ে তুললো।...'এই লেখাপড়া হচ্ছে—অ্যাঁ? পড়ে-পড়ে ঘুম!'

রামচরণ চোখ রগড়ে বললে, 'এই—একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। খটা হ'য়ে গেছে। দেখবেন?'

'এখন আর দেখতে হবে না। মা ডাকছেন, যাও—চায়ের জল চাপাও গে।'

রামচরণ একটুখানি হেসে বললে, 'আজ রাত্তিরে ফুটপাতে বসে বসে সব ঠিক করে ফেলবো। কাল একটু শিগগির শিগগির আসবেন।'

মণ্টু বললে, 'কাল তোমার ছুটি। কাল ম্যাটিনিতে সিনেমায় যাচ্ছি বড়োমামার সঙ্গে।'

রামচরণ বললে, 'একটা দিন নষ্ট হলো খোকাবাবু, আর কদিনই বা বাঁচবো!'

BLEED THROUGH.

দেব শিশু

৺রায় বাহাদুর রমণীমোহন ঘোষ

নগ্ন শিশুটি পথ পাশে বসি' খেলিছে মনের সুখে,
কচি হাতে লয়ে মুঠা মুঠা ধূলি মাখিছে মাথায়-বুকে।
ফুলের মতন মুখখানি ভরা মৃদু নির্ম্মল হাস,
পাখীর কাকলী সম সুমধুর কণ্ঠে অফুট ভাষ।
তস্কর সেথা আসি' হেন কালে দেখে—কোথা নাই কেহ,
খেলিছে একেলা সুকুমার শিশু স্বর্ণভূষিত দেহ।
ত্বরিতে শিশুর দেহ হ'তে খুলি' নিল আভরণরাশি,
কাঁদিল না শিশু, মুখে চেয়ে তার কেবল উঠিল হাসি'।

নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ গৌর শিশুর পানে
চাহি'—কি বেদনা উঠিল জাগিয়া চোরের কঠোর প্রাণে।
মরি মরি! এ কি অপরূপ রূপ! ধূলি-ধূসরিত কায়
সোনার পুতলী, শিশু-সন্ন্যাসী! আয়, বাছা, কোলে আয়!
সযতনে চোর কোলে লয়ে তা'রে ধূলি মুছি দিল ধীরে,
যেখানে যা ছিল—রতনে ভূষণে সাজাইয়া দিল ফিরে'।
কোথা গেল তা'র অর্থ-লালসা, কোথা গেল পাপে মতি,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহিয়া গৌর শিশুর প্রতি।

লুসাং

সুকুমার দে সরকার

লুসাংএর বয়স কতই বা হবে? বড় জোর বছর সাতেক। এরি মধ্যে কিন্তু মোষের দল তাকে মেনে নিয়েছে। ভোর বেলা পাঁচন-বাড়ী হাতে নিয়ে বিরাট বিরাট মোষের পেছনে ছোট্ট লুসাং যখন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে, সে ভারী সুন্দর দেখতে। কোমরে আঁচলটি জড়ান, মুখে জুবজুবে করে মহুয়া তেল মাখা আর ঝুঁটিতে বুনো ফুল গোঁজা লুসাং মোষের পাল তাড়িয়ে ঢেউ খেলান পাহাড়ে জমীর ওপর দিয়ে ছোট্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়। সাঁওতাল গাঁয়ের থেকে দূর, বহুদূর দিগন্তে বিছানো দিক্‌ভোলা সবুজ মাঠের ওপর লুসাংয়ের সাদা কাপড়ের আঁচলটা শুধু—রোদে ঝলসানো এক কুচী সাদা বরফের মত ঝক ঝক করে ওঠে। গাংটু সেদিকে চেয়ে একবার শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, লাঙ্গল কাঁধে বলদ জোড়া তাড়িয়ে নিয়ে জমীতে পাড় দিতে চলে যায়।

মা-মরা লুসাংকে গাংটু কি ভালই না বাসে! তার আর ছেলেপুলে নেই, একমাত্র লুসাংই তার চোখের মণি। তাকে একমুহূর্ত্ত আড়াল করতে গাংটুর মন চায় না তবু সাঁওতালের মেয়ে, তাকে কাজ শিখতে হবে, আর ঘরে লোকের অভাবে মোষ চরান'র ভার গাংটু লুসাংএর হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। লুসাং মোষের পাল নিয়ে সেই কত দূরে বনের ধারে কাঁসাই নদীর পাড়ে চলে যায়। গাংটুর মনের ভয় আর যায় না। যদি ভাল্লুক আসে, যদি কিছু বিপদ হয়।

লুসাংএর কিন্তু ভয়-ডর নেই। এই পাহাড়ে, পাথুরে আত্মভোলা উদাস পরগনায় জন্মে তার মনটা পাথরের মতই নির্ভীক সহনশীল।

কাঁসাই নদীর পাড়ে মোষের দল ছেড়ে দিয়ে লুসাং প্রথমে বুনো ফুল তুলতে লেগে যায়। কখনও বা অন্য কোন রাখাল সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে প্রজাপতির পেছনে তাড়া করে। কাঁসাইয়ের ওপারে সবুজ শালের বন ঘন থেকে ঘনতর হতে হতে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। কাঁসাই নদী বাঁক নিয়েছে সেখানে। নদীর জলে গভীর সবুজের ছায়া। সেই থানটায় নদীর পাড়ে এসে বসতে লুসাংয়ের ভারী ভাল লাগে। নদীর সেই সবুজ গভীরতার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে লুসাংয়ের ভয় করে। কি যেন আছে ওই জলের নীচে। একটা প্রকাণ্ড রাজার বাড়ী যেন। নদীর জল শির শির করে কাঁপে! জলের নীচে কারা যেন চলা ফেরা করে,

BLEED THROUGH.

যক্ষি-বুড়ি কত হাজার হাজার বছরের যখের ধন আগলে ফেরে। ওপরে বেলা বাড়তে থাকে, মোষের দল ঝিমোয়। দূরে নীল মেঘের মত পাহাড়ের শ্রেণী নিস্তব্ধ শান্ত। নিরালা পথ বেয়ে দূরে কোন বুড়ো সাঁওতাল লাঠি হাতে কুটুম বাড়ী যায়। দূর থেকে তাকে ঠিক পুতলের মত লাগে। সূর্য্যি যখন মাথায় ওঠে দূর থেকে গাংটুর গলা শোনা যায়—"লুসাং লুসাং!"

লুসাং চমকে জবাব দেয়—"কিরে বাপ?"

"তোর খাবার এনেছি।"

বাপে বেটিতে মহুয়া গাছের ছায়ায় বসে শালের পাতায় ভাত খেতে বসে।

খাওয়া দাওয়া সেরে গাংটু চলে যায়। বলে যায়—"সাঁঝের আগে বাড়ী ফিরিস লুসাং দেখিস যেন দেরী হয় না।'

লুসাং বলে—"না রে বাপ ভয় করিস নি।"

সন্ধ্যেবেলা দিক্‌ভোলা উদাস আকাশের রং বদলায়। রাঙা মুখে ফুলের গয়না পরে মোষের দল তাড়িয়ে লুসাং ঘরে ফেরে। নীলাভ পাহাড়ের মাথা ধূসর হয়ে আসে। সাঁওতাল গাঁ থেকে দিন শেষের মাদলের বাজনা ভেসে আসে—দিপীর দিপাং, দিপীর দিপাং, দিপীর দিপাং দাং······!

এমনি করে বিরাট উদার আকাশের নীচে গাংটু আর লুসাংএর দিন কেটে চলে প্রগাঢ় শান্তিতে।

নিস্তব্ধ চাঁদিনী রাতে সাঁওতাল পরগণায় সে যেন এক অপরূপ রূপ! সমস্ত পৃথিবী যেন চাঁদের রূপোলী হিম মেখে ঝিম ঝিম করে। সাঁওতালেরা এক জায়গায় শালের পাতার আগুন জেলে জড় হয়। মাদল বাজে···দিপীর দিপাং···। কালো পাথরে কোঁদা সাঁওতাল মেয়ে পুরুষে মিলে হাত ধরা ধরি করে নাচতে থাকে। আগুনের শিখাও কেঁপে কেঁপে নাচে, পোড়া কাঠের মধ্যে থেকে খল খল করে হাসির মত একটা কাঠ পোড়ার শব্দ হয়।

ঘরে ফিরে লুসাং বাপকে শুধোয়—"হ্যাঁরে বাপ কাঁসাই নদীর নীচে কারা থাকে রে?"

গাংটু বলে—"কারা আবার?"

"হ্যারে কারা সব থাকে! নীল জলের নীচে ঘর আছে। নেই রে বাপ?"

লুসাংকে ভোলাবার জন্যে গাংটু বলে—"তা হবে বনের দেব্‌তাদের ঘর থাকতে পারে।"

"তুই দেখেছিস কোন দিন?" লুসাং শুধোয়।

"দেব্‌তাদের কি কেউ দেখতে পায়? ঘুমো লুসাং চোখ বোজ।"

লুসাং চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলে—"আমি একদিন দেখতে পাবরে বাপ দেখিস!"

সাঁওতালদের শান্ত গাঁয়ে একদিন প্যান্ট কোট পরে জুতো মস্ মস্ করতে করতে এক সহুরে লোক এল। সে গাঁয়ের প্রধানকে ডেকে এক সভা করে কি সব বলে গেল। অনেক লোককে দুটো করে টাকা দিয়ে গেল। চকচকে রূপোর টাকা। সেই টাকা দেখে এমনকি গাঁয়ের প্রধান শুদ্ধ অবাক। তারপরে সেই সহুরে লোকটার সঙ্গে অনেক সাঁওতাল গাঁ ছেড়ে চলে যেতে স্বুরু করল।

লুসাং সেদিন ঘরে ফিরে প্রশ্ন করেছিল—"সবাই কোথায় যাচ্ছে রে বাপ?"

গাংটু জবাব দিল—"কোম্পানীর কলে কাজ করতে।"

"কোম্পানী কে রে বাপ?"

কোম্পানী কে তা গাংটুও জানে না তবু সে জবাব দেয় "সে মস্ত বড় লোক।"

"তার কলে কি হয় রে?"

"কয়লা তোলে।"

"তুই যাবি না রে বাপ?"

"তুই কি বলিস রে লুসাং যাব?"

লুসাং একটু ভাবল। তারপরে বলল—"সেখানে কাঁসাই নদী আছে?"

"কাঁসাই নদী সেখানে কোথায়?" গাংটু জবাব দিল।

"তবে মোষ চরাব কোথায়?" গাংটু হেসে উঠল।

"সেখানে কি আর মোষ চরাতে হবে রে পাগলী? কলে খাটলেই পয়সা। পয়সা দিয়ে যা খুসী কেনা যাবে।"

"সেই প্রধানের মেয়ের মত কাঁচের মালা!"

"হ্যাঁ।"

লুসাংএর ভারী লোভ হোল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হল সেই কাঁসাইয়ের পাড়, সেই সবুজ জলের নীচে বন-দেবতাদের ঘর। এ ছেড়ে সে যাবে কি করে? সেই বন-দেবতাদের তাকে দেখতেই হবে। কালও দুপুরে নদীর পাড়ে শুয়ে শুয়ে তার মনে হয়েছে জলের নীচে থেকে কে যেন তাকে ডাকছে—লুসাং লুসাং···লু—সা—ং...

কাঁসাইয়ের জলদেবতারা তাকে নিশ্চয় ভালবাসে, না হলে ডাকে কেন? একদিন সে তাদের দেখা পাবেই।

"তুই যাসনি রে বাপ, বুঝেছিস?" লুসাং বলল।

গাংটু জবাব দিল—"ক্ষেত আমার ফেলে কোথায় যাব রে পাগলী? এমনি শুধোচ্ছিলাম।"

মানুষ ভাবে এক, হয়ে যায় আর। সাঁওতালদের গ্রামে সেবার এল ভীষণ অজন্মা। দেবতা আকাশ থেকে এক ফোঁটা জল ঢাললেন না, নতুন জাগা ধানের শীষ হলদে হয়ে শুকিয়ে গেল। ভুট্টার দানা জন্মাল না। সমস্ত দেশ একটা বিরক্ত রুক্ষ মূর্ত্তি নিয়ে ধূ ধূ করতে লাগল। সাঁওতালেরা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে স্বুরু করল। গাংটুর আর দিন চলে না।

সেদিন লুসাং ঘরে ফিরতে গাংটু বলল "কাল আর মোষ চরাতে যাবি না রে লুসাং!"

গাংটুর গলা ভারী।

"কেন রে বাপ?"

"মোষ গুলো বেচে ফেলব।"

লুসাং অবাক হয়ে গেল। সংসারের অভাব গাংটু কোনদিন মেয়েকে জানতে দেয় নি।

"বেচে ফেলবি কেন ?"

গাংটু কি জবাব দেবে ?

"বেচে ফেলতেই হবে।"

"দূর তা কি হয় ?"

"খুব হয় !"

বাপের কড়া গলায় লুসাং চমকে উঠল। কিছু না বলে সে চলে গেল। গাংটুর কাছে কখনও সে বকুনী খায় নি।

সেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে গাংটুর মনে হোল লুসাং কাঁদছে। গাংটু ডাকল—"লুসাং !"

কোন সাড়া নেই।

"লুসাং !"

"লুসাং ! লুসাং !"

লুসাং ফুঁপিয়ে উঠল।

"কি হয়েছে কাঁদছিস কেন ?"

"আমাদের মোষগুলো বেচে ফেলবি রে বাপ ?"

লুসাং আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

খানিকক্ষণ গাংটু কোন জবাব দিল না। তারপরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল "দূর পাগলী এই জন্যে কাঁদছিস ? আচ্ছা বেচব না, হয়েছ ত ?" লুসাং বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল

পরের দিন মোষ চরাতে গিয়ে প্রতিদিনের মত কাঁসায়ের পাড়ে লুসাং শুয়ে আছে। নদীর স[illegible] জলে কেমন যেন একটা হলদে ছোপ পড়েছে। লুসাংয়ের মনে হোল কি যেন আজ হারিয়ে গেছে। [illegible] নদীর ভিতরের সেই রহস্যময় যক্ষপুরি ভোজবাজীতে মিলিয়ে গেছে। সেই চলা-ফেরা, সেই ডাক আর নেই। লুসাংএর বুকটা একটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল।

গাংটুর ডাক শোনা গেল—"লুসাং, লুসাং।"

"কি রে বাপ ?"

"তোর খাবার এনেছি।"

খেতে বসে লুসাং শুধোল "তুই খাবি না রে বাপ ?"

"না আমার ক্ষিধে নেই।"

তারপর থেকেই লুসাং দেখে তার বাপের প্রাই ক্ষিধে থাকে না। কোন অদৃশ্য অনুভূতির বলে লুসাংয়ের কাছে একটু একটু করে সব পরিস্কার হয়ে গেল।

ক্ষেতে ফসল নাই। মরাইয়ে ধান নাই। গ্রাম খাঁ খাঁ !

একদিন রাতে লুসাং গাংটুকে বলল "মোষগুলো বেচে ফেল রে বাপ !"

তখন গাংটুর চোখের জল আর বাধা মানল না। গাংটু বলল "চলরে লুসাং আমরা কোম্পানীর কলে যাই সেখানে কাজ নিই গে।"

লুসাং বাপের বুকে মুখ গুঁজে বলল "তাই চল।"

তারপরে কোম্পানীর কলে একটা বছর কেটে গেছে। সার সার কুলী-বস্তীতে তারা থাকে। গাঁয়ের প্রধানের মেয়ের মত লুসাংএর ও লাল কাঁচের মালা হয়েছে। তবু লুসাংএর মনে শান্তি নেই। পয়সা হয়েছে, স্বাস্থ্য এসেছে, জীবনে তবু কিসের যেন অভাব। কি যেন ফেলে এসেছে সে। এই আধা-সহরে কি আবিলতা, কি কদর্য্যতা। সেই বিরাট আকাশের নীচের সেই প্রগাঢ় শান্তি, সেই দিকভোলা প্রান্তরের ডাক, সে সব যেন স্বপ্ন। আর সেই কাঁসাই নদীর তীরের বন, সেই জলের নীচের সেই অদ্ভুত রহস্যময় কুঠি—সে সব লুসাংকে আজও ডাকে। লুসাং অস্থির হয়ে ওঠে। বনের দেবতাদের সঙ্গে আজও তার পরিচয় হয় নি। তাদের যে তাকে দেখতেই হবে। সে গাংটুকে বলে—"আর কেন, গাঁয়ে ফিরে চলনা বাপ। দেবতা ত আকাশে জল ঢালছে, চল ঘরে ফিরে যাই। টাকা ত হয়েছে আবার মোষ হবে, আবার লাঙ্গল হবে। ক্ষেত ত পড়েই আছে।"

কিন্তু সহরের এই জীবন গাংটুকে গ্রাস করে নিয়েছে। কয়লার খনিতে কাজ করে উঠে কুলিদের সঙ্গে মাতাল হয়ে সে বাড়ী ফেরে। চাষীর সরল জীবন সে ভুলতে বসেছে। লুসাংএর কথায় সে কান দেয় না। তার মেজাজ রুক্ষ কঠিন।

তারপরে আবার ভাগ্যের কারসাজী।

সেদিন লুসাং ঘরে রান্না করছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ বাইরে একটা গোলমালে সে চমকে ছুটে বাইরে এল। কয়েকজন কুলী একজন লোককে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে নিয়ে আসছে। একটু কাছে আসতেই লুসাং গাংটুকে চিনতে পেরে ডুকরে কেঁদে উঠল। খনির ভেতর একটা দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ে গাংটু অজ্ঞান। খনির কাজ নতুন সুরু হয়েছিল, তখনও হাঁসপাতালটাতাল ভাল করে হয়নি। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে গাংটুকে প্রাথমিক খানিকটা চিকিৎসা করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সারা রাত লুসাং তার অজ্ঞান বাপের শিয়রে জেগে বসে রইল। দুঃখকে সে বরণ করতে শিখেছে। ভোরের দিকে গাংটুর জ্ঞান হোল।

"লুসাং !"

"কি ? কি রে বাপ ?"

"আমি কোথায় ?"

"ঘরে, এইত আমার কাছে। তুই মরিসনি বাপ, তুই ভাল হয়ে ওঠ ! আমার আর কেউ নেইরে বাপ !"

গাংটুর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

"লুসাং ঘরে যাবি ?"

"কি বলছিস তুই ? এই ত আমরা ঘরেই আছি !"

"না না, গাঁয়ের ঘরে ফিরে যাবি ?"

লুসাং নিজের কাণকে বিশ্বাস করতে পারল না।

"তুই সত্যি বলছিস বাপ ?"

"সত্যিরে লুসাং, ভাল হয়ে উঠলেই আর এখানে নয়।"

আবার সেই গ্রাম। সেই ক্ষেত-ক্ষামার, সেই গরু মহিষের দল। লুসাংএর চোখে আবার সেই হরিণী-নৃত্য ফিরে এসেছে। আবার তার হাতে সেই পাঁচন বাড়ী। কোমরে আঁচল জড়িয়ে জুবজুবে করে মহুয়া তেল মেখে, মাথায় বনফুলের মালা পরে সে নাচতে নাচতে মোষ তাড়িয়ে চলে। সেই বন সেই কাঁসাই নদী। বিরাট উদাস প্রকৃতির নীচে কি যেন শান্তি, কি অদ্ভুত অপরিমেয় অনাবিলতা। আর কাঁসাই নদীর সবুজ গভীর বাঁকের সেই যক্ষপুরীতে আবার প্রাণ ফিরে এসেছে। কাঁসাই নদীতে জল এসেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর পাড়ে কাশফুলের গোছার মধ্যে শুয়ে অবাক হয়ে লুসাং জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাঁসাইয়ের জল কাঁপছে, সবুজ, গাঢ় সবুজ, নীল কালচে হয়ে কোথায় কোন অতলে যেন মিশিয়ে গেছে। ওপারের সবুজ বনানীতে মর্ম্মর। একঘেয়ে দিনশেষের ঝিঁঝির ডাক। লুসাংএর কেমন যেন তন্দ্রা আসছিল। হঠাৎ সে শুনল—লুসাং···লুসাং···লু—সা—আ—ং···! আর তার চোখের সামনে জলের নীচে অদ্ভুত এক রহস্যময় যক্ষপুরী ফুটে উঠল। প্রথমে সে দেখল যক্ষিবুড়ীর সাপের মত শুকনো আঙ্গুলগুলো সেই পুরীকে ঘিরে আছে। আঙ্গুলগুলো তার মনে হোল যেন সহস্র সহস্র গাছের শেকড়। তারপরে সেই যক্ষপুরীর দরজা খুলে গেল। আর তার মধ্যে থেকে অদ্ভুত সুন্দর সবুজ পরীর দল সার বেঁধে বেরিয়ে আসতে লাগল। কারো হাতে ধানের গোছা, কারো হাতে গমের শীষ, কারো হাতে ফুলের স্তবক। সবুজ পরীর দল অদ্ভুত সার বেঁধে জল ছেড়ে বনের মাথায় উঠতে লাগল।

···লুসাং···লুসাং···লু—সা—আ...ং

লুসাং বলল—"তোমরা কারা ভাই ?"

"আমরা ? আমরা ত বনদেবী।"

লুসাংএর মন একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠল! তার কাণে ভেসে এল একটা মিষ্টি বন-সঙ্গীত; যেন এক সঙ্গে সহস্র সহস্র পল্লবের মিষ্টি মর্ম্মর। আর নীল আকাশ থেকে তারার রাশ কুচি কুচি হয়ে ফুলের মত ঝরে পড়তে লাগল। লুসাং পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজল।

"লুসাং···লুসাং···লু—সাং"

এত আর বনদেবীদের ডাক নয়। স্বরে কেমন যেন একটা ভয় মেশানো, একটা স্নেহ মাখান আগ্রহ। লুসাং চমকে জেগে উঠল।

গাংটু তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

"একি, তুই ঘুমচ্ছিস! রাত হয়ে গেল যে! আমার যা ভয় হয়েছিল!"

লুসাং ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

"বাপ আমি বনদেবতাদের দেখেছি।"

"কি বলছিসরে লুসাং ?"

"হ্যাঁরে বাপ! তারা ওই কাঁসায়ের জলে থাকে। সার বেঁধে তারা বনের মাথায় উঠে গেল। আকাশ থেকে ফুলের মত তারার রাশ ঝরে পড়ল।"

"লুসাং, লুসাং ঘরে চল!"

"ওই দেখ বাপ, ওই দেখ তারার রাশ ফুল হয়ে ঝরে পড়েছে।"

গাংটু দেখল কাঁসাইয়ের পাড়ে ঘাসের মধ্যে থেকে শীষের ওপর মাথা তুলে তারার গোছার মত স্তবকে স্তবকে সাদা রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে। মাথার ওপর আকাশে তারার দল চমকাচ্ছে, ঝলকাচ্ছে, মিটমিট করে হাসছে।

কুকুর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কুকুর আমার খুব ভালো লাগে। কুকুরকে আমি অনেক মানুষের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। জন্তুদের সম্বন্ধে "শ্রদ্ধা" কথাটা যদি ব্যবহার করা যায় তা' হলে বল্‌বো কুকুরকে আমি শ্রদ্ধা করি, অনেক মানুষের চেয়েই বেশী শ্রদ্ধা করি। যদি ভালো একটা কুকুর পাওয়া যায়, বিশ্বাসী আর জোরালো, যার ধারালো নোখ আর ঝক্‌ঝকে দাঁত আর টকটকে জিব, আর সে যদি আমার হয়—তা' হলে যে কোনো আন্তরিক বন্ধু পেয়েছি বলেই মনে করবো। এদের মধ্যে লুকোচুরী নেই, এতো সহজে নির্ভর করা যায় এদের!

কুকুর আমার ভালো লাগে। তবে সব কুকুর নয়। এক গা লোম আর ছোট্ট আর সুখী কুকুর, যারা মেয়েদের কোলে ঘুরতে ভালবাসে, রাত্রে যারা লেপের মধ্যে আদর খাবার বায়না ধরে, সে ধরণের কুকুর আমার দু' চোখের বিষ। সে ধরণের মেয়েলি কুকুর, আর যারই ভালো লাগুক না কেন, যদি আমার পায়ের কাছে ঘুচঘুচ করে আদর কাড়াতে আসে, তা' হলে আমি বল্‌তে কি, তা'কে ফুটবলের মত লম্বা একটা শ্যুট্‌ করার লোভ হয়তো সামলাতে পারবোনা। কুকুর হবে জোয়ান আর জোরালো, মেঘের মত গম্ভীর আর বিদ্যুতের মত তেজী।

ছেলেবেলা থেকেই কুকুর আমার খুব ভালো লাগ্‌তো। আর এটা প্রায়ই দেখা যায় ছেলেবেলায় আমাদের যা ভালো লাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুজনরা তা পছন্দ করেন না। কতবার, বেশ মনে আছে,

কুকুরের জন্যে বায়না ধরায় শেষ পর্য্যন্ত কাণমলা পেয়েছি। বাবার ধারণা কুকুর ভারী অপরিষ্কার, তাদের গায়ের লোমে যত সমস্ত বিচ্ছিরি অসুখের বীজাণু লুকিয়ে থাকে, কাছে এলেই অসুখ করবে। এটা বাবার ধারণা; আর গুরুজনদের যেটা ধারণা সেটা নিয়ে তর্ক করা সব সময় খুব সুখের হয় না। আমার মা অবশ্য কুকুর সম্বন্ধে অন্য আর একটা আপত্তি তোলেন। কুকুর কাছে এসে তাঁর পায়ের কাছে যদি একবার ঘোরাঘুরি করে তা' হলে ভয় পেয়ে, চেঁচিয়ে, তিনি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড একটা বাধাবেনই। তবে মা'র কথা আলাদা: এই তো সেদিন রাত্রে খাবারের সময় একটা আরশোলার জন্যে কি কাণ্ডই করলেন! আমরা টেবিলের চারদিকে ঘিরে বসে গল্প কর্‌তে কর্‌তে খাচ্ছি এমন সময় মা'র পায়ের ওপর একটা আরশোলা উড়ে এসে বস্‌লো। আর যায় কোথা: চেঁচিয়ে-মেচিয়ে তিনি, সত্যি বিশ্বাস করো, সটান টেবিলের ওপরেই পড়্‌লেন: সুপ গেল উল্টে, অমন ভালো মাংসের প্লেটটা মাটিতে পড়ে একেবারে চুরমার। বাবা ব্যস্ত হয়ে মাকে সাহায্য কর্‌তে উঠলেন। বেচারা আরশোলা! পোকা-মাকড়দেরও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিষ আছে তো! মা'র ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত হয়েই বোধ হয় জান্‌লা দিয়ে উড়ে পালালো। সেবার সেই বাচ্চা টিকটিকিটাকে নিয়েই বা কি হুলস্থুল মা বাধালেন! —তাই কুকুর যে তাঁর ধাতে একেবারেই সইবে না, এটা আর বেশী কথা কি!

তবু আশ্চর্য্য, এই বিরুদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই কুকুর আমার খুব ভালো লাগ্‌তো। কতবার ভেবেছি একবার বড় হতে পারলে হয়: এমন সুন্দর একটা কুকুর পুষবো! আমি যখন বেড়াতে যাবো আমার পেছনে সে আস্‌বে, অনেক রাত পর্য্যন্ত টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প জ্বালিয়ে যখন পড়্‌বো স্প্রিঙের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে সে ঘুমুবে, আমি ডাকলে কাণ খাড়া করে ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে সে ছুটে আসবে। ঐ সময় কত কথা ভাবতুম!

তবু, প্রথম যে কুকুর আমার ভালো লেগেছিল তার ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম! এ ছাড়া উপায় ছিল না!

তখন আমার ঠিক কত বয়েস মনে নেই। অনেক দিন অসুখে ভোগার পর বাইরে কোথাও চেঞ্জে যাওয়া হবে ঠিক হল। সমুদ্রতীর আমার পক্ষে উপকারী হবে, ডাক্তারে বললেন, অতএব পুরীতে এলুম আমরা সবাই। সমুদ্রের ঠিক ওপরেই চমৎকার ফিকে হল্‌দে রঙের একটা বাড়ী। সব সময় ঢেউ ভাঙার অনবরত শব্দ শোনা যায়। বারান্দায় বস্‌লে দূরে সমুদ্রের শান্ত নীল ছায়া চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। দিনে দুপুরে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে শুয়ে আকাশের মত সেই নীল সমুদ্রের দিকে চাইলে দু' মিনিটের মধ্যেই চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে; ঘুম পায়।

দু' একদিনের মধ্যেই শরীরে বেশ জোর পেলুম। আরো কয়েকদিনের মধ্যে সমুদ্রতীরে বেড়াবার অনুমতি ডাক্তার দিলেন। সকাল-বিকেল বাবা-মা'র সঙ্গে অল্প অল্প বেড়িয়ে আসতুম।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। পায়ের তলায় সবে বালি আরম্ভ হয়েছে। একদিকে ফণিমনসার ঝাড়। আর তার পাশেই দেখলুম হল্‌দে একটা কুকুর কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে। আমাদের ছোট দলটিকে সে তার সাম্‌নের পা-দুটোর ওপর মুখ রেখে ছল্‌ছল্‌ করে চেয়ে দেখছিল। অল্প বয়েসের

নির্ব্বুদ্ধিতা আমাকে যেন একেবারেই ছেড়ে যায় নি। তাই কোনো কিছু না ভেবেই ডাক্‌লুম: "এই আয়; তু তু···"

আর ওম্‌নি কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখলুম খুসীর হাসিতে তার সমস্ত মুখ ভরে গিয়েছে। তোমরা ভাব্‌ছো কুকুরের আবার হাসি কি? কিন্তু সেই বিকেলে আমার সঙ্গে তোমরা থাক্‌লে স্পষ্ট বুঝতে পারতে কুকুরটা সত্যিই হেসেছিল কিনা। তার চোখ দুটো দিয়ে হাসির আলো ঠিক্‌রে পড়্‌ছিল। পথের কুকুর সেই বোধ হয় প্রথম কোনো মানুষের কাছ থেকে আহ্বান পেলো। ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে তার অপরিষ্কার দেহ নিয়ে আমার খুব কাছে সে এসে দাঁড়ালো। মানুষের ডাকে কুকুরটার ঝিমানো দেহে যেন নতুন প্রাণ এসেছে।

বাবা-মা খানিক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর কুকুরটাকে পুষ্‌বো বলে সত্যিই ডাকি নি তখন: এক্‌টা পথের কুকুর, ময়লা, সাধারণের চেয়েও অনেক খারাপ। কুকুরটাকে এম্‌নিই একবার ডেকেছিলুম! কিন্তু কে জান্‌তো আমার সেই ডাককে সত্যিকারের নিমন্ত্রণ ভেবে ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে উঠে সে আস্‌বে! আমি সেটার দিকে আর মন না দিয়ে একটু জোরে জোরে পা ফেলে মা'র পাশে এসে পড়লুম। গল্প কর্‌তে কর্‌তে কুকুরটার কথা আর মনেই ছিল না। হঠাৎ একবার পেছনে চাইলুম। দেখি কুকুরটা কিছু দূরে মাটির দিকে মুখ রেখে আস্‌তে আস্‌তে আমাদের পেছনেই আসছে।

সেদিন বেড়ানো শেষ হল। আমরা বাড়ী ফিরে এলুম। আড়চোখে দেখলুম্ কুকুরটা বাড়ীর কিছুদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পরের দিন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখি গতকাল সন্ধ্যায় কুকুরটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল। আমাকে দেখেই গা ঝেড়ে উঠে সে দাঁড়ালো। ওর চোখের ভেতর সেই হাসি। আমি আর ডাকলুম না। তবুও আমাদের পেছনে পেছনে কিছুদূর দিয়ে সমস্তক্ষণ সে ঘুর্‌লো। আমরা যখন বাড়ী ফির্‌লুম সে জায়গাটাতেই এসে সে থেমে গেল। বিকেলেও তাই।

কুকুরটার ওপর ক্রমশঃ ভারি মায়া পড়ে গেল। সেই প্রথম কুকুর আমার ভালো লেগেছিল। এই বোবা জীবের অদ্ভুত নিষ্ঠুর ভালবাসা আমার শিশুমনকে আশ্চর্য্য করেছিল। আমি পকেটে করে বিস্কুট নিয়ে যেতুম। বিস্কুট ছুঁড়ে দিলে ভারি খুসি হয়ে এক লাফে সেটা নিয়ে নিতো। আমার ছোট্ট একটা লাল বল ছিল। অনেক দূরে সেটা ছুঁড়ে দিলে তীরের মত ছুটে গিয়ে সেটা নিয়ে আসতো সে শিকার ধরার ভঙ্গীতে।

এই রকমে কুকুরটার সঙ্গে বেজায় ভাব হল। প্রতিদিন তাকে উৎসুক হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখতুম। সেই সমুদ্রের তীরে কুকুরটাই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।

বেশ সময় কাটছিল।

কিন্তু মুস্কিল হল অল্প ক'য়েকদিন পরেই। প্রতি সপ্তাহে স্থানীয় এক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা কর্‌তে আস্‌তেন। সেদিন বেড়িয়ে ফির্‌ছি! বাড়ীর কাছাকাছি এসে হাতের লাল বলটা অনেক দূরে ছুঁড়ে দিলুম। সেটা মুখে করে কুকুরটা এক নিমেষে আমার কাছে ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে এসে দাঁড়ালো। আদর করে সেটার পিঠ বার দুই চাপড়ে বিদায় নিলুম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ডাক্তারের চোখ এড়ালো

না। বাবাকে তিনি বল্‌লেন, "দেখুন! আপনার ছেলেকে ষ্ট্রীট ডগের সঙ্গে খেলা কর্‌তে দেবেন না। অসুখের জার্ম্‌স্ ক্যারি করে।"

কথাটা নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ। আমার ওপর আদেশজারী হল আর কখনো কুকুরটার সঙ্গে খেলা না করি।

বিকেলে যথা সময়ে আবার বেড়াতে বেরুলুম। ইচ্ছে করেই পকেটে বিস্কুট আর হাতে লাল বল নিই নি। যথাস্থানে কুকুরটা শুয়ে ছিল। আমাকে দেখেই লাফাতে লাফাতে ছুটে এলো। বাবা তেড়ে গেলেন সেটাকে। আমি কোনো কথা বল্‌লুম না। কুকুরটা কি বুঝলো জানি না। আমরা যতক্ষণ বেড়ালুম আমাদের পেছন পেছন মাথা নীচু করে সে ঘুর্‌লো, তারপর বাড়ীর কাছাকাছি এসে, গেটের ওধারে সেই জায়গাটায় থেমে গেল।

পরের দিন সকালে আমি আর বেড়াতে গেলুম না। বল্‌লুম শরীরটা ভালো নয়। বাড়ীর সবাই যখন বেরিয়ে গেল চুপিচুপি লাল বল আর অনেকগুলো বিস্কুট নিয়ে বেরুলুম! কুকুরটা চুপচাপ শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো। এলো আমার কাছে। তার মাথায় আস্‌তে আস্‌তে হাত বুলুতে লাগলুম। খুসিতে সে উপ্‌চে পড়ল। খাওয়ালুম বিস্কুটগুলো! বল নিয়ে খানিক খেলালুমও।

কিন্তু বয়স তখন অল্প। খুব চালাক হয়ে উঠি নি। বাবাদের যে ফিরে আসার সময় হয়েছে সেদিকে খেয়ালই নেই। কুকুরের সঙ্গে আমার খেলা দূর হতেই তিনি দেখেছিলেন। অতি সহজেই ধরা পড়লুম।

এর পরেই আমি দু' দিন জ্বরে ভুগলুম। বাবার দৃঢ় ধারণা হল কুকুরটাই এর কারণ। আমাদের দু'জনের ওপরেই তিনি চটে উঠলেন। তারপর আমাকে ভয় দেখাবার জন্যেই বোধহয় দো-নলা বন্দুকটা বার করে পরিষ্কার কর্‌তে লাগ্‌লেন। বল্‌লেন, এর পর আবার যে-দিন কুকুরটার সঙ্গে আমাকে খেল্‌তে দেখবেন সেদিনই তার কুকুর-জীবনের শেষ হবে।

তখন ছোট ছিলুম আর বন্দুক সম্বন্ধে কেমন একটা অশরীরী ভয় ছিল। তাই বাবার কথায় সত্যিই ভয় পেলুম। এখন দেখছি বাবা মোটেই শিকারী নন। কুকুর মারা ত দূরের কথা তাঁর জীবনে এক্‌টা চিল ছাড়া আর কিছুই শিকার করা হয়ে ওঠে নি। আর তাই বা কি রকম: চিলটি একটা ঝোপের ওপর বসে ছিল, কিছু না ভেবেই বাবা গুলি করেন। বেচারার ডানায় গুলি লেগে পড়ে যায়, রক্ত বেরোয় প্রচুর, কিন্তু মরে না। প্রথমে বাবা উৎসাহিত হয়ে ছুটে গেলেন। কিন্তু চিলটার ছট্‌ফটানি আর প্রচুর রক্তপাত দেখে মিনিট দুয়ের মধ্যেই বাবার উৎসাহ কোথায় উবে গেল। বাল্‌তি বাল্‌তি জল এলো, চাকর পাখা আন্‌লো, তারপর ঘণ্টা তিনেক বাবার হাতে সেবা খাবার পর সেটা মরে যায়। এরপর অনেক দিন বাবা বন্দুকে হাত দেন নি। মাঝে মাঝে সেটা বার করে পরিষ্কার করে তুলে রাখতেন, আর যখনই আমরা কোলকাতা থেকে কোথাও বাইরে যেতুম আমাদের প্রবাস-জীবনের একজন নিষ্কর্ম্মা সঙ্গী হয়ে সেটা ট্রেণের কাম্‌রায় উঠে বস্‌তো।

কিন্তু তখন ছোট ছিলুম তাই অতি সহজেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলুম কুকুরটাকে বাবা হয়ত সত্যিই

গুলি করে মেরে ফেল্‌বেন। ভয়ে ভালো ঘুম হত না। রাত্রে দুঃস্বপ্নে দেখতুম গুলি খেয়ে কুকুরটা যেন ছট্‌ফট্‌ করছে।

দিন চার-পাঁচ পরে আবার বেড়াতে যাবার অনুমতি পেলুম। ভেবে ছিলুম কুকুরটা এতোদিনে আমাকে না দেখে হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। কিন্তু গেটের ভেতর থেকেই দেখলুম কুণ্ডুলি পাকিয়ে যথাস্থানে সেটা শুয়ে রয়েছে। ভয়ে সমস্ত বুকটা ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করে উঠলো। যেমন করেই হোক সেটাকে বাঁচাতে হবে। সামনেই অনেক পাথর আর ভাঙা ইঁট পড়ে ছিল। দু' পকেট বোঝাই করে সেগুলো নিলুম। আর কুকুরটা যখন আমাকে দেখে ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে ছুটে এলো পাগলের মত একটার পর একটা ইঁট সেটার দিকে ছুঁড়তে লাগ্‌লুম। কুকুরটা প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ভাবলো প্রথমে হয়তো নতুন ধরণের এটা কোনো খেলা। কিন্তু ক্রমাগত মার খেয়ে তার উৎসাহ কমে গেল। কেঁউ কেঁউ করে করুণ-ভাবে ডাকৃতে ডাকৃতে সে আবার সেই ফণিমণসার ঝোপের পাশে স্প্রিঙের মত কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো।

চোখের জলে সেই বিকেল তখন আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

এর পর সত্যিই পুরীতে আমার শরীর আর ভালো হল না। কেবলই ভুগ্‌তে লাগ্‌লুম। ডাক্তার বললেন কোনো পাহাড়ী জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে। আমরা শিলঙে চলে এলুম।

———

আমার একটি কুকুর ছিল
নামটি বাহাদুর,
গর্জ্জনেতে উঠতো জেগে
বুনো বাঘের সুর।
মাঘমাসেতে বাঘ এলো সেই
হলুদকুঠি গাঁয়,
বাঘের সাথে লড়াই দিতে
বীর বাহাদুর যায়।
সেই লড়াইয়ে কি হল তা
বুঝতে পারো কেউ?
পালালো বাঘ শুনতে পেয়ে
বাহাদুরের ঘেউ।

দূরের আলো

জাপানী-মারু

আমার দেশের ছোট্ট ভাইবোনেরা—

[সন্ধ্যেবেলা ঠাকুমার কাছে শুয়ে রূপকথার রাজকুমার আর বেঙ্গমার গল্প তোমরা অনেক শুনেছ। শুনে ভেবেছ যে কবে দেখা পাবে সেই রাজকুমারের আর তার পক্ষীরাজ ঘোড়ার। ঘুমের ঘোরে জেগে উঠেছ তার উড়ে চলার শব্দে। পাতালপুরীর রাজকুমারী সোণার কাঠির স্পর্শে প্রাণ ফিরে পেয়েছে ইত্যাদি। এ সব গল্প আর তোমাদের আনন্দ দিতে পারে না। আর ঠাকুমাও তাঁর ঝুলির সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন তোমাদের।

তোমাদের ভাল লাগবে এই আশায় লিখছি। আজ তোমাদের একটা দেশের কথা বলব সেটা এতদিন ঘুমিয়ে আর নিজেদের নিয়ে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা হয়ে ছিল। অন্ধকারেই থাকতে এরা অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত ৬০ বছরের মধ্যে কি করে জেগে উঠল তাই তোমাদের আস্তে আস্তে বলব। আমরা যেদিন এ-দেশকে আবিষ্কার করলুম সেদিন এর অধিবাসীকে অসভ্য বলতেও দেরী করি নি কেন না আমরা ভাল করেই জানতুম যে আমাদের মত সভ্য এবং শিক্ষিত জাতি প্রাচ্য দেশে আর নেই। এ দেশটাকে আমরা জানি 'নিপ্পং' বা 'জাপান' বলে। এর মানে 'সূর্য্যোদয়ের দেশ'।

তারপর একদিন সোণার কাঠির স্পর্শে এর ঘুম ভেঙ্গে গেল—জেগে উঠে দেখল তাদের সবই আছে—নেই শুধু সভ্যতার আলোক। আরম্ভ হ'ল ভাঙ্গা-গড়ার কাজ। আরম্ভ হ'ল মহাজাগরণের উৎসব আর এতদিনের স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ধূম।

যদি এ দেশের বিষয়ে আরও জানতে চাও তবে আমাকে লিখো বা আমার বাড়ীতে এস—যদি সম্ভব হয়। অনেক রকমের বই আর ছবি আছে সেগুলো সম্পাদক মশাই ছাপাতে পারবেন না—আর সম্ভবপরও নয়।···লেখক]

খবরের কাগজখানা খুলে যদি তোমরা কোনদিন 'জাহাজের খবর' পাতাখানি খোলো তা' হলে দেখতে পাবে জাপান থেকে যে সব জাপানী জাহাজ আসে বা যায় তাদের নামের পেছনে 'মারু' লেখা থাকে—অবশ্য যাত্রীবাহী এবং মালবাহী জাহাজে। এই 'মারু' শব্দটা কি করে হ'ল আর কেনই বা ব্যবহৃত হয় তাই নিয়ে কিছু বলব। জাপান

ডিক্‌সনারিতে 'মারু'র মানে লেখা আছে: a circle, a ring, a canoe, exposed, a round face, a column, barbecue etc. এখন এ শব্দটা কি করে জাহাজের নামের পেছনে এসেছে এ নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। সেই জন্যে এর আসল অর্থ অতীতের কোলে মিশে আছে। তা' হলেও নীচের ঘটনাগুলো থেকে অনেকটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে: প্রায় ৪০০০ বছর আগে চীনদেশে কোতেই নামে একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে স্বর্গ হতে 'হাকুদোমারু' নামে একজন অভিজ্ঞ দূত এসেছিলেন লর্ড তাইচোশিকে জাহাজ-তৈরী-করা শেখাবার জন্যে। এতে মনে হয় তখন থেকে 'হাকুদোমারু'র নামানুযায়ী 'মারু' চলে আসছে।

জাপানে অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্রের তলায় 'আজুমিনো সোরামারু' নামে যে একজন জল-দেবতা বাস করেন, যাঁর নামে সীগাশিমা দ্বীপের সীগা মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছে, তাঁর নামানুসারেই জাহাজে 'মারু' ব্যবহৃত হয়—ইত্যাদি। আগে জাপানী নৌকো-গুলো চামড়ায় জড়ান—আকারে ছোট আর গোলাকার—এই রকম তৈরী হ'ত। এতে মনে হয় যে 'মারু'র অর্থ অনুযায়ী ঠিক হ'ত।

আবার ছেলেদের অনেকে আদর করে তাদের নামের পেছনে 'মারো' বা মারু যোগ করে ডাকত। আমাদের দেশেও যেমন আছে আদরের ডাক: খুকুমণি, হাবুরাম, আহুবাবু ইত্যাদি। ওদের দেশে আদরের নাম: হিতোমারো, নাকামারো, হিয়োসিমারু, উসি ওয়া কামারু * ইত্যাদি। জাপানের ইতিহাস খুললে দেখতে পাবে যে 1400 খৃঃ অঃ মুরোমাতির সময়ে (চতুর্থ আসিকাগা সিওগুণ) ইয়োসিমোতির জাহাজের নাম ছিল গোসিওমারু, গোজামারু ইত্যাদি।

১৫৯১ সালে হিদে ইয়োসি কোরিয়া জয় করবার জন্য তাঁর অধীনস্থ রাজাদের বড় বড় জাহাজ তৈরী করবার হুকুম দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে 'নিপ্পংমারু' নামে একটী জাহাজ

* উসি ওয়া কামারুর বিষয়ে একটা চমৎকার গল্প আছে। তোমাদের পরে বলব।

তৈরী করেছিলেন, সেটা 'ভাসমান-দুর্গ' নামে পরিচিত ছিল। কি অঙ্গসৌষ্ঠবে, কি কারুকার্য্যে নিপ্পংমারু তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ ছিল।

বর্ত্তমানে জাপানে দু'টি প্রধান জাহাজ কোম্পানী আছে:

(1) Nippon Yusen Kaisha মানে Japan Mail Steamship Co.

(2) Osaka Shosen Kaisha মানে Osaka Oceanic Steamship Co.

প্রথম কোম্পানীর সব চেয়ে বড় জাহাজ হচ্ছে M. S. Chichibumaru, যেমন ইংলণ্ডের 'কুইনমেরী' আর ফ্রান্সের 'নর্ম্মাদি'।

ভাল লাগলে আমাকে লিখো।

শ্রীসুনীল কুমার চক্রবর্ত্তি
৫৩।৪, প্রিন্স রহিমুদ্দিন পার্ক
টলীগঞ্জ, কলিকাতা

———

পেতেম যদি একটা জাহাজ দিতেম আমি পাড়ি।
সাতসাগরের ঢেউয়ের শেষে ওকামারুর বাড়ি।
ওকামারু! ওকামারু! নামটা চেনা চেনা,
তার কাছে তো পয়সা ফেলে' রঙীন পুতুল কেনা।
'মারু' 'মারু' জাহাজগুলো পুতুল নিয়ে আসে,
সস্তা দরে মাল বিকিয়ে ওকামারু হাসে।
কোন্ যাদুতে পয়সা দরে পুতুল দিয়ে যায়,
শিখতে যাবো ওকামারুর পুতুল-কারখানায়।
'মারু' মারো' জাহাজগুলো পাল তুলেছে বুঝি?
আসছি আমি, টিকিট কিনে চাপবো সোজাসুজি।

"কিং লিয়ার"

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৪

রাজা লিয়ার বড় মেয়ে গণেরিলের কাছে এখন থাকেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি বুঝতে লাগলেন, মিষ্টি কথার মিথ্যে কোথায়!

বড় মেয়ে যত রকমে পারলো, বুড়ো বাপের কাছ থেকে যা আদায় করে নেবার, তা ষোল গণ্ডা নিল। কিন্তু তার বদলে বুড়ো লিয়ার, যা আশা করেছিলেন, তার কিছুই পেলেন না।

কয়েক মাস যাবার পর, গণেরিল একদিন ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে, বাবা, তুমি থাক, থাক! কিন্তু তোমার সঙ্গে যে ঐ একশোজন দেহরক্ষী......এ বড় বাড়াবাড়ি......একশো জন দেহরক্ষী নিয়ে কে কবে মেয়ের বাড়ীতে থাকে?

বড় মেয়ের কথা শোনেন আর বুড়ো লিয়ার চমকে চমকে ওঠেন......কোথায় গেল সেদিনকার সেইসব সুন্দর সুন্দর কথা.....

বুড়ো বাপের সেবা করা দূরে থাক, যদি হঠাৎ কখনও বাপের সঙ্গে মুখামুখী সাক্ষাৎ হয়ে যেতো, তাহলে, গণেরিল মুখ বেঁকিয়ে, ভ্রূ কুঁচকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতো। এই ভাবে আরও কিছুদিন যাবার পর, বাড়ীর চাকরেরা পর্য্যন্ত বুড়ো রাজার অসম্মান করতে লাগলো। একদিন তিনি বিরাট রাজত্ব চালিয়ে এসেছেন...তাঁর একটা আঙ্গুলের সঙ্কেতে লোকের জীবন মরণ দুলে উঠেছে......আজ তিনি নিজের হাতে সে শক্তি অপরের হাতে তুলে দিয়েছেন......তাই রাগে, ক্ষোভে তিনি ভুলে গিয়ে আগেকার মত আদেশ করে ওঠেন কিন্তু সে আদেশ শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসে। বৃদ্ধ স্থবির সিংহ নিষ্ফল আক্রোশে শুধু দেখে যে, তুচ্ছ শশকে তাকে পদাঘাত করে যাচ্ছে!

তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল তাঁর বয়স্য। যেদিন তাঁর ছিল রাজপাট, সেদিনও এই বয়স্য তাঁর ছিল পাশে পাশে। নানারকম হাসির আর মজার কথা বোলে তাঁকে আনন্দে রাখতো। আজ আর তাঁর রাজ্যপাট নেই। তবুও সে আছে সঙ্গে সঙ্গে, সকল দুঃখ, সকল দৈন্য সব লাঞ্ছনার মধ্যে সে এখনও তেমনি হাসে;...হাসি দিয়ে চায় লাঞ্ছনাকে আড়াল করে রাখতে।

আর সঙ্গী ছিল তাঁর এক চাকর। অদ্ভুত, অপূর্ব্ব এই চাকরটী। সবাই যখন

তাঁকে ছেড়ে গেল, সে এলো তাঁর পাশে। গণেরিলের চাকরেরা যখন বুড়ো লীয়ারকে অপমান করতো, তখন এই চাকরটী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো...তখন তার মুখের চেহারার দিকে চাইলে মনে হতো না যে সে সামান্য চাকর! আসলে সে চাকর নয়। রাজা লীয়ার আর্ল অফ কেন্ট-কে তো তাঁর রাজ্য থেকে দিলেন তাড়িয়ে কিন্তু তাড়িয়ে দিলেও কেউ কেউ যায় না। যাকে তিনি দিলেন তাড়িয়ে, সে আবার ফিরে এলো চাকরের ছদ্মবেশে। রাজা কিন্তু বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারেন নি। যেদিন তাঁর রাজ্যপাট ছিল, সেদিন আর্ল অফ কেন্ট যেমন তাঁর সম্মান রক্ষা করবার জন্যে তাঁর পাশে ছিলেন, নির্ব্বাসিত হয়েও তিনি চাকরের ছদ্মবেশে তেমনি তাঁর প্রভুর পাশে রয়ে গেলেন।

একদিন গণেরিলের এক চাকর অত্যন্ত বেয়াদপী করায়, বুড়ো লিয়ারের সেই চাকর তাকে কাঁধে করে তুলে রাস্তার ধারে গভীর খাদে ফেলে দিয়ে এলো। গণেরিল একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রেগে সে বুড়ো বাপকে জানালে, এসব এখানে আর চলবে না—তোমার লোকজন সব বিদেয় করতে হবে! তারা বসে বসে রাজভোগ খাবে আর গুণ্ডামি করবে তা আমি সহ্য করবো না আর। নিতান্ত একা যদি না থাকতে পার তোমার মত দু'একজন বুড়োকে সঙ্গে রাখতে পার, বুঝলে?

বৃদ্ধ, স্থবির লীয়ার আর সহ্য করতে পারলেন না। চীৎকার করে বলে উঠলেন, আমার লোকদের অযথা নিন্দা তুই করিস্ না! তারা জানে তাদের কর্ত্তব্য! গণেরিল, এখনি আমার ঘোড়া তৈরী করতে বল্, আমার লোকদের নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। আমার আর এক মেয়ে আছে! আমার ভয় কি? এই বলে বৃদ্ধ চলে এলেন। চলে আসবার সময় মেয়েকে ডেকে অভিশাপ দিয়ে বল্লেন, কোন দিন যেন তোর কোন সন্তান না হয়। যদি হয়, আজ তুই আমাকে যে-ভাবে শাস্তি দিলি, তেমনি শাস্তি যেন তার হাত থেকে তুই পাস্।

এই বলে তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে তাঁর মেজ মেয়ে রিগ্যানের বাড়ীর দিকে চল্লেন।

৫

রিগ্যানের রাজ্যের কাছে এসে তিনি আগে তাঁর চাকরকে খবর দেবার জন্য পাঠালেন। চাকরের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে দিলেন যে তিনি আসছেন।

এধারে গণেরিল বাপকে তাড়িয়ে সন্তুষ্ট হয় নি। যেই লীয়ার তার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, অমনি সে তাড়াতাড়ি বোনকে পরামর্শ দেবার জন্য বোনের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। লীয়ারের চিঠির জবাবে দুই বোনে জানালো যে, তাঁর অত লোকজনকে তারা পুষতে পারবে না। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, একলা থাকতে পারেন!

লীয়ার বুঝলেন যে, এখানেও তাঁর আশ্রয় নেই। দরিদ্র হলেও, তিনি রাজা। রাজা হয়ে তিনি তাঁর অনুচরদের ত্যাগ করতে পারেন?

সেদিন তুমুল ঝড়ের রাত্রি। ঘন বৃষ্টি পড়ছে। সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বৃদ্ধ লীয়ার পথে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর অন্তরের-অন্তঃস্থল থেকে দীর্ঘশ্বাসে বেরিয়ে এলো,

পশ্চিমা বাতাস, তুমি আরও ঝড় আনো ..আমি জানি, মানুষের মন যত নিষ্ঠুর, তুমি তবুও তত নিষ্ঠুর নও......

সেই রাত্রিতে পথে এক ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে তাঁকে মাথা গুঁজতে হলো।

পরের দিন তাঁর সেই চাকর তাঁদের সকলকে ডোভারে নিয়ে এলেন। ডোভারের ওপারে ফ্রান্স। সেখানে তাঁদের রেখে তিনি একা ফ্রান্সে এলেন, কর্ডিলিয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

কর্ডিলিয়াকে চাকর-রূপী আর্ল অফ কেন্ট সব কথা জানালেন। বৃদ্ধ পিতার সেই নিদারুণ অপমান শুনে কর্ডিলিয়ার মন কেঁদে উঠলো। তিনি কাল-বিলম্ব না করে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ডোভারে বৃদ্ধ পিতার কাছে এলেন।

ফিরে এসে দেখেন, বৃদ্ধ লীয়ার পাগল হয়ে গিয়েছেন। সারাদিন আপনার মনে ঘুরে বেড়ান, গাছ-পালা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে কি কথা বলেন। মাথায় নেই রাজ-মুকুট, তার বদলে বুনো গাছের কাঁটা মাথায় জড়িয়ে থাকেন। মানুষ দেখলে চিনতে পারেন না।

কর্ডিলিয়া তাঁকে এনে সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। যখন তাঁর একটু জ্ঞান হলো, তখন কর্ডিলিয়া তাঁকে ডাকলেন, বাবা!

হঠাৎ সেই ডাক শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠল, কে?

—আমি কর্ডিলিয়া, তোমার মেয়ে!—আমাকে কেন অকারণ তোমরা ঠাট্টা করছো! এক এক বার মনে হচ্ছে, আমি যেন তোমাকে চিনি...কিন্তু তোমার পোষাকগুলোকে তো আমি চিনি না!

—বাবা! চেয়ে দেখ! আমি তোমার সেই আদরের কর্ডিলিয়া! আমি তোমার অপমানের নেবো প্রতিশোধ!

সেই অচৈতন্য বার্দ্ধক্যের মধ্যে হারানো স্নেহের স্পর্শ পেয়ে লীয়ারের চেতনা আবার জেগে উঠলো। আদরে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে উঠলেন, আমাকে তুই ক্ষমা কর, কর্ডিলিয়া, আমি তোকেই ভুল বুঝেছিলাম!

৬

এধারে যখন গণেরিল আর রীগ্যান শুনলো যে কর্ডিলিয়া ডোভারে সৈন্য নিয়ে রাজা লীয়ারের কাছে এসেছে, তখন তারা দুজনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। গণেরিল তার স্বামীকে বললে যে কর্ডিলিয়া তাদের রাজ্য কেড়ে নেবার জন্যে এসেছে। স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে, ডিউক অব আলবানী সৈন্য নিয়ে ডোভারের দিকে যাত্রা করলেন।

কর্ডিলিয়ার মুষ্টিমেয় সৈন্য পরাজিত হয়ে গেল! রাজা লীয়ার ও কর্ডিলিয়াকে বন্দী করে কারাগারে রাখা হলো। গণেরিল আর রীগ্যানের মতলব ছিল যে, কর্ডিলিয়াকে তারা ফাঁসী দেবে। সেই রকম সমস্ত আয়োজন করা হলো। ফাঁসীর দিনও ঠিক হয়ে গেল।

এধারে ডিউক অব আলবানী জানতে পারলেন যে এই সব ব্যাপারের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর দুষ্ট-বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁকে সমস্ত ব্যাপার লুকিয়ে গণেরিল তাঁর দুরভিসন্ধি সফল করে এসেছে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।

গণেরিল যখন বুঝতে পারলো যে তাঁর স্বামী সমস্ত জানতে পেরেছেন তখন শাস্তির ভয়ে সে নিজে বিষ গ্রহণ করলো এবং সে-ই যদি মরে যায়, তবে রিগ্যানই কেন বেঁচে থাকবে, এই ভেবে রিগ্যানকেও গোপনে বিষ খাওয়ালো।

ওধারে কর্ডিলিয়ার ফাঁসীর হুকুম রদ করবার জন্যে ডিউক অব আলবানী তাড়াতাড়ি কারাগারে লোক পাঠালেন। কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। গণেরিল সে বন্দোবস্ত পাকা করে, বিষ খেয়ে মরেছে।

বৃদ্ধ লীয়ার কারামুক্ত হয়ে দেখেন, কর্ডিলিয়ার মৃত দেহ!

বৃদ্ধের আর তখন কোনও জ্ঞান নেই। মৃত কন্যার দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে সোজা তিনি ডিউক অব আলবানীর সভায় এসে উপস্থিত হলেন।

—যে তোকে খুন করেছে, আমি বৃদ্ধ হলেও তাকে হত্যা করে এসেছি...কর্ডিলিয়া...মা আমার...একবার চা...চাইবি না? আর তুই এই পৃথিবীর দিকে চাইবি নি, না......

বৃদ্ধের তখন আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না।

মৃত কন্যার দেহকে জড়িয়ে বৃদ্ধ সেইখানেই শুয়ে পড়লেন।

আর উঠলেন না।

BLEED THROUGH.

সুকুমার দে সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উপেনবাবু চলে যাওয়ায় পরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, হরিদাস এসে ডাকল "কি ... ইস্কুল যেতে হবে না ?"

জিগেস করলাম "উপেনবাবু কে হরিদাস ?"

হরিদাস আমার মুখের দিকে তাকাল, গম্ভীর সে মুখ।

"কেন বল দেখি ?"

"না, এমনি জিগেস করছি।"

"তোমার খালি প্রশ্ন ! কে, কেন, কোথায় ? ছেলে মানুষের এত খোঁজে দরকার কি ?"

তখন তার ওকথার ঠিক জবাব দিতে পারিনি। আজ বুঝি যে কি কেন এবং কোথায়—ছোটদের মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন। পৃথিবী তখন ও বয়সের কাছে বিস্ময়কর। হরিদাসের বয়সে পৃথিবী তখন তার রহস্য হয় উন্মুক্ত করে শেষ হয়ে গেছে না হয় সে মন সে সম্বন্ধে হয়ে গেছে উদাসীন।

বললাম "বলই না এত আপত্তি কেন ?"

"কে জানে বাপু !" হরিদাস জবাব দিল "কোন ইস্কুলের মাষ্টার নাকি !"

বকতে বকতে হরিদাস ঘরে গেল।

তারপরে সেদিন বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরছি হঠাৎ পেছনে আমার নামের পেছনে বাবু লাগিয়ে ডাক শুনে বিস্মিত হলাম।

"সুরথ বাবু ?"

পেছন ফিরে দেখি ময়লা পায়জামার ওপর ঢোলা ঢালা জামা পরা একটা লোক মাথায় তার একটা ভুটিয়া টুপি, নেংচাতে নেংচাতে অথচ বেশ দ্রুত আমার দিকে আসছে।

লোকটা কাছে আসতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

"কি চাই ?"

"জোয়দ্রথ বাবুর ভাগিনা না ?" লোকটা জিগেস করল।

তার কথার একটু টান ছাড়া বাংলা পরিস্কার।

"হ্যাঁ কেন ?"

লোকটা বেঁটে, ঈষৎ খোঁড়া, চোখের নীচের হাড়গুলো অস্বাভাবিক স্পষ্ট।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল "এই চিঠিটা জোয়দ্রথ বাবুকে দিতে হোবে।"

একটা চিঠি লোকটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বললাম "তুমি নিজে দিয়ে এসোনা।"

লোকটা হাসল। ছোট ছোট চোখগুলো তার আরও ছোট হয়ে গেল।

"বাবু আমাকে দেখলে খুসী হোবেন না।"

"তার মানে ?"

"তুমি খুব ভাল ছেলে সুরথ বাবু ! নাও চিঠিটা নাও তোমাকে আমি ভুলব না।"

হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন করলাম "আমার নাম জানলে কি করে ?"

লোকটা হঠাৎ আমার হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল—"চক্ররেখা ! কি আশ্চর্য্য !"

"কি বলছ কি ?" অধীর স্বরে জিগেস করলাম।

"কিছু না ! নাও চিঠিটা নাও।"

গম্ভীর মুখে চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে লোকটা নেংচাতে নেংচাতে হন হন করে চলে গেল।

মামার সঙ্গে সেই রূঢ় ব্যবহারটা করা অবধি মনটায় একটা খোঁচা রয়ে গিয়েছিল। হাজার হোক তিনি গুরুজন এবং আমাদের ওপর তাঁর পরের ব্যবহার যথেষ্ট ভদ্রজনোচিত হয়েছিল। ভাবলাম চিঠিটা দেওয়ার সূত্রে মামার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসব।

বইটই রেখে সেই উদ্দেশ্যে মামার ঘরের দিকে যাত্রা করেছিলাম। দালানের আধো অন্ধকার থামের আড়াল থেকে হঠাৎ হরিদাসের আবির্ভাব হলো।

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"কেন ? মামার কাছে।"

"এখন যেওনা !" হরিদাসের স্বর গম্ভীর।

"কেন ?"

"যেওনা। ভাল হবে না বলছি।"

চাকরত নয় যেন বাড়ীর মনিব! কিন্তু হরিদাসের স্বরে কি যেন ছিল, এবং ভাবলাম যে আমার চেয়ে মামাকে ভাল জানে হরিদাস। তাই তখনকার মত নিরস্ত হলাম। কিন্তু ঔৎসুক্য গেল না। আধঘণ্টা পরে পা টিপে টিপে দালানের দক্ষিণ দিক দিয়ে মামার ঘরের পেছনে এসে উঠলাম। ঘরের সে দিকটায় অনেকগুলো ঘুলঘুলি ছিল। একটা ঘুলঘুলির সামনে দিয়ে প্রকাণ্ড মোটা একটা থাম উঠেছে। থামটার বালী সব খসে গিয়ে ইঁটগুলো দাঁত ছরকুটে আছে। পা টিপে টিপে থামটার ইঁটগুলো বেয়ে উঠে পড়লাম তারপরে ঘুলঘুলিটায় হাতের ভর দিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। যা নজরে পড়ল স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তাতে। দেখি যে মামার সামনের টেবিলে সেই খোঁড়া ভুটিয়াটা বসে আছে আর মামার চোখ দুটো যেন আগুনের মত জলছে।

তারপরে মামার গলার সেই বাঘের গর্জ্জন "যাও বেরিয়ে যাও!"

ভুটিয়াটা হাসল "আর একবার ভেবে দেখুন জোয়দ্রথ বাবু!"

মামা লাফিয়ে উঠলেন। ঠিক সেই সময় আমার হাতে একটা ঠোকর লাগল। তখন বুঝিনি যে সেটা পায়রার ঠোকর। হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। আর সেখানে দাঁড়ায়?

খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছি। ঘরের কোণে রেড়ীর তেলের বাতীটা হাওয়ায় কাঁপছে আর দেওয়ালে সেই সঙ্গে কয়েকটা ভুতুড়ে ছায়াও কাঁপছে। দিনের ঘটনাগুলো মনের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে রেখেছিল। ভুটিয়া লোকটা কে? তার সঙ্গে মামার রাগের কি কারণ? আর মামা সব সময় ঘরেই বা বন্ধ থাকেন কেন? পৃথিবীতে মামার কোন বন্ধু নেই? সঙ্গে সঙ্গে উপেনবাবুর কথা মনে পড়ল। উপেনবাবুই মামার একমাত্র বন্ধু? অমন সৌম্য চেহারার লোক মাত্র ইস্কুল মাষ্টার!

মা ঘরে এলেন এই সময় সমস্ত কাজটাজ সেরে! এসব কথা মাকে আমি বলিনি। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন তিনি, শুধু শুধু তাঁকে আর চিন্তিত করে তুলে লাভ কি? দেখলাম মা একবার মশারীর বাইরে থেকে আমার বিছানায় উঁকি দিলেন।

"সুরথ ঘুমিয়েছিস?"

"উঁ!"

"পিদ্দিমটা নিভিয়ে দিই?"

"উঁ!"

পিদ্দিমটা নিভিয়ে দিতেই জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর অন্ধকারে মোড়া একটা ধোঁয়াটে ক্ষীণ আলো এসে ঘরে ঢুকল। মশারীর মধ্যে দিয়ে কালো আকাশে আলপিনের মাথার মত তারাগুলো ঝাপসা। উদাস গ্রামের বাহ্যপ্রকৃতি যেন ঘরের মানুষকে তার রহস্যময় স্বরে ডাকছে। তন্দ্রায় চোখ ভারী। সেই আধো জাগা আর আধো তন্দ্রায় দেখলাম দূরে আকাশে একটা সবুজ আকাশ-পিদ্দিম লাল জ্বল জ্বল করছে। আধ চেতনার মধ্যেই মনে হোল অকালে আকাশ-পিদ্দিম? কেন? তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে এল। আবার তন্দ্রা ভেঙে গেল। বাইরে শেয়াল ডাকছে। আবার তন্দ্রা আসতে লাগল। আকাশটা নজরে পড়ল। কি আশ্চর্য্য আকাশ পিদ্দিমের লাল আলোটা কখন সবুজ হয়ে গেছে! কেন? কি করে?

ঘুমে চোখ বুজে এল।

ক্রমশঃ

দোত্ কলমে

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

দোত্ কলমে হচ্ছে সেদিন কথার কাটাকাটি
তাই না দেখে কাগজ এসে জুটলো!
খানিক্ পরে টেবিল 'পরে বাধ্‌লো লাঠালাঠি
চেয়ার দূরে থেকেই মজা লুঠ্‌লো।

দুই জনে তো ভাবই ছিল, থাক্‌তো পাশাপাশি,
কে জানে বা এম্‌নি হবে খাপ্‌পা!
ঝগড়া বেধে গেল যখন—কী যে সর্ব্বনাশী;
বাস্তবিকই, কথাটা নয় ধাপ্‌পা!

কোত্থেকে যে গড়ায় কিসে যায় না কিছু বলা!
কারণটা তো একেবারেই তুচ্ছ।
কলমটা তো আগুন হ'য়ে বাগিয়ে নিবের ফলা,
বার দুই তিন নাড়িয়ে নিলে পুচ্ছ।

দোয়াত তখন বিষম রেগে উঠ্‌লো যেন ফুলে,
খট্‌-খটা-খট্‌ বাজালো তার ঢাক্‌না।
টেবিল বলে, 'নারদ্‌-নারদ্‌' কপালে চোখ তুলে;
চেয়ার হাসে—রগড় দেখা যাক্ না।

'কে লেখে রে, তুই না আমি?' এই তো হ'ল কথা।
তারপরেতেই বাধ্‌লো তুমুল তর্ক।
কলম বলে, "লেখকেরই মালিক হওয়া প্রথা,
দোয়াত, তুমি শুধুই কালির পর্ক।

"আমিই লিখি, মালিক আমি; নইলে কেবা আর!"
দোয়াত শুনে মুখ ভেংচে ব'ল্‌লে—
"আমাকে বাদ দিয়ে লেখে সাধ্য আছে কার;
তুই তো চলিস্ আমি সরল চ'ল্‌লে।"

পেন্‌সিলল্‌টা এক পাশেতে চুপ্‌টি প'ড়ে ছিল,
হঠাৎ কী যে মগজে তার জাগ্‌লো !
"আমি লিখি" ব'লে সে যেই কথায় ফোড়ন দিল
দোত্‌কলমে তার উপরেই লাগ্‌লো।

মুখটা থেঁতো ক'রলে দোয়াত একটী লাথি মেরে,
চালায় কলম খোঁচা এবং ডাণ্ডা।
পেন্‌সিল কয়—"ঘাট হ'য়েছে, দাওগো আমায় ছেড়ে
তোম্‌রাই তো লেখার বড় পাণ্ডা।"

কলম তখন দোত্‌কে বলে—"কি বল্‌ছিলি ব'ল্‌তো,
তুই নইলে আমি নাকি খঞ্জ ?
খুব যে দেমাক্‌ ! দাঁড়া তোকে দেবই উচিত ফল্‌তো ;
একটী খোঁচায় পাঠাই ময়ূরভঞ্জ।"

এই না ব'লে গোঁত্তা দিলে যত্‌ত ছিল জোরে,
দোতের বপু টেবিল পরে প'ড়লো।
সাদা কাগজ একপাশেতে ছিল চুপ্‌টী ক'রে
যতেক কালি তার উপরে ঝ'রলো।

সেই সময় এলুম আমি লিখ্‌তে বোধহয় কিছু,
হ'চ্ছে যখন চীন-জাপানী যুদ্ধ।
শব্দ পেয়েই দু'জনে তো ক'রলে মাথা নীচু,
চুপ্‌চাপ্‌, নাই নড়ন-চড়ন শুদ্ধ।

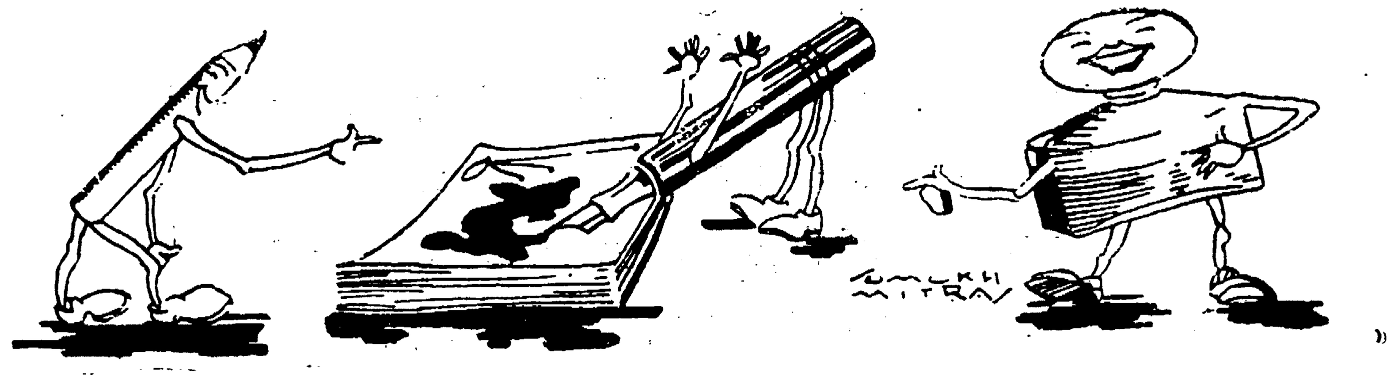

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

অনিক

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একটী কৃতী শিল্পীর নাম চীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাঁর নাম অনিক; তাঁর জন্ম হয়েছিল ১২৲৩ খৃষ্টাব্দে নেপালে। খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল, সহপাঠীদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় sketcher, painter, modeller ও decorator—রেখা-শিল্পী, চিত্রকর, কারিকর ও প্রসাধক ছিলেন।

মূর্ত্তির মাপ-যোক (প্রতিমা-মান) সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে নিজের দেশ থেকে যে পুঁথিখানি তিব্বত ও চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি তিব্বতীয় ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে এখনও সংরক্ষিত আছে।

১২৬০ খৃষ্টাব্দে চীন ও তিব্বতের অধীশ্বর কুবলাই খাঁর গুরুর আদেশে তিব্বতের রাজধানী লাশাতে ...র্ণময় বৌদ্ধবিহার (প্যাগোডা) নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। নেপাল থেকে একশত শিল্পী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ...ন্তু বহু অনুসন্ধানের পর মাত্র ৮০ জন শিল্পী পাওয়া গেল। এই শিল্পীদের নেতা হয়ে যাবার মত ...াকের অভাবে সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

অনিকের বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর; তিনি এগিয়ে এসে বললেন শিল্পীদের দলপতি হয়ে যেতে ...নি প্রস্তুত আছেন। সকলে প্রবল আপত্তি করে উঠলেন যে তাঁর বয়স অত্যন্ত অল্প, উত্তরে একটু হেসে ...নিক বললেন "আমার বয়স কম হলেও আমি বুদ্ধিতে ত কারো চেয়ে কম নই।" অবশেষে তাঁকেই ...পতি করে পাঠান স্থির হল।

নেপালী শিল্পীদের নিয়ে অনিক তিব্বতে যান; সেখানে ২ বছরের মধ্যেই তিনি বিহার-নির্ম্মাণ শেষ ...লেন।

দেশে ফিরবার অনুমতি প্রার্থনা করায় রাজগুরু অনিককে চীনদেশে কুবলাই খাঁর সভায় যেতে অনুরোধ ...লেন—অনিক চীনযাত্রা করলেন।

রাজসভায় সম্রাট অনিককে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তুমি প্রকাণ্ড একটা দেশে এসেছ—তোমার ভয় করছে না ত ?"

উত্তরে অনিক বললেন, "সম্রাট আপনি বহুদেশের শত শত প্রজা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, আমি আপনার পুত্রতুল্য ; পিতার সমক্ষে পুত্রের কি ভয় থাকতে পারে ?"

সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেন, "তুমি আমার সভায় এসেছ কিসের জন্য ?"

অনীক উত্তর দিলেন, "সম্রাটের আদেশে তিব্বতে বিহার নির্ম্মাণ করেছি এবং সমস্ত নির্ম্মাণ কার্য্য দু'বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ দেখেছি এবং বুঝেছি যে তিব্বতের জাতিরা নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ। আমার বিনীত প্রার্থনা যে আপনি সে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন যেন লোকে নিশ্চিত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে।"

আবার সম্রাট প্রশ্ন করলেন, "শিল্পী, তুমি কি কি কাজ জানো ?"

অনিক বললেন যে সম্পূর্ণ নিজের রীতিতে তিনি রেখা-চিত্র, মূর্ত্তি-গঠন ও ঢালাই করে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে পারেন। সম্রাট রাজপ্রাসাদ থেকে বহু পুরাতন একটি তামার মূর্ত্তি এনে জিজ্ঞাসা করলেন সেই মূর্ত্তিটি অনীক রিপু-কর্ম্ম করে রং করতে পারবেন কি না। তিনি বললেন, "এই মূর্ত্তিটি কয়েক শত বছর পূর্ব্বে এ দেশের সম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। এ দেশে এমন কোনও শিল্পী নাই যে এটি সংস্কার করতে পারে, তুমি কি এটি নূতন করে দিতে পারবে ?"

উত্তরে অনিক বললেন, " একাজে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই তবে আপনি অনুমতি করলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে মূর্ত্তিটির সংস্কার কাজ শেষ হল ; সংস্কার শেষে মূর্ত্তিটিকে আর পুরাণ বলে মনেই হল না ; অনিকের অলৌকিক শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পেয়ে কুবলাইখাঁ প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলেন ; সমবেত চীন-শিল্পীরা লজ্জায় অধোবদন হলেন।

চীনের উত্তর ও দক্ষিণ রাজধানী ও অন্যান্য নানাস্থানের বিহারের অধিকাংশ মূর্ত্তিই অনিকের কীর্ত্তি বলেই বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

১২৭৪ খৃষ্টাব্দে অনিককে বহু সম্মান প্রদর্শন করে চীন-সম্রাট তাঁকে উপাধি দান করলেন। তিনি ধাতুময়ী প্রতিমাকারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে গণ্য হলেন ; তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে বাঘের ছবি আঁকা একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হল।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে অনিককে আবার উপাধিদানে বিভূষিত করা হল—রাজশিল্পী-সমাজের সচিব।

অনিকের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতিকে চিরজাজ্জ্বল্যময়ী করে রাখবার জন্য তাঁকে আরও উপাধি দান করা হল।

ডাক টিকিট

গ্রেটবৃটেনের নূতন যে পাঁচ শিলিং ডাকটিকিট বার হল, তা যেমন সুন্দর তেমনি সাদাসিদে। পাঁচ শিলিং যে ডাকটিকিট, সে-দিন পর্য্যন্ত চলে এসেছে, তার সঙ্গে আকারে ও পরিকল্পনায় এর কোনোই সাদৃশ্য নেই। এই নূতন ডাকটিকিট সমজ্দার মহলে খুব খাতির পেয়েছে।

এই ডাকটিকিটের একটা ফোটো আমরা ছেপে দিলুম। চমৎকার অনাড়ম্বর পরিকল্পনা, কোথাও জবরজং একটা ভাব নেই। ফুল লতা পাতা চক্কর বেচক্কর ডাকটিকিট দেখে দেখে পুরনো হয়ে গেছে। এই নূতন ডাকটিকিটে যা আছে তা না থাকলে চলে না, অথচ কি সুন্দর মানিয়েছে ! যে কোনো রংচঙা বইয়ের মলাটের চেয়ে এই ডাকটিকিট কম যায় না। টুকটুকে লাল জমির উপর ফিকে রঙে আসল ছবিটি ছাপা হয়েছে। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী এডমাণ্ড ড্যুলাক্ এই টিকিটের পরিকল্পনা করেছেন। অনেকের মতে এত সুন্দর ডাকটিকিটের পরিকল্পনা তিনি এর আগে আর করেননি। এডমাণ্ড ড্যুলাকের নাম নিশ্চয়ই তোমরা বিশেষ ভালো করেই জানো। ওমর খৈয়ামের যে সব আশ্চর্য্য ছবি তিনি এঁকেছেন, তা একবার যে দেখেছে সে আর ভুলতে পারবে না। তার আঁকা এই ছবিগুলিই তাঁকে শিল্পী মহলে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

গ্রেটবৃটেনের নূতন ডাকটিকিটের পর ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশগুলির নূতন ডাক-টিকিটের কথা মনে পড়ে। নূতন এই সব ডাকটিকিট দেখলে আর বুঝতে বাকী থাকে না যুদ্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পোল্যাণ্ডের নূতন ডাকটিকিটে দেখা যাচ্ছে মার্শাল পিল্-সুদ্স্কির বাহিনী বীরদর্পে মার্চ করে চলেছে। হায় পোল্যাণ্ড ! তার পরেই ইয়োরোপের ম্যাপ থেকে তোমার নাম মুছে গেল ! পোল্যাণ্ডের আর একটা ষ্ট্যাম্পে দেখা যাচ্ছে বি-সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করছে, ষ্ট্যাম্পের এক কোণায় মার্শাল স্মিজ্‌লি রিজ্‌এর প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার নূতন সব ডাকটিকিটে যুদ্ধ জাহাজের ছবি দেখা যাচ্ছে।

মূক ও মুখর

মল্লিকা মিত্র

আমরা সুন্দরকে যেমন ভালবাসি, তার কাছে কাছে থাক্‌তে চাই বা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার ক'রে নিতে চাই, তেমনি ক্ষুদ্রকেও ভালবাসি খুব, তাকেও চোখে চোখে রাখতে ইচ্ছা হয়, তাকেও পোষ মানাবার ইচ্ছে হয় খুব বেশী। সুন্দর না হ'লেও ছোট্ট ব'লে অনেক মার্কা-মারা অসুন্দর অনেক সময় আমাদের খুবই প্রিয় হ'য়ে পড়ে। দেখতে যেমনই হোক না কেন ক্ষুদ্র বস্তু বা প্রাণী দুইই আমাদের দৃষ্টি, প্রীতি এবং স্নেহ ভালবাসা আকর্ষণ করে। বোধ হয় এই কারণেই সেদিন ছোট্ট নিরীহ চড়াই পাখীর ছানাটীকে আমার ধরে রাখতে ইচ্ছে হ'য়েছিল। ধরেওছিলুম, কিন্তু রাখতে পারিনি, তাকে রক্ষা করবার ভার নিয়েও শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার ক'রতে পারিনি।

ছুটির দিন, কি একটা গল্পের বই নিয়ে তেতলার ঘরে নিবিষ্ট মনে প'ড়ছি হঠাৎ বেশ কচি কণ্ঠের স্বরে আমার চমক ভাঙ্গলো—"মা—মা—" একটা ছোট্ট চড়াই পাখীর ছানা আমার দিকে পিছন ফিরে তার মাকে ডাক্‌ছে। তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হ'ল বোধ হয় খেলা ক'রতে ক'রতে তার মায়ের অন্য-মনস্কতার সুযোগে একটু বেশী উড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখনও ডানা খুব শক্ত হয়নি, একেবারে বেশী উড়ে আসার দরুণ অত্যন্ত ক্লান্ত—আর উড়তে পারছে না।

আমি বইয়ের পাতায় একটা চিহ্ন রেখে বন্ধ ক'রলুম। পাখীটা পিছন ফিরে ঘরটা ভাল ক'রে দেখলে, তারপর আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে কাতরভাবে ব'ল্‌লে—"আমার মা কই,—আমার মা?" "তোর মা এখুনি আস্‌বে, তুই আমার কাছে আয়।" পাখীটার চোখ ছলছল ক'রছিল, সে আবার কাতরভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক্‌লে—"মা—ও মা—" আমি ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে তার কোমল গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলুম—"তোর মা এক্ষুণি খুঁজতে আস্‌বে তোর কোনো ভয় নেই—।" পাখীটা উড়ে যাবার চেষ্টা করলে না, অনাগত ভয়ে আমার হাতের ভিতর মুখ লুকিয়ে বল্‌লে, "মা—"। তারপর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল।

তার নরম পালক, কচি ঠোঁঠ, অপটু ডানা, লাল লাল কোমল পা দুটো আর ভয়বিহ্বল ভাব দেখে মনে হ'লো সে বোধ হয় এই প্রথম তার মাকে চিনেছে, জগতের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। প্রথম পাওয়া ব'লেই তার হারাবার ভয় এত বেশী! বেচারার এই অসহায় অবস্থা আমাকে নিতান্ত চঞ্চল ক'রে তুল্‌ল। তাকে নিরাপদে রাখবার জন্যে একটা ছোট্ট খাঁচায় তার সীমা নির্দ্দেশ করলুম। তার খাবার জন্যে এনে দিলুম চাল ও জল—তাড়াতাড়ি খুঁজে যা পেলুম। কিন্তু সে কিছুই মুখে দিল না। আমি কত ক'রে বল্‌লুম—"ওরে, তুই ভাবিস্ নি, তোর মা এখুনি এসে প'ড়বে।"

পাখীটা কেবল চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লো আর মাঝে মাঝে "মা, ও মা, তুমি কোথা" ব'লে কাতর কণ্ঠে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। তার বড্ড মন কেমন করছিল।

অনেক সাধ্য সাধনা ক'রেও তার মন ফেরাতে না পেরে হতাশ হ'য়ে সবেমাত্র বইটা খুলেছি এমন

সময় 'এই যে আমাদের খোকাকে পেয়েছি', শব্দে ফিরে দেখি খাঁচার কাছে তার মা আর বাবা এসে হাজির। খাঁচার ভিতর থেকে ছানাটা ডেকে উঠ্‌ল—"মা, মা—" সে কি আনন্দ তার!

তার মা ব'ল্লে—"তোকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান। দুষ্টু ছেলে কোথাকার, একটু উড়তে শিখতে না শিখতেই এই!"

তার বাবা ব'ল্লে—"দেখ, খোকা, মার কথা না শোনার কি ফল। এখানে বন্দী হ'লে, আর ছাড়া পাবি না। আমাদের কাছে আসতে পারবি না।"

তার মা আনন্দের আতিশয্যে এ কথাটা বুঝতেই পারে নি যে তার খোকা বন্দী। সে যে তার খোকাকে জীবিত অবস্থায় নিরাপদে দেখ্‌তে পেয়েছে সেইটাই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখন বুঝতে পারল যে, তার খোকাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না তখন অধীর হ'য়ে প'ড়ল—বারবার খাঁচার চার পাশে ঘুরে ঘুরে তাকে ব'লতে লাগ্‌লো—"খোকা তুই কাঁদিস্ নি, আমি দেখছি তোকে বের করবার ব্যবস্থা।"

ছানাটা ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্‌লে—"আর কখনও তোমার কাছ ছাড়বো না মা, আমায় নিয়ে চল।"

তার বাবা মা দু'জনে অনেকক্ষণ খাঁচার চারপাশে ঘোরাঘুরি ক'রলে, খাঁচার দরজাটা ধরে নাড়াচাড়া ক'রলে, কিন্তু কিছুই ক'রতে পারছে না দেখে বোধ হয় হতাশ হ'ল। আমি এক দৃষ্টে তাদের চেষ্টা লক্ষ্য ক'রছিলুম।

তার মা ব'ল্‌লে—"খাঁচার দরজাটা যে বন্ধ, এখন উপায়? মানুষটার একটু দয়ামায়া নেই।"

তার বাবা বল্‌লে—"ওরা আমাদের খাঁচায় পুরে কী যে আনন্দ পায় জানি না।"

তার মা—"একবার মানুষটাকে ব'লে দেখ্‌লে হয় না, আমাদের খোকাকে ছাড়বে না।"

তার বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লে—"বল্‌তে গেলে তোমাকে শুদ্ধ খাঁচায় পুরে ফেল্‌বে।"

"তা যদি ফেলে ফেলুক, ভালই হবে, খোকার কাছে থাক্‌বো।" ব'লে সে আমার দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল।

পাখীটার বাবা তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে ব'ল্‌লে—"তুমি দাঁড়াও, আমি যাই, যদি খোকার বদলে আমায় আট্‌কে রেখে খোকাকে ছেড়ে দেয় তুমি তোমার খোকাকে নিয়ে থাকবে।"

মা ব'ল্‌লে—"তা হবে না তোমাকে ফেলে আমরা থাকতে পারবো না। তার চেয়ে চল, দু'জনেই এক সঙ্গে গিয়ে বলি, ধরে তো দু'জনেই বন্দী হব। তিনজনে মিলে খাঁচায় থাক্‌বো।"

আর থাক্‌তে পারলুম না! সামান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে কী স্নেহ, কী ভালবাসা! তিন জনের মধ্যে কেউই কাউকে ছাড়তে নারাজ। আস্তে আস্তে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিলুম। তার মা বাপ দু'জনেই ভিতরে ঢুক্‌ল—তাদের খোকাকে আদর করলে কত রকমে, তার ঠোঁটে ঠোঁট ঘ'সে, তার সর্ব্বাঙ্গে মাথা বুলিয়ে, ঠিক আমাদের মা বাপ যেমন আদর করেন। তারপর তারা সবাই মিলে আমার দিকে চাইলে এবং ছানাটার বাবা ব'ল্‌লে—"আপনি যদি ইচ্ছে করেন, খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। আমরা যাকে খুঁজছিলুম তাকে যখন পেয়েছি তখন এই কয়েদখানাকেই বাড়ী ক'রে নিতে পারি। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমাদের খোকাকে যত্ন ক'রে রেখেছেন এবং আমাদের ঢুকতে দিয়েছেন।"

আমি তার কথার কোনো উত্তর খুঁজে পেলুম না কেবল খাঁচাটা এনে সাম্‌নের খোলা ছাদে বসিয়ে

দিলুম, দরজা খোলা অবস্থাতেই মুক্ত আকাশের তলায়। তারপর বল্লুম—"এবার তোমাদের যা ইচ্ছে কর, আমার খাঁচার দরজা সব সময়েই খোলা থাক্‌বে।"

পাখীরা মনের আনন্দে অজস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে বেরিয়ে এল, তাদের খোকাকে তাদের মাঝে নিয়ে। তার বাবা তার মাকে কি একটা কথা ব'লে উড়ে গেল। খোকা তার মা'র সঙ্গে আমাদের ফুলগাছের টবগুলোর উপর খাবার খুঁজতে লাগ্‌ল। তার মা তাকে খুঁটে খাওয়াতে শেখাচ্ছিল আর একটু একটু ক'রে আবার উড়তে শেখাচ্ছিল ঠিক যেমন ক'রে আমাদের মা ছোটবেলা আমাদের হাত ধরে হাঁটতে শেখান। পাখীটাও তার খোকাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে গড়ে তুলছিল। কিছুক্ষণ উড়বার পর পাখীটা ক্লান্ত হয়ে প'ড়লো: মা তাকে খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হ'ল। টবের গোড়ায় কিছু না পেয়ে তাকে ব'ল্‌লে—"খোকা, তুই এখানে খেলা কর, কোথাও যাস্‌নে। আমি তোর খাবার নিয়ে আসি। খেলেই গায়ে জোর পাবি, বাসায় ফিরে যেতে পারবি।"

ছানাটা বল্‌লে—"না মা, তুমি যেও না, আমার ভয় ক'রছে।"

তার মা তাকে সাহস দিলে—"কিছু ভয় নেই, আমি এক্ষুণি ফিরে আস্‌বো। তুই ওঁর কাছে ব'সে থাক।" ব'লে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে—"আপনি আমার খোকাকে একটু দেখুন না, আমি ওর জন্যে খাবার খুঁজে আনি, ও এখনো নিজে খেতে শেখেনি কি না, খাইয়ে দিতে হয়।"

আমি হেসে ব'ল্‌লুম—"আচ্ছা যাও, তোমার খোকা থাক আমার কাছে।"

ছানাটার মা তার খোকাকে আমার জিম্মায় রেখে চ'লে গেল। ছানাটাকে ডাক্‌লুম—"আয়রে খোকা, আমার টেবিলের উপর ব'সে থাক্‌বি।"

ছানাটা ব'ল্‌লে—"না, আমার এই গাছের টবটাই ভাল লাগ্‌ছে, আমি এইখানেই বসি।"

"আচ্ছা তাই বোস্‌। তোর নাম কি রে খোকা?"

"নাম আবার কি?"

"তোকে তোর বাবা মা কি ব'লে ডাকে?"

"আমাকে খোকা বলেই ডাকে। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খাবার দিতে পার?"

"তুই কি খাস বল্‌তো?"

"তা তো জানি না, মা খাইয়ে দেয়।"

"তবে আমি কি দোবো বল্‌?"

"তোমার মা তোমাকে যা খাওয়ায়।"

"আমরা তো অনেক কিছু খাইরে, কোনটা দোবো?"

"তোমার মা তোমাকে যা খাইয়ে দেয়।"

"এখন তো আর আমাদের মা আমাদের খাইয়ে দেন না।'

"কেন?"

"আমরা যে বড় হয়েছি রে! এখন আমরা নিজেরা হাতে করে খাই। তুইও যখন বড় হবি তখন আর তোর মা তোকে খাইয়ে দেবে না।"

"কেন?"

"তুই তখন নিজে খুটে খেতে পারবি।"

ছানাটা আমার সঙ্গে বেশ কথা কইছিল হঠাৎ কাতর ভাবে বল্‌লে—"আমার বড্ড ভয় ক'রছে।"

"ভয় কি রে? এইতো আমি রয়েছি। আয় তুই আমার কাছে।"

"না, তুমি বড় দুষ্টু।"

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন বল্‌তো?"

"যদি ফের আটকে দাও।"

"না রে পাগল না, তোকে আর বন্ধ করবো না। তুই আমার কাছে এগিয়ে আয়, এইখানে বসবি আয়, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আস্‌ছি।" বলে আমার হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখতে এসেছি, সেই মুহূর্ত্তেই এক আর্ত্তনাদ—"ও মা" ছুটে এসে যা দেখলুম তেমন বীভৎস দৃশ্য কখনও দেখিনি। আমার পায়ের তলায় যেন ছাদটা ধ্বসে গেল। একটা বিকট কাক তাকে মুখে ক'রে আল্‌সের উপর বসেছে। ছানাটার শিথিল মাথাটা তার ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলছে।

আমার বুকের ভিতরটা দুর দুর করে উঠলো, কাকটাকে ধরতে গিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়লুম। কাকটা উড়ে গিয়ে সামনের বাড়ীর কার্ণিশে বসে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে ছানাটাকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খেতে লাগল। তার প্রতি ঠোকর আমার বুকের ভিতর শূলের মত বিঁধতে লাগল।

কতক্ষণ যে অচেতনের মত বসে ছিলুম জানি না, 'খোকা'শব্দটা কানে যাওয়ায় যেন জ্ঞান হ'ল। দেখলুম, মা তার খোকার জন্যে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে এসে খুঁজছে। ফুলগাছের টবগুলোতে তাকে দেখতে না পেয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"খোকা কোথার গেলো গো? ভারী দুষ্টু, আবার বুঝি উড়ে গেছে?" আমি কিছু উত্তর দিচ্ছি না দেখে সে আবার বললে—"একটু আগে ক্ষিদেয় নড়তে পারছিলনা এর মধ্যে না খেয়ে উড়ে গেল কোথা, হ্যাঁ গা, কোন্ দিকে গেল বলতে পার?"

আমি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে সে একটু অস্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কোন্ দিকে গেল তুমি জান না বুঝি? ত'র যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?"

আমি নির্ব্বাক।

—"ওগো, বল না আমার খোকা কোন্ দিকে গেল—সে যে আজ প্রথম উড়তে শিখেছে, তার ডানায় এখন জোর হয় নি।"

আমি যন্ত্রচালিতের মত সেই কাকটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিলুম। কাকটা তখন খাওয়া শেষ করে ঠোঁট পরিস্কার করছে।

"কী দুষ্টু ছেলে বাবা! এইটুকুর মধ্যে আবার ঐ দিকে উড়ে যাওয়া হয়েছে!" ব'লে মা তার খোকার খাবার মুখে করে সেই দিকে উড়ে গেল। আমি সেইখানেই নিশ্চল ব'সে রইলুম।

পেঙ্গুইনের দেশে

পেঙ্গুইন-এর মত অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া পাখী বুঝি আর নেই। চালচলনে মানুষকে এরা উদ্ভটরকমে নকল করে চলে। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস মানুষকে ঠাট্টা করে একখানা বই লিখেছেন—বইয়ের সবকটি চরিত্রই হচ্ছে কিন্তু পেঙ্গুইন। ঘাড় উঁচিয়ে ডাঙায় যখন পেঙ্গুইন পাখীরা ভারিক্কি চালে হেঁটে বেড়ায় মনে হয় যেন একদল বামন, সাদা ধবধবে ফ্রকের উপর লম্বা লেজুড়ওয়ালা কালো কোট তাদের পরণে।

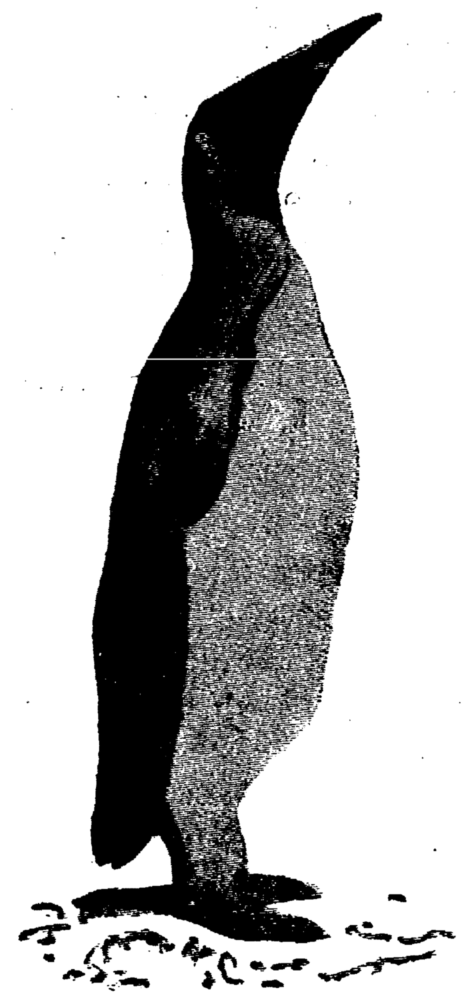

পেঙ্গুইনদের, ডানা বলতে যা বোঝায় তা নেই। দুপাশে সরু দুটি হাতলের মত আজব পাখনা আছে বটে। তড়বড় করে চলার সময় চাকার মত বন বন করে হাতল দুটো ঘুরতে থাকে। পেঙ্গুইনদের সত্যিকারের পা বলতে কিছু নেই। দুটি চামড়ায় আটকানো পায়ের পাতা দেখা যায় বটে, অনেকটা হাঁসের মত।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই পেঙ্গুইন পাখী একেবারেই উড়তে পারে না। কিন্তু সাঁতারে এরা ওস্তাদ। বেশীরভাগ সময় পেঙ্গুইনদের সমুদ্রের ঢেউয়ে-ই কেটে যায়। সীলদের মত এরাও ডাঙার চেয়ে ঢেউই পছন্দ করে বেশী। কিন্তু সীলদের চেয়ে পেঙ্গুইনরা ঢের বেশী চঞ্চল। এত চঞ্চল পাখী আর দুটি নেই। ঢেউয়ে ঢেউয়ে উলটে পড়ে এরা যে খেলা করে তা একটা দেখার জিনিষ।

ভারী চমৎকার সাঁতার কাটতে জানে পেঙ্গুইনরা। সরু দুটি পাখনা দাঁড়ের মত বেয়ে তারা তর তর করে জল কাটিয়ে চলে। ফুসফুসে হাওয়া ভরে নিয়ে ভুঁস করে তারা ডুবে

যায়, জলের তলায় মাছদের তাড়া করে ছোটে, মাছ গিলতে গিলতে ভুঁস করে আবার জলের উপর ভেসে ওঠে। কিন্তু মাঝে মাঝে পেঙ্গুইনদেরও প্রাণ হাতে করে ছুটে পালাতে হয়। দক্ষিণ সমুদ্রে একরকম চক্করবেচক্করকাটা সীলমাছ দেখা যায়, এদের জলের চিতাবাঘ বলে ডাকা হয়। এদের হাতে পড়লে পেঙ্গুইনদের আর রক্ষা নেই।

পেঙ্গুইনদের ভিতর সবচেয়ে মাথায় উঁচু গায়ে ভারী যারা তারাই হচ্ছে পেঙ্গুইন রাজ্যের সম্রাটের জাত। সম্রাট যদি মাথা উঁচিয়ে টান হয়ে দাঁড়ান তো ডাঙার উপর পুরো চারফুট হবেনই। এঁরা বড় একটা ডাঙায় ওঠেন না। জলেই সারাক্ষণ থাকতে পছন্দ করেন। কখনো কখনো বরফের চাকে উঠে খোসমেজাজে ভেসে বেড়ান।

পেঙ্গুইন সম্রাটরা মহা চালিয়াত জাত—বরফের ভিতর ডিম পাড়তেও তাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। ডিম জমে যাতে শক্ত না হয়ে যায় সে জন্যে মা-পেঙ্গুইন পায়ের পাতার পিছন দিকটায় ডিম তুলে নিয়ে আলগোছে তার উপর বসে থাকে, গায়ের গরম পালক দিয়ে ঝাঁপ দিতে থাকে। তবু, বেশীর ভাগ ডিমই নষ্ট হয়ে যায়, খুব কম ডিমই শেষ পর্য্যন্ত ফোটে। এইজন্যে, পেঙ্গুইনদের ভিতর বাচ্ছা হওয়াটা মস্ত একটা ব্যাপার। যাদের বাচ্ছা আছে তাদের দেখে অন্য পেঙ্গুইনরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে। পেঙ্গুইনদের ভিতর অসম্ভব রকমে বাচ্ছা চুরী যায়। মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। একদল পেঙ্গুইন হয়তো তাদের পড়শীর বাচ্ছা চুরী করে নিয়ে যাচ্ছে, পড়সী পেঙ্গুইনরা দেখতে পেয়ে হয়তো ধাওয়া করলে। তখন ছুট ছুট। মাঝে মাঝে বাচ্ছা নিয়ে 'তোর না আমার' বলে রীতিমত টানা হেঁচড়া হয়।

পেঙ্গুইনদের মত এত মিশুক পাখী খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। মস্ত এক একটা দল বেঁধে এরা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ডাঙায় রীতিমত ছাউনী ফেলে এরা থাকে। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পেঙ্গুইনকে সমুদ্রের ধারে ধারে এক জোটে দেখা যায়।

পুরুষ পেঙ্গুইনরা ডাঙায় আসতেই স্ত্রী পেঙ্গুইনরা সমুদ্র পারের পাথরে বসবার ধাপের মত খাচ কুঁদে নেয়, তারপর যেন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই এভাবে চুপচাপ বসে থাকে। পুরুষ পেঙ্গুইনরা এসে ঘোরা ফেরা করতে থাকে, অনেকেই নানা রকম উপহার নিয়ে আসে মন ভোলানোর জন্য। সবচেয়ে সৌখীন উপহার হচ্ছে রংবেরংএর পাথরের কুচি। কুঁড়ে পেঙ্গুইনরা প্রায়ই সস্তাদরের নুড়ি এনে মিছে কথা বলে স্ত্রী পেঙ্গুইন-এর মন ভোলাতে চায়। কখনো কখনো একটি স্ত্রী পেঙ্গুইনের কাছে দুটি পুরুষ পেঙ্গুইন এক সময়ে এসে পড়লে আর রক্ষা নেই। অমনি সুরু হাতাহাতি। সরু পাখনা দিয়ে দুজন দুজনকে বেদম পিটতে থাকে। তবে, এ যেন অনেকটা আপোষে লড়াইয়ের মত। প্রতিদ্বন্দ্বীদুটি কাউকে তেমন একটা জখম করতে চায় না।

মানুষ যেমন সুবিধা পেলেই পরের বাড়ীঘর জমি দখল করে বসে পেঙ্গুইনরাও তেমনি ফাঁক পেলেই অন্যের আস্তানা দখল করে নেয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় এক পেঙ্গুইনএর বাড়ীর সামনে রীতিমত দাঙ্গা বেধে গেছে। আর পাথুরে কোটরের খাঁচে বসে গিন্নি পেঙ্গুইন হাঁক ডাক করছে!

খেলাধূলোয় পেঙ্গুইনদের জুড়ি নেই। ডিম ফুটবার পর পাথুরে কোটরে বাচ্চাদের রেখে পেঙ্গুইনরা সমুদ্রের পাড়ে খেলাধূলো করতে আসে। পেঙ্গুইনরা খেলাধূলোর কায়দা কসরতে মানুষের চেয়ে কম যায় না। উঁচু থেকে চর্কি খেয়ে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়া থেকে সুরু করে সার বেধে কুচকাওয়াজ করা, কোনোটাই বাদ যায় না।

শরতের উষা

শ্রীকালিদাস রায়

নিদ না ভাঙ্গিতে মোর জানালা ধারে,
সোনার হাসিটি হাসে কার বাছা রে,
ফুটফুটে' নির্ম্মল সোনায় মাখা
হাসে যেন যুঁই বেলা পাতায় ঢাকা।
রূপালী আকাশ-গায় সোনার ভেলা
চাঁদ কি উঠিল ভুলে দিনের বেলা?
কচি শিশু আনমনে যে হাসি হাসে
তাই কি ভাসিল মোর জানালা পাশে?
অথবা এ কোন্ হাসি কার এ আলো

কেন এত সুন্দর লাগিছে ভালো!
মন যে উতলা হ'লো ভোরের বেলা
মরি মরি কি মধুর আলোর মেলা!
কার তরে এ হাসির লহরী ছুটে
পুলকের মাতামাতি কেন বা উঠে?
ওরে এ যে চেনা হাসি ধরণী প'রে
শারদা আসিল বুঝি জনক ঘরে।

ভৌতিক কাহিনী

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

কলকাতা থেকে দারজিলিং—

শিয়ালদা থেকে দারজিলিং-মেলে শিলিগুড়ি—

শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া-মোটরে দারজিলিং।

পূজোর ছুটীতে কলকাতা ছেড়ে আমাদের দারজিলিং আসা। আমাদের মানে আমার ও আমার বন্ধু কমলের।

শিয়ালদায় রাত ন'টায় ট্রেণে চেপে ভোর আটটায় শিলিগুড়ি পৌঁছলাম। শিলিগুড়ি থেকে দশটার সময় ভাড়া-মোটরে চাপলাম—ঘণ্টা ছয় সাতের মধ্যে দারজিলিং পৌছে যাবার কথা। কিন্তু ঠিক সময়ে দারজিলিং পৌছানো গেল না। ভাড়া-মোটরে আমাদের সব রাস্তা নিয়ে যেতে পারে নি বরং তাকেই আমাদের ঠেলে নিয়ে আসতে হয়েছে মাইল কয়েক। কালিম্পংএর কিছু আগেই ভাড়া-মোটরের কল খারাপ হয়ে গেল। পাহাড়ে রাস্তা ভেঙ্গে মোটর টেনে আনতে হল কালিম্পিংএ। তারপর ওখানে মোটর সারিয়ে দারজিলিংএ আগমন।

দারজিলিংএ যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। ছ'টার আগেই এখানে সন্ধ্যে হয়।

মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেলে আগেই চিঠি লিখে যায়গার ব্যবস্থা করছিলাম। গিয়ে নাম বলতেই ...নেজার আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরখানা বেশ—দু'দিকে দু'খানা খাট—বিছানা-পত্তর সব ...টেলের। ও-সব কিছুই আমাদের আনতে হয় নি।

জিনিষ-পত্তর রেখে হাতমুখ ধুয়ে নীচে খেতে গেল কমল—আমার আর খাওয়ার উৎসাহ ছিল না—...াড়ে-পথ মোটরে আসতে এবং মোটরকে ঠেলে নিয়ে আসতে দু'বার বমি করেছি। ভারী ঘুম পাচ্ছিল—...লো নিভিয়ে কম্বল টেনে শুয়ে পড়লাম—শোওয়া মাত্র ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না—হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখি গায়ের কম্বল গায়ে নেই—আমি ...তে কাঁপছি। কম্বলটা সরে গেছে বোধ হয়! পা দিয়ে অনেক খুঁজলাম—শেষে হাতড়াতে সুরু করলাম। ...ন্তু কম্বল কই?

হাতটা একটু বাড়াতেই কম্বল পেয়ে গেলাম। কম্বল ধরে টান দিলাম—কিন্তু কম্বল এলো না— ব্যাপার! জোরে এবার এক টান লাগাতেই কম্বলটা আলগা হয়ে আসছিল—কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ...ন নিয়ে গেল কম্বলটাকে—-টাগ্-অব্-ওয়ারে আমি হেরে গেলাম—দস্তুরমত চম্‌কে উঠলাম।

আবার হাতড়াতে সুরু করলাম—কম্বলটাকে পেলাম কিন্তু এবার আর কম্বল সরছে না—হাতড়ে ...লাম একটা লোক কম্বলটা গায়ে শক্ত করে জড়িয়ে শুয়ে আছে আমার পাশে।

"এ আবার কে?"—ভাবনা হ'ল! একটু ভয়ও পেলাম। "চোর-ডাকাত নাকি?—চোর-ডাকাত

হলে শুয়ে থাকবে কেন ? চোর ত' চুরি করে"—আমি ভাবতে থাকি, "হয়ত খুব শীত লেগেছে—এ হচ্ছে দারজিলিংএর শীত—অন্ধকার একটু ফর্সা হলেই উঠে আমাদের ফর্সা করবার মৎলব বোধ হয় ওর !"

সাহস করে ফের হাত বাড়ালাম, "এই যে দেখছি নাক—একটা নাক—হুঁ একটা নাক-ই বটে !"

"হ্যাচ্চোঃ !"

বে-কায়দায় পড়ে আমার একটা আঙ্গুল ওর ওই একমাত্র নাকে ঢুকে যাওয়াতে এই বিপত্তি—আমার পাশের লোকটি হেঁচে দিল। আমি বেজায় রকম চমকে গেলাম—ভয়ও পেলাম খুব।

"এই যে দেখছি কান,—একপাটি কান,—মলা যাক তা হলে—" মনের সুখে আর হাতের সুখে ওর কান মলতে থাকি—রাত দুপুরে ভদ্রলোকের ঘরে চুরি করতে ঢোকার ফল আর আমাকে হেঁচে ভয় ভয় দেখানোর শাস্তি, "আঃ—উ-উ-ম—" ভারী আরাম পাই আমি—ওর এটা কম্বল কেড়ে নেবার শাস্তি।

ভারী শীত—আমার এদিকে—গায়ে একটা গেঞ্জী ব্যতীত আর কিছু নেই। ভাবলাম, "ডাকা যাক কমলকে, তারপর দু'জন মিলে ওকে মার লাগাবো ; ডাকাই যাক !"

"কমল—কমল—!" খুব নীচু স্বরে ডাকলাম।

কমলের সাড়া নেই।

"কমল—কমল— !" আগের চেয়ে একটু উঁচু পর্দ্দায় ডাকি।

কোন উত্তর নেই। ছেলেটা ভারী ঘুম-কাতুরে। ঘুমুলে ওর আর জ্ঞান থাকে না—একেবারে মরার মত ঘুমোয়।

"কমল—কমল— !" একটু গলা তুলে।

"উঃ !" কমলের খাট আমার বাঁ দিকে—সেখান থেকে উত্তর আসে খুব নীচু স্বরে।

"শোন— ."

"কি ?"

"দ্যাখ ভারী…।"

"কি দেখব—আর কেমন করেই বা দেখব—যা সূচীভেদ্য অন্ধকার !"

"দেখতে হবে না—শোন… ।" আমি চটে উঠি।

"কি ?"

'ভারী মুস্কিল—একজন লোক এসে আমার কম্বল কেড়ে নিয়ে আমার পাশেই খাটে শুয়ে আছে ; আমি এদিকে শীতে মরছি।"

"আমারও খাটে একজন এসেছে—কিন্তু কম্বল কাড়তে পারে নি—একবার টেনে নিয়েছিল কেবল—ফের টেনে এনেছি—পাশে শুয়ে ভারী অত্যাচার সুরু করেছে।"

"ভারী শীত করছে ভাই,—কি করি— ?"

"আমার এখানেও দু'জন—তা না হলে এখানে শুতে পারতিস—আমার কম্বলটা ভাগাভাগি করে গায়ে দিতাম।"

"এখন কি করি তবে ?—তোমার খাটের সেই লোকটি ত' আমায় যায়গা ছেড়ে দেবে না !'

"এক কাজ কর…।"

"কি ?"

"কাতুকুতু দিয়ে তোর পাশের লোকের কাছ থেকে কম্বল কেড়ে নে।"

"ও ভাই আমি পারব না—কোথায় ওর বগল কে জানে…কম্বলের ভিতর আমি হাত ঢোকাতে পারব না—যদি হাত কামড়ে দ্যায়।"

"তবে এক কাজ কর… ।"

"কি ?"

"তোর পাশের লোকটাকে তুই এক লাথিতে খাট থেকে ফেলে দে—আমিও আমারটাকে দেখছি।"

"আমি ভাই পারব না—আমার চেয়ে ওর গায়ের জোর বেশী—কম্বল নিয়ে টাগ-অফ্-ওয়ার করতে গিয়ে আমি তা টের পেয়েছি। ও তাহলে আমায় মেরেই ফেলবে !—কাছে যে ছুরি ছোরা নেই তাই বা কে বললে ?"

"চেষ্টা কর…!"

"আমার খাটের অপর বাসিন্দা বোধহয় আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল—সে আমাদের দু'জনের মধ্যে ছিল—অর্থাৎ আমার বাঁ পাশে। হঠাৎ এক প্রচণ্ড লাথিতে আমি খাট থেকে পড়ে গেলাম। 'বাবাগো'—বলে আমি আর্ত্তনাদ করে উঠি ব্যথায়। আমার পিলে বোধহয় ফেটে গেছে ওর লাথির চোটে।

কমলের গলা শোনা যায় এতক্ষণে, "হ্যাঃ—হ্যাঃ—আমার সাথে চালাকী—দিয়েছি ব্যাটাকে এক লাথিতে ফেলে, হ্যাঃ !"

"কমল—কমল—" আমি কেঁদে ফেলি।

"কিরে, তোর কি হল ?"

"আমাকে সেই পাজীটা খাট থেকে ফেলে দিয়েছে।"

"ঘাবড়াস না—আয় তুই আমার খাটে এসে শো—এই কম্বল দু'জনে গায় দেওয়া যাবে !"

"ভাই কমল—বে-কায়দায় পড়ে আমার পা মচকে গেছে—আমি উঠতে পারছি না—।"

"দাঁড়া আমি যাচ্ছি —।"

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। কমল আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে তার বিছানায় শোয়ালে…।

"সেই লোক দুটো কই—" আমি কমলকে প্রশ্ন করি, "ওদের ধরে পিটুনি দিতে হবে।"

"কই দেখছিনা ত' !" কমল আলমারীর পাশ—চৌকীর তলা সব খুজে দেখে।

"পালিয়েছে—বোধহয়—"

"কোথা দিয়ে পালাবে ?"

"কেন ? দরজা !"

"দরজা দিয়ে কেমন করে পালাবে—দরজা দেখছিস না ভিতর দিয়ে বন্ধ—পালাবার পর ভেতর থেকে কে দরজা বন্ধ করবে শুনি ?"

কমল চটে ওঠে।

"তবে তারা গেল কই ?"

"ব্যাপারটা ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে—!"

"না—না—ভূত নয় কক্ষনো"—আমি তীব্র প্রতিবাদ করি, "ভূত কখনো অমন করে হাঁচতে পারে না—ও রীতিমত হেঁচেছে—তার উপর—আমি ওর কাণ মলে দেখেছি—ওর কাণ রীতিমত মানুষের কান !"

"মানুষ হলে তারা যাবে কোথায় শুনি ? মানুষ ত' আর ভূত নয় যে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে—ও ভূত—ই—নিশ্চয়, মানুষ সেজে এসেছিল।"

হঠাৎ আমার চোখ পড়ে আমার-ই পরিত্যক্ত বিছানার উপর। বিছানা একেবারে টান করে পাতা—বালিশ সব ফোলানো--কম্বল পায়ের নীচে ভাঁজ করা—যেন কেউ শোয়নি।

"কমল দেখছিস—" আমি কমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিছানার দিকে !

"এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড !"

"তা হবে···" আমি আমার দুঃখ ব্যক্ত করি, "শেষে ভূতের মার খেতে হল আমাকে···!"

"আমাকেই কি ছেড়েছে রে ভাই—!" কমল কাঁদ কাঁদ।

"তোকেও কি লাথি দিয়ে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে না কি ?"

"না-তা দেয়নি—তবে কান মলতে কসুর করেনি—নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচিয়েছে—ভূতটা কম বজ্জাৎ !"

যাক আমার মনটা এতক্ষণে আশ্বস্ত হল কিছুটা—ভূতের হাতে মার আমার একলা খেতে হয়নি !

সাগর

বিজয় সেনগুপ্ত

ওই যে সাগর, ওই যে সাগর, মুক্ত সাগর সম্মুখে
নীল জলধি, স্বচ্ছ বারি, মুক্তি দোলে তার বুকে !
লক্ষ্যহারা ঢেউ ছুটেছে অসীমেরই বন্ধনে,
বিশাল ধরার বক্ষপানে যায়রে ছুটে গর্জ্জনে।
মেঘের সাথে একটু খেলে, চায় আকাশে কৌতুকে।
একটু কভু মিষ্টি দোলায় নেয় ঘুমায়ে মার বুকে।

সাগর বুকে এই-যে আমি, এই-যে আমি তার বুকে ?
তারই কোলে রইব আমি, চিরদিনের সুখ-দুখে।
পায়ের তলে নীল সাগর, নীল আকাশ অম্বরে,
চলার পথের ছন্দে মেতে তৃপ্তি জুড়ায় অঙ্গ রে !
ঝঞ্ঝা যদি এগিয়ে আসে, জাগিয়ে দিয়ে দুর্ব্বাসা—
ভয় কি তাতে ? পান আহারে জীবন যাবে বেশ খাসা !

এই তো আছি পরম সুখে, লাগছে ভালো স্পন্দনে ;
ঝঞ্ঝা-জাগা কাঁপিয়ে তোলা দূর সাগরের গর্জ্জনে।
চন্দ্র যখন আড়াল করে পাহাড়-সম তরঙ্গে,
হয়তো তখন ঝড়ের দোলা সুর বেঁধেছে সারঙ্গে !
বলছে কানে পায়ের তলে কেমনতর বিশ্ব রে !
বলছে কেন ঈশান কোণে বাতাস হেন ভীষ্ম রে !

নিইনি কভু শুকনো মাটীর পোষমানা সে স্পর্শরে,
সাগর আনে নিত্য প্রাণে প্রেম ব্যাকুল হর্ষরে !
তাইতো ফিরি পিছন পানে স্নেহ যেথায় সিঞ্চরে,—
পাখীর মত নীড়ের পানে মায়ের স্নেহ পিঞ্জরে !

এইতো আমার মায়ের মত, এইতো রবে মোর মাতা,
সাগর কোলে জন্ম আমার তারি কোলে স্থান পাতা ।

শুভ্র ছিল তরঙ্গ দল, প্রদোষ ছিল অলক্ত—
ঝঞ্ঝাবাতে প্রথম যেদিন মেলনু আঁখি আরক্ত ।
শীষ দিয়েছে সীল মাছেরা, ঘূর্ণী দিল হাঙ্গরে,
স্বর্ণ বরণ পিঠ দেখিয়ে মৎস করে রঙ্গ রে !
আর কখনও ঢেউ জাগেনি এমন ধারা তুর্য্যোগে,—
যেমন ডাকে এগিয়ে নিল সমুদ্র বর-পুত্রকে ।

সেই অবধি হেথায় আছি শান্তি এবং দ্বন্দ্বেতে,
অর্দ্ধ শত বর্ষা গেল নাবিক জীবন সঙ্গেতে ।
রত্ন আছে সাগর ভরা, সাহস আছে অন্তরে,
চাইনি কভু ভাণ্ডার তরে এই জীবনের ছন্দরে ।
মৃত্যু যখন আসবে কাছে, আসবে হেসে সখ্যেতে,
আসবে হেসে মুক্ত উদার এই সাগরের বক্ষেতে ।
(বেরী কর্ণওয়ালের অনুসরণে)

চলন্তিকা

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সব চেয়ে বড় খবর—যা তোমরা সবাই শুনেছ—ইউরোপে যুদ্ধ। পয়লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ স্থরু হয়েছে কোন ঘোষণা না হয়েই আর আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত —এই তিরিশ দিনে পৃথিবীতে কত না কাণ্ড ঘটে গেল! কিন্তু কোন শান্তি হল না। সেপ্টেম্বরের আগে পোলাণ্ড ছিল স্বাধীন রাজ্য—আজ সে ধ্বংসাবশেষ। পোলাণ্ড আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কত সৈন্য সামন্ত কত লোকজন হত আহত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। সীমান্ত ধ্বংস হয়েছে—নতুন সীমানা সৃষ্টি হচ্ছে আবার ধ্বংস হবে বলে। কবে এই যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার অবসান হবে কে জানে! বিশ্বাসঘাতকতায় ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলি আজ পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত হতে বসেছে। আমরা ভারতবর্ষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও তাদের হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। মানুষে-মানুষে হানাহানি চরমে পৌঁছেচে।

১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যুদ্ধের ডায়েরী ও প্রধান ঘটনাগুলি আমরা নীচে দিলাম। এ থেকে বোঝা যাবে পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র এই কদিনে কি পরিবর্ত্তন হোল—

১লা সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণ সৈন্যের পোলাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম ঃ ইংরাজদের রণসজ্জা

২রা „ পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণদের যুদ্ধ—ওয়ারসতে বোমাবর্ষণ

৩রা „ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট পোলাণ্ডের চুক্তিমত সাহায্য প্রার্থনা

৪ঠা „ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইংরাজদের যুদ্ধ ঘোষণা

৫ই „ পশ্চিম-সীমান্তে যুদ্ধারম্ভ ঃ সাবমেরিণ দ্বারা ব্রিটিশ জাহাজ ডুবি ঃ পোলাণ্ডে বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ

৬ই „ কিয়েল খালে (ডেনমার্কের দক্ষিণে) ব্রিটিশ উড়ো জাহাজ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজে বোমা বর্ষণ ঃ মার্কিন জাহাজ "এথেনিয়া" টরপেডো আঘাতে সলিল সমাধি

৭ই „ সিগফ্রিড ও ম্যাগিনো লাইনে বিরাট যুদ্ধ

৮ই ” পোলাণ্ডের 'করিডর'—জার্ম্মাণীর হস্তগত

৯ই	সেপ্টেম্বর	ফরাসী সৈন্য বাহিনী দ্বারা জার্ম্মাণীর পশ্চিম-সীমান্ত ভেদ : পূর্ব সীমান্তে পোলাণ্ডের দ্বারা জার্ম্মাণীর এরোপ্লেন ধ্বংস
১০ই	”	পশ্চিম-সীমান্তে ফরাসী সৈন্যের অগ্রগতি : অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে জার্ম্মাণ সাবমেরিণের ফাঁদ
১১ই	”	পোলাণ্ডের রাজধানীতে পোলাণ্ড সৈন্যদের আশ্চর্য্য বীরত্ব : জার্ম্মাণ আক্রমণ ব্যর্থ : পোলাণ্ডে অপ্রতিহত যুদ্ধ-চালনা
১২ই	”	পশ্চিম-সীমান্তে জার্ম্মাণ সহর ফরাসীর অধিকারে : স্থলে, জলে ও আকাশে ফরাসীর আক্রমণ
১৩ই	”	পূর্ব্ব সীমান্তে হের হিটলারের আগমন : জার্ম্মাণীতে খাদ্যের অভাব : ইংরাজ-ফরাসীর মিলিত যুদ্ধ
১৪ই	”	জার্ম্মাণীর পশ্চিম-সীমান্তে অনেক অংশ ইংরাজ-ফরাসীর দ্বারা বিধ্বস্ত : জার্ম্মাণ কামানের দ্বারা পোলাণ্ডরুমানিয়ার সীমান্ত ধ্বংস
১৫ই	”	পোলাণ্ডে সহরবাসীদের ওপর জার্ম্মাণীর বোমা নিক্ষেপ : জার্ম্মাণ গুলি দ্বারা Dr. Schuschnigg নিহত
১৬ই	”	ইংরাজদের দ্বারা জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট ধ্বংস : দক্ষিণ সীমান্তে বিরাট যুদ্ধ
১৭ই	”	পূর্ব্ব-সীমান্তে জার্ম্মাণ-শক্তি আহত : বেলজিয়াম জাহাজ "অপষ্টান" জার্ম্মাণ সাবমেরিণ দ্বারা ধ্বংস
১৮ই	”	রাশিয়ার সৈন্যসামন্তের পোলাণ্ডে প্রবেশ : জার্ম্মাণীর হুম্‌কিতে পোলাণ্ডের রাজধানীর আত্মসমর্পণে অস্বীকার
১৯শে	”	জার্ম্মাণ ও রাশিয়ার সৈন্যদলের সাক্ষাৎ : রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে পোলাণ্ড ভাগাভাগির আলোচনা
২০শে	”	জার্ম্মাণীর দ্বারা অসংখ্য শ্লোভাক নিহত : হিটলারের নূতন মারাত্মকঅস্ত্রচালনার হুমকি : রাশিয়ার যোগদান সত্ত্বেও ইংলণ্ড যুদ্ধ করতে প্রস্তুত
২১শে	”	জার্ম্মাণীতে এক হাজারের ওপর নাৎসীদের ফাঁসি : পূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসীর যুঝবার সঙ্কল্প
২২শে	”	রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী নিহত : সোভিয়েট সৈন্য দ্বারা সমস্ত পোলাণ্ড-রুমানিয়া সীমান্ত অধিকার : ফরাসী দেশের ইঙ্গিত যে পৃথিবীর সমস্ত দেশকেই শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে নামতে হবে
২৩শে	”	রুমানিয়াতে প্রধান মন্ত্রীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত শত্রুদের দলে দলে ফাঁসি : রাশিয়া ও জার্ম্মাণী ভিতর পোলাণ্ডের ভাগ বাটোয়ারা : সমগ্র পোলাণ্ড-রুমানিয়া ও পোলাণ্ড-রুথেনিয়া সীমান্ত রাশিয়ার অধিকারে

২৪শে	সেপ্টেম্বর	পোলাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট রুমানিয়াতে আবদ্ধ : ইউক্রেনএ পোলাণ্ড রাজকর্ম্মচারীগণ আটক : জার্ম্মাণী বেলজিয়াম সীমান্ত ভেদ করবে প্রকাশ : পোলাণ্ডের রাজধানীতে ও নানা দেশে বোমাবর্ষণ
২৫শে	”	রুমানিয়ার উপর জার্ম্মাণীর শ্যেন-দৃষ্টি : পোলাণ্ড ভাগবাটোয়ারাতে রাশিয়ার নিকট জার্ম্মাণী জব্দ : পশ্চিম সীমান্তে হিটলারের গমন
২৬শে	”	পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস'র অগ্নি-পরীক্ষা : ক্রমাগত গোলা ও বোমা বর্ষণ : পশ্চিম-সীমান্তে জার্ম্মাণী ক্ষতিগ্রস্ত : সুইশ-সীমান্তে জার্ম্মাণ জেপলিন কারখানায় বোমাবর্ষণ
২৭শে	”	সুইশ-সীমান্তে গোলা বর্ষণ : বেলজিয়াম-সীমান্তে রেলওয়ে পুল ধ্বংস : পশ্চিম-সীমান্তে ফরাসী-জার্ম্মাণীতে বিপুল যুদ্ধ
২৮শে	”	সিগফ্রিড লাইন বিধ্বস্ত : জার্ম্মাণদের সারব্রুকেন্ প্রদেশ পরিত্যাগ : ওয়ারশর শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণের গুজব : সমর্পণের পূর্ব্বে সমস্ত সহর ধ্বংস করার সংকল্প :
২৯শে	”	জার্ম্মাণীর হস্তে ওয়ারশর আত্মসমর্পণ : জার্ম্মাণ অধিকৃত পোলাণ্ডের দেশসমূহে সামরিক আইন জারী : মস্কোতে ষ্টালিনের সঙ্গে জার্ম্মাণ মন্ত্রীর আলোচনা : পৃথিবীর সমস্ত রাজধানীর এই বিষয়ে উদ্বেগ : এষ্টোনিয়ার উপর সোভিয়েটের নানা দাবী
৩০শে	”	জার্ম্মাণ-সোভিয়েট নতুন চুক্তি : পোলাণ্ড ভাগাভাগি : যুদ্ধ শেষ করার জন্য জার্ম্মাণ-সোভিয়েট কর্ত্তৃক সর্ত্ত দাখিল শান্তির চুক্তি আনা : ওয়ারশ জার্ম্মাণীর হস্তগত।

এই এক মাসে তিনটী প্রধান ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : প্রথম—শত্রুহস্তে পোলাণ্ডের পতন কিন্তু এখনও তার স্বাধীনতার পূর্ণ বিসর্জ্জন হয়নি। দ্বিতীয়—ইউরোপে রাশিয়ার খবরদারি ও জার্ম্মাণীর সঙ্গে তার 'মিতালি'। তৃতীয়—ইংলণ্ড-ফ্রান্সের কাছে শান্তি সম্মিলনীর প্রস্তাব করা।

* * * *

ইউরোপের এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ কি পথ অবলম্বন করবে এই গুরুতর বিষয় নিয়ে কংগ্রেস কয়েকদিন থেকে নানা আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছেন ভারতবর্ষের দুজন যোগ্যতম ব্যক্তি—মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল এবং লর্ড লিনলিথগো। মহাত্মা গান্ধী এরমধ্যে বার দুই বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয় আলোচনা করেছেন। আলোচনার কোন ফলাফল এখনও প্রকাশ হয়নি। বড়লাট আরো কয়েকজন নেতার সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের নেতাদের, বিশেষ করে কংগ্রেসের, ইউরোপের এই যুদ্ধের প্রতি কি মনোভাব তা জানতে ইংলণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের সাহায্য ইংরাজদের কাম্য। ভারতবর্ষ ইংরাজদের পক্ষেই আছে কিন্তু ভারতবর্ষ অহিংসা-ব্রতী। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন পরাধীনভাবে ভারতবর্ষ ইংরাজদের সত্যকার কতটুকু সাহায্য করতে পারে? একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষই ইংরাজদের সত্যকার সাহায্য

করতে পারে। আজ এই বিপদে ইংরাজ যেমন ভারতবর্ষের পূর্ণ সাহায্য চায় তেমনি ভারতবর্ষও ইংলণ্ডের কাছে মুক্তি চায়। আমরা আশা করি ভারতের যোগ্য নেতারা, কংগ্রেস, ভারতের বড়লাট ও ইংলণ্ডের ভারত-বন্ধুরা—এঁদের সবাকার মিলিত চেষ্টাতে সুফল ঘটবে।

* * * *

একটী কৃষ্ণ-রশ্মি ("Black-Ray") লণ্ডনে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই রশ্মিতে এরোপ্লেন আক্রমণের সময় গাড়ী চলাচলের বিশেষ সুবিধে হবে। ব্ল্যাক-আউটের সময় এক রকম আল্ট্রা-ভায়োলেট আলো রাস্তাঘাটে ব্যবহৃত হবে—এই আলোতে স্পষ্ট পথ দেখে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী, দমকল, সৈন্যসামন্তের গাড়ী প্রভৃতি নিরাপদে যাওয়া আসা করতে পারবে। ওপরের আক্রমণকারীদের চোখে কিন্তু এই আলো মনে হবে পুরু অন্ধকার—তাদের কাছে সমস্ত রাস্তাঘাট ঘন অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। আর এক রকম আলোক-রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে, এই রশ্মিতে ঘরদোর হোটেল হাঁসপাতালের বিষাক্ত বীজাণুগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। নিউ-ইয়র্কের একটী ব্যাঙ্কে এই আলোক-রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে করে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পান। বীজাণু নষ্ট করার জন্য হোটেলে খাবার জিনিষপত্রের ওপর এই রশ্মি ফেলা হচ্ছে। হাঁসপাতালে রোগীর অস্ত্রোপচারের সময় রোগী ও ডাক্তার উভয়ের ওপর এই রশ্মি ফেলা হবে। এক কথায় যাকে আমরা antiseptic বলি এই রশ্মি হচ্ছে তাই।

* * * *

আমেরিকার সুবিখ্যাত দক্ষিণ-মেরু এক্সপ্লোরার এ্যাড্‌মিরাল বীর্‌ড্‌ পুনরায় এ্যানটার্কটিক এক অভিযান নিয়ে যেতে সঙ্কল্প করেছেন। তাঁর অভিযানে যোগ দেওয়ায় জন্য অনেকে আবেদন জানিয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটী মজার চিঠি তিনি পেয়েছেন। একটী মেয়ে লিখেছে, তুমি আমাকে মোটেই কোন বাধা বলে ভেবো না,—দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি। প্রিয় এ্যাড্‌মিরাল—তুমি কুসংস্কার মনে রেখো না। একটী কৃষক বালক লিখেছে—আমার বাবা তোমাকে চার পাঁচটা গরু দেবেন, অবশ্য যদি তিনি বোঝেন আমি নিজেই গরুগুলির পরিচর্য্যা করব। আর একটী ছেলে অনুনয় করে লিখেছে—দয়া করে আমাকে আপনার সঙ্গে নিন, আমি ঠাণ্ডার ভয় করি না, শীতের সময় আমি গরম জামাই পরি না—আর রাতে সমস্ত জানলা খুলে শুই। আর একজন লিখেছে—তুমি যদি চাঁদে যাও তাহলেও তোমার সঙ্গে আমি যাব।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার ছেলেমেয়েরা কত এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়।

ভিখারী

দীপ্তেন্দ্র সান্যাল

(টুর্গেনিভের 'Beggar'এর গল্প নিয়ে লেখা)

বৃষ্টি টিপ্‌ টিপ্‌ করে সারাদিন ধরে পড়লেও, খানিক আগে গেছে থেমে, তবু আকাশে এখনও মেঘের ভীড়।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। গলির মোড়টায় ও'র সঙ্গে আমার দেখা।

ওখানে, ও একটা ভিখারী।

ও'র মুখের দিকে তাকান যায় না। গালের চামড়া পড়েছে ঝুলে, ঠোঁট দুটো গেছে নীল হয়ে, রক্তের মত লাল চোখে ও'র অশ্রু টলমল করছে, গলার হাড় এসেছে বেরিয়ে, মাথায় তেল না পড়ে, চুল যাচ্ছে জটার মত পাকিয়ে। পা দুটো আর চলতে চায় না, তবু জোর করে তাকে চালাচ্ছেও, কাঁধের ওপর একটা ছেঁড়া ঝুলি, হাতে একটা ভাঙ্গা লাঠি।

দৈন্যের কি ভীষণ অভিশাপ ওর ওপর ঝরে পড়েছে।

ও হাত পাতলে আমার কাছে কিছু পাবার আশায়। পকেটে হাত গলিয়ে দিলাম। এ কি! মনিব্যাগ না নিয়েই বেরিয়েছি আজ। একটা রুমাল পর্য্যন্ত নেই। লজ্জায় মাথা এল নুয়ে। ওর হাত দুখানা তখনও কাঁপছে। ও'র হাত দুখানা ধরে আমি বল্লাম, "ভাই, কিছু মনে কোর না, আজ আমি কিছুই আনি নি, তোমায় আমি কিছুই দিতে পারলুম না।"

ও তেমনিভাবে আমার হাত দুখানা ধরে বল্লে, "তাতে কি হয়েছে? তুমি ত আমায় ঘৃণায় তাড়িয়ে দাও নি, এই ত ঢের।"

ও' আমার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। আধো অন্ধকার গলিতে ওকে আর দেখা যায় না। লাঠির শব্দ শুনি...ঠক্‌...ঠক্‌...ঠক্‌...। ও'কে কিছু দিতে গিয়ে, আমিও যেন নিয়ে এলাম অনেক কিছু।

এখনও ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং ছবির
চমৎকার ব্লক করে সমজদারদের
চমৎকৃত করছেন

দি ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং
২১৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ২৯০৫

ছুটির ঘণ্টা

ব্রাবোর্ণ কাপ

তোমাদের ভিতর যারা ফুটবলের খবর রাখো—তারা সকলেই বোধহয় জানো ব্রাবোর্ণ কাপের কথা। যারা সবটা জাননা—এটুকু তারা নিশ্চয়ই জানো ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, কালিঘাট এই তিনটী দল আই, এফ, এর কোন কোন বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিল। সেজন্য আই, এফ, এ শীল্ডে তাদের যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। এই তিনটী দলের উৎসাহেই বেঙ্গল ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের উৎপত্তি। এই বি, এফ, এর নক্ আউট টুর্ণামেন্ট ব্রাবোর্ণ কাপের খেলা সুরু হয়েছে—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে।

যুদ্ধের বাজারে ফুটবল তেমন কি আর জমে! তবু একটা বড় কাপের খেলা—তার খবর আমাদের কানে পৌঁছতেই হবে। তাই সকালের খবরের কাগজের বোমা বারুদ সিগফ্রিড লাইন পেরিয়ে মাঝে মাঝে বিকেলে ময়দানে উঁকি ঝুঁকি মারতে হয়েছে; মাঠে অসময়ে লোক তেমন হয়নি—কিন্তু খেলা তেমন হয়নি বল্‌লে অন্যায় হবে।

আমাদের ধারণা আছে একটা—যে আই, এফ্ এর প্রতিযোগিতায় যাদের খেল্‌তে দেখি—তারাই বুঝি শুধু দেশের ভাল ভাল টীম। কিন্তু সে ধারণা সত্যিই বদলাল। ইষ্টবেঙ্গল মহামেডান কালিঘাটের কথা ছেড়ে দিলেও এমন অনেক টিম এসেছে—যাদের খেলা সত্যি উঁচুদরের। এদের ভিতর মর্নিংষ্টার ক্লাব (ভিজাগাপট্টম), অল্ সিলোন, কুটির গিরদি,

ন্যাশানাল স্পোর্ট্স্ ক্লাব প্রভৃতি কয়েকটীর নাম প্রথমেই করা যেতে পারে। মর্নিংষ্টার ক্লাব দুর্দ্ধর্ষ মহামেডানের সঙ্গে খেলায় প্রথমভাগে চেপে ধরে একটি গোল ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেই তারা করল মস্ত ভুল; তারা পিছনে পড়ে খেল্‌তে লাগল,—গোল যাতে মহামেডান শুধে দিতে না পারে। মহামেডান এ সুযোগ ছাড়ল না। একটী পেনাল্টিতে প্রথম গোলটী শোধ করল; তারপর একটী একটী করে আরও দুটি গোল দিয়ে দিল। এই খেলাতে মর্নিংষ্টার ক্লাবের ফরোয়ার্ড কানাইয়া আর ব্যাক ধরমবীর যে রকম উঁচুদরের খেলা দেখিয়েছেন তা সত্যিই সচরাচর দেখা যায় না। একটা জিনিষ লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ফুটবলে মুসলমান ছেলেরা খুব উন্নতি দেখাচ্ছে। দক্ষিণ-ভারতের খেলাও খুব উঁচুদরের। এরাই যেন কলকাতার ময়দান মাতিয়ে রেখেছে। সবচেয়ে ভালো খেলা হয়তো হয়েছে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে অল-সিলোনের। প্রথম দিন অল-সিলোন ৪-১ গোলে হেরে যায়। কিন্তু প্রথম হাফ্ টাইমে পাঁচ মিনিট কম খেলা হয়, এই কারণে আবার খেলা হয়। দ্বিতীয় দিন ইষ্টবেঙ্গল ৪-২ গোলে জেতে। ইষ্টবেঙ্গলে বিখ্যাত ফরওয়ার্ড জোসেফ, প্রসাদ, ডি ব্যানার্জ্জী যোগ দিয়েছেন। ফলে ইষ্টবেঙ্গল দুর্দ্ধর্ষ টিম হয়ে পড়েছে।

ব্রাবোর্ণ কাপ কে নেবে?—বলা শক্ত—তবে মহামেডানের নামটাই প্রথমে মনে উঁকি দেয়। ইষ্টবেঙ্গলের কথাও ভেবে দেখতে হবে। ইষ্টবেঙ্গলের হাতে মহামেডান ঘা খেয়েছে বহুবার—; তার উপর জোসেফ, প্রসাদ আর ডি-ব্যানার্জ্জি এসে যোগ দিয়েছে। কুটির গিরদিও হেলার নয়! অতএব——দেখা যাক কি হয়।

রঞ্জি ট্রফি চলবে

চারিদিকে শুধু লড়াইয়ের খবর—জল্পনা আর কল্পনা। লোকের কি আর খেলার দিকে মন আছে? রঞ্জি ট্রফির চ্যাম্পিয়ান বাংলা দেশ তাই প্রস্তাব করেছিল—খেলা এবার বন্ধ থাক। সুতরাং ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সকল প্রদেশের মত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন—কি করা যায়! অধিকাংশের মতে সাব্যস্ত হয়েছে খেলা হবে।

আমাদের মতও খেলা হোক। যুদ্ধ যুদ্ধ করে একদল সত্যি সত্যিই যেন যুদ্ধ সুরু করে দিয়েছে! অবশ্য বাক্য-যুদ্ধ। আর অধিকাংশ লোকে নানা ভুঁয়ো খবরে, মিথ্যা গুজবে মুষড়ে পড়েছে। কলকাতায় বোমা পড়বেই—এই ভয়ে অনেক কাজ ফেলে পালাচ্ছে—যারা পালাচ্ছে না অনেকে চুপ চাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বোমা পড়বেই—মারা তখন যাবেই—মিথ্যা কাজ করে আর লাভ কি?

বিলেতেও খেলা বন্ধ হয়েছিল—তবে দু-একদিন। বিশেষজ্ঞরা দেখলেন—খেলা ধুলো বন্ধ হলে একটু একটু করে লোকের প্রাণশক্তি হয়ে আসবে ক্ষীণ; মরবে তারা যুদ্ধ না করেই। অতএব খেলা চলুক!

জো লুই এখনও ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ন

দু একমাস আগে—জো লুইয়ের কথা তোমরা 'রংমশালে' পড়েছ—আর পড়েছ তার সাংঘাতিক ডান হাতের কথা। এবার দেখা গেল তার বাঁ হাতও কম সাংঘাতিক নয়। সেদিন বব্ প্যাষ্টারের সঙ্গে তার 'ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়নসিপ ফাইট' হয়ে গেল। বব্ প্যাষ্টরের চোখের একটু দোষ ছিল! তবু সে দমেনি। বরং অষ্টম নবম আর দশম রাউণ্ডে তার ঘুষির বেগে যেন জোই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। লুইকে তিনবারই দড়ির আশ্রয় নিতে হল। ৪০,০০০ দর্শক—তাদের যেন নিঃশ্বাস আর পড়েনা—তবে কি লুই এবার—? কিন্তু বেশী ভাববার সময় আর থাকল না। কালো বাঘের মত লুই হঠাৎ রুখে দাঁড়াল। তার বাঁ হাতটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বব্ প্যাষ্টর ধরাশায়ী হল—আর উঠতে পারলনা—অবশ্য রেফারীর গণণার সময়ের মধ্যে।

জো লুই কি হারবে? হয়ত হারবে—কিন্তু যেদিন সে সত্যিই হারবে—সেদিনের যুদ্ধের কথা দর্শকেরা বোধহয় কোনদিন ভুলবে না।

শুধু ভালো ছাপা ভালো ছবি হলেই বই দেখতে সুন্দর হয় না,
নিখুঁত মজবুত রুচিসঙ্গত বাঁধাই হওয়া চাই
চমৎকার পরিপাটী বাঁধাইয়ে
আমাদের জুড়ি নেই
বিবেকানন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্ক্স্ঃ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

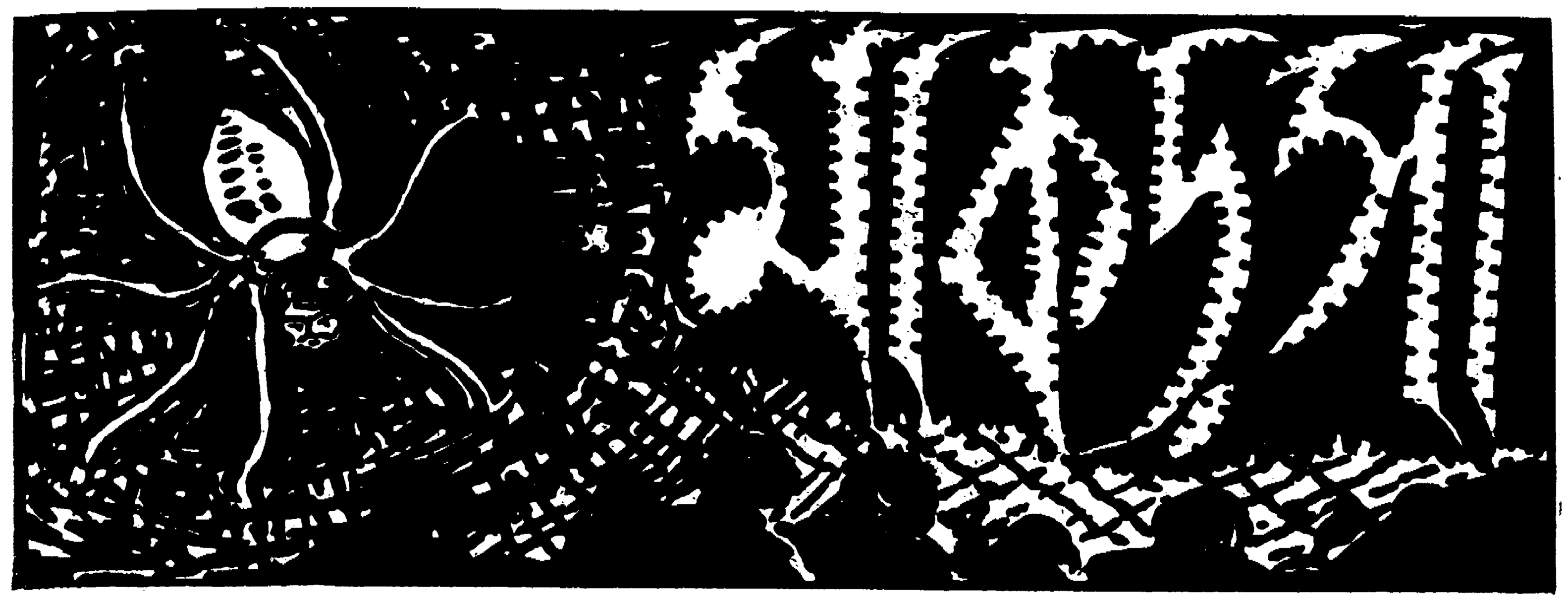

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রজত সেন

তিন

বাড়ী ফেরবার পথে পেছনে ফেলে-আসা টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর রোমাঞ্চময় স্মৃতি তাদের চঞ্চল মনের আকাশে মেঘের মত ভেসে যাচ্ছে। সহজ, সবুজ জীবন-যাত্রার পথে ছোট খাটো উত্তেজনা কখনও বা দল বেঁধে আসে, কখনও আসে একাকি। বিদ্যুতের মত তারা ক্ষণস্থায়ী; নদীর একটা তরঙ্গের মত তার ক্ষণিক চাঞ্চল্য! কিন্তু এ বৈচিত্র্য তাদের আকস্মিক নয়, এ ঘটনা তাদের জীবনে শুধু এক মুহূর্ত্তের আলোড়ন নয়। তাদের মনে শুধু একটা ঢেউ এসে ভেঙ্গে মিলিয়ে যায়নি, তাদের বেষ্টন করেছে একটা স্রোত। যার জলোচ্ছ্বাস, যার শিহরিত, অবিশ্রাম কল্লোল-ধ্বনি তার কানের কাছে বাজবে। কে জানে! ...তো প্রচণ্ড স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—অনেক দূরে! মানুষ যে-নীতির বন্দর সৃষ্টি করেচে—তার ...ঙ্গর ছিঁড়ে অনেক দূরে।

গণেশ তাদের জীবনে শুধু নিছক ঘটনা নয়, একটা অপ্রতিহত উপস্থিতি। একটা দুরন্ত আবির্ভাব। ...র সঙ্গ ত্যাগ করেও তার কথা মনের চিন্তাকে দেয় সূত্রহীন, অঙ্গহীন একটা অস্পষ্ট কাল্পনিক আভাষ! বঙ্কিম, ... আর জহর প্রত্যেকেই ফিরে এলো তাদের পুরোণা পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে, কিন্তু মনে তাদের নতুন ... জগতের দুরন্ত ইসারা! ওদের পকেটে রুমাল আর ফাউনটেনপেন, ওদের চারপাশে বাজছে টাকা! ...ঝন শব্দে যার বিহ্বলতা এনে দেয়! অথচ কালও তারা জানতো না টাকা এত মধুর, টাকার মধ্যে ... উত্তেজনা! অর্থকে বেষ্টন করে এত সুখ এত স্বপ্ন! বাস্তবিক বড়লোক যারা তারা কত না সুখী! ...দের ঘরে নানারকম সুস্বাদু আর দুষ্প্রাপ্য খাবারের মেলা, তাদের পোষাক পরিচ্ছদে ঠিকরে পরে সূর্য্যের সোনালি আভা, আর তারা নিজেরা চালায় মোটার—ষাট মাইল সত্তর মাইল বেগে।

বঙ্কিম জানে বাড়ী গিয়ে তার জন্য রোজ কি খাবার থাকে, অন্যদিন তারই লোভে সে হাতের কালি

ধুতে ভুলে যেতো! কিন্তু আজ সেই ভাঙ্গা কাঁসার বাটিতে সামান্য একটু তেল-ছোঁয়া মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কার কথা মনে পড়তে সমস্ত মন তার রুখে দাঁড়ালো। মনে মনে সে জানে—সম্পূর্ণ নিজের সুখ, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য সে চায় না! তার হবে অনেক টাকা! সে-টাকাতে মাকে কিনে দেবে পরবার সাড়ী আর ছোট বোন রাণুকে কিনে দেবে রঙ্গীন, পাতলা কাপড়ের একটা ফ্রক; যে ফ্রক অনেক রকম সে আজ মার্কেটে দেখেছে! মায়ের ছেঁড়া, পরিত্যক্ত সাড়ী থেকে ন্যাকড়া ছিঁড়ে তাই সেলাই করে হয় রাণুর জামা! বঙ্কিমের বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কেবিনে বসে নানারকম সুস্বাদু জিনিষ খেতে খেতে তার বার বার মনে পড়ছিলো মার কথা, রাণুর কথা! ছাপাখানায়—এক এক দিন বঙ্কিম ভাবে—কি কাজ করে তার বাবা? ওরা কেন বেশী মাইনে দেয়না তার বাবাকে? তারা কি জানেনা—কতদিন কতদিন তাদের শুধু নুন মেখে ভাত খেতে হয়? সেবার রাণু অসুখে মর মর, তার বাবা কানাইবাবু ছাপাখানার মালিকের কাছে কিছু অগ্রিম টাকা চেয়েছিলেন, মাইনে থেকে প্রতি মাসে কেটে নেবে এই চুক্তিতে। ছাপাখানার মালিক তার বাবাকে ঐ কয়েকটা টাকা অগ্রিম দেয়নি, তার বিশ্বাস আসলে মেয়ের অসুখের নাম করে কিছু টাকা বাগিয়ে পিট্টান দেবার মতলব। অথচ ওর বাবার ওখানে তু' বছর চাকরী হয়ে গেল, রোজ দশ ঘণ্টা খাটুনী! আশ্চর্য্য! বঙ্কিম সেদিন ভেবে পায়নি বড়লোকরা গরীবদের বিশ্বাস করেনা কেন? তারা সব মিথ্যুক, জোচ্চোর, ঠক!

অথচ কানাইবাবুর গোটা পনেরো টাকা যেমন করে হোক চাই-ই। না হলে রাণুর জন্যে ডাক্তার আসবে না, ওষুধ আসবেনা, বার্লি বা বেদানা আসবেনা, চোখের সামনেই রাণুর মৃত্যু ঘটবে। তার বাবাকে ছুটতে হয়েছিলো কাবুলীওয়ালার কাছে পনেরটা টাকার জন্যে। মাসে টাকায় এক আনা সুদ, মাসে পাঁচ টাকা ধার শোধ। কুড়ি টাকা থেকে পাঁচ টাকা ধার শোধ মানে মাসের সাত দিন সেরেফ উপোস। ওরা কিছু কাগজপত্র লেখা চায় না কিছু বন্ধক চায়না, শুধু কোন্ বাড়ীতে থাকে আর কোন্ অফিসে চাকরী করে এই দেখিয়ে দিলে সন্তুষ্ট। ওদের আইন, আদালত, মামলা, সাক্ষী ওই প্রকাণ্ড লাঠিখানা। বছর থানেক আগেকার ঘটনা, বঙ্কিমের মনে আছে কাবুলীওয়ালার হাত থেকে এড়াবার জন্যে তার বাবা কোন কোন দিন বাড়ী আসতোনা। 'পাইস' হোটেলে তু' পয়সার ভাত আর এক পয়সার ডাল—এই খেয়ে কালীঘাটের ধর্ম্মশালায় কোঁচার খুঁট বিছিয়ে রাত কাটাতে হত। আর বঙ্কিমকে বলতে হত নরম গলায়, আস্তে আস্তে যত রকম মিথ্যে কথা! কাবুলীওয়ালা মাটিতে লাঠি ঠোকে আর গোঁপে পাক দেয়। লাঠির শব্দে তার বুকের রক্ত জল হয়ে আসতো।

বঙ্কুর বাবা কানাই বাবু ছাপাখানার কিছু উপরির জন্যে দশ ঘণ্টার জায়গায় তেরো ঘণ্টা খাটতে লাগলো। আর সৌভাগ্যক্রমে সেবার ছাপাখানায় কাজও কিছু বেড়ে গিয়েছিলো।

সে-যাত্রা রাণু সেরে উঠেছিলো। শুধু কানাই বাবুর স্বাস্থ্যই আব একটু খারাপ হয়ে গেল। চোখগুলো বসে গেল আরও ভেতরে। মেজাজ হয়ে উঠেছিল আরও রুক্ষ!

আজ বাড়ীতে পা দিয়ে বার বার তার গণেশের কথা মনে পড়লো। সত্যিই ত! পড়াশুনো করে লাভ কি? ছেঁড়া, ময়লা জামা-কাপড়; শাকসেদ্ধ আর ভাত! ব্যবসা! একটা ব্যবসা করতেই হবে,

গণেশ বাবুকে সে আজই বলবে—তার দোকানে বঙ্কু কাজ করবে, বাবাকে বলে সে স্কুল ছেড়ে দেবে। তার বাবা আনন্দিতই হবে তাতে সন্দেহ নেই। চার হাজার টাকা দরকার নাকি একটা দোকান খুলতে! গণেশ বাবু বলেছেন টাকা যোগাড় করতে হবে,—কেমন করে? জহরের কত সুবিধে! তার বাবার কাছে চাইলেই পারে, তার বাবার ত অনেক টাকা!

তবু—কোথায় কোনখানে যেন একটা কাঁটা বঙ্কিমের মনে খচ খচ করে বেঁধে। এক এক বার মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে রীতিমত অসম্ভব! অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে কোন গোলমালই নজরে পড়ে না! কিছু সে স্থির করতে পারে না! চুপ করে বসে থাকে!

এদিকে শিবু আর জহরও ভাসতে থাকে—উদ্দাম চিন্তার স্রোতে। বইগুলো পড়ার টেব্‌লে ফেলে শিবু নীচে নেমে আসে একেবারে সে-ঘরে—যে-ঘরে তার বাবা তখন পেতলের একটা ছোট দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সোনা ওজন করছে। শিবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ঘরের চারদিকে বড় বড় লোহার সিন্ধুক! কোনটা বা দেয়ালের মধ্যে ঢোকানো, কোনোটা ঘরের মেঝের সঙ্গে একেবারে সিমেণ্ট গেঁথে বসানো! পাশে তুটো পাটের থলিতে বোঝাই টাকা! কাল বোধ হয় বড়বাজার সোনাপটি থেকে সোনা কেনবার দিন। ঘরে এত সিন্ধুক! এত টাকা আর সোনারূপো, কিন্তু কোনোদিন এ-সম্বন্ধে শিবুর বিন্দুমাত্র কৌতূহল হয় নি। আজ সে অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। প্রত্যেকটি সিন্ধুকে না জানি কত টাকা! ঐ পাটের থলিতেই বা কত টাকা সে-সম্বন্ধে শিবুর কোন ধারণা নেই। কত দিন এ-ধার দিয়ে যাবার সময় সে দেখেছে তার বাবা টাকা গুণছে—কিন্তু কোন দিন তার এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে দেখবার ইচ্ছে হয় নি। কিন্তু আজ এ-ঘরের মধ্যে কি যেন মায়া! রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের লাট্টু খেলার শব্দ তার কানেই পৌঁছাচ্ছে না। সে আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচে ঐ থলিগুলোতে কত টাকা আছে। কত টাকা? চার শ' পাঁচ শ', এক হাজার! তু' হাজার! পাঁচ হাজার! শিবুর কপালে ঘাম দেখা দিল। গণেশ বাবুর দেড় হাজার টাকা আছে, আরও টাকা চাই। তিন চার হাজার টাকা না হলে ব্যবসা ... না। চমৎকার লোক গণেশ বাবু! অথচ কি তুঃখের কথা! তাদের এত টাকা, অথচ তার নিজের ...টি পয়সাও নয়! গণেশ বাবু তার বাবার কাছে এসে টাকা চাইলেই ত পারেন। সে জানে তার বাবা ... ভালো লোক। গণেশ বাবু যদি চায় শিবু নিজেই একদিন বলতে পারে তার বাবাকে টাকার জন্যে। ...চ্ছা! শিবুর মাথার মধ্যে লাগলো একটা রক্তের ধাক্কা। আচ্ছা—অনেক টাকা ত! যদি কিছু টাকা ...িয়ে নিয়ে নেওয়া যায় তা হলে কি তার বাবা টের পাবেন? কেমন করে জানবেন কিন্তু? এত টাকার ...উ কখনও হিসেব রাখতে পারে? পারে?

'কি রে? ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্ র‍্যা?' শিবুর বাবা হাঁক দিলেন। প্রকাণ্ড, মোটা লোক তিনি, ফতুয়ার ওপরে বিরাট ভুঁড়িটা সহজে চোখে পড়ে; ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, আর ইয়া লম্বা একটা গড়গড়ার নল সব সময় তাঁর মুখে। তাঁর আশে-পাশে আরও কয়েকটি মাইনে-করা লোক কাজ করে। তিনি বেলা তু'টো পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রা দিয়ে তারপর নীচে আসেন কাজ তদারক করতে।

হাঁক শুনে শিবু একেবারে আপাদমস্তক চমকে উঠলো। কি যে উত্তর দেবে কিছুই সে ভেবে পেলো না।

'কথা বলে না ?' তিনি আবার হাঁক দিলেন।

'একটা পয়সা চাই।' শিবু তাড়াতাড়ি বললে।

'কি হবে কি পয়সা ?'

'ঘুগ্নি খাবো !'

'কেন লুচি কি হ'ল ? স্কুল থেকে এসে খাস্ নি ?'

'খেয়েছি, তবু ঘুগ্নি খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে।'

'না, খেতে হবে না, যা এখান থেকে ঃ রাস্তার যত ধূলোবালি, নোংরা ! তারপর পেট ছাড়ুক, তখন ডাকো ডাক্তার !'

শিবু চলে যাচ্ছিলো, ক্ষিধে তার ছিলো না। 'শোন, এদিকে আয় !' তার বাবা আবার হাঁক দিলেন।

শিবু ফিরে দাঁড়ালো। 'এই নে ! দুটো পয়সা, আমার জন্যে এক পয়সার নিয়ে আসবি।'

সে আর একটু হলে তার বাবার সামনেই হেসে ফেলছিলো।

বাবাকে ঘুগ্নি দিয়ে এসে সে রাস্তায় লাট্টু খেলতে লেগে যাচ্ছিলো। জহর দোতালার বারান্দা থেকে ডাক দিলে—'এই শিবু ! শিবু !'

'নীচে নেমে আয় না।' শিবু বললে।

জহর নীচে এলো। বারান্দার এক কোণে বসলো তারা, রাস্তায় লাট্টু চলেছে।

'শোন্।' জহর কলমটা পকেট থেকে বার করে বললে, 'এ কলম আমার চাই না, এ আমি গণেশ বাবুকে ফেরত দেবো।'

'কেন রে ?' শিবু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে।

'না, এটা ত তিনি—তিনি পয়সা দিয়ে কেনেন নি।'

'বা রে ! নাই বা কিনলেন, তাতে হয়েছে কি ?'

'এ রকম না বলে জিনিষ তুলে নেয়া কিন্তু ভারী অন্যায়', জহর বললে।

'তোর জন্যেই ত নিয়েছে, ওরা ত দোকানে অনেক লাভ করে, তা ছাড়া গণেশ বাবু কি ভালবেন বল্ তো এমন চমৎকার লোক ! আমাদের ভীষণ ভালোবাসেন জানিস্ ? ওটা ত এমনি নিয়েছেন, গণেশ বাবু ত বড়লোক, উনি কি আর কিনতে পারতেন না ভাবছিস্ ?'

'তা কিনলেন না কেন ?'

'বা, তা হলে মজা হ'ত কি ?' শিবুর বিস্ময় এখনও কাটে নি, 'তা ছাড়া গণেশ বাবু তা হলে ভীষণ রাগ করবেন, আমাদের দোকান করে দেবেন বলেছেন ! এই জানিস্ ? বাবার সিন্ধুকে কিন্তু অনেক টাকা আছে, আচ্ছা কিছু সরালে টের পাবে ?'

'কেমন করে সরাবি শুনি ?' জহর জিজ্ঞেস করলে; 'বাবারও ত সিন্ধুকে অনেক টাকা, কিন্তু যদি জানতে পারেন কি বিশ্রী বল দিকি ? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন !'

'দিক না', শিবু বললে, 'গণেশ বাবু ত রয়েছেন।'

ইস্কুল-ঘর

আমাদের মন, ইস্কুল পাঠশালায় গিয়ে, পালাই পালাই করে কেন ? আমরা লেখা পড়া পছন্দ করি না ? এ একটা কথাই হল না ! আমরা যে চুরী করে রাজ্যের বই পড়ি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে স্মুরু করে আজবতত্ত্ব কিছুই যে বাদ যায় না, এতো সবাই জানে। আমাদের মাষ্টারমশাই পণ্ডিতমশাইরা জানেন না বুঝি !

সেদিন দাদা বললেন, চল হাবুরাম, বায়স্কোপ দেখাব।

কি বায়স্কোপ ? হাতেখড়ি ! সেই তো বাবা কোলে বসিয়ে ছেলেবেলায় একবার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন, এক হাতেখড়ির ধাক্কায়ই তো কাহিল হয়ে পড়েছি, মাষ্টারমশাইদের বেতের আগে আগে এ ঘর সে ঘর ছুটছি। তার উপর, ছবি দেখতে গিয়েও যদি আবার হাতেখড়ির পাল্লায় পড়তে হয়, তাহলে—

কানে ধরে দাদা নিয়ে গেলেন ছবি দেখাতে।

ছবি স্মুরু হল। বিখ্যাত ইস্কুল-পালানো ছেলে ভোলানাথের কাহিনী। ছবির ভোলানাথকে দেখে বুঝতে আর বাকী থাকে না এ সত্যিই একটী গুণধরবিশেষ। বাংলা দেশে এই ধনুর্দ্ধরের কোনো জুড়ি থাকে তো সে হচ্ছি আমি।

ভোলানাথ—যাকে বলে ডানপিটে ছেলে। ট্যাক্সির পিছনে চেপে ষ্টেশানে আসা, বিনা টিকিটে গাড়ি চাপতে যাওয়া, বাড়ী থেকে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরে বেড়ানো, সব বিদ্যায় ওস্তাদ ছেলে।

একদিন সে বাড়ী থেকে সত্যিই বেরিয়ে পড়ে, ট্যাক্সির পিছনে চেপে একেবারে শেয়ালদা ষ্টেশানে। বিনা টিকিটে সে গেট পার হচ্ছিল আর কি, টিকিটচেকার ধরে' ফেললেন। একজন প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন—ভোলানাথ তাঁর বিছানার

ভিতর থেকে বালিশ টালিশ সরিয়ে ফেলে কিছু জায়গা করে ফেললে। তারপর ঢুকে পড়লে বিছানার খোলের ভিতর। ভদ্রলোক বিছানা তুলতে গিয়ে দেখেন বড় ভারী ঠেকছে। ভোলানাথ শেষে ধরা পড়ে যায়। চেকার হুমকি দেন, ভদ্রলোক রুখে আসেন, ভোলানাথ দমে না। ধমক দিয়ে বলে, 'আরে, আমি কাপ্তেন ভোলানাথ! দেশ ভ্রমণে যাচ্ছি।'

তারপর—তারপর ভোলানাথের বাপ তো ছেলের কানটা ধরে বাড়ী নিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুতেই ছেলে আর বাগ মানে না। বাপকে দেখে কখনো লুকোয় ডাষ্টবিনে, কখনও কোথায় হাওয়া হয়ে যায়।

একদিন ভোলানাথদের পাড়ার এক ভদ্রলোক তার বাপকে বললেন, 'মশাই, ছেলেটাকে মডেল ইস্কুলে দিয়ে দেখুন, ঠিক পড়বে।'

মডেল ইস্কুলে লেখাপড়া হয়, কিন্তু সে যেন আমাদের জানাশোনা ইস্কুল পাঠশালার মত নয়। গান হচ্ছে, খেলাধূলো হচ্ছে, তার ভিতর দিয়েই ছেলেরা শিখছে, জানছে। যে মেয়েটী ছেলেপুলেদের ভার নিয়ে আছেন, কি মিষ্টি তাঁর গলা, কি মিষ্টি তাঁর হাসি। গল্পের ভেতর দিয়ে, গানের ভেতর দিয়ে তিনি কত কথা বলেন—বেশ মনে থাকে।

একটু পড়া, একটু খেলা, সময়টা বেশ কেটে যায়। খেল্‌না ইস্কুল থেকেই দেওয়া হয়—যে যেমনটী চায় তেমন খেল্‌না। যে ছেলের ঝোঁক গাড়ী ঘোড়ার দিকে, সে পুতুল-ইঞ্জিন, এরোপ্লেন, জাহাজ নিয়ে খেলছে; যে ছেলের গান-গান মনটা, সে খেল্‌না-বাজনা বাজাচ্ছে, ক্ষুদে গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে।

ভোলানাথ ইস্কুলের নামে চটে মটেই একবার হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেল—কিন্তু কানে এলো গানের মিষ্টি আওয়াজ, পুতুল ইঞ্জিনের স্প্রিংএর চমৎকার ফর্‌ফর্‌ শব্দটা। ইস্কুল ঘরের খেলাধূলো-লেখাপড়া মেশানো আবহাওয়াটা তাকে পেয়ে বসল।

ফিরে এলো সে ইস্কুলে। কিন্তু নাম সই করে খেল্‌না নিতে হয়। ধনুর্দ্ধর ছেলে তখনও নিজের নামটা লিখতে শেখেননি। সে কাঁদো কাঁদো মুখে ইস্কুলের হেড্‌ মিস্‌ট্রেস্‌কে বললে, 'আমি খেল্‌না পাবো না?'

'কেন পাবে না? নাম সই করে দিলেই পাবে।'

'আমি তো লিখতে জানি না।'

'তাহলে লিখতে শিখে ফ্যালো।'

তারপর—তারপর এই ভোলানাথ যে একদিন লেখাপড়া শিখে মহাপণ্ডিত হবে তার আভাস পেলুম। শেষ দৃশ্যে দেখলুম ভোলানাথ রাজ্যের খেল্‌না ছড়িয়ে পড়তে বসেছে।

তাহলে সে নাম লিখতে শিখেছে।

আমি—শুধুই নাম লিখতে, আমি বই লিখতে শিখতুম যদি পেতুম ভোলানাথের নতুন পাওয়া ইস্কুলের মত একটা ইস্কুল।

ইস্কুল চাই, মনের মত একটা ইস্কুল, যে ইস্কুলে এসে মনে হবে বেঁচে গেছি, বাড়ী থেকে পালিয়ে যেখানে আসব, যেখানে মিষ্টি গান আর খেলাধূলোর ভিতর দিয়ে মধুর পড়া পড়ে মানুষের মত মানুষ হব।

আমাদের লাইব্রেরী

ছোটদের নাটমঞ্চ: মন্মথনাথ রায় রচিত, মনোজিৎ বসু সম্পাদিত: ইম্পিরিয়াল ষোলপেজি: ...৬ পৃষ্ঠা: মূল্য বারো আনা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত।

বড়দের নাটক লিখে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় নাম কিনেছেন। শুনতে পাই তাঁর কয়েকটি নাটক এদেশের ...কে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা তিনি ভোলেন নি, কিছুকাল ধরে নানা সাময়িকপত্রে ...নি ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ সুন্দর ছোট ছোট নাটক লিখেছিলেন। এই সব নাটক ছেলেমেয়েদের মন ...ণ করেছে একথা শুনতে পেয়েছি। এই বইয়ে মোট ১০টি নাটক দেখতে পাচ্ছি। নীতি, বুদ্ধি ও ...দেশের সঙ্গে লেখকের সরস ভঙ্গী মিশে নাটকগুলি সত্যই উপভোগ্য হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ছুটির দিনে ...ই নাটক পড়তে, করতে কিম্বা দেখতে পেলে বিলক্ষণ খুসি হবে।

ছেলেমেয়েদের জন্য এত ছোট, এত সোজা নাটক লেখার চেষ্টা হয়তো এই প্রথম। অন্ততঃ সেদিক ...য়েও 'ছোটদের নাটমঞ্চ' এদেশের শিশু সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থানঅধিকার করে থাকবে।

পুরু সাদা কাগজে ঝর ঝরে ছাপা। সুন্দর রঙ্গীন মলাট। এবই লিখে কিম্বা প্রকাশ করে লেখক ... প্রকাশক কোনো অন্যায় করেন নি!

ঘরের বাহিরে

একদিন দুপুরে

একটী ছোট ছেলের ডায়েরী থেকে নিয়ে লেখা

শ্রীমতী প্রীতিলতা দেবী

দূরের পাহাড়টা দেখে ভারি লোভ হয়, মনে হয় একদিন ওর চুড়োয় গিয়ে উঠি।

ঢেউ-খেলানো মাঠ, ঝিরঝিরে নদী আর আঁকাবাঁকা পথের শেষে পুরণো পাহাড়, কত বছরের পুরণো তা কেউ জানে না। সাঁওতাল বুড়োরাও জানে না। তারা শুধু ঘাড় নেড়ে নেড়ে হুঁ হুঁ করে বলে, 'বড় পাহাড়, ভারী পাহাড়।' আমার শুধু মনে হয় মায়া-পাহাড়, ঘুমন্ত পাহাড়।

সেদিন, ঘুমন্ত পাহাড়ের কোলে ঝড় বিদ্যুতে মাতামাতি লেগে গেল, তার ঘুম বুঝি ভেঙে গেল। ঝড়ের শেষে আকাশে এলো পড়ন্ত বেলার রোদের বন্যা। পাহাড়ের মাথায় কে যেন রঙীন আলোর একটা মুকুট পরিয়ে দিল। আমি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই রঙের কাণ্ড দেখছিলুম। তখন আমার পাশে কে যেন পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো। চমকে উঠতে দেখি মংরু, আমাদের ঝরু আরদালির ছেলে।

মংরু বললে, 'কি দেখছ খোকাবাবু ?'

বললাম, 'পাহাড়।'

মংরু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ফিসফাস করে বললে, 'জানো খোকাবাবু ?'

'কি রে !'

'ওই পাহাড়ের চুড়োয় পরী থাকে জানো ?'

পরী ? রূপকথার গল্পের পরী ! সবুজ সোনালী মিষ্টি কবিতাগুলির টুকটুকে ফুটফুটে পরী !

বললাম, 'যাবি পাহাড়ে ?'

বললে, 'ভয় করে যে '

'পরীদের কাছে আবার ভয় কি রে ! পরীরা তো আর ভূত নয় !'

মংরু ঘাড় নাড়লে। তারপর বললে, 'চলনা একদিন !'

পরদিন পাহাড়ের মাথায় ভরাদুপুরে রোদ ঝক্‌ঝক্ করছে। আমি আর মংরু আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে মাঠে এসে পড়েছি। শালবনের ধার দিয়ে আমরা দুজন যেন ছুটে চলেছি। নিঝঝুম শালবনে কারা থাকে ঘুমিয়ে কে জানে ! কে যেন ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকাচ্ছে ! মংরু আমার গা টিপে বলে, 'শুনেছো খোকাবাবু।' কোনো জবাব দিই না, কিন্তু বুকটা দুরদুর করে ওঠে, ভেবে মরি জটাই বুড়ি—সেকি দুপুরে শালবনের অন্ধকারে এসে ঘুমোয় ?

দূরে ঝিরঝিরে নদী একটা রূপালী সাপের মত কিলবিল করছে। আমি বলি, 'মংরু, আর কতদূর রে !' মংরু বলে, 'কতদূর আর !' কিন্তু ঝিরঝিরে নদী দূরে দূরে যেন সরে সরে যায়। খানিকবাদে মংরু বলে, 'কি আপদ, নদীটা ভারী দুষ্টু খোকাবাবু !' মংরু ঠিকই বলে হয়তো, নাহলে বারান্দা থেকে দেখা এত কাছের নদী এত দূর হয়ে যায় কি করে ? তেপান্তরের নদী ভারী দুষ্টু, ডাইনির সঙ্গে তাদের ভাব। তাইতো তেপান্তরের পাটনিকে দেখে রাজপুত্তুর ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মংরু সঙ্গে আছে, ভয় কি ?

চলতে চলতে কাঠফাটা রোদে পাথুরে মাটি তেঁতে ওঠে। মংরু বলে, 'খোকাবাবু বড় তেষ্টা পেয়ে গেছে।' আমি বলি, 'নদী এলেই পেটভরে জল খাবি ! আর কতদূর রে মংরু।' মংরু বলতে যায়, 'এইতো এসে গেছি—কিন্তু হঠাৎ সে থেমে যায়, বলে, 'দেখছ খোকাবাবু।' দেখি, তাই তো, ঝিরঝির নদী সেই অনেক দূরেই যেন ঝিরঝির করছে। নদীটা কতদূর ? নদীটা কি সত্যিই নদী নয় ? কোনো ডাইনী বুড়ি ছল করে নদীর রূপ ধরে নেই তো ! কে জানে পিছু হটে হটে কোথায় কোন্ অগম দেশে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

আমি বলি, 'মংরু !' মংরু বলে, 'উঁ।' 'নদীটা কেউ কখনো পার হয়েছে শুনেছিস ?' 'একদিন ঝরুসর্দ্দারই তো পার হয়েছিল !' 'সত্যি ?' 'তিন সত্যি—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি খোকাবাবু !' 'তবে নদীটা আসে না কেন রে ?' মংরু কোনো জবাব দেয় না। আমি বলি, 'আয় মংরু, আমরা খানিকটা ছুটে যাই।' না ছুটে তো উপায় নেই। সন্ধ্যা হয়ে গেলে পাহাড়ের চুড়োয় আর ওঠা যাবে না।

দুজনে মিলে ছুটে ছুটে হায়রাণ। ঝিরঝিরে নদী রোদে ঝলকায়, ছোট ছোট ঢেউয়ে চমকায়, কিন্তু ধরা দেয় না। ছুটে ছুটে আমরা হায়রাণ হয়ে যাই। মংরু বলে, 'সাঁওতাল বুড়োকে সঙ্গে আনলে হত। সে তুক জানে খোকাবাবু। খোকাবাবু, দ্যাখো, দ্যাখো তো

একবার।' দেখি, আমাদের ডাইনে লাল মাটির আর একটা পথ ধরে হন্ হন্ করে লাঠির আগায় পুটলী বেঁধে নিয়ে লাল্টু ধোপা পথ চলছে। আমরা তুজনেই চেঁচিয়ে উঠি, 'লাল্টু!' লাল্টু চমকে থেমে যায়। তারপর কাছে আসতে আসতে বলে, 'আরে খোকাবাবু ধুলো মেখে কোথায় যাচ্ছ?' বলি, 'পাহাড় চুড়োয় যাবো লাল্টু, নদীটা কি বড্ড দূরে?' লাল্টু চোখ পাকিয়ে বলে, 'তাহলেই হয়েছে! ওযে বিশমাইল দূরে পাহাড়টা! ··মরা কেউ যাইনি—শুধু একবার সুখন মাঝি বাঘ মারতে গিয়েছিল।' আমি বলি 'সুখন কোথায়!' লাল্টু বলে, 'সে আর ফিরে আসেনি।'

ফিরে আসে নি! তাহলে ফিরেই চলি। কিন্তু ঝিরঝিরে নদীটা গিয়ে একবার দেখে আসলে হয় না। লালটুকে বলতে গেলে বলে, 'সর্বনাশ! ও এখনও পাক্কা তুটি মাইল। তাছাড়া নদীতে এখন বান ডাকবে।' ঝিরঝিরে নদীতেও যাওয়া হল না। তুজন ফিরে আসি, আমি আর মংরু।

কিন্তু একদিন আমি ওই পাহাড় চুড়োয় যাবোই, ঝিরঝির নদী পার হয়ে। পরীদের দেখতে গম্ভীর পাহাড়ের মেঘমাখানো চুড়োয় একবার চাপবো। সেই একদিন কবে আসবে, জানি না। সেদিন আমি আর ভয় পাবো না। আমি তখন বর হব, বীর হব, তখন তো আমি আর ভয়কাতুরে ছেলে থাকব না। সেদিন আমার পাশে হয়তো মংরু থাকবে না। হয় তো নতুন সাথী সঙ্গে থাকবে। ঝিরঝিরে নদীতে পৌঁছে গেলে সে আঁচলের খুঁট খুলে চিড়ে ভিজিয়ে নেবে, কিম্বা খেতে দেবে উড়কি ধানের মুড়কি। সেদিন লালটু মাঝি এসে হাজার বারণ করলেও শুনবো না। লাল্টুরা ভারী পাজী। পৃথিবী জুড়ে তারা খালি ভয় দেখিয়ে বেড়ায়।

দরকারী	রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকরা স্মরণ রাখবেন (১) চিঠিপত্র টাকাকড়ি, ম্যানেজিং এডিটর, রংমশাল, ১০ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে
নূতন টেলিফোন ঃ সাউথ ৪৭৯	(২) কোন ব্যক্তিগত নামে টাকাকড়ি চিঠিপত্র পাঠালে ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হয়

ধারাবাহিক উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খুনে নয়, ডাকাত নয়, সিঁদেল চোর—রাখালের কথা বলছি গো—ভুঁইতরাসি গ্রামের রাখাল আর তার সাকরেদ ভূতনাথ ওরফে ভূতো।

ধরা পড়ল, না, সেই সেবার হারু মোড়লের বাড়ি সিঁদ কাটতে গিয়ে! মার ধর ত দেওয়া যৎপরোনাস্তি। তারপর তালাবন্দ রইল রাতের মত হারু মোড়লের গুদোম ঘরে। রাতটা বইত নয়। সকালেই গিয়ে থানায় দারোগার কাছে ধরে দেওয়া যাবে। এই ঘুটঘুট্টি আঁধার রাতে প্রাণ হাতে করে কে আর যায় তিন ক্রোশ হেঁটে ফাঁড়িতে।

কিন্তু সকাল বেলা সবাই গুদোম ঘর খুলতে এসে একেবারে তাজ্জব। কোথায় বা রাখাল আর কোথায় বা তার সাকরেদ ভূতো! বোকা বনে গিয়ে কেউ আর আর কারুর দিকে চায় না, খালি মাথা চুলকোয়।

ছি, ছি, কি আহাম্মুকিটাই হয়ে গেছে! রাখাল আর ভূতোকে ঘরে ত পোরা হয়েছে, কিন্তু সিঁদকাটিটাই কেড়ে নিতে কারু মনে পড়েনি! দেয়ালের গায়ে গোল ফোকরটা তাদেরই মত হাঁ করে আছে।

কিন্তু গেল কোথায় রাখাল আর ভূতো ? চোর ডাকাত হলেও কি প্রাণের ভয় নেই ! আবাদী গাঁ, দিন ত্বপুরে বাঘের ডাক শোনা যায়। আর এই ঘোর অমাবস্যার রাতে তারা বনবাদাড় ভেঙে শুধু জেলখানার ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে ! উহু—তা'ত হতে পারে না ! জেলখানার ভয় করবে রাখাল আর ভূতো ! ব্যাঙের আবার সর্দ্দির ভয় ! তাদের জেল বা কি ঘরই বা কি ! না ব্যাপারটা গোলমেলে। খোঁজ করতে হয়।

খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল, গাঁয়ের ঘাটের ওপর তোলা হারু মোড়লেরই ডিঙিখানা নেই।

ঠিক হয়েছে—এই ডিঙি নিয়েই তারা সরে পড়েছে। কিন্তু ডিঙি যে ভাঙ্গা গো—শতেক ফুটো !

তাও ত বটে !

তবে তারা গাঙ্গের জলে ডুবে মরল নাকি ! আহা একেই বলে নেয়ৎ ! কেন এ হুর্বুদ্ধি হয়েছিল বাছাদের—মেয়েরা বল্লে চোখের জল মুছে,—না হয় চার ছমাস জেলই খাটতিস !

বেটাছেলেরা বল্লে—গেছে আপদ গেছে,—কিন্তু বড় নিখ্‌খুঁত সিঁদ কাটত -যাই বল আর তাই বল। হাজার হলেও ভুঁইতরাসীর ছেলে ত বটে !

রাখাল আর ভূতো সত্যি ডুবে মরল নাকি ! উহুঃ—তেমন পাত্তরই তারা নয়। ডিঙি বেয়ে মাঝ গাঙে পড়তেই চোরা স্রোতের টানে নৌকো অবশ্য সামাল সামাল। ডিঙি একবারে তীরের মত ছুটে চলে।

রাখাল বসেছে হালে আর ভূতো নিয়েছে বৈঠা ! কিন্তু বৈঠা আর চালাতে হয় না !

খানিক বাদে ভূতো ভয়ে ভয়ে বলে,—ও রাখাল বড় জল যে !

রাখাল খেঁকিয়ে ওঠে,— গাঙ্গে জল হবে না ত হবে কোথায় ?

গাঙ্গে নয় ডিঙিতে।

অ্যাঁ বলিস কি ডিঙিতে ! ডিঙিতে জল উঠছে নাকি ! ছেঁচে ফেল ছেঁচে ফেল !

কত ছাঁচব ! আর ছাঁচব কিসে ? কিছুত নেই !

রাখালকে আর জবাবে কিছু বলতে হয় না। হঠাৎ চোরা ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকো একেবারে চরকী বাজির মত ঘুরপাক খেতে থাকে। গাঙ্গের জলেই তারা যে ছিটকে পড়ে না এই আশ্চর্য্যি।

ডিঙি কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। তাদেরও চোখে সর্ষেফুল ঘুরপাক খেয়ে !

তারপর কি যে হয় !

রাখাল চোখ রগড়ে বলে—দেখত ভূতো !

ভূতো দেখে কিন্তু মুখে তার কথা ফোটে না।

রাখাল আবার চোখ রগড়ায়—একবার হুবার তিনবার, তারপর হাত বাড়িয়ে ভূতোকে জোরে একটা চিমটি কাটে।

ভূতো লাফিয়ে উঠে বলে,—উঃ—

হুঁ, তুই ঠিক বেঁচে আছিস। কিন্তু আমি ! আঙ্গুলটা কামড়া দেখি একটু !

ভূতোকে আর হুবার বলতে হয় না, তার কামড়ের চোটে রাখাল উঠে নাচতে সুরু করে --বেঁচে আছি বেঁচে আছি, নির্ঘাৎ বেঁচে আছি ! তারপর কসে ভূতোর গালে এক চড় কসায় !

ভূতো কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে,—মারলি যে বড় !

মারবনা, আমার আঙ্গুল কামড়ানো !

বাঃ —তুই ত বল্লি !

তখন কি জানতাম যে বেঁচে আছি !—অম্লান বদনে বলে রাখাল তারপর তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে,—যাক্ তুই কামড়েছিস আমি চড়িয়েছি শোধবোধ হয়ে গেছে ! শুধু একটু চিমটি না হয় তোর পাওনা রইল !—কিন্তু এ কোথায় এলাম বল ত ! ডিঙিটাই বা কখন ডুবল, সাঁতরেই বা কখন এলাম ! মনে পড়ছে কিছু !

ভূতো মাথা নাড়ে।

রাখাল বলে,—ঠিক চিনতেও ত পারছি না। এ তল্লাটে সব আবাদী গাঁ-ই ত চিনি, এটা আবার কবে কে বসাল ? ঠিক গাঁ বলেও মনে হচ্ছে না।

ভূতো খানিক মাথা ঘামিয়ে বলে,—এটা বোধহয় কলকাতা !

তোর মাথা ! ভুঁইতরাসী থেকে কলকাতা অমনি গেলেই হল। মহকুমা থেকে সদর সদর থেকে কলকাতা ! তোর আমার মত সিঁদেল চোরের কর্ম্ম নয়, জাল জুয়াচোর, খুনে লেঠেল না হলে আর কলকাতার কয়েদে পাঠায় না বুঝেছিস্ !...আর কলকেতা হলে টেরামগাড়ি কোথায় !

টেরামগাড়িটা ঠিক কি বস্তু ভূতো জানে না, তবু চারিদিকে কোন রকম গাড়িরই সন্ধান না পেয়ে জায়গাটা কলকাতা নয় বলেই তার মনে হয়।

কিন্তু ওই যে পেল্লয় পেল্লয় কোঠাগুলো—ওগুলো কি? গাঁয়ে কি অমন কোঠা হয়!

তা হয় না বটে—রাখালকে সে কথা স্বীকার করতেই হয়। গাঁয়ে কেন, সেবার ধরা পড়ে সদরে গিয়েও ত সে অমন কোঠা দেখেনি। আর শুধু কি কোঠা,—রাস্তাঘাটগুলো কি রকম! যেন সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়, আর কি সব কেয়ারি করা ফুলের বাগান! তার মাঝে মাঝে ফোয়ারা!

তার ভাবনায় বাধা দিয়ে ভূতো বলে,—হুঁ ঠিক হয়েছে, ও কোঠাগুলো কিসের বুঝেছি!

কি বুঝেছিস্?

ও গুলো জেলখানা!

জেলখানা! জেলখানা ত একটাই হয়—রাজ্য শুধু জেলখানাই এরা বানিয়েছে নাকি? মুল্লুক শুদ্ধ সবাই তাহলে চোর?

ভূতো নিজের ভুলটা বুঝতে পারে, সবাই চোর হলে চুরি করবে কার! তা ছাড়া জেলখানায় কি অত জানলা দরজা থাকে,—সে দরজা আবার অমন হাট্ করে খোলা, না? ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে।

তখন ত সবে ভোর।

তারপর বেলা যত বাড়ে ব্যাপারটা ততই গোলমেলে হয়ে ওঠে, রাখাল আর ভূতো থই পায় না।

যেমন তাজ্জব মুল্লুক, তেমনি অদ্ভুত সব লোকজন।

ভালো করে' সকাল হতেই দলে দলে তারা সেই সব কোঠা থেকে বেরোয়—ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো, রং বেরংএর তাদের পোষাক। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তারা আবার গানও গায় পথে যেতে যেতে।

আজ বোধহয় এদের গাজনের সং বেরিয়েছে!—ভূতো অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে মন্তব্য করে।

তুই যেমন আহাম্মুক, আশ্বিন মাসে গাজন হয় নাকি!—রাখাল তাকে ধমকে দেয়, কিন্তু এমন রং বেরংএর সাজের মানে খুঁজে পায় না নিজে।

এক দল লোক তাদের দিকেই আসে। সরে পড়তে গিয়েও রাখাল আর ভূতোর সরে পড়া হয় না! লোকগুলো তাদের দেখে ফেলেছে আগেই।

রাখাল ভূতোকে আগে থাকতে সাবধান করে রাখে,—খুব হুঁশিয়ার বেফাঁস কিছু বলে ফেলিসনি যেন!

কিন্তু লোকগুলো তাদের কোন কথাই শুধোয় না। শুধু একটু হেসে তাদের সম্ভাষণ করে তারা গাঙের ধারে ছোট ছোট সব ডিঙিতে গিয়ে ওঠে।

তাইত! গাঙের ধারে এতগুলো এমন সুন্দর ডিঙি বাঁধা ছিল এতক্ষণ ত চোখে পড়েনি! জেলে ডিঙির আবার এমন রং বেরঙের চেহারা হয় নাকি!

রাখাল আর ভূতোকে এবার নিজে থেকেই তাদের দিকে এগুতে হয়।

মাছ ধরতে চলেছ বুঝি তোমরা!

মাছ ধরতে?....তাদের একজন হেসে জবাব দেয়,...হ্যাঁ মাছ ও ধরব বইকি!

দেখ কথার ছিরি, মনে মনে ভাবে রাখাল,...ডিঙি নিয়ে গাঙে চলেছেন তবু বলে, মাছ ও ধরব বইকি! মাছ ধরবিনা ত কি মজা করতে বেরিয়েছিস হতভাগারা?

মুখে সে হেসে বলে,—মাছের দর কিরকম এখানকার বাজারে?

বাজার!—লোকগুলো সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

কালা নাকি সব? রাখাল আবার গলা চড়িয়ে বলে,—মাছের বাজার গো মেছো হাটা—মাছ বিক্রি হয় যেখানে। সেখানে মাছের কি রকম দর মেলে?

লোকগুলো এ-ওর মুখের দিকে চায় আবার।

একজন এগিয়ে এসে বলে,—বুঝেছি! তোমরা বুঝি হট্টমালা থেকে আসছ?

এবার রাখাল আর ভূতোর চোখ কপালে ওঠে,—হট্টমালা! সে আবার কোথাকার দেশ!

ক্রমশ

যুদ্ধের পুরণো গল্প

যুদ্ধের মরশুমে গত মহাযুদ্ধের পুরণো একটা গল্প বলি শোনো।

জার্ম্মাণ সাবমেরিণ তখন মহাসমুদ্রে মহা হুলস্থুল বাধিয়েছে। একে একে ইংলণ্ড ফ্রান্সের অনেকগুলো জাহাজ ডুবে গেল। চারিদিকে মহাত্রাসের সঞ্চার হল। জলের তলায় গা ঢাকা দিয়ে এসে সাবমেরিণ কখন জাহাজের উপর চড়াও হবে, চক্ষের পলকে টর্পেডো এসে জাহাজের খোল ফুটো করে দেবে, অতিবড় ঘুঘু কাপ্তেনও নিশ্চয় করে বলতে পারতেন না। অথচ সাবমেরিণের দল স্বচ্ছন্দে একটার পর একটা জাহাজ ডুবিয়ে যেতে লাগল। রসদ-বোঝাই সদাগরী জাহাজগুলো দুটো বন্দরে পৌছয় তো তিনটে মাঝ-সমুদ্রে বানচাল হয়ে যায়।

এতকাল সমুদ্রটা ছিল ইংরেজদের এলাকা। সাবমেরিণের এই উপদ্রবটা ইংরেজদের পক্ষে একটা কলঙ্কের বিষয় হয়ে পড়ল। শুধু কি তাই? রসদ বোঝাই বড় বড় সদাগরী জাহাজগুলো ডুবতে থাকায় মহাদুর্ভাবনার সূত্রপাত হল। ইংলণ্ডের ভাঁড়ার প্রায় খালি, অথচ যোগ্য পরিমাণে খাবার এসে পৌছচ্ছে না। এভাবে জাহাজডুবির পালা চললে আর কতদিন? কদিন বাদেই দেশ শুদ্ধ না খেয়ে শুকিয়ে মরবে! ফ্রান্স ও ভাবনায় পড়েছিল বটে, কিন্তু ফ্রান্সের চেয়ে ইংলণ্ডের ক্ষতি ঢের ঢের বেশী! কাজেই ইংরেজরা সাবমেরিণ আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

জার্ম্মাণীর নৌবিভাগে বড়কর্ত্তারা যখন গোঁফের ফাকে হাসছেন তখন ইংরেজ নৌবিভাগের বড় কর্ত্তারা টেবিল সাজিয়ে ভাবতে বসে গেলেন। একটা উপায় বাতলানো হল। উপায়টা যত অদ্ভুত, ততই হাস্যকর। কিন্তু এই উপায়টা যেদিন থেকে ইংলণ্ডের মাথায় এলো, সেদিন থেকে জার্ম্মাণীর মুখের হাসি শুকিয়ে যেতে থাকল।

যখন আর কোনো উপায় নেই, তখন অনেকটা বেপরোয়া হয়েই ইংলণ্ড বড় একটা বুদ্ধি ও দুঃসাহসের

চাল চাললে—সুরু হল রহস্য-জাহাজ, 'Q' boat দের অদ্ভুত সব অভিযান। শত্রু যাতে টের না পায়, অত্যন্ত গোপনে কাজ সুরু হল। বেছে বেছে দুঃসাহসী চতুর নাবিকদের 'Q' boatয়ে ভর্ত্তি করা হল।

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন দেখা গেল ইংলণ্ডের একটা বন্দর থেকে একটা নোংরা জিরজিরে পুরণো ষ্টিমার ধুঁকতে ধুঁকতে রওণা হল। কালো সরু চোঙা থেকে ধোঁয়া উঠছে, মনে হচ্ছে যেন একটা রোগা লোক বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছে। ষ্টিমারের ডেকের উপর যে নাবিকদের দেখা গেল তাদের নোংরা জামা কাপড় আর ঢুলু ঢুলু ভাব দেখে স্পষ্টই মনে হল, ষ্টিমারের যোগ্য নাবিকই বটে! কাজে মন নেই, ডেকের উপর এখানে সেখানে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের এইখানটায় জার্ম্মাণ সাবমেরিণগুলি হাঙরের মত নিঃসাড়ে ঘুরে বেড়ায়! দেখে বোঝা যাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে ষ্টিমারটা চলেছে, কোনরকমে বন্দরে পৌছে যেতে পারলে হয়।

U-৮৮ যা তা সাবমেরিণ নয়। জার্ম্মাণীর সবচেয়ে বড় সাবমেরিণগুলির ভেতর U-৮৮ একটা। সাবমেরিণটা দুশো ফুট লম্বা, চারইঞ্চ-নলা একটা কামান, আর শেল টর্পেডো ছুড়বার সরঞ্জাম, কিছুরই অভাব নেই।

U-৮৮ সেদিন আয়র্ল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে গা জাগিয়ে ভেসে আছে। প্রতিটি সাবমেরিণের উপর একটা গোলঘরের মত আছে, ইংরিজিতে একে বলে Conning Tower. সিঁড়ি বেয়ে এখানে উঠে দূরবীণ কষলে সমুদ্রের চারিদিকটা বেশ খুঁটিয়ে দেখা যায়। U-৮৮ সাবমেরিণের এই গোলঘরের আগায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার সেগার দূরবীণ কসছিলেন। হঠাৎ দেখলেন অনেকদূরে সমুদ্রের এক দিকে একটুকরো মেঘের মত ধোঁয়া। মে'র সাত তারিখে ইনিই লুসিটানিয়া জাহাজ ডুবিয়ে দেন, ১১০০ জীবন অকালে শেষ হয়ে যায়। অদৃষ্টের কারসাজি! সমুদ্রের এইখানটাতেই লুসিটানিয়ার সলিল-সমাধি হয়।

শেষে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার দেখলেন, কিছু নয়, একটা সৃষ্টিছাড়া নোংরা ক্ষুদে ষ্টিমার। আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিশাল ঢেউ ক্ষুদে জাহাজটাকে হাততালি দিয়ে টিটকিরি দিচ্ছে। ষ্টিমারটা কিছুটা কাছে আসতে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার দূরবীণ দিয়ে ষ্টিমারটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। তাঁর একটু সন্দেহও হলনা এমন নয়! তবে, বলতে তো একটা জিরজিরে লক্কর ষ্টিমার! এটার দফা রফা করতে কতক্ষণ! লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডারের মুখে তাচ্ছিলের হাসি ফুটে উঠল। বড় জাহাজ ডোবাতে হলে সাবমেরিণকে জলের তলায় নেমে যেতে হয়, ভেসে থাকলে শত্রুর কামানের গোলায় কয়েকটুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা! কিন্তু নচ্ছার নোংরা এই পুঁচকে ষ্টিমারটা ডোবাতে আবার জলের তলায় লুকোতে হবে! দুবার কামান দাগলেই গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে! টর্পেডো ছুড়ে দেবেন গোটা দুচার? মাথা খারাপ! টর্পেডো তো আর অমনি মেলেনা যে একটা নচ্ছর ডিঙি ডোবাতে খরচ করতে হবে।

U-৮৮ থেকে তিনমাইল কামান দাগা হল ক্ষুদে 'ষ্টোন্‌ক্রপ' ষ্টিমারটার উপর। ক্ষুদে ষ্টিমারের কাপ্তেন ব্ল্যাক্‌উড মরতে এসেছিলেন সাবমেরিণের ঘাঁটিতে! কেন বাপু! এত সখ তো এখন পালাও কেন? ছুট ছুট—ষ্টোন্‌ক্রপ পালিয়ে চলল। যেন কিছুই জানতো না, হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটতে বসেছে, ষ্টোন্‌ক্রপ থেকে বেতারে চারিদিকে খবর যেতে থাকলো, বিপদে পড়ে গেছি, রক্ষা কর।' তার পরেই ঘন ঘন সিগন্যাল হতে

থাকলো বেতারে—'ঝটপট সাহায্য না এলে গেলুম, জাহাজ ছেড়ে পালাতে হবে।' ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের জাহাজে জাহাজে বেতারে এই খবর ধরা পড়তে লাগল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেইসব জাহাজের কাপ্তেনরা মুচকি হেসে গ্যাট হয়ে বসে রইলেন, একটা জাহাজও ষ্টোন্‌ক্রপকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না।

পুরো চল্লিশ মিনিট দুর্দ্ধর্ষ সাবমেরিণ U-৮৮ ক্ষুদে ষ্টোন্‌ক্রপকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল; ষ্টোন্‌ক্রপের চতুর্দ্দিকে সাবমেরিণ থেকে গোলা ছিটকে পড়তে থাকল। কম্যাণ্ডার ব্ল্যাকউডের ষ্টিমারে একটা ধোঁয়ার বাক্স ছিল। এই ধোঁয়ার বাক্সে আগুন দিতেই কিছু তফাৎ থেকে মনে হতে লাগল ষ্টিমারে আগুন লেগেছে। U-৮৮ থেকে ভারী একটা মারাত্মক বোমা এসে ষ্টোন্‌ক্রপের খানিক তফাতে সমুদ্রের ঢেউয়ে এসে পড়ে—তখনই কম্যাণ্ডার ব্ল্যাকউডের মাথায় ফন্দিটা আসে! ধোঁয়ার বাক্সে চট করে দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দেন। যেন কী এক মহাঅগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে, ষ্টোন্‌ক্রপের ডেকের উপর নাবিকেরা হৈ চৈ করে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললে! সাবমেরিণ থেকে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার সেগারের বুঝতে বাকী থাকল না এবার বাছাধনরা ষ্টিমার ছেড়ে লম্বা দেবেন। শেষে সত্যি সত্যিই ষ্টোন্‌ক্রপ থেকে নৌকো নামানো হল, ষ্টিমার ছেড়ে নেশাখোর নাবিক কজন পালিয়ে গেল। ষ্টোন্‌ক্রপ জনশূন্য পড়ে রইল! কিন্তু ষ্টোন্‌ক্রপের খোলের ভিতর কারা নিঃশ্বাস ফেলছে? কারা ফিস ফাস কথা কইছে? আর ডেকের উপর কাপ্তেনের কামরায় গা ঢাকা দিয়ে একটা ফুটো দিয়ে কে U-৮৮এর কার্য্যকলাপ উঁকি দিয়ে দেখছে? লোকটা কে? কম্যাণ্ডার ব্ল্যাকউড নন তো?

U-৮৮ আস্তে আস্তে জলের তলায় যেতে থাকল। তারপর খানিক বাদে ভুঁস করে U-৮৮ জলের উপর উঠে এলো, তখন 'ষ্টোন্‌ক্রপ' মাত্র পাঁচশ গজ দূরে। কম্যাণ্ডার সেগারের আর সন্দেহ রইল না যে ষ্টিমারে জনপ্রাণী নেই, এবং সত্যি সত্যিই ষ্টিমারে অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়েছে। পাঁচ মিনিট সব চুপচাপ। U-৮৮এর কাপ্তেন খোলাখুলি আর 'ষ্টোন্‌ক্রপের' কাপ্তেন চুরী করে বিপক্ষের জাহাজের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ দুর্দ্ধর্ষ সাবমেরিণ U-৮৮ যেন ঘুম ভেঙে উঠলো, 'ষ্টোন্‌ক্রপ' থেকে যে নেশাখোরেরা নৌকো করে পালিয়ে চলেছিল তাদের ধাওয়া করে চলল। হাতে পেয়ে শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া কাজের কথা নয়!

সেই কাপ্তেনের কামরায় যে রহস্য মানুষটি উঁকি দিয়ে U-৮৮এর কার্য্যকলাপ দেখছিলেন, তাঁর মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। কাপ্তেনের কামরা থেকে মেঝের ফুটো দিয়ে একটা নল বরাবর নীচেয় খোলের ভিতর চলে গেছে। সেই নলে মুখ রেখে সেই মানুষটি তীব্র স্বরে কি একটা হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টোন্‌ক্রপ ষ্টিমারে ডেকের চারিদিকের ঢাকা খুলে গেল, মাস্তুলে তরতর করে উঠে এলো ইউনিয়ন জ্যাক। খোলা ডেকে বেরিয়ে পড়ল সারি সারি কামানের মুখ, U-৮৮এর দিকে একসঙ্গে কয়েকটা গোলা ছুটে এলো।

সেগার দেখলেন তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। কে জানতো এই ক্ষুদে জাহাজটার খোল গোলন্দাজ আর কামানে ভরতি? সেগার হুকুম দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে U-৮৮ ডুবতে সুরু করল। কিন্তু জলের তলায় গা ঢাকা দেওয়ার আগেই শেল-এর পর শেল এসে U-৮৮কে জর্জর করে দিলে। চতুর্থ শেলটা এসে সাবমেরিণের মঞ্চ-ঘরটা চূর্ণ করে দিলে। জলের তলায় মঞ্চঘর থেকে পেরিস্কোপ দিয়ে সাবমেরিণ অতল-

পথ দেখে চলে, মঞ্চঘর বেকল হলে জলের তলায় সাবমেরিণ অন্ধের সামিল। সেগারের মাথা ঘুরে গেল—'ডোবো ডোবো, জলদি ডোবো।' সেগার গর্জ্জন করে উঠলেন, কিন্তু সেই নোংরা ক্ষুদে ষ্টিমারের ডেক থেকে এক, দুই, তিন, চার—চারটা গোলা এসে চুরমার করে দিলে মঞ্চঘর, পেরিস্কোপ আর সাবমেরিণের সামনের দিকটা।

সাবমেরিণ ফুটো হয়ে জল উঠতে থাকল। সরু খোল জলে ভরে গেল—সাবমেরিণে হাহাকার পড়ে গেল। একটা অতিকায় তিমির বিকট মুখের মত সাবমেরিণের কালোরঙা পুচ্ছটা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর একবার উঠে এলো। ডুবল সাবমেরিণ। সেইখানে সমুদ্রের চঞ্চল ঢেউয়ের কোনো ইতিহাসই লেখা রইল না।

'ষ্টোন্‌ক্রপ' মহাসমুদ্রে আবার একটা বখা রোগা ছেলের মত বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে যেন চলল।

এই রকম একটি, দুটি, তিনটি—কয়েকশ ক্ষুদে দুঃসাহসী ষ্টিমার ইংলণ্ডের হয়ে গতমহাযুদ্ধে জার্ম্মানীকে দিয়েছিলো উত্তর।

Pereira's Photo
&
Cine Service
United India Buildings.
Chittaranjan Avenue,
CALCUTTA.

ইনি বিশ্ববিখ্যাত আগফাফোটো কোম্পানীর ডেভেলপিং, প্রিন্টিং, এনলার্জিং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

একজন প্রসিদ্ধ অ্যামেরিকান টুরিষ্ট খোলাখুলি বলেছেন এঁর হাতের কাজের চেয়ে ভালো কাজ তিনি পৃথিবীর কোথাও কখনো দেখেননি। এঁর কাজের তুল্য কাজও জগতে বিরল।

উচিত পারিশ্রমিকে পেরেরা সাহেব ফোটোও তুলে থাকেন।

BLEED THROUGH.

শ্রীসতীকান্ত গুহ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠান রাজপুত্র দেখলেন, রহস্য-লিপি। কত যুগের পুরণো, একখণ্ড কাগজ, অদ্ভুত রকমের একটা ছক কাটা, ছকের কোঠায় কোঠায় সাপ, লতা আর পাখীর ছবি। কিম্ভূত ছাঁদের অক্ষরে হিজিবিজি সব ছত্র, ছত্রগুলো সব বেঁকেচুরে যেন ফণা ধরে আছে, এক একটা ছত্র কিলবিল করে' ছকের এক একটা কোঠায় ঢুকে যেন ছোবল দিচ্ছে।

নিঃশব্দে পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুব কুণ্ডলের পানে তাকালেন। সাপের চোখের মত কুণ্ডলের ক্ষুদে চোখদুটো টুল্-টুল্ করে উঠল। কুণ্ডল ইয়াকুব আহম্মদের পাশে এসে ছকটা মেলে ধরলে : রাজপুত্র। এটা আমার জীবনের ছক। এতে কি লেখা আছে জানো? লেখা আছে কুণ্ডল পৃথিবীতে যা চায় তা তাকে পেতেই হবে, তার কাছে কিছুই দুর্লভ থাকবে না। কিন্তু—তার প্রথম পরাজয় ঘটবে মানুষের হাতে, অমরলতার লালফুল সে পাবে না।

পাঠান রাজপুত্র ফিসফাস করে' বলতে গেলেন, 'তাহলে, তা হলে আর মিছে চেষ্টায় লাভ কী?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিসফাস করে গর্জ্জন করে ওঠে কুণ্ডল, 'কুণ্ডল হটে আসতে পারে, কিন্তু পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুব তো নাও হটতে পারেন! রাজপুত্র, সবুজদ্বীপে মানুষের অভিযান রওনা হয়েছে। সেই অভিযান মহাসমুদ্রে শেষ করে দাও তুমি, ছিনিয়ে নাও অমরলতার লালফুল, মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নাও, তারপর একদিন এই কুণ্ডল তোমায় দিল্লীর বাদসাহী তক্তে বসাবে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে দাও রাজপুত্র!'

পাঠান রাজপুত্র সাহসে বুক বেঁধে একবার কুণ্ডলের দিকে মুখ তুলে তাকালেন, অভিভূতের মত খানিকক্ষণ তিনি নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলেন। এই কুণ্ডল লোকটাকেই তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। আর তার কথা—কি ভয়ঙ্কর কুটিল হিংসাজর্জ্জর কথা! কেন সে মানুষের সুখের পথে কাঁটা হতে চায়? যুগ যুগ

ধরে' মানুষ অমর হবার যে স্বপ্ন দেখছে সেই স্বপ্ন কেন সে চুরমার করে দিতে চায়? মানুষের সঙ্গে কেন তার আড়ি? সে কি মানুষ নয়?

পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুব হঠাৎ কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব কুণ্ডল! আমি মানুষ, মানুষের বড় হবার তপস্যায় আমি বাধা হতে পারব না, বাদসাহীর লোভে আমি হীন হতে পারব না! ভেবে দেখ কুণ্ডল, যে হও তুমি, তুমিও তো মানুষ?'

'আমি মানুষ!' হো হো করে হেসে ওঠে কুণ্ডল। তার বীভৎস হাসিতে পাঠান রাজপুত্রের প্রাণ চমকে ওঠে।

'তবে তুমি কে?'

'ত্যাখো আমি কে!'

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ কোঠার আলো যেন নিভে যায়। পাঠান রাজপুত্র দেখেন তিনি যেন জাহাজ কোঠা-তেও নেই। যেন কোন্ এক প্রাচীন পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। সেই প্রাচীন পৃথিবীতে যেন মহাপ্রলয় চলেছে, মহাসমুদ্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথলে উঠছে, মাটি কেঁপে কেঁপে ফেটে যাচ্ছে, আকাশ যেন মেঘে বিদ্যুতে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রলয় ঝড়ের ভিতর খলখল হেসে হাততালি দিয়ে কোন্ পিশাচ মহাসমুদ্রে একটা ডিঙি ভাসিয়ে চলেছে! সে এই কুণ্ডল।

তারপর যেন মহাপ্রলয় থেমে যায়। পাঠান রাজপুত্র যেন আর এক যুগের পৃথিবীতে এসে পড়েন। বিশাল রাজ্যের এক রাজধানী, তারই পথে পথে যেন নিশীথে হানাহানি চলেছে। দুরন্ত দস্যুর দল রাজধানীর সিংহদ্বার ভেঙে ঢুকে পড়েছে, প্রাসাদের দিকে তারা ঝড়ের বেগে রক্তস্রোতের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রাসাদের ফটক যেন ভেঙে পড়ল, সান্ত্রীরা তলোয়ার মেলে ধরলে। কিন্তু দস্যুরা বাধা মানলে না, মশালের ধোঁয়াটে আলোয় রাজপ্রাসাদের দেয়ালে মেঝেয় বিপদের ছায়া ফেলে তারা ছুটে চলল রাণীর খাসমহলের দিকে। সখীদের নিয়ে রাণী আতঙ্কে ঘরে খিল দিয়ে বসে আছেন, পালানোর পথ বন্ধ। সেই কবাট কাদের লাথিতে ভেঙে পড়ে, মশালের ধোঁয়াটে আলোয় ঘর ভরে যায়, দস্যুরা পশুর মত উল্লাস করে ওঠে, আর তীর-বেঁধা পাখীর করুণ শিষের মত রাণীর হাহাকার একবার জেগে উঠে মিলিয়ে যায়, সখীদের কান্না তলোয়ারের ঠন্ ঠনে ভেঙে ভেঙে যায়। তখন, সেই গভীর দুঃখ আর অপমানের মুহূর্ত্তে কার হাসির উল্লাসে চারিদিক ভরে যায়? দস্যুদের ছুটে চলার তালে তালে কার হাততালি বেজে ওঠে? সে এই কুণ্ডল! তার কুৎসিত ছায়া সেই মৃত্যুপ্রাসাদের দেয়ালে মেঝেয় একটা ক্লান্ত বাদুড়ের ডানার মত কাঁপতে থাকে।

তারপর, তারপর যেন আর একটা যুগের পৃথিবীতে এসে পড়েন পাঠান রাজপুত্র। যেন এক ধূ ধূ মরুভূমি। সেই নির্জ্জন মরুভূমিতে আবছা চাঁদনী রাতে যেন চলেছে উটের দল, একটা অজগরের মত এঁকে বেঁকে চলেছে! সেই যাত্রীদলে সাদা উটের পিঠে চেপে চলেছেন শাজাদা পাশে বেগম নিয়ে। ডাইনে বাঁয়ে সোনার খাঁচায় বুলবুল আর আতরদানে আতর নিয়ে চলেছে খাসবান্দার দল। সেই চাঁদনী রাতের মরু-ভূমিতে সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলেছেন বরবধূ। হঠাৎ 'হুঁসিয়ার' বলে সারের মাথায় চেঁচিয়ে ওঠে খাসনকীব। শাজাদার সিপাইদের খাপে তলোয়ার ঝন্-ঝন্ করে' ওঠে। ধূলোর ঝড় তুলে ছুটে আসে দুর্দ্দান্ত বেদুইনের

দল। যাত্রীদলে হাহাকার ওঠে। তারপর, তারপর কোথায় শাজাদা বেগম! কোথায় বরবধু! শবে ছেয়ে যায় মরুভূমি। একটা ছুটন্ত ঝড়ের মত আর এক দিগন্তে মিলিয়ে যায় বেদুইনের দল। সেই মৃত্যু-প্রান্তরে, ধূ ধূ মরুভূমিতে হঠাৎ কে হেসে ওঠে খল্ খল্! চারিদিক ভরে যায় পূতিগন্ধে! কে সে? সে এই কুণ্ডল!

সেই মরুপ্রান্তরে কার গম্ভীর গলা শুনতে পান পাঠান রাজপুত্র—'পাঠান রাজপুত্র, ছেলেবেলা থেকে শুধু ঈশ্বরকেই মানতে শিখেছ, ভুলেও সয়তানকে একটা কড়ে আঙ্গুলের নমস্কারটাও দাওনি! আজ তুমি আমার পরিচয় পেলে। সয়তানকে মানতে শেখো পাঠান! সে অসাধ্যসাধন করতে পারে, জলে আগুন লাগাতে পারে, সেই সয়তানকে জানতে শেখো। ঈশ্বরের বহু ভক্ত, কাকে ফেলে কাকে রাখেন! আমার একটিও ভক্ত নেই, এসো তুমি আমার বন্ধু হও। সয়তানের কৃতজ্ঞতা আছে। সে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে, তোমায় দিল্লির সিংহাসনে বসাবে।'

পাঠান রাজপুত্র চীৎকার করে উঠলেন, 'আমি তোমায় চাই না, কে তুমি, দূর হও!'

সঙ্গে সঙ্গে পাঠান রাজপুত্র দেখেন সেই জাহাজ কোঠায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনি ফুটফুটে আলো জ্বলছে, আর দাঁড়িয়ে আছে কুণ্ডল, রহস্যময় কুণ্ডল, সয়তান কুণ্ডল!

'আমি দূর হয়ে যেতে আসিনি পাঠান, তোমার কথা নিতে এসেছি। কথা দাও আমায়!' কুণ্ডলের কঠোর কণ্ঠ বাজের ধমকের মত বেজে ওঠে।

পাঠান রাজপুত্র হঠাৎ এক পাশে সরে আসেন! দেয়াল থেকে তলোয়ারটা খসিয়ে এনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, 'তা হয় না কুণ্ডল। আমি মানুষ। মানুষের সঙ্গে সয়তানের রফা হয় না। আল্লা আমায় রক্ষা করবেন।'

খাপ থেকে তলোয়ার খুলে এনে একটা অতিকায় হিংস্র কালো বেড়ালের মত পাঠান রাজপুত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কুণ্ডল। খক্ করে কেশে সে টিট্‌কিরি দিয়ে বলে, 'মানুষকে রাখবে ঈশ্বর!'

'অন্ততঃ এবারের মত ঈশ্বর মানুষকে রাখবেন' গম্ভীর গলায় কে স্পষ্ট করে' কথা কয়টা বলে! কার তলোয়ারে কুণ্ডলের তলোয়ার আটকে যায়!

পাঠান রাজপুত্র ও কুণ্ডল উভয়েই চমকে ওঠেন। সেই জাহাজ কোঠায় কোন্ আড়াল থেকে বেরিয়ে একটি দীর্ঘদেহ মানুষ পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কুণ্ডল দাঁতে দাঁত ঘসে বলে, 'মহর্ষি পিঙ্গলের শিষ্য বিদ্রোহী বজ্রনাথ!'

গম্ভীর হেসে সেই মূর্ত্তি বলে, 'তোমার অনুমান সত্য, সয়তান কুণ্ডল।'

ক্রমশঃ

সম্পাদকের কথা

এবার আমরা বৈঠকে গ্রাহকগ্রাহিকাদের দুটি লেখা ছাপলুম। গ্রাহকগ্রাহিকাদের লেখা আরও বেশী করে ছাপবার ইচ্ছে আছে। ছাপা না ছাপা আমাদের হাত, এটা ভুল কথা। তোমরা ভালো করে লিখলে আমরা না ছেপে যাই কোথা! সবাই খুব ভালো লিখবে, এ দুরাশা আমাদের নেই। কিন্তু লেখা কিছু ভালো হওয়া চাই। ভালো না হলেই লোকে নিন্দে করার সুযোগ পায়।

দুটি একটী ভালো লেখা ক্বচিৎ আমাদের হাতে যে না আসে, এমন নয়। কিন্তু সে লেখা হয় প্রকাণ্ড, নয় একেবারেই ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়। উদাহরণ স্বরূপ গ্রাহিকা শ্রীমতী শিবানী সিংহের লেখার কথা ধরা যেতে পারে। এই গ্রাহিকার লেখার হাত আছে, হাতের লেখা মুক্তোর মত, কিন্তু লেখা প্রায়ই লম্বা হয়ে পড়ে এবং তাঁর কোনো লেখাই ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়।

কয়েকজন আছেন, ঝরঝরে ভাষায় আঁট সাঁট রচনা পাঠান। তাঁদের লেখার প্লটও পুরণো নয়। কিন্তু তাঁদের লেখা পড়লেই মনে হয় কোনো বিশেষ লেখকের ষ্টাইল ধার করে তাঁরা লিখতে বসেছেন। ষ্টাইলে বড়লেখকদের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, যাঁদের লেখা পড়ি, তাঁদের খানিকটা ধরণ লেখায় এসে পড়েই। কিন্তু ইচ্ছে করে জোর করে যদি কেউ কারো মতন লিখতে যান, তাহলেই সর্ব্বনাশ! লেখা একেবারে পুরণো হয়ে পড়ে, প্লটের মারপ্যাঁচ সত্ত্বেও নকল-লেখা হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতন বড় হওয়ার চেষ্টা খুবই ভালো, কিন্তু কেউ যদি ঝুঁটো দাড়ি বাবরী এঁটে, মুখোষ পরে' খোদ রবিঠাকুর সাজতে যান, তাহলে সবাই সং বলে হাততালি দেবে।

উল্লিখিত লেখকদের লেখা পড়লে মনে হয়, সেরকম লেখা পড়ে পড়ে যেন পুরণো হয়ে গেছি।

গত বছরে রংমশালে যে গ্রাহক গ্রাহিকারা লেখা পাঠিয়েছেন, আসছে বার তাঁদের নাম ছেপে দিয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাবো। এবার থেকে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা এলেই আমরা বৈঠকে প্রাপ্তি স্বীকার করব। গ্রাহক-গ্রাহিকারা রাজী তো?

রংমশালের দিন দিন অধঃপতন ঘটছে—আমাদের কোনো গ্রাহক এই অভিযোগ এনেছিলেন। গত সংখ্যায় আমরা তাঁর অভিযোগের একটা জবাব দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মতামত জানতে চেয়েছিলুম। আমাদের গ্রাহকবন্ধুটি ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছিলেন। প্রায় সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাই প্রতিবাদের সঙ্গে জানাচ্ছেন, এখন থেকে রংমশাল বিশেষ ভালোই হচ্ছে। কিন্তু পাটনা থেকে আমাদের গ্রাহকবন্ধু শ্রীমান অজয় দত্ত লিখে পাঠিয়েছেন ছেলেমেয়েদের নিকৃষ্টতম মাসিকের চেয়েও রংমশাল নিকৃষ্ট। শ্রীমান অজয় এই বয়সেই স্বাধীন চিন্তা করতে শিখেছেন জেনে সুখী হলুম। রংমশাল কি করে ভালো হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানতে পেলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আলোচনা

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মগজে যুদ্ধের ধোঁয়া পাক দিচ্ছে। এবার গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আলোচনায় দেখছি বোমা, বারুদ, বিষাক্ত বাষ্প আর এয়ারোপ্লেন।

শ্রীমতী প্রতিমা বসু (গ্রাঃ নং২১১১)—আমাদের বাড়ীতে আজকাল যুদ্ধ লইয়া খুব কথা কাটাকাটি চলিতেছে। বাবা বলেন, কলিকাতায় বোমা না পড়িয়া যায় না। দাদা গতবার এম-এ পাশ করিয়াছেন। দিনে গোটা সাতেক খবরের কাগজ পড়েন। তিনি বলেন, কলিকাতায় বোমা কি আকাশ হইতে পড়িবে? বাবা বলেন, বোমা তো আকাশ হইতেই পড়ে। দাদা বলেন, রুশ দেশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নামিলে ভারতবর্ষে বিমান আক্রমণ চালাইবে। কিন্তু কলিকাতায় উড়িয়া আসিতে গেলে অনেকটা পথ। এতদূরে আসিয়া কটা বোমা ফেলিবে? জাপান কলিকাতায় বোমা ফেলিতে পারে, কিন্তু জাপান ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে না, ইংরেজ সরকার তাহা হইলে ভারতবর্ষের বাজার হইতে জাপানী মাল তুলিয়া দিবেন। তবে, জাপান যদি ভারতবর্ষ দখল করিতে চায়—কিন্তু সে বড় শক্ত ব্যাপার! জার্ম্মানী ক্বচিৎ কদাচিৎ চুরী করিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে দুচারটা বোমা ফেলিতে পারে বটে, তবে কলিকাতায় নিয়মিতরূপে বোমা ফেলা অসম্ভব। বাবা বলেন, বেশী পড়িয়া দাদার মাথা খারাপ হইয়াছে।

এ বিষয়টা লইয়া রংমশালে কেহ একটা প্রবন্ধ লেখেন তো ভালো হয়!

শ্রীমান মণ্টু সেন (গ্রাঃ নং ১৯০৩)—অনেকদিন আগে শুনে ছিলুম এক রকম রশ্মি বেরিয়েছে, উড়ো জাহাজের গায়ে লাগলে উড়ো জাহাজ বিকল হয়ে যায়। এই কথা ঠিক হলে এখনও যুদ্ধে এই রশ্মি কোন্ দেশ প্রয়োগ করছেনা কেন? কাল আমাদের মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করছিলুম, তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কেউ, কারো কাছ থেকে জেনে নিয়ে, আমার কথার জবাব দেবেন কি?

শ্রীমান শোভনলাল রায় (গ্রাঃ নং ৭)—সম্পাদক মশাই, যতদিন লড়াই চলে এক একটা লড়াইয়ের গল্প দেবেন। সঙ্গে ভালো ছবি দেবেন। পড়লে ভয় করে এ রকম ভয়ঙ্কর সব গল্প দেবেন। আমার ভয় পেতে খুব ভালো লাগে। (এবার একটা যুদ্ধের গল্প দেওয়া হয়েছে। গল্পে অনেক লোক মারা গেছে। জানিনা, এতেও শ্রীমান শোভন ভয় পাবেন কি না।—স)

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

পুরাণ খাতা

গ্রাহক নং ১১৯৬

নীপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

বহুদিন পরে মনে পড়ে' গেল
আমার পুরাণ খাতা,
বাক্স হইতে বাহির করিনু
খুলিনু তাহার পাতা।
চমকি চাহিনু, এ কাহার লেখা!
আমারি হয়ত হ'বে,
নিজের রচনা চিনিতে পারিনি
জানি না লিখেছি কবে।
পুরাণ দিনের কত স্মৃতি আছে
এই খাতাটায় ভরে',
কত চেষ্টায় নানা উপচারে
সাজায়েছি খাতা তোরে।
বহুদিন আগে যে লেখা লিখেছি
দেখিতে সুশ্রী নয়,
তবু সে বিগত দিনের কাহিনী
খাতার পাতায় রয়।
আমি তোরে লেখা করিয়াছি দান
আমার পুরাণ খাতা,
তুইও ঢের মোরে দিয়াছিস্ ফেরে,
জানি না কে বড় দাতা।

গ্রাহক নং ৯৮১

অধিকারী-অবিনাশ

অরুণ কুমার রায়

জমিদার বাড়ীতে কীর্ত্তন হ'বে তাই গ্রামের লোক সব মেতে উঠেছে। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে যে যার জায়গা আগেই দখল ক'রে ব'সে আছে। তিনটে বাজতে না বাজতে সামিয়ানা ঘেরা সেই বিরাট জায়গাটা একেবারে ভ'রে গেল। গান আরম্ভ হ'তে তখনও ঢের দেরী। কিন্তু সবাই মিলে তখন থেকেই ভীষণ চেঁচাতে লাগলো আর গোলমাল ক'রতে লাগলো। গান আরম্ভ হ'বে পাঁচটায় কিন্তু চারটের সময়ই সকলে অধিকারীকে গালাগালি দিতে লাগলো! কীর্ত্তনের দলের সবাই তখনও গলাগলি হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। পাঁচটা বেজে গেল তবুও তাদের আসবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

পাইক-বরকন্দাজের ঠেলাঠেলিতে তাদের ঘুম ভাঙলো। গান যখন আরম্ভ হ'লো দিনের আলোর তখন বিদায় নেবার সময় হ'য়েছে। ঘড়িতে চেয়ে দেখলো সাড়ে ছ'টা। জমিদারবাবু এসে তার জায়গাটিতে ব'সলেন। জমীদারবাবুকে দেখে সকলেই চুপ ক'রে গেল। পালা হ'বে—"স্বর্ণলঙ্কা"!...গান গাইছে তখনকার দিনের সব চেয়ে নামকরা দল। খানিকক্ষণ গান হবার পরই বেশ জ'মে উঠলো। কিছু না বুঝলেও লোকজন সব ব'লতে লাগলো, "আহা,...এমন গান আর শুনিনি। অবিনাশ দীর্ঘজীবী হও।" অধিকারীর নাম অবিনাশ। অল্প দিনের মধ্যেই তার নাম বেশ ছড়িয়ে প'ড়েছে। পুঁথিগত বিদ্যের কোনও বালাই ছিল না তার। ছিল বেশ বুদ্ধি। খুব সামান্য টাকা দিয়ে সে তার দলে ভাল গায়ক আর বাদক রাখতো। তারাও অল্প টাকাতেই তার দলে থাকতো, তার দল ছাড়তো না। কীর্ত্তন হিসাবে অবিনাশ অধিকারীর নাম সবচেয়ে বেশী তখন। সুতরাং যেখানেই তারা যেত সেখানেই বায়না ছাড়াও উপরি টাকা পেত অনেক। অল্প হ'লেও সেই টাকা ভাগ ক'রে তারা যা পেত' অন্য কোনও দলে গেলে তার অর্দ্ধেকও পেত না। তাই তারাও তার দল ছাড়তো না। অবিনাশ যা' দিত তারাও তাই-ই নিত। তারা অবিনাশের উপর চটাও ছিল এইজন্য যে গান গেয়ে সবশুদ্ধ যে টাকা উঠতো তার দশ আনা ভাগ পেতো অবিনাশ; আর ছ' আনা ভাগ ওরা সবাই সমানভাবে ভাগ ক'রে নিত। তা'তে অবিনাশের তুলনায় তা'দের পয়সা অনেক কম হ'ত। মনে মনে রাগ থাকলেও সে কথা তা'রা মুখ ফুটে ব'লতে পারতো না। অবিনাশকে জব্দ করার অনেক চেষ্টাই তা'রা ক'রেছে।

কিন্তু একবারও কৃতকার্য্য হ'তে পারেনি। তবে তারা মনে মনে ঠিক ক'রেছিল যে একবার বাগে পেলে ছাড়বে না।

গান সেদিন চ'লেছে পুরোদমে। বুড়ো মানুষ আর মেয়েরা মাঝে মাঝে অনর্থক, "আহা, ..আহা,...উঃ" ইত্যাদি শব্দ ক'রে চেঁচাচ্ছিলেন। অবিনাশ তখন পুরোদমে গান চালাচ্ছে।—রাম সীতাকে হারিয়ে পাগলের মত হ'য়ে প'ড়েছেন। সকলকেই তিনি সীতার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন। রামের আজ্ঞামত ভাই লক্ষ্মণ সকল জায়গাই খুঁজে দেখছেন। রাম মাঝে মাঝে সীতা সীতা ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছেন। অবিনাশ খুব সুন্দর ক'য়ে গাইতে লাগলো—

"হা সীতা, হা সীতা", ব'লে রঘুকুলপতি
বলিলেন, "রক্ষা কর, অগতির গতি।"
লক্ষ্মণে শুধায়ে কন, "দেখ সব স্থান,
সীতা বিনা এই দেহে থাকিবে না প্রাণ।
মোর ভাগ্য মন্দ হ'ল দেবতার রোষে,
সীতা হ'ল স্বামীহারা আমাদেরি দোষে।"
লক্ষ্মণ বলিল তবে, "শুন মহাবীর,
সীতা দেখা পাবে তুমি, হ'য়ো না অধীর।
ক্রন্দন করিছ বৃথা, আমি তব পাশে।"
এই আজ্ঞা করিলেন তিনি রাম দাসে,
"যাও বীর, দক্ষিণেতে কর অন্বেষণ,
সীতা বিনা রাঘবের কাঁদিতেছে মন।
সুসংবাদ আনি দিও রাঘবের কানে,
তব অপেক্ষায় মোরা রহিনু এখানে।
লক্ষ্মণাজ্ঞা শ্রবণ করিল দিয়া কান।
অতঃপর রাজী হ'ল,—"

এই অবধি ব'লেই অবিনাশের আটকে গেল। একটু পরেই সে বুঝতে পারলো যে সে হনুমানের নামটী ভুলেছে। "অতঃপর রাজী হ'ল" কথাটীকে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকমভাবে গাইলো। দর্শকরা সব, "আহা, আহা" ক'রে উঠলো। যখন আর কিছুতেই মনে প'ড়লো না, তখন সে উপস্থিত বুদ্ধিবলে গাইলো, "অতঃপর রাজী হ'ল পবন নন্দন।" সে যাত্রা রক্ষা হ'য়ে গেল। দলের লোকেরা বুঝলো যে আজ অবিনাশ হনুমানের নাম

ভুলেছে। তারা কিছু না ব'লে গানের সঙ্গে তাল রেখে গান গাইতে লাগলো। একটু পরেই অবিনাশ বুঝতে পারলো যে 'পবন নন্দন' দিয়ে আর কতক্ষণ চালাবে? বারবার এক কথা ব'ললে লোকে বুঝতে পারবে যে সে কিছু ভুলে গেছে। তা'হলেই তার নাম খারাপ হ'য়ে যাবে। কতগুলি অপ্রিয় দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হঠাৎ বুদ্ধিমান অবিনাশের মাথায় এক বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে হাসি মুখে রসিকতা ক'রে দলের দিকে চেয়ে সুর ক'রে গাইলো—

"লঙ্কাদাহ ক'রেছিল, তার নাম কি?"

দলের লোকেরা বুঝলো যে এতদিনে তারা অবিনাশকে বাগে পেয়েছে। সুযোগ একবারের বেশী দু'বার আসে না সুতরাং এ সুযোগ আর ছাড়া হ'বে না।

ওদের মধ্যে একজন গাইলো—

"দশ আনা, ছ' আনা ভাগ আমরা জানি কি?"

অবিনাশ দেখলো বিপদ। এইবার বুঝি তার সব গেল। হায় হায় ক'রতে লাগলো তার মন। সে করুণ সুরে গাইলো—

"এখন হইতে দিব সমান সমান।"

দলের লোকদের মহাফুর্ত্তি। তারা আর দেরী না ক'রে গাইলো—

"লঙ্কাদাহ ক'রেছিল বীর হনুমান!"

* * * *

জমীদারবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। এ রকম কীর্ত্তন তিনি আর শোনেন নি। তিনি খুব খুসী হ'য়েছেন। গান শেষ হ'য়ে গেলে তাদের দলকে পঞ্চাশ টাকা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হ'ল।

রংমশালের উপহার

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা
ম্যানেজিং এডিটর, রংমশাল
১০নং ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৩৪৬ কার্ত্তিক থেকে ১৩৪৭ আশ্বিন পর্য্যন্ত যারা বার্ষিক গ্রাহক হবে তাদের বিনামূল্যে তিনখানা বই উপহার দেওয়া হবে। উপহার পাবার জন্য চাঁদা পাঠাবার শেষ তারিখ ৮ই অগ্রাণ, ১৩৪৬।

সম্পাদিকা—**দিদিভাই**

আমার সোনার ভাই বোনেরা!

অনেকদিন যেন ঘুমিয়েছিলাম, কতদিন জানি না। আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চোখ চেয়ে দেখলাম—অকাল বোধনের শুভ লগ্ন এসেছে।

এ লগ্ন হলো জাগরণের। তাই আকাশে জেগেছে শরতের সোনালি হাসি, বাতাসে জেগেছে সুখস্পর্শ, এ পৃথিবীর মাটি আর তৃণগুচ্ছ সিক্ত হয়ে আনন্দে ঝলমল করছে সকালের রাঙ্গা রোদে।

চারিদিকে আনন্দ! মহামায়া মা আসছেন!

এই মহালগ্নে আমাদের কি অকাল বোধন সুরু হবে?

শরতের আকাশে আর মাটির বুকে দেখলাম তোমাদের তরুণ মুখের তরুণ হাসি, সে হাসি শান্তির, তৃপ্তির ও আনন্দের।

এবার তোমাদের চিঠির দপ্তর খুলছি—শরতের সমস্ত সৌন্দর্য্য তোমাদের চিঠিগুলোর মধ্যে বাসা বেঁধেছে যেন।

একটু যমে মানুষে টানাটানি করেছিল তোমাদের দিদিভাইকে নিয়ে। কিন্তু তোমাদের সম্মিলিত স্নেহ ভালবাসার জোরে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি। শরীর খুব ভাল নেই—তাই এবার যদি ভাল করে উত্তর দিতে না পারি তোমরা কি দুঃখ করবে ভাই?

তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) ১০৬৬

তোমার প্রথম চিঠিটি (যাতে তুমি লিখেছিলে কোন ক্লাসের উপযোগী বই এর নাম চাও) সেখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি বলে এত গোলমাল হয়েছে! তবু তুমি আমার লক্ষী ভাই তাই রাগ করনি, আমি হলে কিন্তু করতুম। আর একবারটী জানিও আমি নিশ্চয় যত শীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দেবো ভাই কেমন? ঐ সঙ্গে অজয় ঘোষের ঠিকানা দিয়ে দেবো।

সুপ্রীতি দে (সিলেট) ১১৮৪

পরিচয় করবার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল বলে বুঝি এত দেরী? আমি কিন্তু খুব দুঃখিত হয়েছি আর

বুঝতে পারছি তোমার এ কথা ঠিক নয়। তুমি যে জিনিষের কথা বলেছ তার বিশেষ সুবিধা হবেনা—যদি হয় চেষ্টা করবো। তুমি তো ঐ জন্যই চিঠি লিখেছিলে—তাহলে আর বোধহয় চিঠি লিখবে না বোন? কারণ দরকার ফুরিয়ে গেল।

কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) ৮৩৩

দুষ্টু বোন দু'টী! সত্যি তোমাদের দুষ্টুমী ভারী ভাল লাগে। ছবি দু'টো কিন্তু এখনও আমার হাতে এসে পৌছয়নি তাই কি রকম লাগলো বলতে পারলাম না বোন। হ্যাঁ তোমাদের সুজাতাদি অনেকদিন বাদে এবার চিঠি লিখেছে কিন্তু সে চিঠি জোর করে নেওয়া, তার চিঠি দেখে অন্ততঃ এই আমার মনে হয়েছে। সে ভাল আছে উপস্থিত খুকু! তুমি লিখেছ "আচ্ছা মনে কর আমাদের রংমশালে যত ভাই বোন আছে সবাই মিলে যদি একদিন তোমার বাড়ী বেড়াতে যাই—তাহলে তোমার অবস্থাটী কি হয় দিদিভাই?" আমার খুব আনন্দ হয় খুকু, সবাই মিলে তোমরা আসছ সেই আশায় আমি রইলাম।

দীপকরঞ্জন গুহ (কুমিল্লা) ১২৮১

তুমি ম্যাজিকের কথা পড়তে ভালবাসো বুঝি? আমার কিন্তু ভারী ভাল লেগেছে—পেনসিলে তোমার হাতের বড় বড় বড় অক্ষরে লেখা ছোট্ট চিঠিখানি। আমি কিন্তু তোমার মত ভাইদের আর এই রকম সুন্দর চিঠি খুব ভাল বাসি ভাই।

অমিয়া (পুরুলিয়া) ১২৯১

ছোটবোন তুমি সে বিষয় নিঃসন্দেহ, জিজ্ঞাসা করবার কি আছে ভাই! নিশ্চয় চিঠি লিখবো। ভাই বোন বাড়লে আমার ভারী আনন্দ হয়।

ইরা বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী) ৭২০

দিদিভাই এর কাছে আসতে ভয় হচ্ছিল? কিন্তু কেন বলতো? যে কাগজ পাওনি তারজন্য একটা একটা চিঠি রংমশাল আফিসে লিখো—মাস ও কোন সাল তাতে লিখে দিও। 'দিদিভাই' তো একটাই থাকে, কাজেই নিঃসন্দেহে 'দিদিভাই' বলতে পারো। চুঁচড়া আর হুগলীর যে বোনরা আছে তাদের সঙ্গে তুমি ভাব করতে চাও, আচ্ছা তারা নিশ্চয় আলাপ করবে।

সুজাতা রক্ষিত (৩০)

বহুকাল বাদে ভাই বোনদের ও দিদিভাইকে মনে পড়েছে? যতই উল্টো চাপ দাও, তুমি যে আমাদের ভুলে ছিলে সে কথা অস্বীকার করতে পারো না। নিতান্ত আমরা ছাড়বার পাত্র নই বলেই বিরক্ত হয়ে একটা কার্ড লিখেছ। এ ছাড়া আরও কারণ আছে পরে বলবো। কোথা থেকে চিঠি লিখেছ তার ঠিকানায় এমন কালী পড়েছে কিছু বুঝবার উপায় নেই। ভালকরে ঠিকানা লিখে চিঠি দিও। ঝগড়াটা তখনকার জন্য রইল।

দেশরঞ্জন ঘোষাল (১১৭২)

ঠিকানা নেই কেন? কে বলেছে দিদিভাইএর স্নেহ পাবেনা তুমি? নিশ্চয় চিঠি লিখবে আর এতো তোমাদের জোরের স্থান ভাই—তবে অত কুণ্ঠিত হয়েছ কেন? তোমার নামটী সত্যই বেশ, না ভাই এ নামে আর কেউ গ্রাহক নেই।

ইলারানী বসু (কলিকাতা) ১২৫৪

ইলু! তুমি লিখেছ "ভাদ্রমাসের রংমশালে যে বইয়ের কথা বেরিয়েছে সেই বই রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকা মাত্রই নিতে পারবে, না যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা তিন বছর থেকে রংমশাল নিয়ে থাকে তারাই নিতে পারবে?" এ সম্বন্ধে তোমরা অনেকেই আমায় লিখেছ এবং অনেক অনুরোধ আমি পেয়েছি, আমি সম্পাদকমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর পেয়েছি যে ১৩৪৬ কার্ত্তিক থেকে ১৩৪৭ আশ্বিন পর্য্যন্ত যারা গ্রাহক থাকবে তারাই পাবে, এ বিষয় নতুন পুরাতন গ্রাহকে কোনও পার্থক্য নেই। কুপন তো রংমশালের পাতাতেই আছে, ভর্ত্তি করে পাঠিয়ে দিও।

রহিমা খাতুন (ধানঘর) ৭৭৭

রমু! তোমার উপদেশটা মেনে নিলেও কার্য্যতঃ করে উঠতে পারিনি—সেটা তুমি সম্পন্ন করবে বলে রেখে দিয়েছি বুঝলে? 'দিদিভাই' নিয়ে বিভ্রাট বেধেছে বুঝি? দিদিভাই তো একটাই হয়—তবে আর কি? মুস্কিল আসান হয়ে গেল। ইন্দিরাদি এবার এসেছেন যা বলবার তাঁকেই বলো।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুন)

তোমার পূর্ব্বপত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর নিয়ে নাও। সম্পাদক বদলেব কারণ কিছুই নয়, যাঁকে নানা কাজে ছুটতে হবে না, পত্রিকা নিয়ে লেগে থাকতে পারবেন এরকম একটি সুলেখককে আমরা সম্পাদক রূপে চেয়েছিলাম—সেই জন্যই এই পরিবর্ত্তন।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন শক্তিচর্চ্চা সম্বন্ধে, আমরা এ বিষয়ে তেমন একটাও ভালো লেখা পাইনি, আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। তবে আজ পর্য্যন্ত ডনকুস্তি সম্বন্ধে হাজারের উপর প্রবন্ধ অন্যান্য মাসিকে ছাপা হয়েছে। সেই রকম পুরোণো ধরণের লেখা ছেপে সুফল হবে বলে মনে করি না। আর 'ছবির অ্যালবাম' এ বিষয়ে আমরা চেষ্টা করছি, তবে পাতায় কুলিয়ে ওঠে না। এমনি তো রংমশালের খরচ সব পত্রিকার চেয়ে বেশী, তার উপর যুদ্ধের দুর্ম্মূল্য বাজার। যাহোক পরে একটা ব্যবস্থা হবেই।

শিবানী সরকার (কলিকাতা) ৪০৮

তোমারও আগের চিঠির উত্তর এটা। ব্যাজ তৈরী নিয়ে আমাদের এমন একটী হাঙ্গামা বেধেছে যে কিছুতেই সুবিধে করতে পারা যাচ্ছে না, যাই হোক একটা ব্যবস্থা আমরা শীঘ্রই করছি—তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। পুরস্কার তোমাদের পাঠান হয়েছে, পেয়েছে—বোধহয়?

শৈলেন্দ্র নাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

তোমার অভিযোগগুলি আমি জানিয়েছিলাম। তোমার কথা খুবই ঠিক কিন্তু এমনিই রংমশাল আমরা ক্ষতি দিয়ে চালাই, গ্রাহক সংখ্যা যতই হোক না কেন, খুব বেশী বিজ্ঞাপন না পেলে খরচই উঠে আসে না, গ্রাহকরা যা দেন, তার চেয়ে প্রতি কপির খরচ ঢের বেশী, তারপর আবার যুদ্ধের বাজার এলো—এরপর বিনামূল্যে বই পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও গ্রাহকদের দু আনা চার আনা নিয়ে কোনো আপত্তি তোলা উচিত হবে না। আর ছবিটির কথা—যা লিখেছ সেটী তাড়াতাড়ির জন্য ঐ রকম ঘটেছে।

রেখা (পাটনা) ৩৭২

কই তোমার আগের চিঠি আমি পাইনি। নোটন নয়—'নটি'ই তোমার উপযুক্ত নাম বুঝলে? বড় চিঠি লিখো—কিন্তু বড় উত্তর পাবার প্রত্যাশা করলেই তোমার অন্য ভাই বোনগুলি ফাঁক পড়বে যে! কাজেই তোমরা কেউ সে রকম স্বার্থপর হবেনা আমি জানি। পরীক্ষার জ্বালায় তোমার মনে হয়, যে লেখা পড়ার সৃষ্টি করেছিল তাকে চিবিয়ে খাও? ওরে বাবা কি সাংঘাতিক কথা। কিন্তু তুমি যখন খুব বড় হবে তখন একথা মনে হবে না বুঝেছ? কি করতে বেশী ইচ্ছা হয়? স্থভাষ বাবু তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন—তোমার খুব ভাল লেগেছে জেনে আমারও খুব ভাল লাগলো।

মোহম্মদ গুলজার আলি গ্রাঃ ১১৮৫

রাগ করোনা ভাই বুঝেছ? তোমার মজার চিঠি আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু দেরীতে তাই উত্তর দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, ম্যাজিকের কথা বলব।

পিন্টুরাণী, মিন্টুরাণী ও স্থরথ বসু (চুঁচুড়া) ৯৮১

স্থরথ তোমার লেখা পাঠিও, মনোনীত হলেই প্রকাশ করা হবে। পিন্টু, কল্পনাকে তুমি তাড়াতাড়ি লিখলেই তাড়াতাড়ি উত্তর পাবে। মিন্টু, সাধনা সরকার কেন তোমার পত্রোত্তর দেয়নি জানি না—আচ্ছা আর একখানা লিখে দেখো।

অরুণকুমার রায় (ভবানীপুর) ৯৮১

তোমার মস্ত বড় চিঠিটা পেয়েছি ভাই কিন্তু আগের তো কোনও চিঠি পাইনি। তোমার কথা ঠিক নয়—রংমশালের ত্রুটী দেখালে সহ্য যদি আমরা নাই করতে পারবো তাহলে কি কাগজ বড় হয়? রাগ কার উপর করবো? পত্রিকাটি যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই। অনায়াসে ত্রুটী দেখিয়ে চিঠি লিখো—অবশ্য যদি সেগুলো যুক্তিপূর্ণ তথ্য হয়।

আজ আর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ভাই। যাদের চিঠি বাকী রইল তারা রাগ করোনা—আগামী বারে তাদের চিঠির উত্তর নিশ্চয় যাবে। যাদের চিঠি বাকী রইল তাদের নাম—অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থনীল দত্ত, যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অজয় দত্ত, মণিমালা দেবী, অবনীকুমার বসু, অরুণ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন রুই, শিবানী সিংহ, গৌরাঙ্গ চৌধুরী স্থনীল কুমার দত্ত।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা ও আন্তরিক শুভকামনা নিও। পূজোর আমোদ কেমন হয় জানিও আমায় কেমন?

ইতি—শুভার্থিনী

তোমাদের—

দিদিভাই

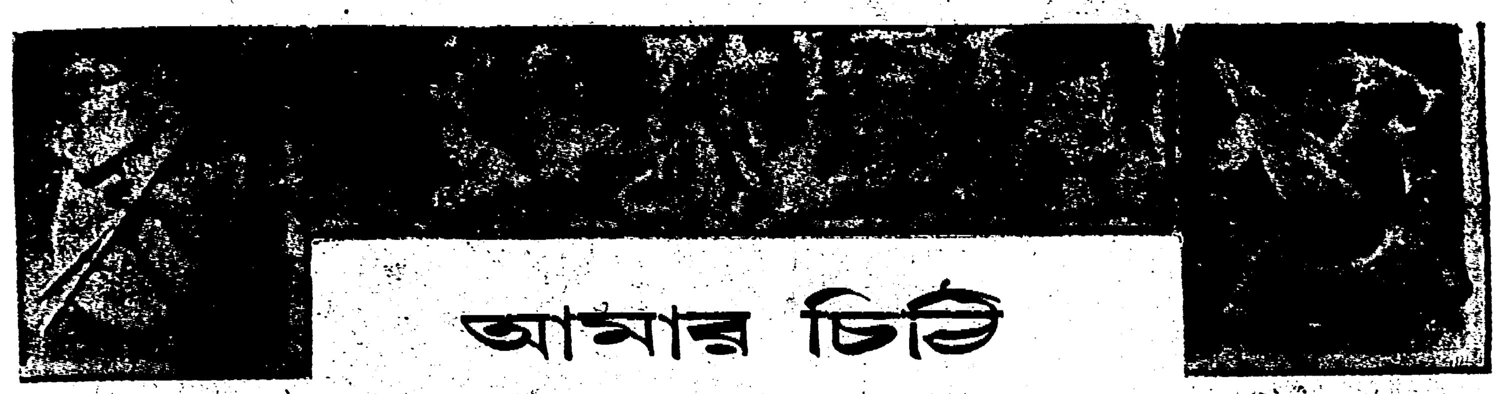

আমার চিঠি

রংমশালের পাঠকপাঠিকা আমার বন্ধুরা,

এক মহা অপয়া সম্পাদক তোমাদের! কলম ধরতে না ধরতে লড়াই সুরু। লড়াই চলেছে বিলেতে, সায়েবরা কচুকাটা হচ্ছে, আর এদিকে এক নিদারুণ লড়াই বেধে গেল কাগজের বাজারে, চড়া দামের সঙীণ দিয়ে কাগজওয়ালারা খুঁচিয়ে আমাদের শেষ করে এনেছে। কাগজের জাহাজ বন্দরে পৌছয়নি, দেশীকাগজওয়ালারা এই সুযোগে রাতারাতি কোঠা দেবার চেষ্টায় আছেন, কম ক'রে দেড়গুণ দাম চড়িয়েছেন। ছবির দরও অসম্ভব উঠেছে।

চড়া দামের ধাক্কায় এক এক করে কয়েকটি পত্রিকা উঠে গেল। ভয় নেই, রংমশাল নিভবে না। কিন্তু, এসো একবার হিসেবের খাতাটা খোলা যাক। রংমশালে এত পাতা এত ছবি আমরা এতকাল দিয়ে এসেছি, একটি পয়সাও লাভ রাখিনি। বরং প্রতি গ্রাহক পিছু বছরে দেড় টাকা দুটাকা করে দণ্ড দিতে হয়েছে। চার আনায় একখানা পত্রিকার খরচ ওঠে না। তবু কোনরকমে বিজ্ঞাপনওয়ালাদের কাছ থেকে কিছু টাকা তুলে আমরা চালিয়ে এসেছি। তখন ছিল নরম বাজার, সস্তায় কাগজ, কালি, ছবি মিলতো। আর এখন? যুদ্ধের আগুণ বাজারে কি যে অবস্থা হবে তাই ভাবছি! রংমশাল বেঁচে থাকবেই কিন্তু চড়া দরের ধাক্কায় আমরা মারা না যাই। আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারো তোমরা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটু বুদ্ধি খরচ করে তোমরা বিষয়টা তলিয়ে দেখো। সাধারণ সংখ্যায় আমরা সত্তর আশি পৃষ্ঠা দিই, প্রথম বিশ পঁচিশ পৃষ্ঠা পূজোর সংখ্যার মত ঝকঝকে কাগজ দিয়ে ৪০।৫০ পৃষ্ঠা যদি আমরা কিছু পাতলা কাগজে ছাপি, ঠক জোচ্চোর বলে গাল দিও না। মনে রেখো, ছেলেমেয়েদের পত্রিকা যাঁরা চালান, তাঁদের ভালোবাসার ব্রত, লোকসান সয়েই চিরটাকাল হাসিমুখ দেখার লোভে তাঁরা কাগজের মালিকানা করেন।

যদি বলো, না, যেমনটি আছে তেমনটি থাক, তাহলে বলব, মার্ব্বেল, চকলেট আর ঘুড়ির পয়সা থেকে জমিয়ে মাথা পিছু আটআনা যুদ্ধের বছরটায় তোমরা রংমশাল ফণ্ডে দাও না!

আমার আজকের কথার অর্থ এই নয় রংমশাল খারাপ হয়ে যাবে। অন্য সবদিকেই রংমশাল ক্রমশঃ আরও ভালো হবেই। তবে দুটি একটি বিষয়ে খরচ কমানো দরকার হতে পারে।

কোথায় লিখবো রঙীন ভাষায় সুন্দর উজ্জল একখানা চিঠি, না নিয়ে এলুম হিসেবের খাতা!

তোমাদের—

সম্পাদক

শব্দচৌকি পুরস্কার ১০৲

নির্ভুল সমাধান আমরা একটিও পাই নি। এক-ভুল সমাধানও কেউ করতে পারেন নি। সব চেয়ে ভালো সমাধানেও দুটির কম ভুল নেই।

নির্ভুল সমাধান

১ র	বি	ঠা	২ কু	র	*	৩ নি	রু	পা	য়
ভ	*	*	৪ বে	তা	৫ ল	ভ	উ	*	*
৬ ক	৭ পু	ট	র	*	লা	*	৮ আ	৯ ছা	ড়
*	চৌ	*	*	১০ কা	টি	ঘ	*	ও	*
১১ পা	দ	১২ প	*	*	১৩ কা	কা	তু	য়া	*
১৪ রি	ক	দ	ও	*	*	*	১৫ অ	ল	ক
তো	*	১৬ র	ক্ত	১৭ জ	১৮ বা	*	*	*	*
ষি	*	জ	*	কে	ম	*	১৯ র	সু	২০ ই
২১ ক	র	*	২২ ব	ল	দে	ব	*	*	ন্দি
*	২৩ জ	গ	দী	শ	ব	সু	*	*	রা

যাঁরা দুই ভুল করেছেন

সামশের আলি আহম্মদ
রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
গৌরাঙ্গ চৌধুরী

যাঁরা তিন ভুল করেছেন

মহম্মদ গুলজার আলি
সুরথ বসু
পিন্টুরাণী ও
মিন্টুরাণী বসু } এক গ্রাহক

সাত টাকা প্রথম তিনটি গ্রাহক ও তিন টাকা পরের দুইজন গ্রাহক-এর ভিতর সমান ভাগ করে দেওয়া হবে।

অনেকে লিখেছেন, শব্দ-চৌকি কঠিন হয়েছে। হয়তো এ অভিযোগ খুবই সত্য। কিন্তু ধাঁধা যত কঠিন হবে, তার সমাধানে আনন্দ হবে তত বেশী। আগামী মাসে নতুন শব্দচৌকি দেওয়া হবে। দেখা যাবে গ্রাহক-গ্রাহিকারা নির্ভুল সমাধান দিয়ে আমাদের শব্দচৌকিকারকে পরাস্ত করতে পারেন কি না।

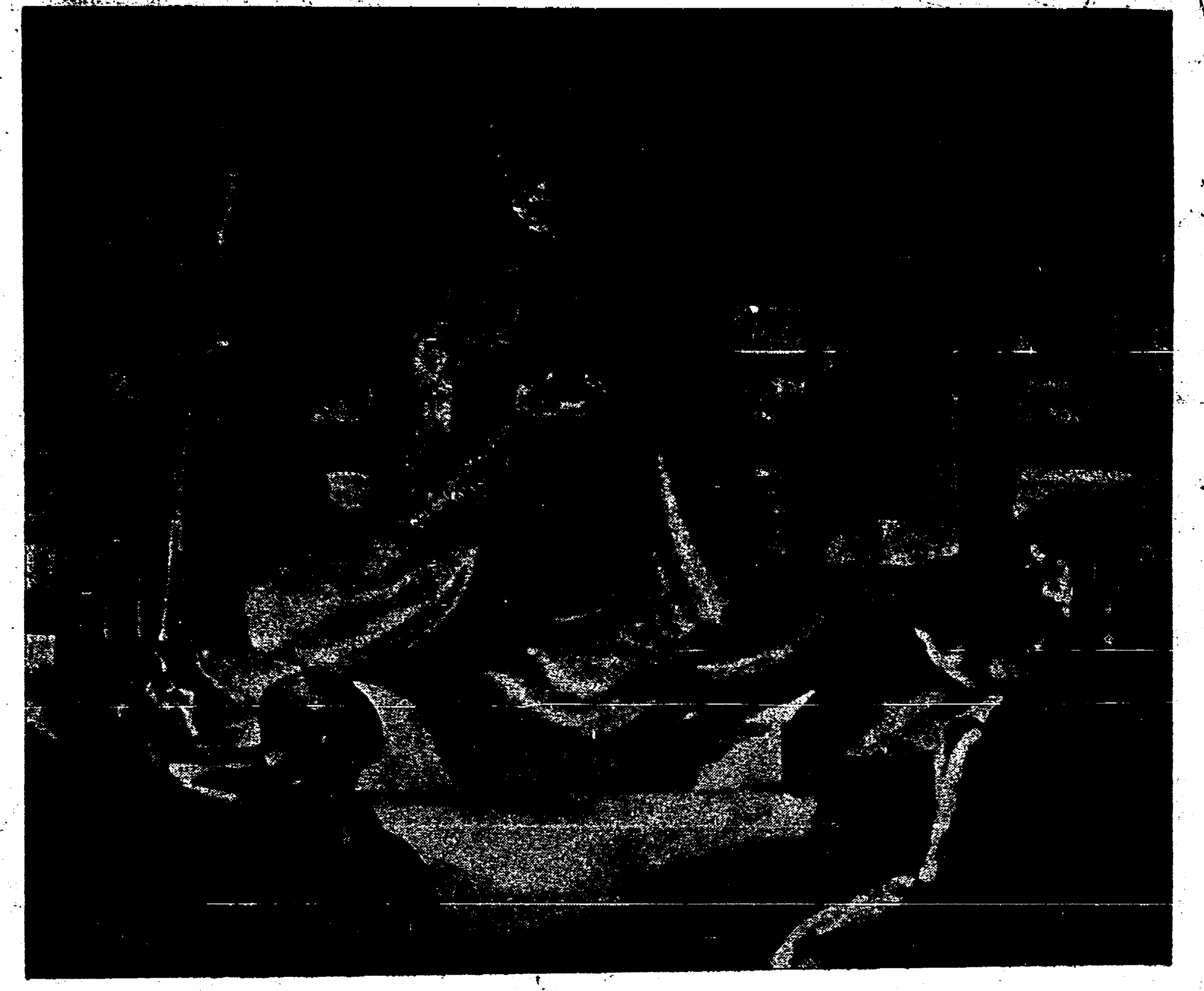

কথক

শিল্পী—ভিক্টর নাগ

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

—চটু জলদী কবিতা—

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

—"বলি' ও মালী, কি হবে এত বড় বাঁশ ?"
—"সগ্‌গ পদীপ দিতে হবে পুরো কার্ত্তিক মাস !"
—"বলি সগ্‌গ পর্য্যন্ত পৌছবে তো পদীপ ?
বাঁশখানা মেপে দেখেছ কয় ফিট ?"
—"ঠিক আছে ষোল পাঁব্,
সাত সাত চোদ্দো গড়ে
কাক পক্ষির তরে
রইলো ডগার দু পাঁব্ ।"
—"সগ্‌গ যে অনেক দূর,
বোধকরি তোমার মাপের আছে ভুল !"
—"আজ্ঞে না, বাড়ীখানা যে চৌতলা,
তার পরে চাপালে ষোলো—
একুনে চৌষট্টি হলো কি না হোলো—
দেখে লন ধারাপাত ;
তারো উপরে পতোকা বিঘৎ চার পাঁচ ।"

—"ও মালী, দেখনা করে আঁচ
পত্তোকায় ঠেকে ভেঙে তো যাবেনা চাঁদ ?
উল্টে পড়বে না তো সূর্য্যের রথ এক পাশ ?"
—"আজ্ঞে সে ভয় করিনে, আমি ভয় করি—
যদি হুড়োহুড়িতে ছেঁড়ে দড়াদড়ি,
পিদিপটা নেভে ফুটে লন্ঠনের কাঁচ—
মুনেজার মাইনে কাটান দেবে মাস মাস।"
—"ও মালী, বাবুদের বাগানে দেখতো একটা আছে না কি
ভেরেণ্ডা গাছ !"
—"আজ্ঞে, আছে বোধ হচ্ছে !"
—"একটা ডাল ভেঙে দিতে পার, দাঁতটা কন্ কন্ করছে সারারাত"।
—"কেমন করে কাঁচি চালাই সরিকি খাছে ?
গোনা গুন্তি ডাল পাতা, ফর্দ্দ ধরা মুনেজারের কাছে
এ কাজ করলে সাঁড়াশি দিয়ে ওপড়াবে দাঁত !"
—"তবে কাজ নেই, ছিঁড়ে দাও ছুটো খুদে মেতি পাত্ !"
—"মশায় পারবো না করছি জোড় হাত !"
—"ও মালী, আমি যে বাবুদের আপনার লোক নেহাতি !"
—"তাতো জানি মশয়
এ কাজ যদি প্রেকাশ হয়
তখন যে ভিটে মাটি চাঁটি
—হে মহাপ্রভু জগড়নাথ !"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তোমরা জানোনা বুঝি ! আছে গো আছে !—তারা সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে ! সে এক ভারী মজার দেশ। সেখানে সব উল্টো !

কি রকম ? শুধোয় রাখাল আর ভূতো।

সেখানে লোকে ধন থাকতে কাঙাল আহার থাকতে উপোষী। সেখানে, চাষের জমিতে আল্, বাসের বাড়ীতে দেওয়াল !

রাখাল আর ভূতো এবার হেসে ওঠে। এ আহাম্মুক লোকগুলো বলে কি ? বাড়িতে দেওয়াল দেবে না ত 'উদোম-হাট' করে রাখবে নাকি ? বাড়ি ত আর বাজার নয় রে বাপু ! আর চাষের জমিতে আল্ না দিলে, কার পাকা ধানে কে মই দিয়ে যাবে তার ঠিক কি !

নাঃ এ পাগলগুলোর সঙ্গে মিছে বকে লাভ নেই। তার চেয়ে এদিক ওদিক একটু ঘুরে বেড়ালে কাজ হবে। একটা পাকা হুঁসিয়ার লোকের দেখা পেলে এ মুল্লুকের সত্যিকার খোঁজ খবরও পাওয়া যেতে পারে।

তারা হু'জনে এবার কেটে পড়ে। তাও লোকগুলো কি সহজে ছাড়তে চায় ! বলে—চল না ভাই আমাদের সঙ্গে। নোনাখালির জলে আজ রূপোলি ডানার ঝিলিক দিয়েছে, গাঙ্গচিলেদের শাদা ডানায় বাতাস উঠেছে ফেনিয়ে......

আ মোলো যা ! যাচ্ছিস্ ত মাছ ধরতে তার আবার আদিখ্যেতা দেখ ! যেন সব কবিওলা এলেন !

রাখাল আর ভূতো বেশ একটু চটেই যায়। কিন্তু নানাদিক ঘুরে ফিরে পাকা হুঁসিয়ার লোকের দেখা তারা পায় না।

এ তল্লাটে সবাই এমনি ক্ষ্যাপা নাকি!

খাসা জায়গাটা কিন্তু!—এক সময়ে মন্তব্য করে ভূতো!

খাসা জায়গা না ছাই!—রাখাল চটে ওঠে। এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম একটা মানুষের মত মানুষ দেখেছিস্—একটা পাহারওয়ালা পর্য্যন্ত না!

তাইত! পাহারাওয়ালা ত সত্যি, চোখে পড়ে নি।

আমি ত তখনই বলেছিলাম, গাজন না হোক কোন একটা পাল পার্ব্বন নিশ্চয় আজ আছে এখানে—ভূতো সোৎসাহে জানায়—নইলে এত রঙ বেরঙের পোষাক কিসের? এত সব হাসি হাসি মুখ! পাহারওয়ালাদের আজ বোধ হয় তাই ছুটি!

পাল পার্ব্বনে বুঝি পাহারওয়ালাদের ছুটি হয়!—রাখাল ধমকে ওঠে; চোর গাঁট-কাটা তাহলে ধরবে কে, কে সামলাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুনি? পাল পার্ব্বণেই ত তাদের বেশী কাজ!

কিন্তু পাহারওয়ালা তাহলে নেই কেন?—ভূতো অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে!

রাখাল খানিকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বলে,—হেঁ বুঝেছি।

ভূতো উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকায়। রাখালের বুদ্ধিতে তার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

রাখাল বলে,—দেখ ভূতো! এদের যে রকম বোকা বোকা ভাল মানুষ মনে হচ্ছে আসলে এরা তা নয়! ভারী প্যাঁচাল ধড়ীবাজ বুঝেছিস্!

ভূতো দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করে, সে কিছু বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পারলি না গাধা!—রাখাল বিরক্তির স্বরে বলে,—এই পাহারওয়ালা না থাকা একটা প্যাঁচ। পাহারওয়ালার বদলে সব চোরা গোয়েন্দা এরা রেখে দিয়েছে,—এমন ভালো মানুষ সেজে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে যে দেখে চেনে কার সাধ্যি!

ভূতো ভীত হয়ে ওঠে—ও বাবা!

হুঁ—খুব সাবধান, বেয়াড়া কিছু করেছিস্, বেফাঁস কিছু বলেছিস কি গেছিস্—কে কোথায় ওৎ পেতে থাকে কে জানে!

ভূতো কাঁদ কাঁদ হয়ে ওঠে,—কিন্তু আমার যে ক্ষিদে পেয়ে গেছে, এত বেলা অবধি ঘোরাঘুরি করে! ভাবছিলাম,—

ভাবছিলাম ত আমিও,—বলে রাখাল রাস্তার ওধারের একটা চমৎকার ভাবে সাজান ঘরের দিকে তাকায়। চেহারাটা তার ঠিক দোকান ঘরের মত নয়, কিন্তু নানান রকমের

খাবার ফলমূল সেখানে যেভাবে সাজান তাতে সেটা দোকান না হয়ে যায় না। তা ছাড়া সেখানে হরদম লোকজন ঢুকছে বেরুচ্ছে যখন তখন সেটা খাবার দোকান ছাড়া কি হতে পারে।

কিন্তু খাবার দোকানে যে যাবে, ট্যাঁক ত গড়ের মাঠ। কোন রকমে ফন্দি ফিকির করে তাদের ফাঁকি দেওয়া হয়ত চলে, কিন্তু চারিধারে চোরা গোয়েন্দা ওৎ পেতে আছে মনে করলেই যে সব ফন্দি গুলিয়ে যায়।

কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শেষ পর্য্যন্ত রাখাল একটা মতলব ঠিক করে ভূতোকে নিয়ে সেখানে গিয়ে ঢোকে।

ঢুকতেই অভ্যর্থনার ঘটা দেখে প্রথমেই ত তারা হতভম্ব। এরা তাদের ভেবেছে কি? কোথাকার আমীর ওমরাহ খাঞ্জা খাঁ নিশ্চয়, নইলে এমন যত্ন করে! না এদের হাত ছাড়ান আরো শক্ত হয়ে উঠল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এসে যখন পড়েইছে, আর পেছুন এখন যায় না।

একজন হাসিখুসী লোক—দোকানের সেই বোধহয় মালিক—নিজে এগিয়ে এসে তাদের খাতির করে বসায়।

কি তোমাদের দিই বলত ভাই?—লোকটি জিজ্ঞাসা করে। রাখাল আর ভূতো দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়।

লোকটি নিজেই বলে,—আজ ফলের বার, খাসা টাটকা আপেলাম্ আছে, নধর পিয়ারতো, কি জাম্পিচ্!

আপেলাম! পিয়ারতো!—এ আবার কি ফল!

লোকটি তাদের মুখের ভাব দেখে কি বোঝে কে জানে। মুখে বলে, দাঁড়াও ভাই, আমি নিজেই ব্যবস্থা করছি। তোমাদের কিছু বলতে হবে না।

দেখতে দেখতে তাদের সামনে খাবার আর ফলের থালা স্তূপাকার হয়ে ওঠে। দোকানের মালিক—মালিক না হয়ে সে যায় না,—এক গাল হেসে একটা খাবারের থালা নিজে হাতে এনে বলে,—এইটি ভাই আমাদের ময়রা কবির সব চেয়ে সরেস জিনিষ!

লোকটা বড় বক্তার। থালাটা সামনে ধরে দিয়ে সে আবার বকতে সুরু করে,—তিন দিন তিন রাত কবির ঘুম নেই, খালি চাকে আর শোঁকে, আর বলে, লে আও! সে সব কি আজগুবি ফরমাজ! কোথায় চীনে শশার বীচির শাঁস, পারসি জাফরানের টাটকা কুঁড়ি, পেশোয়ারী পেস্তার তেল, এক ফুট দেওয়া চমরী গাইএর দুধের সর...সে হরেক রকম বায়না মেটাতে আমাদের প্রাণান্ত! কিন্তু কিছু বলবার ত জো নেই, কবির যখন মাথায়

খেয়াল চাপে তখন কিছু বল্লে পাছে সুর কেটে যায়, এই ভেবেই আমরা সারা। হ্যাঁ, তারপর যে জিনিষটি বেরুল তার আর তুলনা নেই, আহা যেন জীভের একটি রসাল ঠুংরি!

বলে কি লোকটা! ময়রা কবির জীভের ঠুংরি, সে আবার কি! নাঃ, এ লোকটাও কম পাগল নয়। কিন্তু পাগল হোক আর যাই হোক, খাবারগুলো সত্যিই খাসা। এমন খাবার এমন ফল রাখাল আর ভূতো জন্মে কখন মুখে দেয়নি।

লোকটা নিজের মনে বকে যায়। তারা আকণ্ঠ খেয়ে এবার পালাবার পথ খোঁজে।

লোকটা ভেতরে কি যেন আনতে গেছে। আশ পাশে কেউ তাদের বড় লক্ষ্য করছে না। রাখাল ভূতোকে টিপে দেয়।

ভূতোকে আর দুবার টিপতে হয় না। চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে সে তখুনি পগার পার।

দোকানের মালিক—মালিক না হয়ে সে যায় না—ছুটতে ছুটতে আসে—আরে হল কি ভাই!

হল?—রাখাল একেবারে তেরিয়া হয়ে ওঠে, বেটা চোর বেটা ডাকাত। বেটাকে খুন করে ফেলব! আমার টাকার থলে নিয়ে পালান।

রাখাল সুবিধে থাকলে বুঝি তখুনি ছুটে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু সোরগোলে সবাই তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

তারা কেমন যেন অবাক হয়ে বলে,—চোর ডাকাত টাকার থলে! বলছ কি?

কি বলছি বুঝতে পারছ না!—রাখালের মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়া;—দাম চুকিয়ে দেব সবে টাকার থলিটি ট্যাঁক থেকে বার করেছি—আর ছোঁ মেরে নিয়ে ছুট!

এত মেজাজ দেখান সত্ত্বেও লোকগুলো সবাই হেসে ওঠে যে!

একজন বলে,—টাকার থলে নিয়ে গেছে ত! তা গেলেই বা এখুনি আবার ফিরে আসবে দেখো।

হ্যাঁ ফিরে আসবে! টাকার থলে নিয়ে কেউ ফিরে আসে!—এবার রাখাল সত্যিই চটে ওঠে লোকগুলোর আহাম্মুকীতে।

আহা ফিরে আসবে না ত করবে কি! আর টাকা তোমার কি দরকার!

শোনো কথা! টাকার কি দরকার! ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় না! কোন রকমে সে ইচ্ছেটা দমন করে রাখাল বলে,—এখন আমি দাম দেব কোথা থেকে!

দোকানের মালিক—না, মালিক না হয়ে সে যায় না—এবার এগিয়ে এসে হেসে বলে,—বুঝেছি! তোমরা বুঝি হট্টমালা থেকে আসছ!

আবার সেই হট্টমালা! না এরা পাগল না করে' ছাড়বে না। রাখাল হঠাৎ এক ধাক্কায় সামনের লোককটাকে ঠেলে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারে।

পেছন থেকে দোকানের মালিকের ডাক শোনা যায়—ও ভাই! যাও কোথাও পান-সেন খেয়ে যাও!

হ্যাঁ আর সোহাগে কাজ নেই। পান খেতে গিয়ে ধরা দেবার ছেলেই সে বটে! এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে ক্রোশখানেক না গিয়ে আর সে থামে না।

তারপর ভূতোর সঙ্গে দেখা হতে দুজনের কি হাসি! আহাম্মুকগুলোকে কি ঠকানই ঠকান গেছে!

খানিক বাদে হাসি থামিয়ে রাখাল বলে,—আহা ভূতো সিঁধকাটিটা যদি থাকত! গেছে ত জলে হারিয়ে?

ভূতো মুচকি হেসে কোমরের কাপড়ের বাঁধন খুলতে খুলতে বলে,—হ্যাঁ গেলেই হল আর কি? প্রাণটি গেলেও সিঁধকাটিটি ছাড়তাম নাকি!

খুশী হয়ে রাখাল বলে,—বহুতাচ্ছা! আজ রাত্রেই বুঝেছিস

কোথায়!—শুধোয় ভূতো।

কোথায় আবার!—যেখানে খেয়ে এলাম।

শেষকালে সিঁধ কেটে খাবার চুরি!

খাবার চুরি কেন রে আহাম্মুক! শুধু বুঝি খেয়েই গেছিস, কিসে খেলি তা বুঝি খেয়াল করিস্ নি!

না ত।

আরে থালাগুলো যে নীরেট চাঁদি আর সোনার!

সোনার!—ভূতোর চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে! বলিস্ কি সোনার থালায় খেয়ে এলাম, আর তখন তুই কিছু বল্লিনি! নিজেও ত একখানা সরিয়ে আনতে পারিস্।

আমি ত তোর মত গাড়োল নই। তখন একখানা সরিয়ে আনলে আর সবগুলো নেবার এ সুবিধে হত। ওরা হুঁশিয়ার হয়ে থাকত না তাহলে!

ভূতো গভীরভাবে ভেবে বলে,—তা বটে!

ক্রমশঃ

ভাবী গৃহিনীর বৈঠক
ইন্দিরা দেবী পরিচালিত

আল্‌পনা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রা-কলসী

যাত্রা-কলসী, বৌ-ছত্র, লক্ষ্মীপূজো, সুবচনি এম্‌নি নানারকম আল্‌পনা পাড়াগাঁয়ে বৌঝিদের, ধারব্রত পালপার্ব্বণে, ছেলেমেয়ের বিয়েতে—বছরে প্রায় বারমাসই—কখন পিঁড়ের উপর কখন উঠোনের মেঝেয়, ঘরের দাওয়ায়, চণ্ডিমণ্ডপে, ছাঁদনাতলায় সুন্দর ক'রে আঁকতে হয়। যে মেয়েটি ভাল আল্‌পনা দেয় পাড়ায় তার আদর কত! বরকণের ছিরিপিঁড়ি যে মেয়েটি চিত্র করে, তাকে মাছ, দই, সন্দেশ, রাঙ্গা শাড়ী, পায়ের আল্‌তা, হাতের শাঁখা এমনি আরো কতকি বর আর কণের বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়ে, ঢাক-ঢোল ধুমধামের সঙ্গে লোকে মেয়েটির হাতের আল্‌পনা দেওয়া পিঁড়িখানি এনে ঘরে সাজায়। সুন্দর বর, তার চেয়েও সুন্দর কণে এই সব আল্‌পনায় লেখা আসনের উপরে পা রেখে যখন দাঁড়ায় তখন যেন আনন্দ আর শোভা এক সঙ্গে মেলে—রাজার দালানে, প্রজার কুটীরে, সুখী দুঃখী সবার ঘরে। আবার চণ্ডিমণ্ডপে রাঙ্গা আল্‌তায় মা লক্ষ্মীর রাঙ্গা পায়ের-চিহ্ন লেখা আল্‌পনা-গুলি দেখ্‌লে মনে হবে যেন এক একটি শ্বেত পদ্মের উপরে পা রেখে দেবী এসে বেদীতে বস্‌লেন। এ-ছাড়া আরো কত রকমের আল্‌পনা,—কোনটায় মেয়েদের যত গহনা সবগুলির চিত্র, কোথাও চন্দ্র সূর্য্যি, আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল। আল্‌পনার পৃথিবী সে ভূগোলের পৃথিবীর মত গোল নয়—তিন কোণা, তার তিনদিকে সমুদ্রের ঢেউ, মাঝে দাঁড়িয়ে সব প্রথম যে ছেলেমেয়েটি পৃথিবীতে এসেছিল তারা! আমরা চোখে দেখি কলার-কাঁদি, এক্‌রাশ খৈ, একটা শাঁখ কিন্তু আল্‌পনায় লেখ্‌বার বেলায় মেয়েরা লিখ্‌বে শঙ্খলতা, খৈলতা, কলালতা,—দেখলে মনে হবে স্বর্গ থেকে যেন পারিজাতলতা পৃথিবীতে এসে ফুট্‌লো। এ ছাড়া সুপুরী বাগানে বাড়ীর কর্ত্তা কোঁচা দুলিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, দুই-দুই দরোয়ান যোড়-বাঙ্গলার দরজায় খাড়া পাহারা দিচ্ছে, তেঁতুলতলা, গোয়ালঘর, খিড়কির পুকুর, হেঁসেল্‌, মায় হাতা বেড়ি এমনি সব ঘরকন্নার ছবি পাড়ার মেয়েরা কারু কাছে না শিখে লিখছে। ছবির গোড়া হল এই আল্‌পনা, না-শেখার সুন্দর লেখা। রং এতে বেশী নেই, এক সাদা আর লাল, বড় জোর নীল, হলুদ, সবুজ। হাতের কাছে সহজে যা পাওয়া যায়, চালের গুঁড়ি নয় চাল-বাটা জল

এরি থেকে চমৎকার সাদা আর তাতেই নানা রং মিলিয়ে চিরকাল মেয়েরা আল্‌পনা দিয়ে আসছে। আল্‌পনার ছবি শেখাও যেমন শেখানও তেমনি সহজ, কেননা সহজে যা মনে আসে হাতে আসে চোখে পড়ে তাই হল আল্‌পনা আর এত সহজ বলেই আল্‌পনা এত সুন্দর। আল্‌পনার এই সহজ না-শেখা সুন্দর অলকা-তিলকা দিয়ে মেয়েরা শিশুকালে যে মাটির বুকে খেলেছে, বৌ হয়ে' যে মাটির ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই মাটিকে সুন্দর করে' তুলেছে চিরদিন। আল্‌পনা দেওয়া শিখতে ইস্কুলে যেতে হয় না, বইও পড়তে হয় না, যেমন খুসী লেখ, হয় কাঠিতে তুলো জড়িয়ে তুলি করে' নিয়ে, নয়তো কাপড়ের একটু পুঁটুলি পিটুলির জলে ভিজিয়ে। এক বুড়ির সখ হল যে তার দুয়ারে দুইদিকে দুই হাতি বাঁধা থাকা চাই, যেমন তার ছেলেবেলার সাথী রাজার মেয়ের বাড়ীতে থাকে। কিন্তু বুড়ি সূতো কেটে খায়, সংসারে তার এক নাত্‌নি ছাড়া কেউ নেই, হাতি কেনেই বা কোথা থেকে, হাতি ধরেই বা আনে কে! বুড়ী ত হাতীর জন্য পাগল। সেই সময় একদিন বিক্রমাদিত্য রাজা সন্ন্যাসীর বেশে বেড়াতে বেড়াতে সেইখানে এসে ভিক্ষে চাইলেন, বুড়ির নাত্‌নী সন্ন্যাসীকে খুব যত্ন করে রাখলে। বিক্রমাদিত্যের কাছে এক মহাপুরুষের দেওয়া আশ্চর্য্য তুলি ছিল, সেই তুলি দিয়ে দেওয়ালে যা আঁকা হোত রাত্রে সেগুলো জ্যান্ত হ'য়ে দেখা দিতো। বুড়ির নাতনীর যত্নে সন্ন্যাসী রাজা তুষ্ট হয়ে মেয়েটিকে সেই তুলি দিয়ে গেলেন। মেয়েটি সেই তুলি দিয়ে তাদের ঘরের দরজায় মস্ত দুই হাতি লিখলে, রাত্রের মধ্যে তারা জ্যান্ত হয়ে শুঁড় নাড়তে লাগলো আর বুড়ীর চালের খড় খেতে লাগলো—বুড়ি আর পাড়ার লোক দেখে অবাক্‌। সেই তুলির একটু একটু তুলো যারা ভাল আল্‌পনা দেয় এমন কোন কোন মেয়েদের কাছে এখনো লুকোনো আছে। আমি এক জায়গায় একটু তুলোর সন্ধান পেয়েছি কিন্তু সে অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে আমার মামার বাড়ীতে; সহরে কারু ঘরে সে তুলোও নেই সে তুলিও নেই। ভাল আল্‌পনা যার হাতে বেরোচ্ছে দেখবে, তারি কাছে জান্‌বে সেই মহাপুরুষের দেওয়া তুলো একটুখানি আছে নিশ্চয় কিন্তু সে তোমায় কিছুতে বল্‌বে না যে সে তুলো তার কাছে আছে।

'পার্ব্বনী'র প্রথম সংখ্যা হতে তুলে দেওয়া হল

মহাযুদ্ধের আর একটা পুরণো গল্প

কখনো সখনো সদাগরী জাহাজের হাতে মানোয়ারী জাহাজকে দস্তুরমত নাস্তানাবুদ হতে হয় বৈকি! মহাযুদ্ধের একটা পুরণো গল্প বলা যাক।

ইংরেজ একটা সদাগরী জাহাজ, নাম 'ওটাকি'। ৪·৭ ইঞ্চি নলা একটামাত্র কামান ডেকে চড়িয়ে একদিন বন্দর ছাড়লে। কাপ্তেন হচ্ছেন লেফটেনাণ্ট এ. বি. স্মিথ, সঙ্গে মায় খালাসীসুদ্ধ মাত্র ৭১টি প্রাণী।

ক্ষুদে সদাগরী জাহাজ ফুঁ ফুঁ করে ঢেউ কাটিয়ে চলেছে। মহাসমুদ্রের একটা দিগন্ত শেষ হয়ে আর একটা দিগন্ত ধরা দিচ্ছে।

অসংখ্য দিগন্তরেখা অতিক্রম করে জার্ম্মাণ যুদ্ধজাহাজ 'মাওয়ি' তুরদার করে মহাসমুদ্রের ঢেউ ভেঙে আসছে। ডেকের উপর চার চারটা ৫·৯ ইঞ্চি নলা, ১টা ৪·৬ ইঞ্চি নলা ও তুটো ২২ পাউণ্ড গোলা ছোঁড়ার কামান; তা ছাড়া টর্পেডো ছোঁড়ার পূরোদস্তুর ফিটফাট ব্যবস্থা। কাপ্তেন হচ্ছেন লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার হারম্যান্ জাং।

এক শুভক্ষণে জাহাজ তুটির মোলাকাৎ হল। মাওয়ি জাহাজের কাপ্তেন হারম্যান জাং-এর ডায়েরী থেকে ঘটনাটা আগাগোড়া তুলে দেওয়া যাক।

মাওয়ি জাহাজ যুদ্ধ জাহাজ, ভারিক্কি চালে হুকুম জানালে ওটাকিকে থেমে পড়তে। ওটাকির কাপ্তেন স্মিথ সাহেব জবাবে জাহাজ পূরোদমে ছুটিয়ে দিলেন, ওটাকির গোলন্দাজরা তাদের একটিমাত্র কামানের পিছনে তৈরী হয়ে দাঁড়াল।

মাওয়ি জাহাজ থেকে এই বেয়াদপির জবাবে একটা গোলা ছুটে এসে ওটাকির একপাশে ফেটে পড়ল। ওটাকি ভ্রূক্ষেপ করলেনা, পূরোদমে প্রাণপণ ছোটার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হল না।

মাওয়ি জাহাজের ধৈর্য্যচ্যুতি হল। মাওয়ি জাহাজের ডেকভরা জার্ম্মাণীর বাছাই করা গোলন্দাজ। মাওয়ি জাহাজের তিনটি কামানের গহ্বর থেকে একসঙ্গে আগুনের অভিসম্পাত বেরিয়ে এলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ওটাকি জাহাজটার কি ভয়ডর নেই! ক্ষুদে জাহাজের ক্ষুদে কামান তেরিয়া হয়ে গোলা ভেট পাঠালে যুদ্ধজাহাজ মাওয়িকে।

মাওয়ি জাহাজের সবকটা কামান তখন একসঙ্গে একটা বাজেভরা আকাশের মত গর্জ্জন করে উঠল। তুটো ছ ইঞ্চি শেল ছুটে এসে ওটাকি জাহাজের কামানের ঠিক নীচেয়

জাহাজের খোল ভেদ করে গেল। কিন্তু এতে জাহাজের কামানের গোলা ছোঁড়ার কামাই হল না। ওটাকি জাহাজের কামান থেকে একটা গোলা এসে মাওয়ি জাহাজের সামনেটা প্রায় মুড়িয়ে দিলে। এই অব্যর্থ লক্ষ্যে মাওয়ি জাহাজের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, মহাসমুদ্রের ঢেউ জাহাজের ভাঙা খোলের ঢালুপথে হু হু করে ছুটে এলো, জাহাজের মাথার দিকটা ডুবে এলো, জাহাজ হেলে গেল। সেদিন সমুদ্র ছিল অস্থির উচ্ছৃঙ্খল, মাওয়ি জাহাজ প্রায় ডুবি ডুবি।

মাওয়ি জাহাজের গোলন্দাজরা তখন কামানে গোলার পর গোলা ঠেঁষে দিলে; চার চারবার ওটাকি জাহাজ শত্রুর গোলার আঘাতে থরথর কেঁপে উঠল। কিন্তু সেয়ানা জাহাজ এই ওটাকি, তার গোলন্দাজরা স্থির হয়ে লক্ষ্যস্থির করে কামান দাগলে, মাওয়ি জাহাজের সঙ্কেত-সেতু চুরমার হয়ে গেল। ওটাকি জাহাজ থেকে আর একটা গোলা এসে ফেটে পড়ল মাওয়ি-র কয়লার ঘরে। ভীষণ এক বিস্ফোরণ হল। কয়লার ঘরে আগুন ধরে গেল, সে আগুন নেভানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। মহাসমুদ্রে অন্ধকার রাত নেমে এলো। সারাটা রাত মাওয়ি জাহাজ ডুবি ডুবি হয়ে অসহায়ের মত আধভাসা হয়ে রইল। কম্যাণ্ডার জাংয়ের নিজভাষায় কাহিনীটা শোনা যাক:

"প্রতিমুহূর্ত্ত আমরা মারাত্মক ভয়ে রইলাম, কখন জাহাজ সমুদ্রের তলায় চলে যায় কিম্বা বিস্ফোরণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে আকাশে ছিটিয়ে পড়ে। জাহাজের ডেকের তলায় কয়লার ঘরে মহা অগ্নিকাণ্ড চলেছে, আমাদের পায়ের তলায় ডেক গরম হয়ে উঠল, জাহাজের খোল খিলান তেঁতে উঠল। অসহায়ের মত আমরা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলাম। পূরো তুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তবে আমরা জাহাজের আগুন নেভাতে পারলাম, ছ্যাঁদা বোঁজাতে পারলাম। ওটাকির চেয়ে তিনগুণ বেশী লড়বার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ওটাকির হাতে আমাদের ইহলীলা প্রায় শেষ হতে বসেছিল।"

কিন্তু 'ওটাকি'র খবর কী? মাওয়ি জাহাজের দফারফা করতে পেরেছে, ওটাকির পক্ষে এই যথেষ্ট। না হলে মানোয়ারি জাহাজের সঙ্গে ক্ষুদে সদাগরী জাহাজের কি আর লড়াই করা চলে! মাওয়ি-র গোলার আঘাতে ওটাকি-র হয়ে এলো। কাপ্তেন স্মিথ তখন নৌকো নামাতে হুকুম দিলেন। কাপ্তেন জাহাজ ছাড়লেন না। মহাসমুদ্রের তুরন্ত বাতাসে জাহাজের পতাকা উড়তে থাকল, জাহাজ একটু একটু করে মহাসমুদ্রে গা হেলিয়ে দিলে।

ইস্কুল ঘর

এমন স্কুল আছে যেখানে না-যেতে পারলে ছেলেরা কাঁদে, ছুটির ঘণ্টা পড়লেও তারা ঘরে ফির্‌তে চায়না, ঘরে ছেলে দুষ্টুমি করলে বাপমা যেই তাকে শাসিয়ে দেন, "কাল তোমাকে স্কুলে যেতে দেবোনা" অম্‌নি সে চুপ করে, তা হ'লে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে হবে, কোনো এক উল্টো দেশের কথা বল্‌ছি। তা যে যাই ভাব, সত্যিই এমন স্কুল আছে।

কোথায় ?

সেই সব দেশে যেখানে রাজা প্রজা সকলেই ছেলে মানুষ করাটা সব চেয়ে জরুরী কাজ ব'লে মনে করে। ধর, আমেরিকায়—সেখানে ছোট ছেলে মেয়েদের এক পাঠশালা আছে তার নাম গ্যারী স্কুল। এখানে বাঁধাবাঁধি নিয়ম কানুনের বড় একটা চাপ নেই ; ছেলেমেয়েরা যখন খুসী, যেখানে খুসী বসে' গল্প করে, হাসে, খেলা করে। গোলমাল হচ্চে ব'লে গুরুম'শায় চোখ রাঙান না, তাই ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে খেল্‌তে পারে। যাদের বাড়ীতে পোষা কুকুর, বেরাল, ছাগল, ভেড়া আছে তারা তাদের স্কুলে নিয়ে যায় ; স্কুলের উঠোনে তারা চরে, সেখানে স্কুলসুদ্ধু সবাই মিলে এদের খাওয়ায়, যত্ন করে।

আর গুরুমশায় কি করেন ?

তাঁকেও এই সব খেলায় যোগ দিতে হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্তুদের বিষয় অনেক

কথা তিনি ছেলেদের বলেন। তারা খুব মন দিয়ে সব শোনে আর জন্তুদের ভালো ক'রে আদর যত্ন করতে শেখে।

তারপর, ধর, একদিন বেশ পরিষ্কার দিন,—মেঘ কেটে গেছে, বাইরে আর ঠাণ্ডা কন্‌-কনে হাওয়া বইছেনা, অনেকদিন পরে রোদ্দুরের মুখ দেখা দিয়েছে, তাই ছেলেমেয়ের দল স্কুলে এসে জুট্‌তেই কেউ বলে' উঠল "চল্‌ ভাই, আজ নদীর ধারে—সেখানে ভারি মজা।" যেই বলা অমনি দলকে দল নদীর দিকে ছুট্‌ল ; কারো হুকুমের অপেক্ষা নাই। গুরুম'শায় আর কি করেন ? তিনিও পিছন পিছন চল্‌লেন। ছেলেরা নদীর ধারে এসে জুট্‌ল ; তারপর এইখানেই নদী, নদীর জন্ম, নদীর গতি, নদীর জীব জন্তু, আশেপাশের গাছপালা এই সব কথা নিয়ে সেদিনকার ক্লাস্‌ বস্‌ল।

স্কুল ঘরে নানারকম খেলার আয়োজন থাকে ; সেই সব খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে কত কি শেখা যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা একরকম খেলা খেলে, তার নাম রঙের খেলা। দু' তিনবার খেল্‌লেই এরা সব রঙ চিন্‌তে পারে।

সব ছেলের সব বিষয়ে সমান ঝোঁক থাকে না। যার যেটা ভালো লাগে তাকে সেটাই শেখান ভালো। এক ধরণের কোনো একটা ছাঁচে সকলকেই লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা কর্‌তে গেলে মানুষের মন ঠিক্‌ গড়ে উঠ্‌বার সুযোগ পায়না। এইজন্য হাতে কলমে কাজ কর্‌বার অনেক আয়োজন গ্যারী স্কুলে আছে। যারা একটু বড় তারা ছোট ছোট ছাপাখানায় নিজেদের খুসিমত বই ছাপায়,—নিজেরাই অক্ষর বেছে বেছে সাজায়, নিজেরাই কালি দেয়, নিজেরাই ভুলচুক্‌ ঠিক ক'রে নেয়, এমনি করে' তাদের বানান শুদ্ধ হয়, কথার মানে শেখা হয়, আর হয় হাতে কলমে গুছিয়ে কাজ করার অভ্যাস। যারা হাতে কলমে ভাল কাজ কর্‌তে পারে তাদের বই বাঁধান ও কাঠের ছোট ছোট টেবিল চৌকি তৈরীর কাজ শেখান হয়।

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে লাইব্রেরী আছে – টেবিল, চেয়ার, আলমারী দিয়ে সাজানো একটি ঘর ; সেখানে রঙিন্‌ ছবির বইয়ের অন্ত নেই। ছেলেরা নিজেরাই বই পেড়ে নেয়, ছবি দেখে, গল্প করে, একজনে পড়ে সবাই শোনে, এম্‌নি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। মাষ্টার ম'শায়রাও সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ছেলেরা যা বুঝতে পারেনা, তাঁরা তাই বুঝিয়ে দেন।

ছোট মেয়েরা শেখে সেলাই ও পশমের কাজ। তারা স্কুলে বসে' নিজেদের পুতুল নিয়ে খেলা করে, তাদের কাপড় সেলাই করে দেয় ; আবার কখনো কখনো নিজেদের জামা টুপীও সেলাই ক'রে বাড়ী নিয়ে যায়।

একথা কিন্তু ঠিক্ নয় যে, ছেলেরা যা-খুসি করচে, সমস্তদিন কেবলি হুটোপাটি— কোনো নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নেই। ছোট বেলা থেকে ছেলেমেয়েদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তারা বুঝ্তে পারে সব কাজই নিয়ম ক'রে গুছিয়ে করা ভালো। কোন্ নিয়মগুলি পালন করলে ভাল করে কাজ করা যায়, ছেলেরা নিজেরাই তা বের করবে। তা হ'লে কোনো তৈরী নিয়মের শাসন না মেনে তাদের নিজেদের পক্ষে যা ভালো তাই তারা মান্‌বে। মোট কথা বকে' মেরে' ধম্‌কে ভালো মানুষ, গো-বেচারা করার চেষ্টাকে একালের স্কুলের গুরুম'শায়রা কোনোমতেই ভাল মনে করেন না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মন যেন এক একটি ফুলের কুঁড়ি; তাকে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল্ লেখাপড়ার কাজ,—মেরে ধরে তাকে ফোটানো যায়না।

১৩২৫ সালের পহেলা আশ্বিনে প্রকাশিত ছেলেমেয়েদের বিখ্যাত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে তুলে দেওয়া হল। লেখক পার্ব্বণী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শব্দচৌকি প্রতিযোগিতা

শব্দচৌকি প্রতিযোগিতায় এক নিদারুণ ঝঞ্ঝাট বেধেছে। গত শব্দচৌকি প্রতিযোগিতায় যে কটি সমাধান আমাদের অফিসে পৌছয়, তার ভিতর একটিও নির্ভুল নয়। দুই ভুল তিনভুল কয়েকটি সমাধান আমরা পাই, এবং যথারীতি উত্তরদাতাদের নাম-ও ছেপে দেওয়া হয়। তারপর গ্রাহকগ্রাহিকাদের কাছ থেকে খুব কম করে আমরা দুশো চিঠি পাই। এই দুশো চিঠি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন একভুল দুই ভুল সমাধান পাঠানো সত্ত্বেও তাঁদের নাম কেন ছাপা হয়নি? কয়েকজন জানিয়েছেন শব্দচৌকি-তে ভুল আছে, যথা সূর্য্য 'অলর্ক' নয়, 'অর্ক।' আমাদের দোষ ঢাকবার ইচ্ছা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা চিরকালই এই আচরণের ব্যতিক্রম করে এসেছি। যিনি শব্দচৌকি বিভাগের সম্পাদকরূপে আছেন, তিনি 'শব্দচৌকি' নির্ভুল ভেবে-ই ছাপবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ভুল তাঁর চোখে ধরাপড়া উচিত ছিল। সূর্য্য কখনই অলর্ক নয়, অর্ক। ছকে এই ভুল থাকার দরুণ অনেক উত্তরদাতা নির্ভুল উত্তর দিতে পারেননি। তারপর, আর একটা ব্যাপার, যে ব্যাপারের রহস্য এখনও নির্ণয় হলনা। যে দেড়শো দুশো উত্তর গ্রাহকরা পাঠিয়েছিলেন, যে উত্তর সম্পাদকের হাতে আসেনি, তারা কোথায় অন্তর্দ্ধান করলে? আমরা অফিস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু এখনোও হারাণো চিঠির বাণ্ডিল ধরা দেয়নি। ব্যাপার যা-ই হোক, এ দুর্ঘটনার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা বিশেষ মন দিয়ে কয়েকটি শব্দচৌকি পরীক্ষা করছি, এবং যোগ্যতর হস্তে এর ভার দিচ্ছি! আগামী সংখ্যা থেকে আমরা সুচারুরূপে এই বিভাগ চালাতে পারব আশা করছি। গত শব্দচৌকি প্রতিযোগিতা দুর্ঘটনায় নিস্ফল হল। গ্রাহকগ্রাহিকারা মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না এবং আমাদের ক্রটি মার্জ্জনা করবেন—

সম্পাদক

আমার চিঠি

রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকা আমার বন্ধুরা,

আমার তুর্ভাগ্য, গোড়া থেকেই তোমাদের সঙ্গে অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে' আসছি। কিন্তু ধৈর্য্য ধরো, সবুরে মেওয়া ফলে। কে জানে, হয়তো তুটি একটি মাস না যেতেই হারুণ-অল-রসিদী গল্পে সম্পাদকী-আসর জমে উঠবে। ঈশ্বর হয়তো অপ্রিয় প্রসঙ্গের তেঁতো মিক্শ্চার খাইয়ে সেই বিরাট কাহিনী ভোজের জন্য আমাদের তৈরী করে নিচ্ছেন!

প্রথম কথা, তোমরা পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিগুলো মন দিয়ে পড়ে' না দেখে' খামোকা আমাদের দোষ ধরো কেন? পত্রিকায় রীতিমত বড় হরপে ছেপে দেওয়া হয়েছে, অঘ্রাণে, পৌষে ও মাঘে 'পৃথিবীর কথা' একখণ্ড করে' গ্রাহকগ্রাহিকাদের ঠিকানায় যাবে। তবু অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করে' লিখেছো, মশাই, পৃথিবীর কথা তো খুব দিলেন! আপনাদের অভিসন্ধিটা কি বলুন তো! অতি তুঃখে আমরা তোমাদের উপর রাগ করতে পারিনি। তারপর, পূজোর সংখ্যা এবার ডাকে যেতে অসংখ্য কপি খোয়া গেছে। আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। কেননা, পত্রিকা পাঠিয়েও আমরা শুনছি তোমরা কেউ কেউ পত্রিকা পাওনি। এ ব্যাপারে অবশ্য আমরা চুপ মেরে বসে নেই। ডাকঘরে আমরা নালিশ জানিয়েছি। কিন্তু তোমরা—অনায়াসে লিখতে পারো, মশাই আমাকে অমুক সংখ্যা পাঠিয়ে দিন। অশিষ্ট ভাষায় চিঠি লেখার বাহাতুরিটা কোথায়? মিষ্টি কথায় যে কাজ আদায় করতে জানে তাকেই বলি বাহাতুর।

যাক—এবার পত্রিকা পেয়ে তোমরা বলবে,. অমরলতা, ঘরে-বাইরে, ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নাম, গ্রাহকগ্রাহিকার বৈঠক কোথায়? পত্রিকা বার হতে দেরী হল কেন? আমরা বলতে পারি, ভগবান জানেন! কিন্তু কথাটা শোনো। এবার পত্রিকা আগে বার করা সম্ভব হয়নি। রংমশাল ছাপতে যে কাগজ দরকার হয়, যুদ্ধের বাজারে তা' আমরা জোটাতে পারিনি। তারপর যে কাগজ জুটল, তাও যতটা দরকার পেলুম না। ১৬ পৃষ্ঠা ছাপবার কাগজ জোটাতে গিয়ে সাতদিন গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়েছে। ফলে, এত দেরী হয়ে গেল যে আমরা কয়েকটি লেখা বাদ দিয়েই পত্রিকা বার করে' দিলুম। পত্রিকা এবার খারাপ হয়নি। কিন্তু যেমনটি আমরা করতে চেয়েছিলুম সেই নমুনা পৌষের আগে দেখাতে পারলুম না, এই তুঃখ রয়ে গেল।

তোমাদের সম্পাদক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুকুমার দে সরকার

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনা। হঠাৎ দালানে একটা ক্ষীণ অস্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কত রাত ধারণা নেই তবে চেয়ে দেখলাম আকাশে তারাদল উজ্জ্বল। কালপুরুষ আমি চিনতাম—কালপুরুষ পশ্চিমে ঢলে গেছে। আবার সেই শব্দ, কে যেন একটা তুরপুন চালাচ্ছে কাঠের ওপর। কাণ খাড়া করলাম। হ্যাঁ। ঠিকই! এত রাত্রে দালানে কে কি করে? নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলাম। দালানে অন্ধকার ঘন ঘোর। মনে হোল একটা থামের আড়ালে ছায়ার মত কি যেন একটা নড়ে উঠল। বুকটা সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল।

"কে?" নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম আমাদের দরজাটা বন্ধ করে তার সামনে। কোথা থেকে যে কি হোল জানিনা হঠাৎ সামনে দেখি একটা কালো আকৃতি। সজোরে একটা হাত তার আমার ওপর নেমে এলো। আমার বুদ্ধি তখন হারিয়ে গেছে। অনুভূতিতে মনে হোল কে যেন আমায় আঘাত করতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে হাত তুললাম। একটা হাতের সঙ্গে সজোরে আমার হাতের ধাক্কা লাগল। আর মনে হোল আমাদের ঘরের কাঠের

দরজাটায় কি যেন একটা বিঁধে গেল। আমি তখন ভয়ে, উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। সজোরে মূর্ত্তিটাকে লক্ষ্য করে একটা ঘুসী চালালাম। ঘুসীর সঙ্গে একটা সংঘর্ষণ হোল। আমার আততায়ী দেখলাম ঘুরে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে উঠেই ছুট মারল অন্ধকারে। দালানের উত্তর কোণে একটা জানালা খুলে গেল আর একটা মূর্ত্তি সেই জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত্ত চাঁদের আলোয় লক্ষ্য করলাম মূর্ত্তিটার মাথায় একটা ভুটিয়া টুপি। জানলাটা লক্ষ্য করে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ছুটলাম।

এত কাণ্ড হয়ে গেল যেন চোখের নিমেষ না ফেলতে ফেলতে। বিশেষ কোন শব্দও হয় নি। জানালাটা খুলে যেতেই পঞ্চমীর চাঁদের পাণ্ডুর আলো দালানে ঢুকে অন্ধকারকে আরও বিভীষিকাময় করে তুলল। জানলাটার ধারে এসে তখনও স্থির করতে পারিনি যে কি করব। হঠাৎ পেছনে একটা দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ পেয়েই ঘুরে দাঁড়ালাম।

আমার মামার ঘরের পাশের ঘরটা সব সময়ে বন্ধ থাকত। দেখলাম সেই ঘরটার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। তারপরে সেই খোলা দরজা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে আসতে লাগল। হাতটা কনুই থেকে কাটা।

আমি যে ভীরু নই তার সামান্য পরিচয় বোধহয় আগে কিছু দিতে পেরেছি। তবু, একে রাতের সেই উত্তেজনা তারপরে কনুই থেকে কাটা হাতের সেই বিভীষিকা দৃশ্য! আর সহ্য করতে পারলাম না। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার সে চীৎকার ব্যর্থ হোল না। মুহূর্ত্তে দরজা খুলে গেল এবং একলাফে একটা বিশাল শরীর এগিয়ে এসে আমার মুখ চেপে ধরল। এক মুহূর্ত্ত সব অন্ধকার হয়ে গেল আমার চোখে।

জ্ঞান হোল মামার বুকে। যে সময়টা আমার মনে হয়েছিল অনন্ত সেটা আসলে একমিনিট ও নয়। তখনও আমি দাঁড়িয়ে আছি মামার বুকে হেলান দিয়ে। জ্ঞান হতেই ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। মামা চাপা গলায় বললেন—"চুপ!"

মামার সেই গম্ভীর স্বরে কি একটা ছিল যেন সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা উত্তেজনার অবসান হোল। তবু বলে উঠলাম—"মামা মামা তুমি?"

মামা ঘাড় নাড়লেন।

"মামা একটা কাটা হাত···"

"ভয় পেয়েছিস স্বরথ?" মামার এত নরম গলা বিস্মিত করল আমাকে।

মামা বাঁ হাতের তর্জ্জনী দিয়ে নিজের দক্ষিণ বাহুর দিকে নির্দ্দেশ করলেন। বাহুটা কনুইএর নীচে থেকে কাটা।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মুখ দিয়ে কথা বেরোল, বললামা "মামা তুমি, তুমি, তোমার···"

মামা শুধু বললেন "হ্যাঁ! কিন্তু কি হয়েছিল কি?" বিস্ময়ের ধাক্কায় পরিপার্শ্বের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মামার প্রশ্ন আবার ফিরিয়ে আনল আমাকে। উত্তেজিত স্বরে বললাম "মামা, চোর এসেছিল।"

"চোর?"

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়া টুপিটার ছবি ভেসে এল মনে। মামার প্রশ্নের উত্তরে নিজের অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "চোর?"

"কেন কি হয়েছে? বল! বল!"

"চোর নয় মামা, সেই লোকটা!"

"কোন্ লোকটা?" মামার গলায় গম্ভীর বিস্ময়!

অন্ধকারে কাণ দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

"সেই যে ভুটিয়াটা এসেছিল তোমার কাছে।"

"তুই দেখেছিলি তাকে?" অন্ধকারেও মনে হোল মামার চোখ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে।

"হুঁ!" জবাব দিলাম।

মামা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে ডাকলাম "একবার এদিকে এস মামা!"

"কোথায়?"

"আমাদের ঘরের সামনে।"

"কেন?"

"এসোনা!"

মামাকে নিয়ে আমাদের ঘরের সামনে এলাম। অন্ধকারে দরজা হাতড়াতে হাতড়াতে একটা জিনিষ হাতে ঠেকল। সন্দেহ তখন ভঞ্জন হয়ে গেছে।

"এই যে মামা দেখ।"

মামার হাতটা দরজায় বেঁধা ছোরাটার ওপর তুলে ধরলাম! মামা নিঃশব্দে সজোরে ছোরাটা বার করে নিলেন। অন্ধকারেও বাঁকা ছোরাটা একবার ঝকঝক করে উঠল। দেখলাম একটা কুক্‌রী!

"এটা···?" কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

ঘাড় নাড়লাম, "হ্যাঁ মেরেছিল আমাকে।" বিশাল একটা থাবার মত মামার বাঁ হাতখানা নামল আমার কাঁধে—"তোকে যত দেখছি তত আশ্চর্য্য হচ্ছি স্বরথ! কিন্তু চোরটা ঢুকল কি করে?"

"চোর নয় মামা, সেই ভুটিয়াটা!" আমি জোর দিলাম। এক মুহূর্ত্ত থমকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন আমার দিকে, তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"লোকটা ঢুকল কি করে বাড়ীর ভেতরে? বাড়ীটা পুরোণ বটে কিন্তু এমনভাবে তৈরী যে ভেতর থেকে বন্ধ থাকলে একেবারে লোহার সিন্দুকের মত শক্ত। হরিদাস কি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল?"

মামা তারপরে দরজাগুলো পরীক্ষা করে বললেন "না দরজা ত সব বন্ধই আছে শুধু এই জানালাটার ছিটকিনিটা ছাড়া। আর ছিটকিনিটা ত কাটাও নয় ভাঙ্গাও নয়। তার মানে হরিদাস ওটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। আয় ত দেখি।"

আমরা হরিদাসের ঘরের দরজায় এসে টোকা দিলাম।

"হরিদাস! হরিদাস!" মামা ডাকলেন।

কোন সাড়া এল না।

দরজাটায় ঠেলা দিলাম আমি। দরজা খুলে গেল। "দরজা খুলে ত ঘুমোয় না হরিদাস!" আমার পেছনে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিস্মিত গলায় মামা বললেন।

হরিদাসের ঘরে একটি মাত্র ছোট্ট জানলা। সেটা দিয়ে যা চাঁদের আলো ঢুকছিল আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সমস্ত ঘরটায় একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম "ঘরে হরিদাস নেই মামা!"

"নেই?" মামা থমকে দাঁড়ালেন "নেই মানে? যাবে কোথায়? এক যদি গোলমাল শুনে উঠে থাকে! কিন্তু তা হলে ত আগেই দেখা হোত আমাদের সঙ্গে।"

"না মামা হরিদাস আজ শোয়ই নি। দেখছনা বিছানাটা গোটানোই রয়েছে! কোন গোলমাল শুনে কি কেউ বিছানাপত্তর গুটিয়ে রেখে তবে দেখতে যায়?"

"তুই কি বলছিস কি?" মামার গলায় একটা উষ্মা, "দাঁড়া একটা পিদ্দিম আনি। দাঁড়াতে পারবি স্থরথ? ভয় করবে না?"

"না মামা!"

মামার বাড়ী আসা অবধি হরিদাসের হাভভাব যেন কেমন কেমন লেগেছিল। তখন ভেবেছিলাম একলা মনিবের চাকর, স্বভাবে খানিকটা কর্ত্তৃত্ব এসে গেছে। আর সেদিনের চুরীর ব্যাপারটার পর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। ভাবছিলাম হরিদাস গেল কোথায়? মামার 'পিদ্দিম আনি' কথাটা চিন্তাধারায় সংযোগ এনে দিল। ঘর অন্ধকার, চাঁদের আলোয় ম্লান। আকাশের দিকে তাকালাম জানলা দিয়ে—তারাদল ঝলমল করছে নির্ম্মল আকাশে। একটা সবুজ তারার আশায় দৃষ্টি আমার ঘুরে এল সে দিকের আকাশে। একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ মনে উঁকি মারছিল। আকাশের সেই সবুজ আকাশ পিদিমটা কখন নিভে গেছে?

মামা পিদ্দিম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। পিদ্দিমের হলদে আভায় মুখে তাঁর বিস্ময়।

"তাই ত রে! হরিদাস ত শোয়নি দেখছি। আর ওই দেখ!"

"কি মামা?"

"কাপড়ের আলনাটা খালি। ট্রাঙ্কটাও ত নেই দেখছি। হরিদাস গেল কোথায়?"

"মামা!" হঠাৎ প্রশ্ন করলাম "বাড়ীতে কি আজ আকাশপিদিম জ্বালা হয়েছিল?"

"আকাশ পিদিম? এই অসময়ে কেন?"

"হ্যাঁ! এসোত দেখি।"

মামা জানলা দিয়ে বাড়ীর মাথায় তাকালেন।

"কৈ কিছু ত নেই। তুই কি বলছিস কি?"

"একবার ছাতে এস মামা। দেখে বলছি।"

দরজা খুলে ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এসে সগর্ব্বে নির্দ্দেশ করলাম "ওই দেখ মামা।"

"কি?"

"ছাতের কোণে বাঁশটা দেখছনা? আর ওইত দড়ি।" বাঁশের ডগায় বাঁধা নেভানো লণ্ঠনটা

নামিয়ে আনতে আমাদের বেশীক্ষণ লাগল না। লণ্ঠনটায় সবুজ কাঁচ লাগান ছিল এবং ছাতে একটু খুঁজেই আমিই একটা লাল কাঁচও আবিষ্কার করলাম।

"এর মানে কি স্থরথ?" মামার গলা গম্ভীর।

শুতে যাবার সময় দূরে যে একটা লাল আকাশ প্রদীপকে সবুজ হয়ে যেতে লক্ষ্য করেছিলাম জানালাম মামাকে।

"বুঝছ না মামা? এই আকাশ পিদিম দিয়ে কেউ সঙ্কেত করেছিল কাউকে যে এখানে সব পরিষ্কার ওই লাল আর সবুজ কাঁচ ওই জন্যেই।"

মামা সবিস্ময়ে বললেন "তুই দেখছিলি দূরে আর একটা আকাশ পিদিম?"

"শুধু দেখেছিলাম নয় মামা। লালকে সবুজ হয়ে যেতেও দেখেছি।"

"হুঁ! ছেলেটার চোখ আছে!" এটা মামার স্বগত উক্তি। তারপরে তেতো স্বরে তিনি বলে উঠলেন "কিন্তু হরিদাস? হরিদাস এ কাজ করল?"

"তাই ত বুঝতে পারছিনা মামা! এর মানে কি? ভুটিয়াটাই বা কে?"

"হুঁ!" মামা বিড় বিড় করে বললেন "পদম্‌পৎ আক্রমণ স্থরু করেছে!"

কথাটা কানে এসেছিল, জিগেস করলাম "পদম্‌পৎ কে মামা?"

"সব খবরে তোর দরকার কি?"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মামার গলায় মনুষ্যত্ব ছিল হঠাৎ শেষ কথাটায় আবার আগেকার সেই রুক্ষতা ফুটে উঠল। আমি আহত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। হঠাৎ আবার নরম গলায় বললেন 'তোর বয়স কত স্থরথ?"

"সতেরো।"

উত্তর বোধহয় একটু কাটা হয়েছিল, মামা জবাব দিলেন "যা শুয়ে পড়গে যা। এখন আর কিছু করবার নেই। আমি সব বন্ধ করছি।"

"পুলিশে খবর দেবে না মামা?"

"না! যদি কিছু জানাবার হয় সকালে বলব তোকে। সকালে উপেন আসবে পরামর্শ করতে হবে।"

চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ডাকলাম।

"মামা?

"কি?

"ওই ওই জন্যেই কি তুমি ঘর ছেড়ে বের হওনা?" কাটা হাতটা দেখালাম।

মামা করুণ একটা মুখবিকৃতি করলেন। সেটাই বোধ হয় তাঁর হাসির কাছাকাছি চেষ্টা। হায় মানুষের শরীরের গর্ব্ব!

ক্রমশঃ

আকাশের দেশে

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

[লেখকের 'আকাশের দেশে' কিছুদিন হয় বেরিয়েছে । বইখানা পড়ে সমালোচকেরা মুগ্ধ হয়েছেন । আমরা এই বই থেকে একটা অধ্যায় তুলে দিলুম।]

বামন বললে "তোমার জন্যে আমি কালের চাকা উল্টো করে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, টেবু। নিজের চোখেই দেখতে পাবে সমস্ত ব্যাপার। বর্ত্তমান থেকে আমরা এখুনি অতীতে চলে যাবো-তোমার জন্ম হবার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর আগে।"

টেবুর বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল—না জানি কি দেখবে এবার! ধীরে ধীরে আকাশের চেহারা বদলাতে লাগল; কতগুলো তারা বড় হয়ে উঠল, তাদের জ্যোতি যেন বেড়ে গেল আরও। অন্য কতগুলো গেল ছোট হয়ে আর কতগুলো একেবারে কোথায় যে দূর হয়ে গেল তাদের আর দেখা-ই গেল না। আগে যেখানে যেখানে তারাগুলো যেমন করে জোট বেঁধে ছিল সেগুলো গেল বদ্‌লে। সমস্ত এলোমেলো হয়ে তারা জোট বাঁধল অন্য রকম করে। থেকে থেকে বিশাল আগুনের রাশি হাউই এর পাশ দিয়ে ভেসে ভেসে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।

বামন বললে, বায়োস্কোপ দেখেছ ত? যে জিনিষ ঘটতে সত্যি অনেক দিন লাগে বায়োস্কোপে দু'মিনিটেই তা' দেখিয়ে দেওয়া হয়। দু'বছর, পাঁচ বছরের আগে পরের ঘটনা দু'তিন মিনিট আগে পরে দেখান হয়ে থাকে। তেমনি আমিও তোমাকে তাড়াতাড়ি সব দেখিয়ে দেব তবে উল্টো করে। তার মানে মাটি খুড়ে গাছ গজিয়ে সেই গাছে কুঁড়ি, তারপর ফুল ফোটা আর তারপরে তার ঝরা পাতা না দেখে তুমি দেখবে খানিকটা ঝরা পাতা হয়ে যাবে একটা ফুল, সেই ফুল হবে কুঁড়ি, কুঁড়িটা মিলিয়ে যাবে গাছে আর গাছটা ছোট হতে হতে শেষে মাটির মধ্যে ঢুকে পড়বে। তোমাকে যদি অমনি করি তাহলে এত বড় টেবু বাবু ছোট খোকা হয়ে যাবে, তারপর দোলনায় শুতে হবে, বোতলে দুধ খেতে হবে, কাঁথা গায়ে দিতে হবে। তারপর তোমাকে দেখতেই পাওয়া যাবে না কারণ তোমার তখন জন্মই হয় নি। কিন্তু তোমাকে তা করব না—তাহলে এত মজা দেখবে কে?"

টেবু ডাগর চোখ দুটো তুলে বললে, "আর তুমি?"

বামন হেসে উঠল, "আমি চিরদিন একই রকম। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান আমার কাছে সমান।"

আড় চোখে টেবু বামনকে দেখে নিলে। অদ্ভুত ব্যাপার; তাকে দেখে মনে হয় যেন বহুদিনের বুড়ো আবার একেবারে ছেলে মানুষ।

আকাশের চেহারা এবার এত তাড়াতাড়ি বদলাতে লাগল যে টেবু চিনতেই পারলে না তাকে। তারাগুলোও সব বদলে যেতে লাগল, সূর্য্য অনেক বড় আর অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

টেবু বললে, "সূর্য্যকে অনেক বড় দেখাচ্ছে, না?"

"হ্যাঁ, অনেক বড় আর ঢের বেশী উজ্জ্বল। আমরা এখন লক্ষ লক্ষ বছর অতীতে চলে এসেছি। ঐ দেখ পৃথিবী, বুধ আর শুক্র সূর্য্যের চারিধারে ঘুরছে আর দূরে ঐ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এরা সব। কত উজ্জ্বল দেখেছ? শুধু যে সূর্য্যের আলোয় ওরা এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, তা নয়, এখন ওরা প্রত্যেকে জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড।"

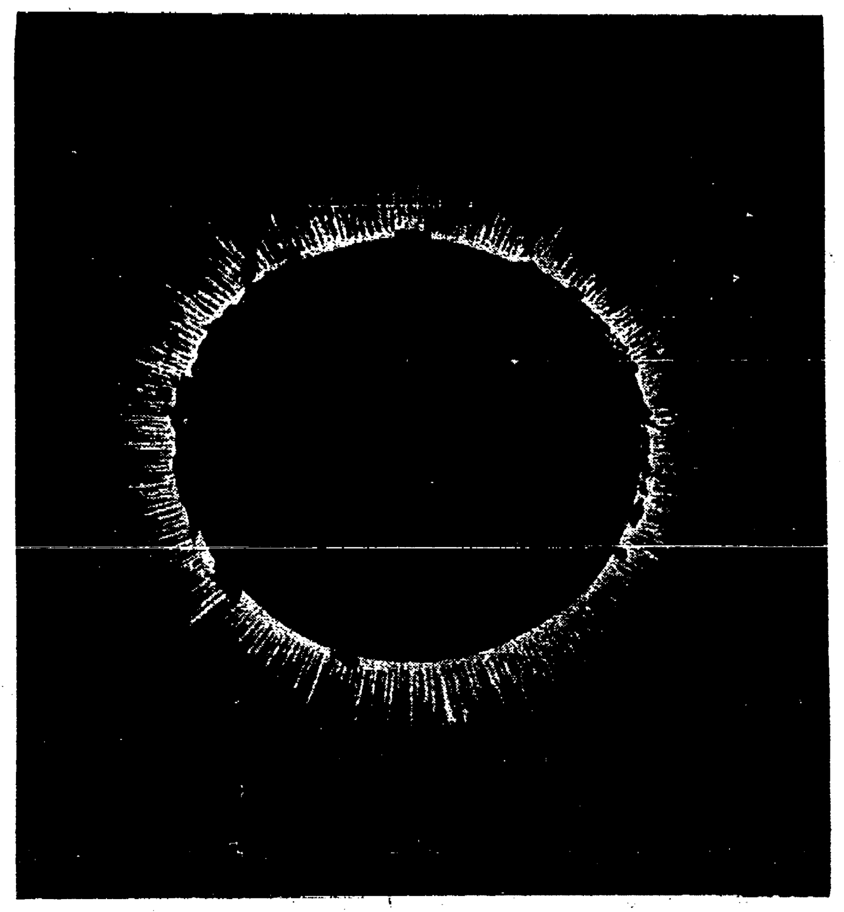

সূর্য্যের মুকুট

টেবু অবাক হয়ে দেখতে লাগল। চোখে পলক পড়তে না পড়তেই যেন গ্রহগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল; প্রত্যেকের ছটা ছুটে যেতে লাগল প্রত্যেকের দিকে। তারপর হঠাৎ কেমন করে কি হয়ে গেল টেবু ধরতেই পারলে না। তাদের ছটাগুলো মিশ খেয়ে হঠাৎ এক হয়ে গেল—গ্রহগুলো আর আলাদা আলাদা থাকল না, সবাই একসঙ্গে মিলে লম্বা একটা সারি বেঁধে ফেললে। মাঝখানটা একটু মোটা, দু'পাশে ছুঁচলো—যেন ঠিক বর্ম্মা চুরুট। এই অদ্ভুত জিনিষটা সূর্য্যের চারিধারে ঘুরতে লাগল ঠিক যেমন করে গ্রহগুলো ঘুরছিল।

টেবুর মনে হল এমন অদ্ভুত আতসবাজী কেউ কোনও দিন দেখে নি। জিগেস্ করলে, "কি হবে এবার?"

"দেখ না—ঐটে সূর্য্যের সঙ্গে মিশে যাবে।"

টেবু দেখলে বহুদূর থেকে একটা উজ্জ্বল তারা ছুটে আসছে সূর্য্যের দিকে। ক্রমে সে আর তারা রইল না, বড় হয়ে উঠল সূর্য্যের মতই। এই সূর্য্যের মত বড় তারাটা চুরুটটার কাছে আসতেই চুরুট যেন বিষম ভয় পেয়ে উল্কাবেগে সূর্য্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের তুবড়ি আর ঝর্ণার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতিকায় তারাটা সূর্য্যের এত কাছে এসে পড়ল যে টেবু ভাবলে এইবার দুটোই চুরমার হয়ে যাবে। ঠিক যখন ভয়ে টেবু চোখ বুঁজল তখনই একটুখানি পাশ কাটিয়ে সেই তারা ছুটে চলে গেল—দেখতে দেখতে ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

ভয়ে টেবুর মুখে কথা ফোটে না। কোনও রকমে শুধু বললে, "ও কি হল?"

বামন বললে, "আমরা যে সমস্ত জিনিষই উল্টো করে দেখছি সে কথা ভুলে যেও না। চুরুটটা সত্যি সূর্য্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, আসলে ঐ তারাটা চুরুটটাকে সূর্য্যের ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল। যাই হোক্ এবার তোমাকে সোজা করে সব দেখাচ্ছি, তা' হলেই বুঝবে।"

বামন সময়ের চাকা এবার সোজা করে ঘুরিয়ে দিতেই—

টেবু দেখলে দূরে একটা তারা ছুটে আসছে।

"দেখ এইবার কি হয়—"

নিঃশ্বাস বন্ধ করে টেবু নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইল। প্রতি মুহূর্ত্তে বড় হতে হতে তারাটা শেষে সূর্য্যের সমান হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ টেবু দেখলে সমস্ত সূর্য্যটা ফুলে ফুলে উঠছে, ফুটন্ত জল যেমন করে ঠিক তেমনি। তারাটা যত এগিয়ে আসতে লাগল সূর্য্য থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুনের শিখা তার দিকে ছুটে যেতে আরম্ভ করে দিলে। যে পথে তারা ছুটেছে সেই পথের শিখাগুলো লাফিয়ে যেন তাকে ছোঁবার চেষ্টা করতে লাগল আর তারাটা এগিয়ে যেতেই সূর্য্যের মধ্যে পড়ে মিলিয়ে গেল।

সূর্য্য ফুটন্ত জলের মত ফুটছে

বামন বললে, "আগুনের ঐ শিখাগুলো হাজার হাজার মাইল উঁচু। ঐ যে প্রকাণ্ড তারা ছুটে আসছে তার টানে সূর্য্যের গা থেকে ঐ শিখাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। চাঁদের টানে তোমাদের পৃথিবীর নদী আর সমুদ্রে জোয়ার হয় জান ত। জোয়ারের সময় জল কেমন ফুলে ওঠে নিশ্চয় দেখেছ। ভাগ্যি চাঁদের টান খুব বেশী নয় তাই হাজার মাইল উঁচু জল ফুলে ওঠে না পৃথিবীতে। সূর্য্যে অবশ্য জল নাই। এই প্রকাণ্ড তারার প্রচণ্ড টানে সূর্য্যের আগুনে এমনি বিষম জোয়ার এসেছে।"

টেবু দেখতে লাগল সূর্য্যের আগুনের জোয়ার উথলে উঠেছে তারার দিকে। তারা আর একটু কাছে আসতেই সূর্য্য থেকে আগুনের প্রকাণ্ড একটা চুড়ো লাফিয়ে উঠল—এই ধরে ধরে বুঝি।

টেবু ভাবলে এইবার তারা আর সূর্য্যে দু'টোই চুরমার হয়ে যাবে একেবারে। কাঁদ কাঁদ স্বরে জিগেস্ করলে, "আগুনের ঐ ছড়াটা যদি তারায় গিয়ে ঠেকে, কি হবে তাহলে?"

"তা' হবে না; দেখ, দেখ—"

টেবু দেখলে সূর্য্যের সমান বিরাট তারা কি যেন ভেবে একটুখানি বেঁকে ছুটে চলল। সূর্য্যের আগুনের চুড়ো আরও উঁচু হয়ে উঠল—আরও উঁচু—যেন ধাওয়া করে যাবে তারাটাকে। ক্রমে তার গোড়াটা সরু হয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে শেষে হঠাৎ একেবারে ভেঙ্গে গেল। একটা আগুনের পাহাড় সূর্য্যের মধ্যে থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ছুটে চলল অতিকায় তারার পিছনে। কিন্তু তাকে ধরতে পারবে কেন? দেখতে দেখতে সে উধাও হয়ে গেল অসংখ্য তারার দেশে। এই আগুনের ছড়া না যেতে পেল তারার কাছে, আর না ফিরে গেল সূর্য্যের মধ্যে। মাঝখানে আকাশপথে বেচারা পড়ে রইল। তার দুটো মুখ ক্রমে ছুঁচলো হয়ে এল, আকার হল বর্ম্মা চুরুটের মত আর সেটা ঘুরতে আরম্ভ করে দিলে সূর্য্যের চারিধারে।

গ্রহ নয়টী

হেসে বামন বললে, "ব্যাপার দেখলে ত? সূর্য্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে চুরুটটাকে টেনে নিতে কিন্তু ও এত তাড়াতাড়ি ঘুরছে যে পারছে না কিছুতে।"

হঠাৎ চুরুটটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল। অবাক্ হয়ে টেবু দেখলে ন'টা আগুনের পিণ্ড সূর্য্যের চারিধারে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বামন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "সূর্য্যের সব চেয়ে কাছে যেটা তার নাম বুধ, তারপর শুক্র, তারপর তোমাদের ঐ পৃথিবীর পর মঙ্গল, তারপর বৃহস্পতি, শেষে শনি। শনির পর ইউরেনাস, নেপচুন

আর ঐ একেবারে শেষে প্লুটো। প্লুটো তোমাদের পৃথিবী থেকে এতদূরে যে খুব বড় দূরবীণ না হলে তাকে দেখাই যায় না।

এতক্ষণে টেবুর মনে আবার সাহস ফিরে এসেছে। হেসে জিগেস্ করলে, "আচ্ছা, প্লুটো ত সূর্য্য থেকে অনেক দূরে; ওখানে নিশ্চয় বিষম ঠাণ্ডা?"

বামন বললে, "না; এখনও গ্রহগুলো জলন্ত আগুনের পিণ্ড হয়ে আছে, তবে দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, উনুন থেকে কয়লার টুকরো বার করে ফেলে দিলে যেমন হয়।"

একটু পরে আবার বামন বললে, "ঐ দেখ, গ্রহদের আগুন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে; এবার আর তাদের নিজের আলো নাই, সূর্য্যের আলোতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।"

টেবু জিগেস্ করলে, "পৃথিবীতে মানুষ জন্মেছে?"

"এখনও জন্মায় নি, তবে আর বিশেষ দেরী নাই। তোমার জন্যে আমি কালের চাকা খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছি। পৃথিবী ক্রমেই ঠাণ্ডা আর কঠিন হয়ে আসছে, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল সূর্য্যের দারুণ তাপের বেশীর ভাগ আটকে রেখে কেমন রক্ষা করছে তাকে। এবার ক্ষুদে ক্ষুদে গাছ, তারপর বিরাট্ বট আর সমুদ্রের মধ্যে জেলি মাছ তৈরী হতে আরম্ভ হবে।"

টেবু পৃথিবীর দিকে চেয়েই রইল! কয়েক মিনিট পরে বামন বললে, "বাস, পৃথিবীতে জীবজন্তু এসে গিয়েছে; মানুষ চলে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এবার। শোন, ভুলো না তাহলে তোমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হল কেমন করে। প্রথমে একটা অতিকায় তারা সূর্য্যের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তার টানে সূর্য্যের আগুনের জোয়ার উঠল; দীর্ঘ এক আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠে সূর্য্যকে ছেড়ে সেই তারার পিছনে ছুটল কিন্তু তাকে ধরা আর হল না। আগুনের ছড়াটা শেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল আর সেই টুকরো-গুলো ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আর জমাট বেঁধে পৃথিবী আর বাকী আটটা গ্রহ হয়ে গেল—কেমন ত?"

টেবুর মুখে কথা ফুটল না। কে জানত, কে ভেবেছিল যে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে এমনি করে সূর্য্যের খানিকটা ভেঙ্গে?

বামন বললে, "বর্ত্তমানে আবার ফিরে এলাম টেবু। ঐ দেখ তোমাদের পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল লেপের মতন ঘিরে আছে তাকে। এই মিশমিশে কালো আকাশে ঝক্ঝকে সাদা আলোয় আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তোমাদের পৃথিবীতে এখন হাজার রঙের ফুল ফুটেছে, অযুত পাখী গান ধরেছে, লক্ষ প্রজাপতি বাহারে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। সকাল বেলা সূর্য্যের সোণার আলো মাঠঘাট ভাসিয়ে দিচ্ছে আর বৈকালে পশ্চিম আকাশে রাঙা আবির ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য্য বিদায় নিতেই অন্ধকার তার আঁচল পেতে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে চরাচরকে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার পথে চল একবার দেখে যাই চাঁদের দেশ।"

টেবুর স্বর গাঢ় হয়ে এল। মা এতক্ষণ কি ভাবছেন কে জানে! কবে টেবু বাড়ী ছেড়ে এসেছে, হয় ত মা কাঁদছেন তার জন্যে। টেবুর প্রাণ কেঁদে উঠল।

তার মন বুঝতে পেরে বামন বললে, "আমি একটুখানি দুষ্টুমী করেছি টেবু। রওনা হবার সময় বলেছিলাম যে বাড়ী ফিরতে তিন মাস লাগবে কিন্তু কালের চাকা খুব দ্রুত ঘুরিয়ে দিয়ে সমস্ত দেখা-শোনা আমি এক রাত্রেই শেষ করে দিয়েছি। কাল ভোর হতে না হতে চাঁদ দেখে তুমি বাড়ী ফিরে যাবে।"

আনন্দে টেবু দিশেহারা হয়ে উঠল। বামনকে জড়িয়ে বললে, "এত ভালো এত সুন্দর তুমি?"

ফুলের সাথে

কে জাগে ফুলের বনে কে জাগে।
যে জাগে চাঁদের সনে সে জাগে।
যে জাগে চাঁদ্নি রাতে
সে খেলে ফুলের সাথে
সে শোনে ঝিঁঝির বাঁশী
আন্‌মনে
সে দেখে ফুলের হাসি
আন্‌মনে।

সেখানে আলোর সাথে জাগবো রে।
ফুলেদের কলির সাথে জাগবো রে।
লিখিবো রঙীন গাঁথা,
ফুলেরা বুঝবে না তা?
তাহলে রাতের শেষে
আন্‌মনে
ফিরিবো ঘুমের দেশে
আন্‌মনে।

হীরক কণ্ঠী

দেখতে সে সুন্দরীই ছিল আর তার জন্ম হওয়া উচিত ছিল কোন ধনীর গৃহে কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ, তাই তার জন্ম হ'ল সামান্য কেরাণীর ঘরে। সে চাইতো উঁচু সমাজে পরিচিত হতে, বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আর চাইতো কোন ধনী বা কোন উচ্চপদস্থ লোকের স্ত্রী হতে। সামান্য ঘরে জন্মে' এর কোনটাই তার অদৃষ্টে ঘটে উঠলো না—যথাকালে তাকে "শিক্ষা বিভাগের" একজন সামান্য কর্ম্মচারীর স্ত্রী হতে হোলো। সে কিন্তু এতে মোটেই সুখী হতে পারেনি। সে চেয়েছিল প্রকাণ্ড বাড়ী, সুন্দর ও বহুমূল্য আসবাবে সাজান ঘর, দাস, দাসী লোকজন ইত্যাদি। স্বামীর সামান্য আয়—তাতে কোনমতেই এ সম্ভব হয়ে উঠতো না। সর্ব্বদাই সে তার জীর্ণ ঘরে বসে এই সবের স্বপ্ন দেখতো। তাদের জীর্ণ দেয়ালটার দিকে চেয়ে তার বহুমূল্য রেশমে মোড়া ধনীর বিলাসকক্ষের কথা মনে পড়তো। তা'র স্বামী যখন সামান্য বাসনে খেতেন, তা'র তখন বহুমূল্য রূপার বাসনের কথা মনে পড়তো। তার বেশীদামের কাপড় চোপড় বা গয়না কিছুই ছিলনা, কিন্তু সে সর্ব্বদাই মনে করতো যে এইসব বেশীদামী জিনিস পরবার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তার একটি ইস্কুলের বন্ধু ছিলো, তাদের অবস্থা ভালো, কিন্তু সে তার বন্ধুর কাছে মোটেই যেতে চাইত না—তাদের বহুমূল্য সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র দেখে তার মন বড়ই খারাপ হয়ে যেতো।

একদিন তার স্বামী কাজ থেকে ফেরবার পর তার হাতে একখানি বড় খাম দিয়ে বল্লেন, "ম্যাটিল্ডা, দেখ তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছি।"

ম্যাটিল্ডা খুব আগ্রহভরে তাড়াতাড়ি খামখানা খুলে দেখলে সেটি একখানি নিমন্ত্রণের চিঠি, শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী বৈকালিক অনুষ্ঠানে তাকে ও তার স্বামীকে তাঁদের গৃহে আহ্বান করেছেন।

স্বামী মিঃ ষ্টুয়ার্ট আশা করেছিলেন যে ম্যাটিল্ডা এতে খুবই খুসী হবে কিন্তু তা না হয়ে ম্যাটিল্ডা বিরক্ত ভাবে টেবিলের উপর খামখানা ফেলে দিয়ে বল্লে, "এ নিয়ে আমি কি করবো বল তো?"

মিঃ ষ্টুয়ার্ট একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "কিন্তু ম্যাটিল্ডা, আমি ভেবেছিলুম এতে তুমি আনন্দিত হবে। তুমি ত কখনো বাইরে বেরোবার সুযোগ পাওনা; আর এ রকম সুযোগ কোথা পাবে? সামান্য কর্ম্মচারীদের ত আর এ রকম নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয় না, আমি এটা অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। তুমি সেখানে দেশের সমস্ত বড় বড় লোককে দেখতে পাবে।"

ম্যাটিল্ডা তার স্বামীর দিকে একটু তীক্ষ্ণ ভাবে চেয়ে বল্লে, "ওরকম জায়গায় আমি কি পরে যাবো তুমি মনে করো?" মিঃ ষ্টুয়ার্ট কিন্তু এ কথাটা আগে ভাবেন নি, তাই তিনি একটু কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন, "কেন? কেন? তুমি যে পোষাকটা থিয়েটারে পরে যাও, আমার কাছে সেটা ত খুব সুন্দর বলে মনে হয়।" মিঃ ষ্টুয়ার্ট তাঁর স্ত্রীর চাপা কান্না দেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে কাছে এসে তার পিঠে হাত রেখে বল্লেন, "কি হয়েছে ম্যাটিল্ডা? তুমি কাঁদছ কেন?" অনেক কষ্টে কান্না সম্বরণ করে ম্যাটিল্ডা ধরা গলায় বল্লে, "কিছুই হয়নি; আমার পোষাক নেই আমি যেতে পারবো না। তোমার কার্ড

তোমার কোন বন্ধুকে দিও।" মিঃ ষ্টুয়ার্টের কষ্ট হ'ল। তিনি বল্লেন, "ম্যাটিল্ডা, কত টাকা হলে একটি সুন্দর পোষাক হতে পারে মনে করো?" কতক্ষণ ভেবে ম্যাটিল্ডা দ্বিধাজড়িত স্বরে বল্লে, "আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে দুশো ফ্রাঁ হলে একটি সুন্দর পোষাক পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।"

মিঃ ষ্টুয়ার্টের মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, পাখী শিকারে যাবার জন্য একটা বন্দুক তাঁর অনেক দিন ধরে কেনবার ইচ্ছা ছিলো, সেজন্য তিনি অনেকদিন ধরে ঠিক দুশো ফ্রাঁ জমিয়েছিলেন। যাইহোক, ম্যাটিল্ডার কথার উত্তরে তিনি বল্লেন, "দুশো ফ্রাঁ হলেই তোমার মনের মত পোষাক হবে ত? আচ্ছা তোমায় আমি দুশো ফ্রাঁই দেবো।"

নিমন্ত্রণের দিন এগিয়ে এলো কিন্তু ম্যাটিল্ডাকে সর্ব্বদাই দুঃখিত ও ক্ষুণ্ণ মনে হোতো। তার পোষাক তৈয়ারী ছিল। মিঃ ষ্টুয়ার্ট একদিন তাকে বল্লেন, "তোমার কি হয়েছে বল ত, তোমাকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ দেখি কেন?"

ম্যাটিল্ডা বল্লে, "আমার একটিও গয়না নেই, আমি কি করে সেখানে যাবো?"

তার স্বামী বল্লেন, "তুমি যদি কতগুলো সুন্দর ফুল পরো তাহলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাবে, এই ঋতুতে ফুল পরলে বেশ মানাবে। আমার মনে হয় দশ ফ্রাঁ দিলেই তুমি কতগুলি সুন্দর গোলাপ পাবে। ম্যাটীল্ডা বল্লে, "ধনী স্ত্রীলোকদের মাঝখানে দরিদ্রের মত যাওয়ার চেয়ে লজ্জাকর আর কিছু নেই।"

হঠাৎ মিঃ ষ্টুয়ার্ট বলে উঠলেন, "আমরা কি বোকা! তোমার বন্ধু মেরীর এত গয়না রয়েছে, তুমি তার কাছ থেকে একটা চেয়ে নিয়ে আসতে পারো; তার সঙ্গে তো তোমার যথেষ্ট আলাপ আছে।"

ম্যাটিল্ডা আনন্দে নেচে উঠে বল্লে, "সত্যিই তো আমার একথা একেবারেই মনে পড়েনি।"

পরের দিন ম্যাটিল্ডা তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তার মুস্কিলের কথা জানালে। মেরী তার গহনার বাক্স ম্যাটিল্ডার সামনে খুলে ধরলে।

ম্যাটিল্ডা অনেক রকমের গয়নাই দেখলে, ব্রেসলেট, মুক্তার কণ্ঠি, পান্নার চুড়ি ইত্যাদি, বহুরকমের গয়না। কোনটাকে নেবে তা ঠিক করতে পারলে না।

অনেকক্ষণ দেখার পর সে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাই তোমার আর কিছু নেই?"

মেরী তার ঘরে গিয়ে আর একটি বাক্স নিয়ে এলো। এ বাক্সেও ম্যাটিল্ডা অনেক রকম গয়না দেখলে, তার মধ্যে একটি হীরের নেকলেস তার খুব পছন্দ হয়ে গেলো। নেকলেসটা গলায় দিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে নিজের চেহারাটা দেখলে—আনন্দে বিহ্বল হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল তার বন্ধু তাকে নেকলেসটা দেবে কি!

কিছুক্ষণ পর সে কম্পিতকণ্ঠে মেরীকে বল্লে, "ভাই শুধু এইটে যদি তুমি আমায় দিতে পার!"

মেরী বল্লে, "নিশ্চয়ই, কেন পারবো না?"

আনন্দের আতিশয্যে ম্যাটিল্ডা মেরীর গলা জড়িয়ে ধরল।

নিমন্ত্রণের দিন এসে পড়লো। ম্যাটিল্ডাকে আজ সত্যই চমৎকার দেখাচ্ছিল। নিমন্ত্রণ সভার সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য তার সৌন্দর্য্যের কাছে ম্লান হয়ে গেলো। আজ সব পুরুষেরাই তাকে লক্ষ্য করেছিলেন,

তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা জানিয়েছিলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর সভ্য কেউ কেউ তাদের সঙ্গে নাচতে চেয়েছিলেন। ম্যাটিল্ডা আজ প্রাণের আবেগে ও স্ফূর্ত্তিতে নাচছিলো, আজ নিজের অসাধারণ সাফল্যের কথা ছাড়া আর কোন কথাই তার মনে হচ্ছিল না।

নাচ শেষ হবার পর প্রায় সকাল চারটার সময় ম্যাটিল্ডা বাড়ী ফেরবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তার স্বামী বহুক্ষণ একটি ছোট অভ্যর্থনা ঘরে নিদ্রাভিভূত ছিলেন। মিঃ ষ্টুয়ার্ট একটি অল্পদামী ও সাধারণ শীতবস্ত্র ম্যাটিল্ডার গায়ের উপর চাপিয়ে দিলেন। ম্যাটিল্ডা অন্য ধনী স্ত্রীলোকদের শীতবস্ত্রের তুলনায় সেটার দারিদ্র্য বেশ ভালই বুঝতে পারলে তাদের দৃষ্টির অন্তরালে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট তার স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বল্লেন, "ম্যাটিল্ডা তুমি দাঁড়াও, আমি একটা গাড়ী ডাকি, বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।"

ম্যাটিল্ডা কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলো। রাস্তায় এসে তারা কোন গাড়ী দেখতে পেলে না। তারা শীতে কাঁপতে কাঁপতে 'সিন' পল্লীর দিকে হাঁটতে সুরু করলে। কিছুক্ষণ পর তারা একটি গাড়ী দেখতে পেলে।

তারা দুজনেই ক্লান্ত ভাবে তাদের ঘরে প্রবেশ করলে, ম্যাটিল্ডার সমস্ত দিনের আনন্দ এখন শেষ হয়েছে; মিঃ ষ্টুয়ার্টের মনে হোলো যে কাল আবার তাঁকে ১০টার মধ্যে আফিসে বেরোতে হবে। ম্যাটিল্ডা শেষবার একবার নিজের চেহারা দেখবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালো। সে চীৎকার করে উঠলো; নেকলেসটি তার গলায় নেই।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি হোলো"

ম্যাটিল্ডা সভয়ে মিঃ ষ্টুয়ার্টের দিকে ফিরে বল্লে, "দেখ মেরীর নেকলেসটা আমার গলায় নেই।"

মিঃ ষ্টুয়ার্ট বিভ্রান্ত চিত্তে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "সে কি? সে কি রকম? ওরকম হওয়া তো সম্ভব নয়!"

দুজনে তাদের পোষাকের মধ্যে ও ঘরের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। মিঃ ষ্টুয়ার্ট জিজ্ঞাসা কল্লেন, "আমরা যখন বাড়ী থেকে বেরোই তখন ওটা তোমার গলায় ছিল কি?" ম্যাটিল্ডা জানালে যে সেটা তার গলায় ছিল।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট বল্লেন, "কিন্তু রাস্তায় যদি পড়ত তাহলে তার শব্দ হতো; নিশ্চয়ই এ গাড়ীতে পড়ে গিয়েছে, তুমি কি গাড়ীর নম্বর নিয়েছিলে?"

ম্যাটিল্ডা বল্লে, সে গাড়ীর নম্বর লিখে রাখে নি। দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর মিঃ ষ্টুয়ার্ট বল্লেন, "আমরা যে রাস্তায় পায়ে হেঁটে এসেছি সেই রাস্তায় আবার যাচ্ছি, দেখি যদি পাওয়া যায়" বলে মিঃ ষ্টুয়ার্ট চলে গেলেন। ম্যাটিল্ডা চেয়ারের উপর নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে পড়লো।

সকাল প্রায় সাতটার সময় মিঃ ষ্টুয়ার্ট ফিরে এলেন, তিনি কিছুই খুঁজে পাননি। মিঃ ষ্টুয়ার্ট

থানায় খবর দিলেন, ভাড়াগাড়ীর আড্ডায় পুরস্কার জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন। জিনিসটা ফিরে পাবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি হোলো না।

ম্যাটিল্ডা ভীতিবিহ্বল চিত্তে বসে রইল, তার নিশ্চিন্তমনে শোবারও ক্ষমতা রইল না। বিকেলের দিকে মিঃ ষ্টুয়ার্ট বাড়ী ফিরলেন, তিনি কিছুই করতে পারেননি।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট ম্যাটিল্ডাকে বল্লেন, "দেখ তুমি তোমার বন্ধুকে লিখে দাও, যে তুমি নেকলেসটির আটকাবার কল ভেঙ্গে ফেলেছো, সেটা সারিয়ে পাঠিয়ে দেবে; এই সময়টুকুর মধ্যে আমরা একটু খুঁজে দেখবার সময় পাবো।" ম্যাটিল্ডা সেইকথাই তার বন্ধুকে লিখে দিলে।

এক সপ্তাহ পরেও যখন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তখন তাঁরা আশা ছেড়ে দিলেন। মিঃ ষ্টুয়ার্টের যেন এ কয়দিনে পাঁচ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছিল, তিনি বল্লেন, "যেমন করেই হোক আমাদের নেকলেসটি ফিরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে ম্যাটিল্ডা"। তার পরের দিন তারা নেকলেসের খালি বাক্সটা নিয়ে বাক্সের গায়ে যে জহুরীর নাম লেখা ছিল, সেই জহুরীর কাছে গেল।

জহুরী তার খাতা দেখে বল্লে, "ম্যাডাম্ নেকলেস আমি দিই নি, আমি কেবলমাত্র বাক্সটা দিয়েছিলাম।" তারপর তারা একে একে অনেক জহুরীর কাছেই গেলো, কিন্তু কোথাও ঠিক সেইরকম পাওয়া গেল না। অবশেষে এক বড় জহুরীর দোকানে ঠিক সেইরকম একটি নেকলেস তারা দেখলে। দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। তারা জহুরীকে অনুরোধ করলে যেন সে তিন দিন নেকলেসটি বিক্রী না করে।

মিঃ ষ্টুয়ার্টের পিতৃদত্ত আঠার হাজার ফ্রাঁ ছিল। বাকী বাইশ হাজার তিনি ধার করতে সুরু করলেন। সহরের প্রায় সমস্ত মহাজনের কাছ থেকে তিনি ধার করলেন। একজনের কাছে দুহাজার ফ্রাঁ, আর একজনের কাছে একহাজার ফ্রাঁ এবং অপর আর একজনের কাছে পাঁচশত ফ্রাঁ। মিঃ ষ্টুয়ার্ট পাগলের মত ধার করতে আরম্ভ করলেন। মিঃ ষ্টুয়ার্ট কি কচ্ছেন তাঁর কিছুই খেয়াল ছিল না। এই টাকা শোধ দিতে পারবেন কিনা তা না ভেবেই তিনি তাঁর নাম সই করে দিলেন। বহু পরিশ্রমের পর মিঃ ষ্টুয়ার্ট জহুরীর দোকানে এসে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ টেবিলের উপর রাখলেন।

ম্যাটিল্ডা নেকলেসটি মেরীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এলো।

মেরী বেশী আগ্রহ না দেখিয়েই বল্লে, "তোমার এটা আগেই আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, আমারও তো দরকার হতে পারতো।"

তারপর এদের সত্যই কঠিন জীবন আরম্ভ হল। কোথায় গেল সাজসজ্জা আর কোথায় বা রইল সৌখিনত্ব। ম্যাটিল্ডা এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে বুক বেঁধে লড়াই করলে। এই ভীষণ ধার তাদের শোধ করতেই হবে। তারা তাদের বাসা বদল করে এক খোলার চালের নীচে রইল, বাড়ীর দাসীর জবাব হয়ে গেল।

সংসারের যাবতীয় শক্ত কাজ ম্যাটিল্ডার উপর এসে পড়লো। ম্যাটিল্ডা নিজ হাতেই

বাসন ধোয়া আরম্ভ করলে। তার নখের গোলাপী আভা আর রইল না। রান্নাঘরের ময়লা ন্যাকরা প্রভৃতি সে নিজেই ধুয়ে দিতে লাগলো। সকাল বেলা রোজই সে নিজেই জল আনতো—অনভ্যাসের দরুণ তাকে রাস্তায় তিন চার বার দম নেবার জন্য দাঁড়াতে হোতো। অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরে সে বাজারে যেতো—মাংসওয়ালা, ফলওয়ালা ও তরীতরকারীর দোকানে শেষ পর্য্যন্ত দরদস্তুর ক'রে তবে সে জিনিষ কিনতো।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট সন্ধ্যা বেলা আফিস থেকে ফিরেই আবার এক সওদাগরের আফিসে বই গুছোবার কাজ করতেন, রাত্রে কাগজে লিখে আরো কিছু রোজগার করতেন।

মুক্তির আনন্দে সুখী

স্বামী স্ত্রী দুজনকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হোতো। এই জীবন তাদের দশ বৎসর ধরে চল্‌লো।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে আজ তারা ঋণ-মুক্ত। মুক্তির আনন্দে তারা সত্যই খুব সুখী। তারা তাদের ঋণ সমস্তই পরিশোধ করে দিয়েছে।

ম্যাটিল্ডা এই দীর্ঘ দশ বৎসর পর অনেকটা বুড়ী হয়ে গেছে, আজ আর তার সেই আগের সৌন্দর্য্য নেই, সে কমনীয়তাও নেই, সে এখন আটপৌরে গৃহিণী হয়ে উঠেছে, আগের মত তার আর আজ বেশভূষার পারিপাট্যও নেই। সে এখন খুব উঁচু গলায় কথা বলে, বড় বড় বালতি নিয়ে নিজেই ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে। হঠাৎ একদিন অবসর সময়ে তার সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়তো, যেখানে কতলোক তার খোসামোদ করেছিল, আর তাকে সেদিন কি চমৎকারই না দেখাচ্ছিল!

আর আজ! জীবন কী বৈচিত্র্যময়! সেদিন যদি না নেকলেসটা হারিয়ে যেতো, কে বলতে পারে কি হোতো! কি হতে পারতো!

একদিন বৈকালে মন হালকা করবার জন্য ম্যাটিল্ডা বহুদিন পর সাঁ এলিজের মনোরম রাস্তায় বেড়াতে গেল। বেড়াতে বেড়াতে সে হঠাৎ একজন স্ত্রীলোককে একটি শিশুর হাত ধরে যেতে দেখলে, তাকে ঠিক মেরীর মতই মনে হোলো, একটু কাছে গিয়ে দেখলে, ঠিক, মেরীই তো, সে আগেকার মতই সুন্দরী সুশ্রী রয়েছে। মেরীর সঙ্গে কথা বলবে কি না, ম্যাটিল্ডার মনে দ্বিধা হচ্ছিল, তারপর সে মনে কল্লে কেনই বা বলবে না, আজ সে মেরীকে সব কথাই খুলে বলবে।

কাছে গিয়ে মেরীকে সম্বোধন করে বল্লে, "মেরী কেমন আছ?"

মেরী ম্যাটিল্ডাকে চিনতে পারলে না। একজন সাধারণ স্ত্রীলোককে এরকম পরিচিতভাবে কথা বলতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বল্লে, "কিন্তু ম্যাডাম, আপনি হয়তো ভুল করেছেন, আমি তো ঠিক—"

"না আমার ভুল হয় নি। আমি ম্যাটিল্ডা।"

মেরী বিস্ময়সূচক একটা চীৎকার করে বল্লে, "ও ম্যাটিল্ডা, তুমি কি অসম্ভব রকম বদলে গেছো!"

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার দিনগুলো ভালভাবে কাটে নি; বেশ খারাপ ভাবেই কেটেছে—এবং তা তোমার জন্যই—"

"আমার জন্য? কি রকম?"

"শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে প'রে নাচবার জন্য তোমার কাছ থেকে যে হীরের নেকলেসটা চেয়ে নিয়েছিলাম, সে কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?"

"হ্যাঁ, খুব মনে আছে।"

"আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

"সে কি রকম? তুমি তো আমাকে সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

ম্যাটিল্ডা বল্লে,—"হ্যাঁ আমি তোমাকে ঠিক সেইরকম দেখতে আর একটি নেকলেস ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, এবং তার দামই শোধ দিতে আমাদের দশ বৎসর লেগেছে। আমাদের মত লোকের পক্ষে যে সেটা খুব সহজ কথা নয় তা তুমি বেশ বুঝতে পারো। কিন্তু আমি সব মিটিয়ে দিয়েছি, আর আমার কোন ক্ষোভ নেই।"

মেরী বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বল্লে, "তুমি বোলছো যে আমার নেকলেসের বদলে তুমি একটি হীরের নেকলেস কিনে আমাকে দিয়েছিলে?"

ম্যাটিল্ডা বল্লে "হ্যাঁ, তুমি তখন বুঝতে পারোনি, দুটোই ঠিক একরকম দেখতে।"

মেরীর মুখ গর্ব্বে ও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মেরী ম্যাটিল্ডার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্লে. "হায় ম্যাটিল্ডা! আমার ছিল নকল হীরার কণ্ঠী, তার দাম পাঁচশো ফ্রাঁর বেশী নয়।"

মোঁপাসার একটি গল্পের তর্জ্জমা: তর্জ্জমাকার লিখে পাঠান নি

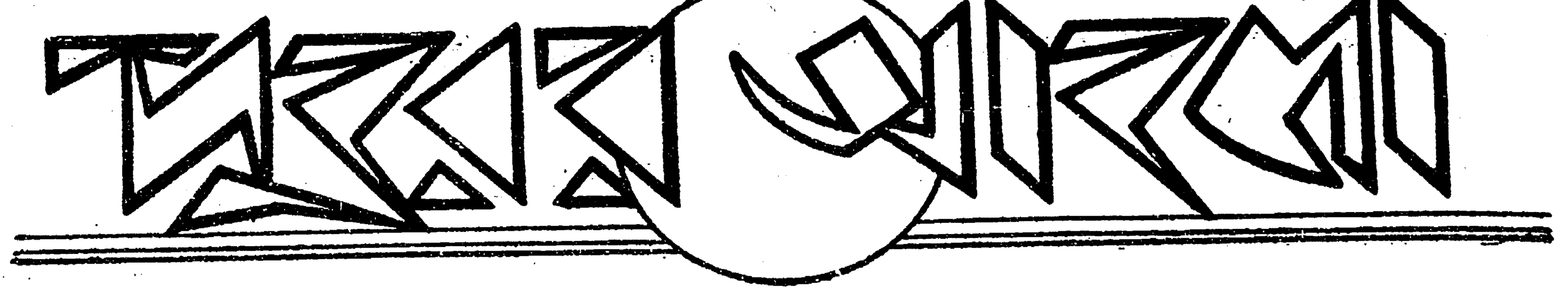

"জাপানী সেরুরয়েড্"*

শ্রীসুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী

আকর্ণ মুখ বিস্তৃত করে ডান হাতখানা ডান কানে চেপে ধরে ধর্ম্মতলায় সকাল সাতটা থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত মনিহারী দোকানের হুকারদের ঃ দো দো আনা—দো আনা—জাপান বালা দো আনা—ইত্যাদি অখণ্ড চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। পথিকেরা চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়। তাদের সাথে ছোট ছেলেমেয়েরা দোকানে সাজিয়ে রাখা 'ডলপুতুল' দেখিয়ে বলে—'বাবা ওটা আমায় দাও না! ঐ দেখ কি রকম মজার খেলনা—দম খেয়ে কেমন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।' দোকানী সাজিয়ে রেখেছে নানা রকমের পুতুল খেলনা, চিনা মাটীর কাপ, ডিস—রংদার, বাহারে। খদ্দেরের ভীড় লেগে আছে মাছির মত এদের দোকানে। জন্মদিনে এই সব খেলনা উপহার পেলে তোমরা নিশ্চয় খুসী হও। এগুলো সব সেলুলয়েডের তৈরী। তোমরা হয়ত আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছ—সে আবার কি? কি করে তৈরী হয়? কোথায় পাওয়া যায়? ইত্যাদি প্রশ্নগুলো ও তোমাদের ঠোঁটের কাছে ভীড় জমিয়েছে। কেউ কেউ আবার বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছ—'কেন আমরা ত জানি ঃ আলুর তৈরী।' আসলে কিন্তু তা নয়। সেলুলয়েড হচ্ছে ঃ তুলো, কর্পূর, স্পিরিট (alcohol), আর নাইট্রিক য়্যাসিডের সংমিশ্রণে এক প্রকার পদার্থ। শিল্পের দিক থেকে এবং আয়ের দিক থেকে সেলুলয়েড জাতির উন্নতির একটা প্রধান উপায়। তোমরা হয়ত জাননা যে এক জাপান গেল বছরে সেলুলয়েডের খেলনা বিক্রী করে আমাদের দেশ থেকে দেড় কোটি টাকা নিয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় তোমাদের ইচ্ছে করছে খেলনাগুলো কি করে কারখানায় তৈরী হয় দেখবার জন্যে। তা'হলে এস আমার সঙ্গে তোকিওতে। কেননা যত বড় বড় সেলুলয়েড কারখানা জাপানে আছে তার অধিকাংশই হচ্ছে এই সহরের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে স্থমিদা নদীর ধার দিয়ে। ওসাকা আর নাগাসাকিতে অনেকগুলি কারখানা আছে বটে তবে সেখানে সস্তা জিনিস মানে সাবানের কেস, চিরুণী, কাঁটা প্রভৃতি তৈরী হয়। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত জাপানে একটা গান প্রচলিত ছিল ঃ

*জাপানীরা 'ল' উচ্চারণ করতে পারে না—বলে 'র'। কাজেই সেলুলয়েড হবে সেরুরয়েড

'America born with blue eyes' কারণ আমেরিকার খেলনাই তখন পৃথিবীর বাজার ছেয়ে ছিল। জাপানে গানটী এখন বদলে গিয়ে হয়েছে ঃ 'The doll Tokyo born with black eyes'—আচ্ছা যাক্।

ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে আমরা কারখানায় ঢুকব। তিনি একটী একটী করে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঃ

সেলুলয়েড প্রথমে পাতলা, কাল রংয়ের হয়। তখন এই তরল জিনিষটীর কাছে মুখ নিয়ে গেলে স্পিরিট আর কর্পূরের অতি উগ্র গন্ধে চোখ নাক জ্বালা করে। সেলুলয়েড গরম পেলে গলে আর ঠাণ্ডায় জমে যায়। সেলুলয়েড অতি শীগ্‌গির আগুনে পুড়ে যায় সেইজন্যে কারখানায় চারিদিকে লাল হরপে ইতঃস্তত লেখা থাকে 'ধূমপান নিষেধ'। অমান্য করলে তার শাস্তি ভয়ানক।

এর পরে এস অন্য একটী ঘরে ঃ এখানে সেলুলয়েডের তরল অবস্থায় ইচ্ছেমত রং মেশান হয়। তারপর তাকে ছেঁকে নিয়ে ময়লা বার করে দিয়ে একটী রোলারের ভেতরে চালিয়ে ঘন করে নিতে হয়। এই সময় রোলারের ঘর্ঘর শব্দে মাথা ধরে যায়। তারপর সেই ঘন জিনিষটী অপর একটী রোলারের ভেতরে চালিয়ে ১'৫ × ১ মিটার মাপের সীট্ বা পাতে পরিণত করা হয়। সেই পাতগুলো ৭ দিন পর্য্যন্ত আবার ঘরের ভেতরে শুকোবার জন্যে রাখতে হবে। এরপরে এই রকম কয়েকটী পাত একটার পিঠে আরেকটা চাপিয়ে ৪০০০ থেকে ৫০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ভারি ওজনের তলায় রেখে একটী মোটা পাতে পরিণত করা হয়। তার থেকে আবার খুব পাতলা পাতলা সীট কেটে নেওয়া হয় মেসিনে। এই সময় ষ্টীম পাইপ থেকে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প ছাড়া হয় এই পাতগুলোকে নরম করবার জন্যে। প্রত্যেক কাজের জন্য আছে 'অটোমেটিক মেশিন'। এইবার ছাঁচে ফেলে ইচ্ছেমত জিনিষ প্রস্তুত হবে।

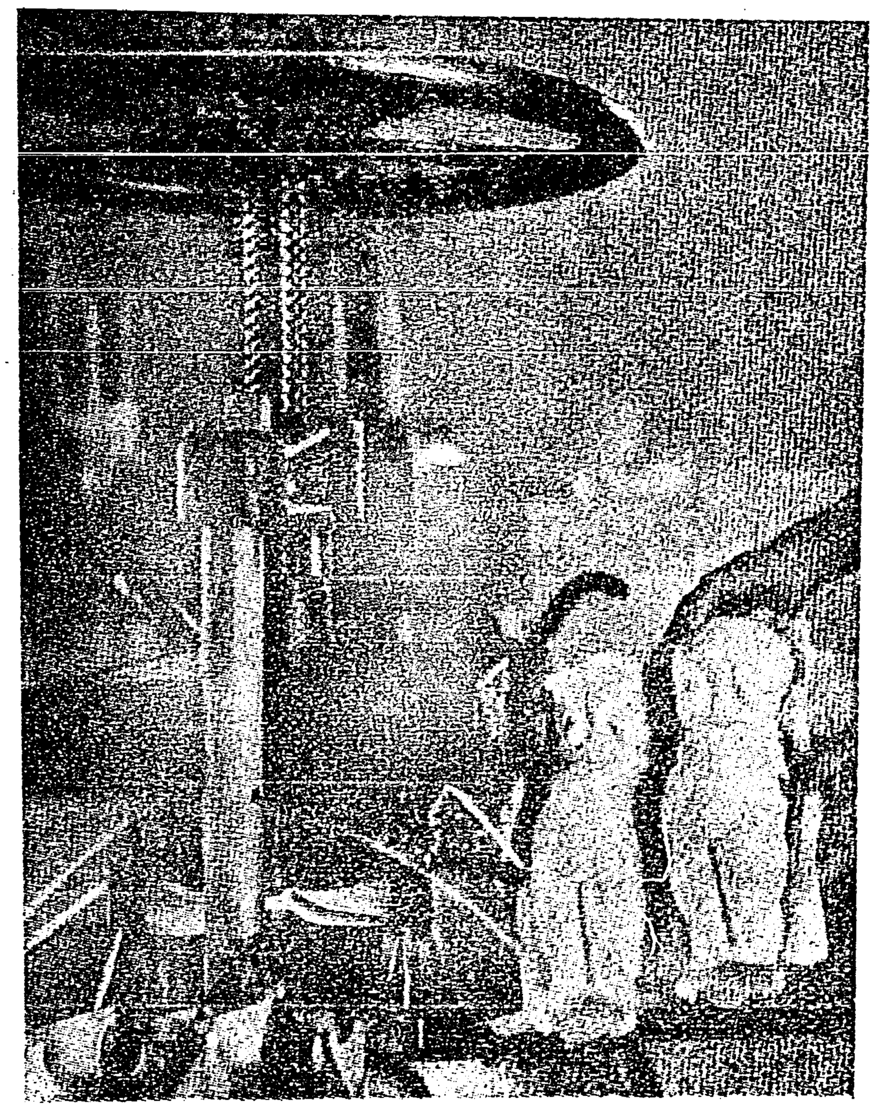

যমজ পুতুল

কারখানাকে একটা ছোট খাট জগৎ বললেও চলে। প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত এখানে দামী।

মেশিনের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, পাইপ হতে হুস্ হুস্ শব্দে বাষ্প বের হওয়া, চারদিকের চঞ্চলতা এক সঙ্গে মিশে মানুষের মনকে কাব্যময় জগৎ থেকে একেবারে পৃথিবীর ধোঁয়া ও কোলাহলের মাঝে টেনে নিয়ে আসে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা গম্ভীর মুখে তদারক করে বেড়াচ্ছেন। মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে চলেছে ঃ অবশ্য হাল্কা কাজগুলো, যেমন তুলি দিয়ে চোখের মণি, মুখ, চুল ইত্যাদি আঁকা—মেয়েদের জন্য। সকলেই হাসি মুখে কাজ করছে। খুব কম বয়েস হতে এরা কারখানায় কাজে অভ্যস্থ হয়—অবশ্য ১৪ বছরের আগে নয়। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কাজ।

এইবার এস প্যাকিং ঘরে ঃ খেলনাগুলো পালিশ এবং ফিনিস্ হবার পর এখানে এসে জমা হচ্ছে। একটী পিসবোর্ডের বাক্সে ১ ডজন ভর্ত্তি করে লেবেল এঁটে-দেওয়া হয়। প্রত্যেকটী খেলনা, বাক্স আর লেবেলে স্পষ্ট করে Made in Japan ছাপা থাকে কেননা তা' না হলে 'কাষ্টম্স্' হতে ছাড়ান পাবে না বিদেশী বন্দরে। এইবার এই বাক্সগুলি পরীক্ষার জন্য Tokyo Export Celluloid Toys Manufacturers' Association এ পাঠান হয়। সেখানে খারাপ এবং ভাঙ্গাগুলো বাদ দিয়ে পৃথিবীর বাজারে ছাড়া হয় বিক্রীর জন্য। ওসাকার বড় সেলুলয়েড সীট নির্ম্মাতা হচ্ছে ঃ

U. Ohta & Co. Manufacturers.
22, Shiomachi Nichome, Minami-Ku.
P. O. Box No 10 Senba. Osaka, Japan.

ম্যানেজারকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে চল আমরা দেশে ফিরে যাই।

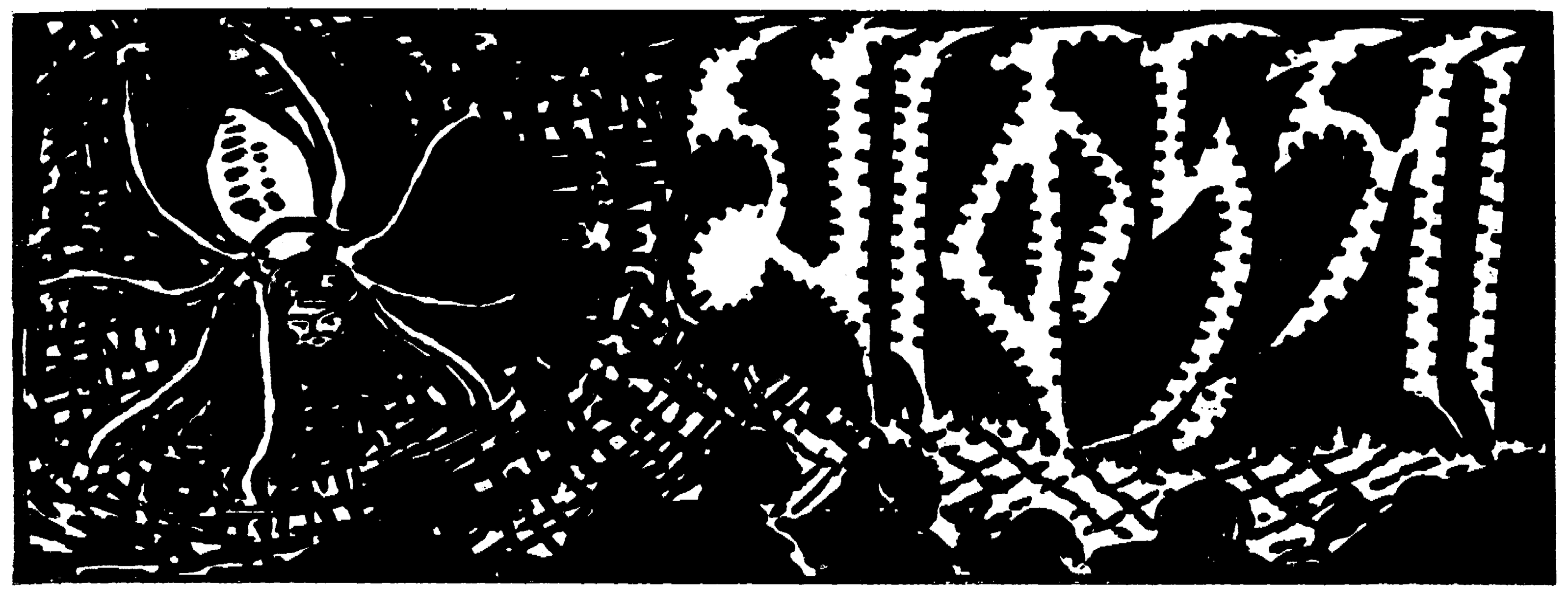

রজত সেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গণেশ বাবু রয়েছে—এ তারা জানে। তাদের তরুণ জীবনে এই একটি লোকের আবির্ভাব তাদের মনে জাগিয়েছে নূতন এক জগতের স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেই রাত্রিটা কেটে গেল।

সকালের সোনালি রোদের সঙ্গে ঝলমল করে উঠলো গণেশ বাবুর স্মৃতি। আজ আবার যথারীতি গণেশ বাবুর দেখা তারা পাবে ত? কিছুই তারা ঐ লোকটিকে দিতে পারেনি, সেরেফ কিসূছু না, তবু ভদ্রলোক তাদের জন্যে কি না করেছেন। কে তারা? রাস্তার লক্ষ লক্ষ ছেলের মধ্যে কয়েকজন মাত্র! তবু গণেশ বাবু তাদের জন্যে কত ক্ষতি স্বীকারই না করেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির জন্যে গণেশ বাবুর কত ভাবনা। সকালে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে জহর ভাবছিলো, আর ভাবছিলো। গণেশ বাবুর উপর যত কিছু বিরক্তি এবং বিতৃষ্ণা তার জন্মেছিলো সবই একে একে শিথিল হয়ে গেল। কোথায় কোন অদৃশ্য উপায়ে গণেশ বাবুর সঙ্গে তাদের একটা আন্তরিক যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে! সেটা তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না, শুধু পারে অনুভব করতে।

আজ আবার রবিবার, স্কুল বন্ধ! সমস্ত দুপুরটাই বলতে গেলে হাতের মুঠোয়! কোন রকমে গরম চা-টা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে জহর রাস্তায় এলো। রবিবারে তার মাষ্টার আসে না, পড়া থেকেও তার ছুটি!

জহর ভাবেনি; দেখলো গলিটার আড়ালে বঙ্কিম আর শিবু তারই জন্যে অপেক্ষা করছে!

'শোন!' শিবু বললে, 'ভারি এক মজার স্বপ্ন দেখেছি!'

'শুনছি,' জহর উত্তর দিলে, 'গণেশ বাবুর ঘরটা দেখেছিস?'

'দেখেছি, আসেনি এখনও।'

'কি তোর স্বপ্ন রে? সেই পরীক্ষায় ফেল তো? আর বলিসনি বাবু, শুনে শুনে হায়রান হয়ে গেছি, না রে বঙ্কু?'

'না, না, পরীক্ষা নয়,' শিবু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আগে শোনই না ব্যাপারটা কি, আগে থেকেই হাঁফাচ্ছো কেন? দেখছি পুলিশে ধরেছে আমাদের, আর গণেশ বাবুই ছদ্মবেশী পুলিশ।'

'কেন?'

'রাত্রে বাবার বালিসের তলা থেকে নীচের ঘরের এবং সিন্ধুকের চাবি চুরি করে তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছি, গণেশ বাবু দেখি কি অন্ধকারে টর্চ্চ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আর পাহারা দিচ্ছেন! প্রায় সব কটা সিন্ধুকই ভেঙ্গে ফেলেছি, এক বস্তা টাকা এমন সময় দেখি কি গণেশ বাবুই পকেট থেকে হাতকড়ি বার করে পরিয়ে দিচ্ছেন, আর বলছেন, কেমন? করবে আর চুরী? জানো না চুরী করা অন্যায়,- চুরী করলে জেলে যেতে হয়? সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

এমন আজগুবি স্বপ্ন-কাহিনী শুনে জহর আর বঙ্কিম খুব এক চোট হেসে নিলে।

বঙ্কু বললে, 'রাত্রে ডিম খেয়েছিলি বুঝি? পেট গরম হয়েছিলো।'

'না রে! ঘুগ্নি!' জহর বললে, 'দেখি বিকেলে খুব ঘুগ্নি খাচ্ছে, কি ছোঁড়ারে বাবা! এক ঘন্টা আগে অত ঠেসে আবার তুই পারলি খেতে?'

'বা রে! এক পয়সার ঘুগ্নি আর কত?'

পেছনে শোনা গেল জুতোর শব্দ! গণেশ আসছে, 'Good morning!' হেসে সে বললে। সকালেই পরিস্কার মাথা আঁচড়ানো, জামা কাপড় থেকে উঠছে মিষ্টি এসেন্সের গন্ধ! গোঁপগুলো পাকিয়ে সূঁচলো করে দিয়েছে! পাঞ্জাবীর এক 'সাইডে' সোনার বোতাম।

'Good morning!' জহর বললে, 'আমরা ভাবলাম আজ বুঝি আপনার আর দেখা পাওয়া গেল না।'

'কেন বল তো?' গণেশ পকেট থেকে তার ঘরের চাবি বার করলে; 'চল, ঘরে গিয়ে বসা যাক, বেশ গল্প করা যাবে! আজ ত রোববার!'

তালা খুলে গণেশ তার ঘরে ঢুকলো। মাটির একটা চাপা, সোঁদা গন্ধ। 'একখানা সতরঞ্চি কিনতে হবে, কি বল? তোমাদের বসে গল্প করবার বড্ড অসুবিধে হয়, না?'

'আপনি রাত্রে কোথায় থাকেন?' বঙ্কিম হঠাৎ গণেশকে প্রশ্ন করলে।

গণেশ যেন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বললে, 'রাত্রে? কেন? ও, আমাদের অনাথ আশ্রমের কথা তোমাদের বলিনি বুঝি? সেখানে থাকে অনেকগুলো ছেলে—যাদের বাপ মা, ভাই বোন সংসারে কেউই নেই, যারা আমাদের আশ্রমে আসবার আগে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কত জায়গায় আশ্রয়ের জন্যে গেছে আর তাড়া খেয়েছে তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে? কেউ কেউ আবার অন্য কোন উপায় না দেখে ক্ষিধের জ্বালায় ভিক্ষে করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলো, আর কেউ বা চুরী! আমরাই সে সমস্ত হতভাগ্য ছেলেদের আমাদের আশ্রমে নিয়ে এসে থাকবার এবং খাবার

ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কেউ স্কুলে পড়ছে, কেউ দোকান দিয়েছে, কেউ বা করে চাক্‌রী! যতদিন না কোন সংস্থান হয় ততদিন আমরা খেতে পড়তে দিই! আমিই এই অনাথ আশ্রমের সেক্রেটারী কিনা! আমাকেই সব দেখা শুনো করতে হয়। প্রায় রাত্রেই আমি সেখানে থাকি, খাওয়া দাওয়া করি।'

লোকটার না জানি কত গুণ! জহর ভাবছিলো; কি অন্যায়ই না সে আগে এমন লোকটার উপর করেছিলো। বাইরে থেকে কি লোক চেনা যায়? শ্রদ্ধায় এবং সম্ভ্রমে মন তাদের পূর্ণ হয়ে গেল।

'অনাথ আশ্রমটা কোথায়?' জহর জিজ্ঞেস করলে।

'সিয়ালদার কাছে, যাবে একদিন দেখতে? দেখবে ওরা নিজেরাই কত কাজ করে, কখনও ওরা বসে থাকে না, সময় নষ্ট করে না। যারা স্কুলে পড়ে না বা অন্য কোন চাকরীরও সুবিধে হয়নি—তাদের মধ্যে দেখবে কেউ ঘরে বসে চরকা কাটছে, কেউ বা বুনছে তাঁত, কেউ সেলাই-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত! প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রোজগার করে!

ওদের একেবারে তাক লেগে গেল, এত সব ব্যাপারও হয়? লোকটা মহৎ ব্যক্তি, আর কোন সন্দেহ নেই।

'মুস্কিল হচ্ছে কি জানো?' গণেশ আবার বললে, 'আমার একটা বিরাট মতলব মাথায় আছে, বাঙ্গালীরা নাকি ব্যবসা করতে পারে না, আমি একবার সবাইকে দেবো দেখিয়ে—কেমন করে বড়লোক হতে হয়। কিন্তু আমার অনাথ আশ্রমে স-ব একেবারে গো-মুখ্যু! একটু যদি লেখা পড়া জানতো! লেখাপড়া শেখবার সময় কখন বল? দু'বেলা ভাত খাবার পয়সা জোটে না তার আবার লেখাপড়া! ও-সব ইডিয়টকে দিয়ে কোন কাজ হয়? কিস্‌ছু না। ব্যবসা পথে বসবে, আমি চাচ্ছিলাম তোমাদের মত কয়েকজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে—যাদের পৃথিবীতে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা আছে। আমি জানি তোমরা আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছো, তোমাদের মত এমন বুদ্ধিমান, ভালো ছেলে আমি পাবো কোথায়?'

'আসুন না! আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই!' বঙ্কিম সোৎসাহে বললে। তার অবশ্য কোন ধারণাই নেই গণেশকে সে কি ধরণের কাজ আরম্ভ করতে বলছে! শুধু তার ধারণা হচ্ছে—প্রকাণ্ড অট্টালিকার মত বাড়ী, চারপাশে অসংখ্য অদ্ভুত আর আশ্চর্য্য সব জিনিষপত্র, মাঝখানে বসে আছে তারা, সে, শিবু আর জহর। লোকে টাকা দিচ্ছে আর জিনিষ কিনছে, সামনে কাঠের ক্যাস বাক্স ভরতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী!

গণেশ ভাঙ্গা একটা টুলের ওপর বসেছে, প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দেশলাই-এর পিঠে আস্তে আস্তে ঠুকছে। তার সামনেই মাটিতে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসে তারা তিনজন।

'কাজ একটা আরম্ভ করতে আমার যে কি ভীষণ ইচ্ছে,' গণেশ সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'সে আর তোমাদের কি বলবো! কিন্তু টাকা কোথায় ভাই? আমার যা আছে সব আমি তোমাদের হাতে দিতে রাজী, এসো না একটা দোকান দেয়া যাক। অথচ বলতে গেলে টাকার কি তোমাদের অভাব? বঙ্কিমের কথা ছেড়েই দিলাম, জহর আর শিবুর বাবার টাকায় তো স্যাওলা ধরেছে! অথচ কিছুই যে লাভ টাকা জমিয়ে কিছুই তো বুঝতে পারি না। টাকা পড়ে থাকলেই তো লোসকান, টাকা খাটাতে

হয় দশ টাকা খাটিয়ে বিশ টাকা লাভ করলাম তবেই না মগজ। এক শ' টাকা খাটিয়ে করবো পাঁচ শ' টাকা তবেই না ব্যবসা!

অথচ মজা দেখ টাকা সবাই জমিয়েই চলেছে। একদিন ত তুমি বাপু মরেই যাবে, তখন কোথায় থাকবে তোমার টাকা আর কোথায় যাবে তোমার পয়সা। হয়তো দেখবে এক রাত্রে সব ডাকাতে লুঠে নিয়ে গেছে, আর যাবেই ত! কোলকাতায় চোর ডাকাতের সংখ্যা কি ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে কি আর বলবো! ওদেরই বা দোষ দিই কেমন করে বল? ওরা ত আর পয়সা ওড়াবার জন্যে ডাকাতি করে না, নেহাৎই পেটের দায়ে! ওদেরও ত চারটি খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে, ঘরে ছেলে মেয়ে তাদেরও ত আছে! কয়েকটা লোক সংসারে টাকার পাহাড় গড়ে তুলবে আর হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরুক আর কি! আর—আমার বক্তব্য হচ্ছে তা নয়, আমি বলতে চাই চুরি করেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক টাকাগুলো কাজে লাগুক, একটা দোকান গড়ে উঠুক বা আরম্ভ হোক কোন রকম ব্যবসা! সৎকাজে টাকা ব্যয় হয় এটা কে না চায়? তোমরা চাও না? তোমরা কিছু কর আর না কর দোকান একটা আমি আরম্ভ করবোই।'

'আমি টাকা দিতে রাজি আছি,' জহর হঠাৎ বললে; তার বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে, চোখে একটা অদ্ভুত দীপ্তি!

গণেশ যেন তার কথাটা ভ্রূক্ষেপই করলে না, নেহাৎই হাল্কা গলায় বললে, 'তুমি আবার কোত্থেকে টাকা দেবে?' জহরের উত্তেজনা একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তাই ত! সে কোত্থেকে টাকা দেবে? সে জানে অনেক টাকার সন্ধান, কোথায় থাকে তার বাবার টাকা, আর ট্রাঙ্কে কোথায় ক'খানা কাপড়ের ভাঁজে থাকে প্রকাণ্ড লোহার সিন্ধুকের চাবি! কিন্তু—জহরের হাতের আঙ্গুলগুলো কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠাণ্ডা, নিস্প্রাণ হয়ে এলো, তার বুকের মধ্যে তখন প্রবল ঝড়, তার কপালে ফুটে উঠছে রেখার পর রেখা!

ক্রমশঃ

বিশ্বম্ভর পাঁড়ে

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী যাবে দরকারী কোন্ কাজে,
পূজার সময় ঠেলাঠেলির মাঝে;
তখন ট্রেনে চড়া মানে—
যারা চড়ে তারাই জানে।
যে-প্যাসেঞ্জার সকাল বেলা ছাড়ে
উঠ্‌লো তাতেই বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

মালপত্তর বেশ গুছিয়ে নিয়ে,
বাক্সটাকে বাঙ্কে তুলে দিয়ে,
কম্বলটা বিছিয়ে নিয়ে,
খৈনী খানিক মুখে দিয়ে,
প'ড়লো শুয়ে, জায়গা পাছে কাড়ে।
চালাক খুবই—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

রাত আটটায় মোগলসরাই যাবে,
সেইখানেতেই খাবার কিছু খাবে।
তার পরেতে গাড়ী ধরে,
এম্‌নি ধারা বিছ্‌না ক'রে
ঘুম দিয়ে রাত কাটাবে নিঃসাড়ে।
ঠিক ক'রলো—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

ছাড়লো গাড়ী বাজ্‌লো যখন বাঁশী;
ফুটলো মুখে নিশ্চয়তার হাসি।
তন্দ্রার ভাণ গেল ছুটে,
তড়াক্ ক'রে ব'স্‌লো উঠে,
আনন্দে তার গান চাপ্‌লো ঘাড়ে।
ছাড়লো গলা—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

সেদিন যে কী গ্রহের ছিল ফের !
পথের মাঝেই দেরী ক'র্লে চের ।
মোগলসরায়েতে নেমে
শুনে, সে তো উঠলো ঘেমে—
এক্‌সপ্রেস্‌টা এই বুঝি বা ছাড়ে !
ডাক্‌লো কুলি—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে ।

'আপ্‌' কি 'ডাউন' না জেনে সে কিছুই,
ছুটলো বেগে কুলির পিছু পিছুই ।
ধড়ফড়িয়ে কুলি শেষে,
যে-কাম্‌রাতে দিল ঠেসে —
সবাই ঘুমোয়, অঙ্গ নাহি নাড়ে ।
তাতেই ওঠে—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে ।

এক দিকেতে বাঙ্ক্‌ যা ছিল খালি,
তার উপরেই শয্যা দিল ঢালি ।
কোনো মতে পেট ভরিয়ে,
বাক্সটাতে মাথা দিয়ে
শোবা মাত্র নাকের ডাকও বাড়ে ।
দিল্লী চলে—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে ।

সকালে তার ভাঙ্‌লো যখন ঘুম
ছাখে সবার মাল নামাবার ধূম ।
শুনে সে তো হারায় দিশে,
এমন তরো হ'লো কিসে !
উঠ্‌লো যেথা দিল্লী যাবার চাড়ে,
ফিরলো সেথায় বিশ্বম্ভর পাঁড়ে ।

অতীত কালের ঐশ্বর্য্য

শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত

আজ নিরন্ন ভারত অন্নের জন্য হাহাকার করছে। অর্থ চিন্তায় অনেকেই ব্যাকুল। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বিলাসী ধনীরা টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। ছিনিমিনি খেলাটা কি ? তা – খেলাটা মন্দ নয়, তবে কিছু ব্যয়সাপেক্ষ। সপারিষদ সৌখীন জমিদার নদীর ধারে মছলন্দ বিছিয়ে বসতেন, অনুচরেরা বস্তাবন্দী টাকা তাঁর পাশে সাজিয়ে দিত, তিনি মুঠো মুঠো টাকা তুলে নিয়ে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলতেন সেগুলি মধুর একটা আওয়াজ তুলে নদীতে মিলিয়ে যেত ধনীর তাইতেই আনন্দ।

কেউ আবার ফেলাফেলির শ্রমটুকুও স্বীকার করতে চাইতেন না। টাকার তোড়ার মুখ খুলে নদী-তীরে বান্দারা রেখে দিত, স্রোতের মৃদু ধাক্কায় টুং টাং করে তারা গড়িয়ে জলে পড়ত, আয়েস করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আলবোলায় সুগন্ধী তাম্রকুট সেবন করতে করতে তাঁরা তাই শুনতেন আর পুলক-আবেশে তাঁদের চোখে ঘুম নেমে আসত। এসব হয়ত গল্প কথা—কিন্তু এবার যেগুলি বলব সেগুলি যে সত্য ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে।

১। মিশর রাণী ক্লিওপেট্রা চারলাখ টাকা দামের একটি মুক্তোকে গুঁড়ো করে তাঁর এক বন্ধুকে মদে মিশিয়ে খেতে দেন।

২। সিজার ব্রুটাসের মা সার্ভেলিয়াকে একটি মুক্তা দেন তার দাম পাঁচ লাখ টাকা।

৩। নাট্যকার ইসোপাসের ছেলে ক্লোদিয়স আশী হাজার টাকা দামের একটি মুক্তা গুঁড়া করে খেয়ে ফেলেন।

৪। সিজার বাজে খরচায় উড়িয়ে দেন একশো সাত চল্লিশ কোটি টাকা।

৫। সিজারের রাজ্য প্রাপ্তির আগে ধার—দুই কোটি, নিরনব্বই লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার টাকা।

৬। সিজার পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে কিউরোর বন্ধুতা কিনে নেন।

৭। সিজার লুসিয়াস্ পল্‌সের বন্ধুতা কেনেন ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে।

৮। ক্লোদিয়সের এক ডিস খাবারের দাম ছিল আট লাখ টাকা।

৯। হিলিওগ বুলস্ একবারের খাবারে খরচ করতেন দুই লাখ টাকা।

১০। লকুলস একটিবারের জলখাবারে খরচ করতেন তুই লাখ টাকা।

১১। লকুলসের পুকুরে যে মাছগুলি ছিল, তার দাম সাড়ে তিন লাখ টাকা।

১২। এপায়াস অপব্যয় করেন পঞ্চাশ লাখ টাকা, যখন তিনি দেখিলেন আট লাখ টাকার বেশী সম্বল নেই তখন আত্মহত্যা করেন।

১৩। সম্রাট ভেসপাসিয়ান সিংহাসনে বসবার সময় তার অনুষ্ঠানের খরচ ঠিক করেন পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা।

১৪। ক্রিসসের ভূ-সম্পত্তির দাম ছিল এক কোটি সত্তর লাখ টাকা। তাঁর জিনিষপত্র ও দাসদাসীর দামও ঐ রকম ছিল।

১৫। রোম সম্রাট টাইবেরিয়াস্ তাঁর মরবার সময়ে রেখে যান তেইশ কোটি, বাষট্টি লাখ, পঞ্চাশ হাজার টাকা। কালিগুলাও ঐ টাকা এক বছরের মধ্যে খরচ করে ফেলেন।

১৬। বিজ্ঞানবিদ্ "সেনেকার" ঐশ্বর্য্য ছিল—তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা। এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েও ইনি বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে ভালবাসতেন।

১৭। মিশরের পিরামিড তৈরী করতে খরচ হয়েছে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা।

১৮। সাজাহান ময়ূর সিংহাসন তৈরী করতে খরচ করেন নয় কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা।

১৯। সাজাহানের নিজ ব্যবহারের হীরা জহরৎ ছিল পাঁচ কোটি টাকার।

২০। কোহিনুরের দাম আজ পর্য্যন্ত স্থির হয়নি। শোনা যায় সারা জগতের দৈনিক খরচের আদ্ধেক এর দাম। কে জানে সারা বিশ্বের দৈনিক খরচ কত!

আমাদের এসব স্বপ্ন বলে মনে হয়।

আজ এইটুকু থাক, আর একদিন শুধু মুসলীম যুগের ঐশ্বর্য্যের কথা তোমাদের শোনাব।

অদ্ভুত

মিহির রায়

হাত থেকে টিকিটটা নিতে নিতে ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন—কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে এক্ষুণি আপনি যাবেন বা কেমন করে? হাতের গোড়ায়ও তো নয় সে বাড়ী।

চিন্তিত স্বরে আমি তার উত্তর দিলাম,—হুঁ, ঘণ্টা কয়েকের জন্য ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তো দ্বিতীয় উপায় দেখছি না।

ষ্টেশন মাষ্টারও সায় দিয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, সেই ভাল। আর লোক আসার যখন কথা আছে বৃষ্টি থামলেই নির্ঘাৎ তা হলে এসে যাবে।—বলে তিনি তাঁর আপিস ঘরের দিকে পা চালালেন।

টিপ্‌টিপে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে আমিও ওয়েটিং রুমের দিকে চল্লাম।

ভাঙ্গা শনের চাল দেওয়া একটা ঘর। বাধ্য হয়েই ওর মধ্যে ঘণ্টা খানেক থাকতে হবে বলে বিরক্ত বোধ করলাম। বিরক্তিত মনে সজোরে দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকবার জন্য পা বাড়ালাম আমি। কিন্তু গণ্ডগোল বাধাল আমার গ্রে-হাউণ্ড বাবলু। ঘরে ও ঢুকবে না। ওখানে দাঁড়িয়েই রাগে ও ভীষণ গোঁ গোঁ আরম্ভ করে দিল। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে ওর রাগ করবার কোন কারণ দেখতে পেলুম না। জোর করেই ওকে নিয়ে আমি ঢুকে পড়লাম ঘরটায়। লণ্ঠনের মিটমিটে আলো ঘরের সবটুকু অন্ধকার দূর করতে পারছিল না। অর্দ্ধেকেরও বেশী অন্ধকার ছিল ঘরটা।

হঠাৎ রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে বাবলু অন্ধকারের এক কোণায় ছুটে ধেয়ে কার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করল। সঙ্গে সঙ্গেই অস্বস্তিকর খ্যাড়খ্যাড়া গলার একটা চীৎকার শোনা গেল—গেলাম গেলাম। কে মশাই আপনি, কুকুর সামলান আপনার!

বাবলুকে আমি একটা ধমক দিয়ে কাছে ডাক দিতেই আমার কাছে এসে ও চীৎকার থামালো বটে কিন্তু রাগে গড় গড় করতে লাগল। বাবলুর মাথায় আস্তে একটা চড় মেরে ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি একটু শান্ত হলেন বলে মনে হোল, বললেন—আচ্ছা অভদ্র কুকুর তো মশাই আপনার! বাঘের মত ও রকম কুকুরকে ছেড়ে রাখেন কেন? ঘ্যাক্ করে যদি কামড়িয়েই দিত কি উপকারে আসতেন মশাই আপনি?

বিনীত ভাবে কুকুরের হয়ে আবার ক্ষমা চেয়ে বললাম—নাঃ সে ভয় আর নেই; ধমক দিয়ে দিয়েছি আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

—হুঁ নিশ্চিন্ত!—ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন বলে মনে হোল না।—তা যাবেন কোথায় আপনি? —যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

—নবকুমার চৌধুরীর বাড়ী।

—এ্যাঁ, নবকুমার চৌধুরীর বাড়ী? এই রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে? কতদূর ও বাড়ী তা জানেন? পাক্কা তিন ক্রোশ। রাস্তায় বিপদ আপদ আছে কত তার খেয়াল রাখেন? তা ছাড়া একটা বদ্‌নামও আছে ও বাড়ীর।

—বদ্‌নাম? কিসের বদ্‌নাম?

ভদ্রলোক কথাটি এড়িয়ে গেলেন মনে হোল। ওঃ হো, আরে, আপনি যাবেনি বা কেমন করে সেখানে আজকে। নবকুমার বাবু তো সপরিবারে সেদিন পুরী গেলেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আমি বললাম—তার মানে? আমি তো দু'দিন আগেই তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নবকুমার বাবুর যাবার কোন কথা ছিল না। তিনি সবে মাত্র কাল গেছেন। তাঁর পরিবারের অন্য সবাই আগেই গিয়েছিলেন। অসুখের তার পেয়ে হঠাৎ তিনি চলে গেছেন কাল।

ভাবলাম হবেও বা, কিন্তু মুস্কিলে পড়লাম। সারাটা রাত এই ভাঙ্গা ঘরে হাত ভাঙ্গা চেয়ারে বসে কাটাতে হবে নাকি? কাল ভোর ছাড়া কলকাতার দিকে ট্রেণও তো নেই আর।

আমার অবস্থা বিবেচনা করে ভদ্রলোকের সহানুভূতি হোল সম্ভবত, বললেন—তা ভাববেন না আপনি গরীবের ঘরে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছা হলে।

ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল তবুও ভদ্রতা বজায় রেখে বললাম—না না, একটা রাতের জন্য আপনাকে আর মিছামিছি ব্যতিব্যস্ত করে দরকার কি? এখানেই বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

—বিলক্ষণ, তা কখন হয় নাকি? ঝড়বাদলে আপনি এখানে কষ্ট করে থাকবেন আর আমি কিনা—চলুন, চলুন। বৃষ্টিটাও একটু ধরেছে; উঠে পড়ুন এই বেলা।—বলে আমার স্যুটকেশটা তিনি তুলে নিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর এমন কি সম্বন্ধ যে আমার কষ্ট দেখে তিনি বিচলিত না হয়ে থাকতে পারেন না তা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু প্রস্তাবটা আমার মন্দ লাগল না। তা ছাড়া তাঁর এত আগ্রহ দেখে মনের মধ্যে আমার যেটুকু বা সঙ্কোচ ছিল তাও আর ছিল না। হোল্‌ড অল্ এবং টিফিন কেরিয়ারটা নিয়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

ঘরের অন্ধকার থেকে ষ্টেশনের ল্যাম্পের নীচে আসতেই অবাক হয়ে গেলাম। বাপ কি রোগা আর লম্বা ভদ্রলোকটি! চার মাস যেন অনশনে কাটিয়েছেন এমনি চেহারা, আর লম্বা কি, ছ' ফীটের নীচে কিছুতেই নয়, ওই বিশ্রী রোগা চেহারায় লম্বাটা আরো যেন বিকট করে তুলেছিল। ওই চেহারার থেকে ও রকম ঘ্যাড়ঘ্যাড়া আওয়াজই বা বের হয় কেমন করে! ভদ্রলোকটির সবই অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। আর চলেছেন কি, সাইকেলের সঙ্গে অনায়াসেই পাল্লা দিতে পারেন তিনি, মনে হোল।

যাই হোক তাঁর সঙ্গে প্রায় এক রকম দৌড়াতে দৌড়াতেই কিছু দূর এসে একটা বাড়ী দেখলাম। ওটার কাছে এসে দেখলাম অত্যন্ত পুরাণো বাড়ীটা, আগাছায় বাড়ীর চারদিকে আর মধ্যে পরিপূর্ণ। এ বাড়ীতে যে লোক বাস করে দেখে তা মনে হয় না।

বাড়ীটায় ঢুকে মনের সন্দেহটা তাকে আমি ব্যক্ত করলাম। উত্তরে তিনি যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—সন্দেহ হবে বই কি। সারা বাড়ীতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ থাকেন নাকি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখবেন? একজন্ লোকের পক্ষে এত বড় বাড়ীটা পরিষ্কার রাখা তো সম্ভব নয়।

তাঁর কথার ভাবে বিরক্ত বোধ করলেও মিষ্টি করে বল্‌লাম—সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সে যাক্, এখন চলুন বরং খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া যাক্, মিছামিছি দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেয়ে আর লাভ কি।

ভদ্রলোক কিন্তু নির্ব্বিকার ভাবে বল্‌লেন—রাত্রে আমি খাই না।

—আপনি না খেলেও আমি খাই।

—তা আপনাকে খেতে মানা করেছে কে?

একটু ঝাঁঝাল সুরে এবার আমি বললাম—মানা না করলেও খাওয়ার একটা পদার্থ চাই তো, আর খেতেই যদি না দেবেন তো আনলেন কেন এখানে?

আমার শেষের কথাটি শুনে ভদ্রলোক একটু হাসলেন বলে মনে হোল, সঙ্গে সঙ্গে তার বিশ্রী ঘোলাটে

BLEED THROUGH.

চোখেও যেন আকস্মিক একটু দীপ্তি দেখলাম। বললেন—খাওয়াব বলে আপনাকে এখানে আনি নি। এনেছি—তিনি মুচকী হেসে বল্‌লেন—একটু ভাল ভাবে ঘুমোতে পারবেন বলে।

ভদ্রলোকের ওই বেহায়ার মত হাসি দেখে সারা গা একদম জ্বলে গেল, কটু স্বরে বল্‌লাম—অসীম দয়া আপনার। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো আর ঘুমোব না। শোবার জায়গা পাব কিছু?

আপ্যায়িত স্বরে ভদ্রলোকটি এবার বল্‌লেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ওই তো ওই ঘরে শোবেন আপনি, চলুন।

ঘরের কাছে এসে ভদ্রলোকটি বললেন—আপনার কুকুর কিন্তু বাইরে রাখতে হবে মশাই। কুকুর নিয়ে ঘরে শোয়া আমি পছন্দ করি না, বাইরে বেঁধে রেখে আসুন ও বাঘটাকে।

—না, কুকুর আমার সঙ্গেই থাকবে।—দৃঢ় স্বরে আমি বললাম।

—না, না ওটাকে ঘরে রাখতে পারবেন না। বাইরের ঘরে রেখে আসুন ও ব্যাটাকে। এমন স্বরে কথা কয়টি বললেন তিনি, যেন হুকুম করছেন আমাকে।

ভদ্রলোকটির অশিষ্ট ব্যবহারে কিছুক্ষণ হোলই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এবার আর সামলাতে পারলাম না। কটু তীব্র স্বরে আমি বল্‌লাম—দেখুন, আপনি পছন্দ না করলেও আমি করি। ওকে নিয়ে ঘরে ঢোকাতে আপনার যদি আপত্তি থাকে বেশ বলুন এক্ষুণি আমি তা হলে ষ্টেশনে যাচ্ছি।—বলে স্যুটকেশটা আমি তুলে নিলাম।

ভদ্রলোকটি এতে কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি আমার হাত চেপে ধরে বল্‌লেন—সে কি রাগ করছেন কেন আপনি? ইচ্ছে যখন হয়েছে থাকুন না কেন কুকুর নিয়ে। আপত্তি করবার আর কি আছে এতে। তবে বেঁধে রাখবেন ওটাকে একদিকে।

আমি কিন্তু ভদ্রলোকটির হাতে হাত লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ চমকিয়ে উঠলাম, উঃ কি ভীষণ ঠাণ্ডা তাঁর হাত! শীতের দিনে এক্ষুণি যেন বরফ আনলেন তিনি হাতে করে, কিন্তু তার শেষের কথাটা শুনে চটে উঠে বললাম—আচ্ছা, আচ্ছা সে বুঝব আমি এখন। আপনি খেয়ে এখন শোন তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি এবার। দরজাটা আপনি খুলেই শুতে পারেন। ভয় পাবার কিছু নেই, আর রাখবেন কিন্তু বেঁধে কুকুরটাকে। ভারী বদ্‌জাত ওগুলো।—বলে তিনি তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

বাবলুকে বাঁধবার দিকে যে এত ঝোঁক কেন তাঁর বুঝলাম না। কিন্তু তাঁর অনুরোধ আমি পালন করলাম না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে টিফিন কেরিয়ার খুলে বসলাম। কি আর করি, যা ঠাণ্ডা কিছু খাবার ছিল তাই-ই খেলাম আর কিছুটা দিলাম বাবলুকে। তারপর আলোটা কমিয়ে পড়লাম শুয়ে।

রাত বোধ হয় তখন বারোটা বেজে গেছে, গভীর অন্ধকারের নিজস্ব একটা সুরের সঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক কানে এসে লাগছিল। বাইরে তখন আবার বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়েছিল। ঝমঝম্‌ করে পড়ার আর বিরাম নেই, পড়ছিল তো পড়ছিলই। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দিচ্ছিল বেশ জোরে, শোঁ শোঁ করে তার শব্দ বাইরে বয়ে যাচ্ছিল। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল বাতাসে, বিছানার চাদরটা উঠিয়ে গায়ে দিয়ে গুড়িসুড়ি হয়ে চোখ বুঝলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। অত্যন্ত ঠাণ্ডা একটা স্পর্শে জেগে উঠলাম। বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা একটা হাত জোরে আমার গলাটা চেপে ধরেছে। আলোটা দেখলাম নেবা, সূচিভেদ্য অন্ধকারে ঘর একদম কানায় কানায় ভর্ত্তি। টিপুনীর চোটে চোখ আমার প্রায় উল্‌টিয়ে আসতে চাচ্ছিল। চীৎকার করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া মুখ দিয়ে কিছুই আর বেরোল না।

মিনিট কয়েক আরো ওরকম অবস্থায় থাকলেই দম আমার বন্ধ হয়ে যেত নিশ্চয়ই কিন্তু ভগবান্‌ রক্ষা করলেন। ভারী একটা জিনিষ আমার বিছানার ওপর লাফিয়ে পড়েই আমার আততায়ীকে চেপে ধরল বুঝতে পারলাম। তারপরেই খাটের নীচে ধস্তাধস্তির শব্দ, কিন্তু আমার তখন উঠে বসবার অবস্থা নয়। নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল তখন আমার। নিঝুম ভাবে বিছানার ওপরেই পড়ে থাকলাম। প্রকৃতিস্থ হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে যখন চোখ খুললাম তার অনেক আগেই ধস্তাধস্তি বন্ধ হয়ে গে'ছিল। ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেলাম না। খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে শুধু ঘরটার মধ্যে।

মেঝের ওপর লণ্ঠনটা পড়ে ছিল। ওটাকে ধরিয়ে নিলাম। কে যে আমাকে আক্রমণ করেছিল বুঝতে পারলাম না কিন্তু বাবলু যে তাকে আক্রমণ করেছিল সেটা বুঝলাম।

বারান্দায় বেরিয়ে ভদ্রলোকটির শোবার ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। ঘরে গিয়ে কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ঘরে তিনি নেই।

এত রাত্রে তিনি গেলেন কোথায়? আর আমাকে আক্রমণই বা কে করেছিল? বাবলুরই বা কি হলো? আমার আততায়ীকে ও আক্রমণ করেছিল। সে তো খুন করে নি ওকে? ভাবতেই অসহ্য রাগে সারা শরীর আমার জ্বলে উঠল। সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ল ভদ্রলোকটির ওপর। মনে হোল কাছে পেলে তাকে নিশ্চয়ই খুন করে ফেলব এখন। ভীষণ রাগে চীৎকার করে তাকে আমি ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ একটা তীব্র চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হয়ে ভয়ে আমাকে কণ্টকিত করে তুলল। ভদ্রলোকটির হাত অত ঠাণ্ডা কেন? শরীরে রক্ত চলাচল করছে এমন মানুষের হাত কখনই অত ঠাণ্ডা হতে পারে না, নিঃসম্বল আমাকে আক্রমণই বা কে করবে? আক্রমণকারীর হাতের ঠাণ্ডার তীব্রতা আমার মনে পড়ল। ভদ্রলোকটির হাতের মত ঠাণ্ডা। ভদ্রলোকটির চেহারা, চাল-চলন, ব্যবহার একে একে সব মনে হতে লাগল। তার চোখের ঘোলাটে রঙের গভীরতার কথা মনে আসতেই শরীর আমার কেঁপে উঠল। বাবলুকে বেঁধে রাখার দিকে অত ঝোঁক কেন তার? বাবলুই বা তাকে দেখে রাগে ও রকম অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন? ভয়ে আমি কি করব বুঝতে পারলাম না।

এ আমি কোন্‌ বাসায় এসেছি! কার কবলে পড়েছি আমি? নবকুমার বাবু যদি চলেই যাবেন ষ্টেশন-মাষ্টার তো তা বলতেন আমাকে। এখানে আমাকে আনবার জন্য ভদ্রলোকের অত ব্যস্ততা কেন? ভয়ে আমার বুদ্ধি জমে পাথরের মত হবার জো হোল। ঠিক ভাবে আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না তখন।

ভূত আমি মানি না কিন্তু একে কি বলব? মানুষের শরীর অত ঠাণ্ডা হয় না। চোখও অত ঘোলাটে কারও হতে পারে? কিন্তু না, ভয় আমাকে পেলে চলবে না। এ অবস্থায় ভয় হচ্ছে শত্রু।

শুনেছি অনেক লোক মারা পড়েছে শুধু ভয় পেয়ে কারণ কিছু না থাকলেও। বাবলুকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। ও গেল কোথায়?

ভদ্রলোকটির ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকলাম। কিন্তু কিছুই দেখলাম না ও ঘরে। বাড়ীর সব জায়গায় দেখতে হবে আমাকে। একতালা হলেও মস্ত বড় বাড়ীটা।

তিন চারটা ঘর পেরিয়ে বাগানের ধারে ছোট একটা ঘরের সামনেই আসতেই থমকিয়ে দাঁড়ালাম। একটা বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ আসছিল ঘরটার থেকে। কোন রকম না ভেবে-চিন্তেই পায়ের এক ধাক্কায় ভেজান দরজাটা খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাতের আলোতে যা দেখলাম তাতে ভয়ে নিথর হয়ে ওখানেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দুর্গন্ধময় একটি শব দেয়ালের কোণে পড়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহ। কত দিন আগে মারা পড়েছে দেখে বোঝা যায় না। স্থানে স্থানে পচে গিয়েছে দেহটার। সেই গন্ধে সারা ঘরটা বিষিয়ে রয়েছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখলাম দেহটার নানাস্থান থেকে কে যেন খাবলিয়ে খাবলিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে, এত গভীর ভাবে নিয়েছে যে সাদা হাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। হাতের আলোতে পড়ে সেগুলো চকচকিয়ে উঠছিল যেন!

সে দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। সাহস আমার সম্পূর্ণ উবে গিয়েছিল। ভয়ে আমি মুহ্যমান তখন। কোন রকমে নিজের ঘরে এসে দরজায় খিল আটকিয়ে দিলাম আমি। আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস তখন পড়ছিল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ব্যক্তির মত।

হঠাৎ সম্পূর্ণ আচম্বিতে কাছে কোথায় যেন ভীষণ শব্দে এক বাজ পড়ল। বৃষ্টি তখন টিপ্ টিপ্ করে পড়লেও বাতাসের বেগ শান্ত হয়ে গে'ছিল। বাজের বিকট শব্দে চমকিয়ে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। কোন রকমে খাটের বাজুটা ধরে দাঁড়ালাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে সারা বাড়ীটা ভরিয়ে তুলল। খানিক আগের বাজের গম্ভীর গর্জ্জন তার কাছে মনে হল তুচ্ছ। দাঁড়িয়ে থাকতে আমি আর পারলাম না, মেঝেতেই বসে পড়লাম, পা আমার তখন থরথর করে কাঁপছে!

কিন্তু ওকি! বারান্দার ওপর কার যেন দ্রুত পদ শব্দ, আমার ঘরের দিকেই আসছে বলে মনে হোল। হ্যাঁ আমার ঘরের দিকেই তো, দরজার কাছে একটু থামল শব্দটা তার পরেই প্রচণ্ড ধাক্কা দরজাটার ওপর। নাঃ, আমি এবার অজ্ঞান হয়ে পড়ব, নার্ভের সহ্য করবার ক্ষমতা আমার শেষ সীমানায় এসে পৌছিয়েছে, হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল।

ভগবানের অসীম দয়া, বাবলুর ডাক শুনতে পেলাম, দরজায় যে ধাক্কা দিচ্ছিল সে আর কেউ নয়, আমার বাবলু।

আনন্দে পাগলের মত হয়ে দরজা খুলে বাবলুকে আমি জড়িয়ে ধরলাম, "আমার তখন বাবলুকে পৃথিবীতে সব চেয়ে প্রিয় বলে মনে হতে লাগল।" বাবলুর মুখে আমি চুমো দিতে গেলাম, কিন্তু একি বাবলুর মুখ যে রক্তে লালে লাল!

বাবলুকে পেয়ে আমার সাহস আবার একটু একটু করে ফিরে আসছিল। তাড়াতাড়ি স্যুটকেশটা এবং বিছানাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সন্তর্পণে বাড়ীর দরজা পেরিয়ে ষ্টেশনের দিকে দৌড় দিলাম আমি।

ষ্টেশনে যেয়ে দেখলাম ওয়েটিংরুমে একটা লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে আর তার পাশে শুয়ে রয়েছে একটি লোক। তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম—এই, এই কে তুমি?

ধড়ফড়িয়ে উঠে লোকটি চোখ কচলাতে কচলাতে বলল—আজ্ঞে, মঞ্জু বাবু বলে একজন আসবেন ভোরের গাড়ীতে তাকে নেবার জন্য এসেছি।

—মঞ্জু বাবু! ও নাম তো আমার, নবকুমার বাবুর বাসা থেকে এসেছ নাকি তুমি? তিনি না কাল পুরী চলে গিয়েছেন?

লোকটি বিস্ময়ান্বিত হয়ে বলল—আজ্ঞে না। তিনি যাবেন কেন? তাঁরাতো সবাই বাড়ীতেই আছেন। রাত্রের গাড়ীতে বৃষ্টির জন্য আসবেন না ভেবে ভোরের গাড়ী দেখতে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

"একটু একটু করে সমস্তই বুঝছিলাম এবার সব স্পষ্ট ভাবেই বুঝলাম। সেই লোক, লোক তাকে বলা যায় কিনা জানি না, তবে সেই-ই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সকালে নবকুমার বাবুকে গত রাত্রের ঘটনা সমস্তই বল্লাম। তিনি তখনই পুলিশ-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে করে সেই বাড়ীতে গেলেন, আমিও গেলাম তাঁদের সঙ্গে। দেখা গেল গত রাত্রে আমাকে যে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল ছাতের চিলে কোঠায় ঘাড়গুঁজে সে পড়ে রয়েছে। গলায় ভীষণ এক গভীর ক্ষত। নিশ্চয় বাবলুই ওখানে কামড়িয়ে ধরেছিল। দারোগা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে সনাক্ত করলেন। বললেন—পাশের গাঁয়ের ভূষণ দাসের দেহ ওটা। ছ'মাস আগে কলেরায় মারা গিয়েছিল লোকটি কিন্তু সেদিনকার অতি-বৃষ্টির জন্য চিতা না জ্বলায় শব দাহ করা যায়নি, শ্মশানেই শব রেখে শ্মশান-বন্ধুরা দূরে অপেক্ষা করছিলেন পরে তারা আর সে শব খুঁজে পান নি।

নীচের সেই অর্দ্ধ গলিত মৃত দেহটিও সনাক্ত হোল, দু'মাস আগে মাসীর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল ছেলেটি। এইরকম একদিন বৃষ্টির রাত্রিতেই ছেলেটি অদৃশ্য হয়েছিল! সেও আমার মতনই এ গ্রামে নূতন আগন্তুক ছিল।

ভয়ের জগত হতে কে সে আসে বুঝি প্রেত ওর নাম!
বসি একা ঘরে কেঁপে মরি ডরে মুখে বলি রাম! রাম!
দুটি ঘোলা চোখে কোন্ আঁধারের ছম্‌ছমে কথা লেখা!
কালো মেঘ ওড়ে চাঁদের উপরে আমি ঘরে বসে একা!
প্রেতপুরী হতে অতিথির দল আসছে মিছিল বেঁধে,
কোথা ডাকে পেঁচা! কোথায় শেয়াল শ্মশানে উঠছে কেঁদে!

চলন্তিকা

খবরের কাগজ খুল্‌লে লড়াইএর খবর ছাড়া আর কোনও খবর যেন চোখে পড়ে না। আর সে খবরেরই বা কী শ্রী! এক ঘেয়ে একটানা ছন্দে বলে চলেছে কোনও ইংরেজ বা ফরাসী বিমানবীরের দুঃসাহসিক বীরত্বের কাহিনী কিম্বা জার্ম্মেনীর শোচনীয় অন্তর্বিপ্লবের কথা, তার কাচা মাল ও তেলের অভাবের কথা এবং তার সঙ্গীহীন বর্ত্তমান অভিযানের পরিণাম যে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় তারও পুনঃ পুনঃ আশ্বাস ও আবৃত্তি। তবু ওর ভিতরেই যে খবরগুলো একটু বিশেষ ধরণের তা তোমাদের বলেছি।

আমেরিকা যুক্তরাজ্য তার নিরপেক্ষতা আইনের যেটুকু অদল বদল ক'রল তাতে করে মিত্রপক্ষের খুবই সুবিধা হবে। বর্ত্তমান আইনে নগদ টাকা দিলে, নিজের জাহাজে আমদানী করবার বন্দোবস্ত করতে পারলে যে কোনও যুদ্ধ্যমান দেশই আমেরিকার কাছ থেকে যুদ্ধের উপকরণ ক্রয় করতে পারবে। জার্ম্মেনীও ইচ্ছা করলে পারবে। তবে জার্ম্মেনীর নগদ টাকা দেবার কিম্বা নিজের জাহাজে আমদানী করবার কোনটারই সামর্থ্য নেই। অর্থ-বল এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য থাকার দরুণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রকারান্তরে নিজেদের অস্ত্রাগারে পরিণত করা বিশেষ কঠিন হবে না। জার্ম্মেনীর সাবমেরিণ যে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবে মনে হয় না। যুদ্ধের আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মেনী ইংরেজের পঞ্চাশখানার কিছু বেশী জাহাজ ডুবিয়েছে সত্য কথা। কিন্তু এই সময়ের ভিতরে যে ক'খানা নতুন জাহাজ ইংরেজের তৈরী হয়েছে এবং জার্ম্মেনীর যে ক'খানা জাহাজ তারা আটক করেছে তাতে মোটের ওপর ব্রিটেনের টনেজ বেরেছে ২৪০০০। তা ছাড়া এদের জাহাজের সংখ্যা এত বেশী যে ৫০।৬০ খানা জাহাজ তার শতকরা দু'ভাগেরও কম।

সম্প্রতি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুরস্কর ভিতর যে রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর হ'ল তাতে ভূ-মধ্য সাগরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েট ছাড়া আর কোনও শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে তুরস্কের

সামরিক সাহায্য নিতে পারবে। সোভিয়েটকে ভূ-মধ্য সাগরে আসতে হলে ডার্ডেনেলিস্ প্রণালীর শরণ নিতে হবেই। সোভিয়েট চেয়েছিলেন তুরস্ক ডার্ডেনেলিস্ দিয়ে ব্রিটীশ এবং ফরাসী জাহাজের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। তুরস্ক তাতে রাজী না হওয়ায় সোভিয়েট সম্প্রতি কিছু বিরক্ত হয়েছেন।

মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। হিটলারের নূতনতম বন্ধু ষ্ট্যালিন বন্ধুর কাছে শেখা বিদ্যাটী বেশ ভাল ভাবেই আয়ত্ত করে ফেলেছেন। পোলাণ্ড, লিথুনিয়া, এস্থোনিয়া, ল্যাট-ভিয়ার পালা শেষ হয়েছে—এবার ডাক পড়েছে ফিনল্যাণ্ডের। ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদল কতকবার মস্কোতে ছুটাছুটি করেও ষ্ট্যালিন সাহেবকে বুঝিয়ে উঠতে পারলেন না। রাশিয়ার দাবী মেটাতে হলে বুঝি ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীন স্বত্বা বজায় থাকে না। আর দাবী না মেটালে? যাক সে কথা। এঁরা এখন সব দেশে ফিরে এসে দেশরক্ষার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেছেন। যে কোনও মুহূর্ত্তে আগুণ জ্বলে উঠতে পারে। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে হিটলার যাতে আর ঝগড়া বাধাতে না পারেন ষ্ট্যালিন সেই চেষ্টাই করছেন। এই তো বন্ধুর কাজ! যারা কথা কয় অল্প তাদের মনের অনেকটাই যে পেটের ভিতরে থেকে যায় হিটলার যদি এটা গোড়ায় বুঝতে পারতেন!

পোলাণ্ডের ছেলেমেয়েদের জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়। তাদের অনেককেই বাবা, মা, ভাই বোন প্রভৃতিকে জন্মের মত হারাতে হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা একটুকু বড় হয়েছে—তাদের অনেকেই এই বয়সে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়েছে। কামানের গোলা ও বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিখা খোঁড়া তো এদের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শত্রুর আক্রমণের সময় তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারবে না এই আশঙ্কায় গ্রেট ব্রিটেনের যত বড় বড় সহর থেকে সমস্ত ছোট ছেলে মেয়েদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় সহরেই বিমান আক্রমণের ভয় সব চেয়ে বেশী কিনা। এদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দূরের ছোট্ট ছোট্ট গ্রামে—যেখানে বাপ মা না থাকলেও দেখবার শোনবার লোক আছে। প্রথমটা একটু একটু মন খারাপ হলেও এখন আর এদের বিশেষ খারাপ লাগছে না। এটা অবিশ্যি আমাদের অনুমান। তবে কেনই বা খারাপ লাগবে? খাওয়া দাওয়া ঘুড়ে বেড়ানো এবং একটু আধটু পড়াশুনা করা—এ মন্দ কি? বাপ মারা মাঝে মাঝে এসে যাঁর যাঁর ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে যান। এরকমটা বেশ

কিছু দিন যদি চলে তবে ছেলেমেয়ের মানসিক গঠনে পরিবার ও বাপ মায়ের যে একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমাদের ধারণা তা বদলে যেতে পারে।

ওদেশ থেকেই একটুকরো হাসির খবর পেয়েছি। সেদিন ফ্রান্সের এক রুটীওয়ালা তার নাম বদলাবার জন্য সরকারে দরখাস্ত পেশ করেছে। বেচারার নাম ছিল হিটলার। আর সেই অপরাধে তার গ্রামের লোক তাকে এমন প্রহার দিয়েছে যে কোনও রকমে প্রাণটী বেঁচেছে। বড় লোকের নাম রাখাতেও বিপদ আছে।

দেশের খবর বিশেষ সুবিধার নয়। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ প্রতিনিধির যে কথাবার্ত্তা চলছিল তার কোনও মীমাংসা হয় নি। দোষ গুণ বিচার করলুম না। বড় হয়ে যখন তোমাদের বিচার বুদ্ধি পাকা হবে তখন তোমরাই বিচার করে নিতে পারবে। আর সেইটেই হবে সব চেয়ে সুবিচার। বর্ত্তমানে আটটী প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীদল পদত্যাগ করেছেন। এক কথা কংগ্রেস ইংরেজকে বলেছেন—তোমার সঙ্গে আমার মত মিলছে না। আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। তবে তোমার দুঃসময়ে তোমার সঙ্গে শত্রুতা আমি করব না।" এর ফল শুভ হবে কি অশুভ হবে সে কথা স্বতন্ত্র। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এতটা Sense of honour খুবই বিরল। এই আটটী প্রদেশে এক আসাম ভিন্ন অন্য কোথাও মন্ত্রী সভা গঠন করা সম্ভব হয়নি। ফলে সাতটী প্রদেশে ১৯৩৫এর শাসন যন্ত্র বিকল হয়েছে। আসাম মন্ত্রী সভায় আবার স্যার সাদুল্লার আবির্ভাব হয়েছে। তবে এর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।

এবারকার নোবেল প্রাইজ কারা পেলেন খবর রাখ তো! বর্ত্তমান সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত আধুনিক লেখক মঃ ফ্রান্সই সেলানু পাকে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের কৃষক জীবন সম্বন্ধে উপন্যাস লিখে ইনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন। এঁর লেখা 'মিক্ হেরিটেজ' এবং 'ফলন্ এস্লিপ হোয়াইল ইয়ং' দু'খানা নাম করেছে। তোমাদের ভিতর কেউ পড়েছ বলে আশা করি না। তবে বড় হয়ে হয় তো অনেকেই পড়বে।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুটেনাণ্ডেট্ এবং জুরিকের অধ্যাপক রুজিকাকে বর্ত্তমান সালের রসায়নের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৮ সালে কোনও পুরস্কার দেওয়া হয় নি। এবার সেটী হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুন্‌কে দেওয়া হোল। এ বছর পদার্থ বিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেলেন কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ণেষ্ট অরল্যাণ্ড লরেন্স্ পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্র সাইক্লোটোন আবিস্কার করে।

পানসী নিয়ে আয়না মাঝি

—পূর্ণেন্দু সেন—

ও মাঝি ভাই আমায় নিয়ে
দাওনা পাড়ি—
আকাশ নামে যেথায় গিয়ে
চাঁদের বাড়ি!
দিগন্তটার নাগাল নাকি শক্ত পাওয়া,
—কঠিন কিবা!
বলেছে ঐ চাঁদের দেশে যায়না যাওয়া,
কেউ বুঝিবা!
গাঙচীল যায় তবে কোথায় বল আমায়
পাখায় লিখে কোথার খবর কোথা নামায়!

নোঙের ছিড়ে আয়না ছুটি,
আয়না মাঝি,
পানসী নিয়ে হইনা ছুটী
উধাও আজি।
বান ডাকবে আসুক না সে, ভয় কি করি,
ঘূর্নি হাওয়া,
চলবে জানি শক্ত হাতের মুঠোয় ধরি
নৌকা বাওয়া।
ছুটব তবু যেথায় কেবল জ্যোস্নাধারা—
পড়ার তাড়া নেইকো যেথা লেখার তাড়া।

বাবা বলেন—খোকন ঘুমো
চুপটি করে,
মাও আমাকে দেয়নি চুমো
গালটী ধরে।—
তাইতো আমি পালিয়ে আসি ভোরবেলাতে
সঙ্গে ভোলা—
মেঘের সাথে চলবে খেলা ঢেউয়ের সাথে—
নাগর দোলা।—
এক নিমেষে এগিয়ে যাব অনেক দূরে,
চাঁদের বুড়ি উঠবে হেসে রাত দুপুরে।

রাত্রি হলে আকাশ পিদীম
উঠবে জ্বলে,
জোনাকীতে দেবদারু নিম
মশাল তোলে।
ভাববে বাবা হাতটি গালে, ভাববে মা তো
আটচালাতে,
আমি তখন ক্লান্ত বেজায় শুনবো না তো
হালচালাতে।

ওরা বসে ভাবুক না হয় খোকার টানে—
খোকা তখন জমাক পাড়ি চাঁদের পানে।

ছুটির ঘণ্টা

পূজোর ছুটি ফুরিয়েছে তোমাদের এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও। অনেকদিন পরে আবার 'রংমশাল' হাজির হচ্ছে তোমাদের কাছে। তোমাদের এখন সময় কম, এ্যান্নুয়েলের পড়া। তবু 'কার্ত্তিকের' রংমশালের পরে কত খবর তৈরী হল—খেলার মাঠে; ফুটবলে, টেনিসে হকিতে এবং ক্রিকেটে। তার একটুখানি তোমাদের জানিয়ে দিই।

ফুটবল

'কার্ত্তিকের' সংখ্যায় যখন 'ব্র্যাবোর্ণ কাপের' খবর লিখি তখন সন্দেহ ছিল—ফাইন্যালে কারা জিতবে। 'ইষ্টবেঙ্গল' না 'মহামেডান স্পোর্টিং।' 'ইষ্টবেঙ্গল' আগে কয়েকবার হারিয়েছে 'মহামেডান'কে; তার উপর আবার 'কালীঘাটের' জোসেফ ইত্যাদিকে নিয়ে তার জোর বেড়েছে আরও। কিন্তু তবু কাপ পেল সেই 'মহামেডান'ই। 'মহামেডান পোর্টিং' অনায়াসেই প্রমাণ করল তাদের চেয়ে ভাল টিম এখন আর নেই।

টেনিস

তোমরা 'খসু সেন' আর 'নসু সেন' এ দুভাইএর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। বয়সে এরা এখনও ছোট কিন্তু খেলায় এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। উত্তর ভারতের এক প্রতিযোগিতায় এবার 'খসু' খুব চমৎকার খেলেছেন। অনেকে বলেন—দু এক বছরের ভিতরই 'খসু'কে হারানো যে কারও পক্ষেই মুস্কিলের ব্যাপার হবে।

হকি

চারিদিকে বোমা বারুদ এবং টর্‌পেডোর অত্যাচার উপেক্ষা করে নিজের ঘরে খেলাধূলা চলে—কিন্তু খেলার জন্য সাগর পাড়ি দেওয়া চলে না। 'ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন' সিদ্ধান্ত করেছেন—এবার অলিম্পিকে ভারতবর্ষের টিম যাবে না। অবশ্য সাবমেরিণের অনিশ্চিত দয়ার উপর নির্ভর করে বিদেশে খেলা করতে না যাওয়াই ভাল এ কথা সকলেই মানবেন। তবে 'অলিম্পিক্' খেলা যে এবার হবে—সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

ক্রিকেট

'পেন্টাঙ্গুলার' খেলা শেষ হ'ল। তোমরা নিশ্চয়ই জান হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, ইয়োরোপিয়ান এবং 'দি রেষ্ট' অর্থাৎ যারা বাকী রইল, তাদের ভিতর প্রতি বছর 'বোম্বেতে' এই প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমে 'মুসলমান'দের সঙ্গে 'দি রেষ্টের' খেলায় মুসলমানেরা জেতে। এদিকে হিন্দুরা 'ইয়োরোপিয়ান' আর 'পার্শীদের' হারিয়ে দেয়। তারপরে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ফাইন্যালেও হিন্দুরা জেতে। এইটুকু হচ্ছে সংক্ষেপে খবর।

ইয়োরোপিয়ানদের সঙ্গে হিন্দুরা প্রথম খেলায় খুব চমৎকার খেলেছিলেন। তাদের রাণের সংখ্যা হয়েছিল—এক ইনিংসেই ৫৯১। এত বেশী রাণ পেন্টাঙ্গুলার কিংবা কোয়াড্র্যাঙ্গুলারে আগে কখনও হয়নি। মার্চ্চেন্ট একাই করেন—১৯১; মানকড্‌ও ১৩৩ করে প্রমাণ করেন—তিনিও কিছু কম নন।

বোলিংএ কিন্তু এবারের প্রতিযোগিতায় 'সি, এস, নাইডুর মত সাফল্য কারও হয়নি। নিসারেরও নয়। তিনি একাই এবার তিনটী ম্যাচে ৩৫টী উইকেট নেন। আমাদের ব্যানার্জ্জি যাঁকে তোমরা শুঁটে বাড়ুজ্যে বল—তিনিও খুব ভাল করেছেন। পার্শীদের বিরুদ্ধে খেলায় সি, এস, নাইডু এবং ব্যানার্জ্জীর পার্টনারসিপ—দেখবার মত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন সি, কে, নাইডু বলেন—এমন খেলা তিনি অনেকদিন দেখেন নি।

এই হ'ল পেন্টাঙ্গুলারের কথা। রঞ্জি ট্রফিও সুরু হবে কিছুদিনের ভিতরেই। বাংলার সঙ্গে প্রথমে বরাবরের মত পড়েছে বিহারের। গত দু বছর বাংলা হারিয়েছে বিহারকে। কিন্তু এবার বাংলার সাহেবরা খেলতে পারবেন না—যুদ্ধের গণ্ডগোলে। ওদিকে বিহারের টিম নাকি আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তবু মনে হয় বাংলাই জিত্‌বে। দেখা যাক।

আমাদের লাইব্রেরী

পৃথিবীর কথা : সতীকান্ত গুহ সম্পাদিত : ডবলক্রাউন ষোলপেজি : ১০০ পৃষ্ঠা : মূল্য দশ আনা : শ্রীমতী প্রীতিলতা দেবী, উদয়তীর্থ, ১০, ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা প্রকাশিত।

ঝরঝরে ছাপা ও বাঁধাই, চমৎকার ছবিতে ঠাঁসা বইখানা দেখে চোখ জুড়োয়। ফাঁকির যুগে মাত্র দশআনায় এই বইখানাকে অসম্ভব সস্তা বলে মনে হবে। এই বই সম্বন্ধে এ বইয়ের সম্পাদক যে চমৎকার কটি সত্যকথা বলেছেন তা তুলে দিচ্ছি :

'আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মানুষ তার জীবন থেকে, স্বপ্ন থেকে, সত্য দিয়ে মিথ্যা দিয়ে, কাব্যকাহিনী গল্প ও নাটকে যে কথার স্বর্গ তৈরী করেছে, যে স্বর্গের নাম সাহিত্য, তারই অস্পষ্ট একটা প্রতিবিম্ব ধরা হয়েছে 'পৃথিবীর কথা'য়। এ-বই পড়ে ছেলেমেয়েরা বিশ্বসাহিত্যের আস্বাদ পাবে। প্রকাশিকা বারোখণ্ডে ছেলে-মেয়েদের জন্য 'পৃথিবীর কথা' প্রকাশ করবেন, তাতে অনেক কিছুই থাকবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে ছোট তিন খণ্ডে তিনি সস্তায় 'পৃথিবীর কথা' প্রকাশ করছেন। এই বই এই-সুলভ সংস্করণের প্রথম বই। এতে অনেক কিছুই থাকবে না, তবুও নানা দেশের কিছু কিছু গল্প, কাহিনী, কাব্য, নাটক থাকবে। অল্পের ভিতর বিশ্বসাহিত্যের সংবাদ তারা পাবে।

সুলভ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডই একটি সম্পূর্ণ বই, অর্থাৎ একখণ্ড থেকে আর একখণ্ডে কোনো লেখা টেনে নেওয়া হয়নি। একখণ্ড কিনে কেউ যেন মনে না করেন, অসমাপ্ত কোনো বই কিনলেন। আর সবখণ্ড কিনে যিনি ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে পারছেন না, তিনিও অসঙ্কোচে এই সুলভ সংস্করণের যে কোনো খণ্ড কিনতে পারেন।

প্রথম খণ্ডের চেয়ে আর দুই খণ্ড আকারে বড় হবে। এই খণ্ডে গল্পের আরম্ভ হল, তারপরেই আদিগুরু ঈশপের নীতিগল্প। নীতিগল্পের পর পুরাণ, কিংবদন্তী, রূপকথা। দ্বিতীয় খণ্ডে রূপক, অ্যাডভেঞ্চার ও ঐতিহাসিক গল্প, ডিটেক্‌টিভ ও রোমাঞ্চকর গল্প ইত্যাদি থাকবে। তৃতীয় খণ্ডে (সবচেয়ে বড় খণ্ড) পৃথিবীর অমর সাহিত্যের ছিঁটে ফোঁটা থাকবে—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ডিভাইন কমেডি, বেদ, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল, উপন্যাস, নাটক, কাব্যকবিতা ইত্যাদি থাকবে।

সুলভ সংস্করণের এই তিন খণ্ড হবে আসল সংস্করণের অগ্রদূত। পাঠক পাঠিকাদের মত আমরাও পৃথিবীর কথার সেই অপরূপ দ্বাদশখণ্ডের পথ চেয়ে রইলুম।'

আকাশের দেশে : বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ লিখিত : ডবলক্রাউন ষোলপেজি : ৮৮ পৃষ্ঠা : মূল্য আট আনা : শ্রীমতী প্রীতিলতা দেবী, উদয়তীর্থ, ১০, ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা প্রকাশিত

আকাশের কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চার। মায়াবী বামন কিশোর টেবুকে চাঁদের দেশে, সূর্য্যের দেশে, গ্রহ নক্ষত্রের দেশে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সকল রহস্য টেবুকে স্বপ্নদেশের একখানা অপরূপ কাহিনীর মত করে' খুলে বলছে। যে তথ্য নীরস ভাষায় শুনতে গিয়ে শিশুরা পড়ার টেবিলে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই তথ্য উপন্যাসের রংয়ে রঙীন হয়ে শিশুর মন রাঙিয়ে দেবে, তার চোখের সামনে অসীম আকাশের রহস্যের যবনিকা তুলে ধরবে। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের মত দামী ছবি বাংলা ভাষায় খুব কম বই-য়েই দেখেছি। এই দুঃসময়ে অসম্ভব দামী পুরু আর্টপেপারে দশখানা ছবি ছাপা হয়েছে, পুরু কার্টুজ পেপার দিয়ে প্রতিটি ছবি মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। তারপর, এত চমৎকার ঝরঝরে ভাষায় এদেশের আর কোনো লেখক বৈজ্ঞানিক উপন্যাস লিখেছেন কিনা সন্দেহ। আকাশের বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে একটানা একখানা উপন্যাস এদেশে লেখক এই প্রথম লিখলেন। এবং লেখকের পূর্ব্বে এত চমৎকার করে আকাশের গল্প কেউ এদেশে বলেননি। এ বই শিক্ষা ও আনন্দের অপূর্ব্ব খোরাক।

বড়দিনের ছুটিতে ঘরে কুনো ব্যাঙ হয়ে বসে না থেকে একবার বেরিয়ে পড় ভালো। সোনালী রোদে সারাটা দেশ যেন নেশায় ঢুলে পড়ে। সেই মরশুমে ই, বি, আর এর কনসেশন টিকিট কেটে দল বেধে দেশে টহল দিয়ে আসা চলে। দেখে আসা যায় দার্জ্জিলিং, শিলং গৌহাটি, কামাখ্যা, গৌড়, পাণ্ডু আরো কত অপূর্ব্ব স্থান!

সম্পাদিকা—দিদিভাই—

আমার সোনার ভাইবোনেরা—

আসি আসি করে মাস শীর্ষ অগ্রহায়ণ এসে গেলো। তার সঙ্গে এলো শীত বুড়ি, সমস্ত বনভূমি অকরুণ স্পর্শে রিক্ত হয়ে উঠবে তারই স্বল্প সূচনা চারিদিকে। বাতাস ঠাণ্ডা, সকালের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বসে তোমাদের চিঠির রাশ খুললাম।

তোমাদের সকলেরই প্রায় পরীক্ষা নিকটে, খুব ব্যস্ত বোধহয়? হ্যাঁ এই সময় খাটুনীটা বেশী হয় বটে—তাহলেও এতে সাফল্যলাভের আশা থাকে। তোমরা জয়যুক্ত হও এ আশীষ জানাই।

আমার অসুখের কথা শুনে তোমরা সবাই খুব চিন্তিত হয়েছ, কেউ রাগ করেছ, কেউ ভৎর্সনা করেছ, কেউ অভিমান করেছ, আমি নাকি সাবধান হয়ে চলি না, শেষ আমার ভাবী ডাক্তার ভাইটী সেবা করবার জন্য ও এগিয়ে এসেছে, চেঞ্জেও পাঠাতে চেয়েছে। কিন্তু কোথাও যাবার দরকার হবে না ভাই, সমস্ত ভারতবর্ষ আজ আমার কাছে ধরা পড়েছে, তোমাদের পত্রের ভিতর দিয়ে কত কত স্থানে আমি মনে মনে বেড়িয়ে বেড়াই তার ঠিক নেই, কাজেই বুঝতে পারছ চেঞ্জের প্রয়োজন নেই। কি হয়েছিল এ প্রশ্ন সবার চিঠিতে—এমন কি দিব্যি পর্য্যন্ত দেওয়া। রোগ তেমন কিছু নয়—ভয়ানক য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল যাতে যমে মানুষে টানাটানি করে ফিরে এলাম—খালি আমার ভাইবোনগুলির স্নেহ ভালবাসার টানে।

মনে পড়ে—অনেকদিন শয্যাগত থাকার পর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বহুদিনের বহুবার দেখা পথ অনেকদিনের অদর্শনের পর এত সুন্দর হয়ে উঠবে কে জানতো। পথের মোড়ের বাঁকে গ্যাস পোষ্ট যেন নতুন লাগলো। বহুবার দেখা রাজপথের প্রত্যেকটি জিনিষের সঙ্গে যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি ঘটলো, এমনি নতুনত্বের বাণী তোমাদের পত্রের প্রতিটি ছত্রে, তাই নতুন কথা আর কি বলবো! দপ্তরটী খুলি, তাহলেই তোমাদের ভিতর গাঢ় হয়ে মিশে যেতে পারবো।

তোমাদের প্রত্যেকের বিজয়ার প্রণাম ভালবাসা আমি পেয়েছি। আমারও আন্তরিক ভালবাসা আশীষ ও শুভ কামনা তোমাদের নির্দ্দিষ্ট দিনেই জানিয়েছি আজ খালি সেটা স্মরণে এনে দিচ্ছি। এবারে তো ফোঁটা ছিল না—তাই শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে আমার শুভকামনা ভাইদের জন্য ছিল।

কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর)

তোমাদের চিঠির সব উত্তরই উপরে দিয়ে দিয়েছি ভাই। এতগুলি ভাইবোন যার—সে কি তাদের ছেড়ে থাকতে পারে? তোমাদের ছবি দুটী পেয়েছি, ভারী সুন্দর হয়েছে, নিজে তুলেছ তো? 'মরিস্' কলেজের ছবিটী ও খুব ভাল তোলা হয়েছে। তোমাদের চিঠি বড় হলেও আমার পড়তে কষ্ট হয় না, খুব ভাল লাগে।

রহিমা খাতুন (ষোলঘর) গ্রাঃ ৭৭৭

তোমাদের ব্যস্ততা আমায়ও চঞ্চল করে তুলেছে বোন, এখন তো নিশ্চিন্ত? পূজা আনন্দে কেটেছে জেনে আমার বেশ লাগলো। যাকে যা দিতে বলেছ, দিয়েছি, খালি কাণমলাটা বাকী রেখেছি তোমার জন্য বুঝেছ? তুমি লিখেছ, রংমশালকে আমি ভাল দেখতে চাই, তার জন্য কিছু যদি চাঁদা বেশী লাগে তা দিতে প্রস্তুত। তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য সাধ্যমত রংমশালকে ভাল করে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে ভাই, তোমাদের ভাল লাগলে আমাদের চেষ্টা সার্থক। যা ভুল বলেছ ওটা প্রেসের ভূতের দৌরাত্ম্য।

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা) গ্রাঃ ৯৪১

অনেকদিন পরে তোমার সুন্দর চিঠিটা পেয়ে খুব আনন্দ পেলাম ভাই। সত্যিই, লেখা তোমাদের আমার চেনা, চেহারার সঙ্গে পরিচয় নেই, এই অক্ষরের ভিতর দিয়ে তোমাদের আমি চিনি, তোমাদের স্নেহ ভালবাসার আন্তরিক পরিচয় পাই। এত লেখা আসে প্রত্যেকটাই বিভিন্ন তবুও এগুলি আমার মনে ছাপ রেখে গেছে। ছোট ভাইটীকে স্নেহ দিয়ে বলো তোমার গ্রাহক নম্বর দিয়ে চিঠি লিখতে। তোমাদের আন্তরিকতা মনকে স্পর্শ করে ভাই, কিন্তু তুমি যা লিখেছ তা সম্ভব হলোনা—তার জন্য দুঃখ পেও না এটা ভবিষ্যতের জন্য রইল। তোমার লেখা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয় আমি পরে লিখবো ভাই, এবার তোমার ভাইবোনদের অনেক চিঠি বাকী, রাগ করোনা লক্ষী ভাইটী কেমন? অরুণ কি আমাদের ভুলে গেছে?

কুমারী সন্ধ্যা ঘোষ (কাল্‌না) গ্রাঃ ১৩২৯

নতুন বোনটী! পর পর তোমার তিনটী চিঠিই পেয়েছি, দেরীতে এসেছিল বলে উত্তর দিতে পারিনি। কোনও সঙ্কোচ নিশ্চয়ই করবে না—তোমাদের জন্যই তো এ আসর। কে বলেছে তোমায় ভালবাসবো না? তাকে বলো দিদিভাই বলেছে সেটা হয় না, নতুন পুরাতন কোন বিভেদ নেই এখানে।

অজয়কুমার ঘোষ (এলাহাবাদ) ৪৫৭

না ভাই, পূজা আর আমোদে কাটলো কই? তাছাড়া আমাদের কি এখন আর আনন্দ করবার বয়স আছে—সে সব তোমাদের জন্য। তোমাদের বাড়ী এখন অসুখ বিসুখ কমেছে তো? ঠাকুমা কেমন আছেন? না ভাই, আমি থিয়েটার বায়স্কোপ মোটেই দেখি না বল্লেও চলে। প্রণামের মিষ্টিমুখ? কাছে এসে করলে তো হবে।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) ৬৭০

তোমার চিঠি আমি সম্পাদক মণ্ডলীকে দিয়ে ব্যবস্থা করাবার চেষ্টা করবো ভাই। আর যা বলেছ সেগুলো ও। সত্যিই যে ত্রুটী হয়েছে সেগুলি যাতে সংশোধন হয় তার জন্য বলবো।

চিত্তরঞ্জন মিত্র (কালীঘাট) ১২৭৮

মণ্টু ভাই! নাম ভুল করেছিলুম? আচ্ছা এবার সংশোধন হয়েছে তো। লেখাটা পেয়েছি।

মাহনূর (বেগমপুর) ১১৬৬

তুমি দুঃখ পাবে জানলে 'ভুল' এর কথা বলতাম না। দিদিভাইএর উচিত কি নয় ভুল সংশোধন করা ভাই? আর এভাবে না বল্লে কি করেই বা বলবো! যাক দুঃখ করোনা আর বোনটী বুঝলে? লেখাটা সম্বন্ধে এখনও জানতে পারিনি।

রেখা ও রেবা দাশগুপ্তা (ইণ্টালী) ১০৩১

মিনু পিনু! পূজায় মজা করেছ, বেশ তো! আনন্দেই যেন কাটে। পারুল সেনএর সঙ্গে আলাপ করবে তা তো আমি পারুলকে বলেছি—আচ্ছা ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো।

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (সিমলা)

খুকু! essay প্রতিযোগিতায় আর ডিবেট কম্পিটিশনে তুমি প্রথম হয়েছে জেনে সুখী হলাম। পরীক্ষার জন্য বেশ ভাল ভাবে তৈরী হও নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। সত্যিই ভাই তোমাদের হাসি দেখলেই আমাদের সার্থকতা।

নক্ষত্র রায় (দেওঘর) ১১২৯

তোমার নতুন চিঠি ও মতামত পেলাম। প্রত্যেকমাসে ছবির রং বদলান সম্ভব হবে কিনা তা এখন বলতে পারিনা--তবে বাইরেটা না দেখে ভিতরটা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করো ভাই বুঝলে? ভাষা আর হাতের লেখা তোমাদের—আমায় কষ্ট দেয় না ভাই আনন্দই দেয়—যে রকমই হোক না কেন।

অবনী কুমার বসু (আলিপুর)

গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলে গেছ কেন ভাই? তোমার হাতটা সেরেছ তো? প্রীতিসম্মিলনী কবে হবে বা শীঘ্র হবে কিনা তার ঠিক নেই এখন ভাই।

সাধনা সরকার (গৌহাটী) ৭৬৫

অনেকদিন পরে যে কি ব্যাপার? পাশের বাড়ীর ইন্দিরাদি'র খবর তোমরা অনেকে জানতে চেয়েছ—খবর তাঁর ভালই, তবে স্থানের সঙ্কুলান হচ্ছে না তাই অদর্শন। তিনি তোমাদের সকলকে বিজয়ার ভালবাসা জানাতে বলেছেন এই চিঠির বাক্স মারফৎ।

সুজাতা রক্ষিত (দেওঘর) ৮৩০

তোমায় কোনঠাসা আমরা করিনি—তুমি তো অনেকদিন ভুলে ছিলে। যাক এখন বেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছ তো? দেওঘরে কি একলাই আছ? সারাদিনের তোমার কাজ কর্ম্ম বা পড়াশুনার অবসর কি ভাবে ব্যয় করো?

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮২৩

তোমার বই এর নামগুলি শীঘ্র পাঠাবার চেষ্টা করছি। তোমার প্রশ্নগুলি কি লিখো।

শিবানী সরকার (কলিকাতা) ৪০৮

তোমার চিঠিটা আমি দেরী করে পেয়েছি ভাই। তোমার মতামত সব পড়লাম। পরীক্ষার জন্য ভয়কি ভাই, উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ঠিক। রংমশাল আর তোমার জন্মদিন একদিনে বলেই তুমি তাকে অত ভালোবাসো বুঝি? শিবানী সিংহের ঠিকানা তোমায় পাঠিয়ে দেবো—নিশ্চয় সে আলাপ করবে—সেও বড় লক্ষ্মী বোন আমাদের—অর্থাৎ তোমাদের বোন হবার উপযুক্ত।

মনিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ৫৭৭

রাগ তোমাদের উপর করতে পারিনা একথা তো বহুবার বলেছি ভাই। প্রণাম ভালবাসা বা যা কিছু তোমরা পাঠিয়েছ সব গ্রহণ করেছি। তোমার পুরস্কারের কথা বলবো।

হৃষীকেশ দে (সিলেট) ৭৫৩

ভাইফোঁটার কথা তো জানিয়েছি আগে। পথে বিপথের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে দেখা যাক কি হয়। যথাদিনে তোমাদের স্নেহাশীষ জানিয়েছি।

শতদল দাস. পিণ্টু মিণ্টু সুরথ বসু, মনোরঞ্জন বসু মল্লিক, তরুণ ঘোষ, লীলা ব্যানার্জ্জী, অরুলেন্দু দত্ত, সুনীল কুমার দত্ত, দীপকরঞ্জন গুহ, সুনন্দা গুহ, প্রিয়কান্ত বসু, দেশরঞ্জন ঘোষাল, জ্যোতি ভদ্র রেবা ভদ্র—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি, উত্তর দেবার বিশেষ কিছু নেই ভাই, যে যা বলেছ সব করবার চেষ্টা করবো। মেদিনীপুর থেকে বিমল দত্ত যে পত্রিকাখানির সম্বন্ধে লিখেছ সম্ভবত সেটী অধুনালুপ্ত মাসিক।

পূর্ব্বেকার যে সব চিঠি বাকী ছিল—এবারে স্থানাভাব হলেও সেগুলির উত্তর আগেই যেতো—কিন্তু আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি যে সেগুলি আমি কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনা বলে। উত্তর দিতে পারলাম না, আমি এজন্য নিজে ভয়ানক লজ্জিত ও দুঃখিত ভাই। তোমরা আমায় ক্ষমা করো।

আমার স্নেহ ভালোবাসা সকলে নিও।

ইতি—শুভার্থিনী

তোমাদের—

দিদিভাই

জাপানী মেয়ে

ভিক্টর নাগ

আমার চিঠি

রংমশালের পাঠক-পাঠিকা আমার বন্ধুরা,

যুদ্ধের বাজার, ওলট পালটের মরশুম। রংমশালের রুটিনও ঠিক রইল না। পড়ুয়াদের পাঠশালায় তুটি মাস লেট হাজির।

কাগজ নেই, কাগজ আসে তো সেদিন হঠাৎ মুখ ভার করে' গ্যাঁট হয়ে বসে রইল, নড়েনা চড়েনা, সাদা কাগজে কালির আঁচড় পড়ে না। হল অঘ্রাণের সংখ্যা লেট। পৌষের সংখ্যার গল্পটাও অনেকটা এই রকম তুর্ভোগের কাহিনী।

ফলে এবার নেই চিঠির বাক্স, নেই ধাঁধা। দেরী করে পত্রিকা বেরোল—দিদিভাই চিঠি পেলেন তুটী একটী। তবে চিঠির বাক্স আর কখনই বাদ যাবে না।

ধাঁধা শব্দচৌকি সব সামনের বারের জন্য তোলা রইল।

আমাদের অসুবিধা তোমরা একটু বুঝতে শিখো। আর গালমন্দ—মাঘ সংখ্যার জন্য গালমন্দ মুলতুবী থাক। আমাদের ব্যাড্ কন্ডাক্ট যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তো মাঘের শীতে সম্পাদকের দপ্তরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিও।

তোমাদের সম্পাদক

আকাশের দেশে

শিল্পী

ভিক্টর নাগ

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ | পৌষ ১৩৪৬ | তৃতীয় সংখ্যা

—চট জলদি কবিতা—

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

—"ভট্চায্, ভোরে ভোরেই যে আজ ?"
—"আছে হে চাটুয্যে, আছে কিছু জরুরী কাজ !"
—"এক টান দিয়ে যাও, ডাক দিক্‌না কাক্ !"
—"না কর্ত্তা আজ মানৎ করেছি স্বপাক !"
—"আহা, বলেই যাও না কোথা কে গমন ?"
—"কিঞ্চিৎ মুর্গির প্রয়োজন !"
—"তা ওদিকে যাচ্ছ কোন্ বাগে
মুদীর দোকান ঐ যে আগে
মুড়কী বেচেন মধুসূদন
ব্যস্ত কেন বসে যাও, মুড়কী হবে এখন !"
—"না কর্ত্তা বসবার সময় নেই
কাক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই
জোগাড় জাগাড় করে করা চাই স্বপাকে রন্ধন।"
—"রন্ধন করবে স্বপাকে মুড়কী—এমন তো শুনিনি কখন !"
—"মুড়কী নয়, মুড়কী নয়—কিঞ্চিৎ মুর্গীর প্রয়োজন !"
—"আহে তাই কও, কিঞ্চিৎ সুরকির প্রয়োজন—
আমি বলি স্বপাকে মুড়কী, সে আবার কেমন ?
যাও, ও বেলা একবার যেন পাই দর্শন।"

গল্পের আরম্ভ

মাত্র কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও গল্প শুনিবার আশায় ছেলেমেয়েদের দৌড়াইতে হইত তাহাদের দিদি-মাদের নিকট। নিতান্ত কড়া মেজাজের বৃদ্ধেরাও তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইত না। শিশুদের, কিশোর কিশোরীদের, সমগ্রভাবে মানুষের গল্প শুনিবার প্রবৃত্তি জন্মগত, গল্প তাহাদের চাই।

আজ আমাদের দুই চারিটি বা বহুল পরিমাণে নিটোল, নিখুঁত গল্পের জন্য অন্যের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয় না, রাস্তায় পা বাড়াইলেই বই-এর দোকান, নানা রকমের রঙীন চিত্র-বহুল গল্পের বইয়ে আলমারি ঠাসা। মন খারাপ হইলে, অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ি হইলে বা নিছক সময় কাটাইবার প্রয়োজনে আমরা ইচ্ছামত টাটকা, আনকোরা গল্পের বই ঘরে বসিয়া পাইতে পারি। কি অদ্ভুত সব গল্প! যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী কাহিনী, ঘুম-পাড়ানি রূপকথা, শরতের পরিষ্কার আকাশের মত ঝলমলে কত কৌতুককাহিনী! কত রকমের ছাপা, কত বিচিত্র তাহাদের বাঁধাই!

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে—যখন এমন পরিষ্কার, সাদা ঝকঝকে কাগজ ও মূল্যবান কালিকলমের কথা লোকে ধারণাও করিতে পারিত না তখনও গল্পের প্রচলন ছিল, গল্প করিবার এবং শুনিবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা আদিম মানুষের মধ্যেও দেখা যাইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাহাদের জীবন-কাহিনী আমরা জানিতে পারি,—এখন, এই এতদিন পরে আমরা যাহাদের অসভ্য জাতি বলিয়া অভিহিত করি তাহারা বাস করিত গভীর অরণ্যে, পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় কাটিত তাহাদের দিন। শীতকালে ঠাণ্ডা যখন অসহ্য, জন্তু জানোয়ারের চামড়া দ্বারা কোন প্রকারে নিজেদের আবৃত করিয়া রাখিতে বাধ্য হইত। পাথর ঠুকিয়া যে আগুন জ্বলিত—সে-আগুনে কাঁচা মাংস পোড়াইয়া খাওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় যাহাদের ছিলনা তাহাদেরও গল্প করিতে ভালবাসা স্বাভাবিক।

ছাপাখানা মাত্র এই কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বের, কিন্তু তারও বহু আগে গল্পের চলাচল ছিল সন্দেহ নাই। জীবজন্তু শীকার বা অন্য আর এক দল মানুষের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রাম-কাহিনী তাহারা রং ফলাইয়া বলিত নিজেদের লোকের কাছে। আবার তাহারাও অন্য আর এক দলের নিকট সে-সব বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিয়া অতিশয় আনন্দ পাইত এ তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার। এমনি ভাবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আজও এমন অনেক গল্প পৃথিবীর সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। লিখিবার সরঞ্জাম এবং পদ্ধতির বিষয় সম্বন্ধে যখন লোকের কোন কিছুই জানা ছিল না তখন লোকে তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখিয়া রাখিত পাথরের উপর। অনেক পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে রাজা অশোক বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি সমস্ত দেশময় পাথরের উপর খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন—যাহাতে সহজেই জনসাধারণের চোখে পড়ে। উচ্চ প্রকারের শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কার লইয়া যে আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহারা বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়া অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। অতি প্রাচীন গ্রীক, রোমান এবং জার্ম্মানদের ইঁহারাই পূর্ব্বপুরুষ।

ইহাদের আদি সাহিত্য বেদের সূত্রাবলি। খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব এই সমস্ত সূত্র ভাল পাতায় লেখা হইয়াছিল।

ইংরাজীতে বলা হইয়াছে **Language is the mirror of Civilisation** অর্থাৎ ভাষা সভ্যতার আয়না; আমরা যে পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করিয়াছি তাহার প্রমাণ আমরা কথা বলিয়া একে অন্যের নিকট

আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ দুঃখের কাহিনী স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি। চিন্তা করিবার বিষয় মানুষের জীবনে যত বৃদ্ধি পাইয়াছে ধীরে ধীরে ভাষাও তত শব্দবহুল হইয়া পরিধি-লাভ করিয়াছে।

গল্পের ভাষাও বদলাইতেছে। ভাষার বিস্তৃতির সঙ্গে গল্প ক্রমশঃ সুন্দর এবং চিত্তগ্রাহী হইয়া উঠিতেছে। ছাপাখানা এবং কাগজ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে গল্প ফিরিত লোকের মুখে মুখে। মনের মধ্যে যখন কোন ভাব চঞ্চল হইয়া উঠে তখন লোকে শুধু মৌখিক কথোপকথনে সে ভাব ব্যক্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। কোন একটি নিগূঢ় চিন্তা যখন আমাদের মনকে অহরহ দোলা দিতে থাকে তখন আমরা কাগজ কলম লইয়া বসি। প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরও এ সহজাত প্রবৃত্তির নিদর্শন আমরা পাই। হাতের কাছে লিখনযোগ্য কোনকিছু যথা পাথর, কাঠ, পরিষ্কৃত মেষ বা ছাগচর্ম্ম—যাহা তাহারা পাইত তাহার উপরেই অস্পষ্ট, কদাকার অক্ষরে লিখিয়া রাখিত জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। আমাদের দেশে তালপাতায় লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল ইহা তোমরা জানো। খুব ছেলেবেলায় আমাদের মনে আছে—আমরা কলা পাতায় লিখিয়া লিখন-অভ্যাস করিতাম।

ভাষা সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের জন্ম। কথা বলিবার সর্ব্বোপরি রং চড়াইয়া অভিজ্ঞতার কাহিনী তাহার পরিচিতদের মধ্যে বর্ণনা করিবার মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। এই রং চড়াইয়া, বাড়াইয়া, ফাঁফাইয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তিই পৃথিবীতে গল্প সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিতেছে।

বনে জঙ্গলে যে সমস্ত আদিম মানুষের বাস ছিল তাহারা যে রাত্রে স্ত্রীপুত্রদের নিকট বসিয়া সমস্ত দিন জীবজন্তু শীকারের কাহিনী সকল না বলিত এমন নহে। হয়ত কেহ নূতন কোন আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর জিনিষ দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার দলের লোকের নিকট সত্যমিথ্যা আরও অনেক কিছু কল্পনা করিয়া সে কাহিনী বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ সে কিছুতেই করিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে কেহ আবার সুযোগ পাইলে দূর দেশে গিয়া সে কাহিনী বর্ণনা করিত। এমনি করিয়া লোকের মুখে মুখে এ-স্থান হইতে সে-স্থানে গল্পের চলাচল ছিল।

চৌরাস্তার মাথায় তুমি হয়ত দেখিয়া আসিলে একটি ছেলে মোটর চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল, আর একটু হইলে গাড়ীর চাকা তাহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত সন্দেহ নাই। তুমি বাড়ী আসিয়া তোমার ছোট ভাইকে বলিলে—"জানিস? যা একখানা এ্যাকৃসিডেণ্ট দেখলাম কি বলবো? একটি দশ এগারো বছরের ছেলে রাস্তা পার হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একখানা মোটার এসে পড়লো তার গায়ের ওপর, মোটারটা এগিয়ে গেল কয়েক হাত, ছেলেটাকে আর দেখা গেল না, শুধু দুম্ করে একটা প্রকাণ্ড শব্দ শোনা গেল! চাকার তলায় দেখছি ছেলেটার অবস্থা, ফুটপাতে কান্নার শব্দ হতে তাকিয়ে দেখি ছেলেটা কাঁদছে! গাড়ীর বাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছেলেটা ছিটকে ফুটপাতে এসে পড়েছে! ওঃ এক চুলের জন্যে বেঁচে গেছে!"

তোমার ভাই তার এক বন্ধুকে গল্পটি বলিতেছে, "কোলকাতায় গাড়ী চাপা পড়েই রোজ হাজার হাজার মরছে! আর বলিস কেন ভাই, পাড়াগাঁর এক ছেলে গাড়ীর তলায় পড়ে একেবারে কাগজ হয়ে গেছে! রাস্তায় কি আর হাঁদার মত ছুটোছুটি করতে আছে! হচ্ছিল রাস্তা পার, একেবারে বিরাট একখানা মাষ্টার বুইকের তলায়, প্রথমে সামনের বাম্পারে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো দশ হাত দূরে, যেই উঠতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকা একেবারে বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে, তারপর আর মানুষ বলে চেনা যায়না, এক তাল রক্তাক্ত মাংস!"

আসল ঘটনা ক্রমেক্রমে রূপান্তরিত হইয়া কেমন করিয়া নিরেট একটি গল্পে জমাট হইয়া উঠে তাহার

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। এমনি প্রত্যহ হাজার হাজার মৌখিক গল্প এখান হইতে সেখানে, এ-পাড়া
হইতে সে-পাড়া, এদেশ হইতে সে-দেশে ঘুরিতে থাকে !

খবরের কাগজওয়ালারা একটুখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছোট খাটো ঘটনার জন্যে অহরহ দেশ বিদেশে ঘুরিয়া
বেড়াইতেছে। কিন্তু একটা দেখিলে বা শুনিলেই হইল, অমনি দেখিতে দেখিতে ফাঁদিয়া উঠিল বিরাট,
রোমাঞ্চকর এক গল্প। শুধু গল্পের জন্যে ভয়সঙ্কুল, অগম্য, কত দূর দেশে বিপদের মুখে তাহারা ঝাঁপাইয়া
পড়ে সে তোমরা ধারণাও করিতে পারিবে না। বিলাতে এক একটি বিখ্যাত পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ শুধু গল্প
সংগ্রহ করিবার জন্য এমন কত লোককে টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীতে গল্পের কি চাহিদা এক-
বার ভাবিয়া দেখ ! এমন কি খবরের কাগজেও আমরা গল্পের সন্ধান করি ! আগেই পাতা উল্টাইয়া দেখি
আজগুবি, অসম্ভব কোন সত্য ঘটনা কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।

যে কোন গল্পই শোন আর যে কোন গল্পের বই পড় দেখিবে প্রায় সমস্ত ঘটনাই সুসংবদ্ধ। পরিষ্কার
একটি বিষয়-বস্তু, অল্পসংখ্যক কয়েকটি চরিত্রের সমাবেশ, কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের
আবির্ভাব সংক্ষিপ্ত কার্য্যকলাপ এবং একটি সম্পূর্ণ পরিণতি, এমনি ভাবেই আজকাল গল্প লেখা হইয়া থাকে।
দেশ বিদেশের বিখ্যাত গল্প-লেখক সাহিত্যিকগণ কি ভাবে লিখিলে এবং কি কি পন্থা অবলম্বন করিলে সত্যি-
কারের ভালো গল্প হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সেই আদিম যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর আজিকার
দিন পর্য্যন্ত গল্প ক্রমশঃ ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। আজকাল লোকে বলিয়া দিতে পারে বিষয়
বস্তু, ভাষা, ঘটনা-বিশ্লেষণ, একটা চরমতম আবেগ এবং পরিণতি কি প্রকার হইলে ভালো গল্প হয়।

কিন্তু সভ্যতার পূর্ব্বে এত কাণ্ড করিবার যে গুহাবাসীদের সময় ছিলনা একথা তোমরা সহজে বুঝিতে
পারো। তারও অনেক পরে যে সকল গল্প রচিত হইত তাহা লোকের সৎবুদ্ধি এবং চরিত্র গঠনের সাহায্য
করিয়াছে। পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশের গল্প পড়ে নাই এমন একজন ছেলেমেয়েও বোধহয় বাংলা দেশে নাই।

এই সমস্ত গল্প নীতিবহুল। সুন্দর গল্পের ভিতর দিয়া আমরা উপলব্ধি করি জীবনের কোন একটা
কঠিন সত্য ; বিচার করিয়া দেখিতে পারি ভালো এবং মন্দ। পুরাকালের মনীষীগণ গল্পের মধ্যে সমাজে
প্রচার করিতেন চরিত্রগঠনোপযোগী নীতিকথা, সৎবাণী।

আমাদের শাস্ত্রপুস্তকেও আগাগোড়া গল্পের ছড়াছড়ি। বাইবেলের গল্পও তোমরা কিছু কিছু পড়িয়াছ
আশা করি।

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পুরাতন গল্পের অধিকাংশ বিষয়বস্তু জীব-জন্তুকে লইয়া।
ইহার কারণ তখন মানুষের জীবন ছিল অনেক স্বাভাবিক। সভ্যতা এত বৃদ্ধি পায় নাই। বিদ্যুৎ, বেতার,
টেলিফোন আর বিরাট অট্টালিকা-সদৃশ বাড়ীঘর তখন ছিল না। মানুষ স্বাভাবিক ভাবে সহজ উপায়ে
জীবনধারণ করিত, সেই জন্যই জীব-জন্তুর প্রভাব তাহাদের জীবনে এত বেশী।

গল্পের ক্রমবিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। আধুনিক মতে সত্যিকারের উৎকৃষ্ট গল্প কোন্ কোন্
বিষয় থাকিলে হয় তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

গল্পে থাকা উচিত একটা সুসংবদ্ধ ঘটনা, তাহার একটা ক্রমিক পরিণতি, মাঝখানে থাকিবে একটা
crisis, (অর্থাৎ সোজা ভাষায় এস্পার কি ওস্পার হইবার একটা চরম সময় !), তারপর শেষকালে একটা
মোচড় বা প্যাঁচ, ব্যস্ তাহা হইলেই একটি পাকা গল্প।

চেষ্টা করিয়া দেখিবে নাকি একবার ?

রজত সেন

আপন বুড়ো

স্বপন দেশের আপন বুড়ো ফোঁকলা দাঁতে হেসে,
বললে এসে রাতদুপুরে একটুখানি কেশে :

বুড়ো

‘কলম হাতে জীবনটা ভোর করবি কেন দাদা ?
‘এর চেয়ে ঢের ভালো জানিস সারে গা মা সাধা।
‘আয়না দাদা কলম ফেলে স্বপন-নায়ে চড়ে’
‘স্বপন ভুলে কলম্‌চী ভাই রইবি ঘরে পড়ে’ ?’

কবি

‘লিখবো ছড়া লিখবো নাটক চলবে কলম হু হু,
‘থামবে না হাত মৌয়া গাছে ডাকলে কোকিল কুহু !’

বুড়ো

‘বন্ধ ঘরে কবিতা তোর জমবে বুঝি ভালো !
‘আয়না সাথে আকাশভরা ক্ষ্যাপা চাঁদের আলো।
‘পূর্ণিমাতে জোয়ার এলো জ্যোৎস্না ভেসে যায়,
‘তারার আখর কে লেখে রে আলোর কবিতায় !
‘এই আলোতে লেখ্ না এসে কবিতা তোর দাদা !
‘বন্ধ ঘরের কবিতা তোর পড়বে বা কোন্ হাঁদা !’

কবি

‘পড়বে উকিল, পণ্ডিতেরা পড়বে রাজামশাই !
‘সখ হয়েছে লিখে যদি মস্ত খেতাবটা পাই !’

বুড়ো

‘পরীরা সব আসবে জানিস ! আসবে পরীরানী
‘আকাশ ভরে উঠবে বেজে হাওয়ার বাঁশীখানি।
‘বৌ কথা কও সুর দেবে শোন্ চাঁদনী রাতের গানে,
‘মিশে যাবে নীল সায়রের জলবালাদের তানে।
‘হেথায় এসে গান ধরে’ দে মিলবে উপহার
‘চাঁদনী রাতে পরীসভার হাসির অলঙ্কার !’

কবি

'হাসি খুসির দাম বুঝি না পয়সা ফেলে খাই,
'রাজামশাই করে' দেবেন এবার কে, সি, এস, আই।'

বুড়ো

'আলোর রাজা, জানিস কে সে ? শুনিসনি তার নাম ?
'আলোর রথে পৌঁছে যাবেন, দেশটা গোলোক ধাম !
'গোলোক ধামের তলায় ফোটে আলোর স্বপনলতা,
'স্বপনলতায় ফুল ফোটে আজ লক্ষ তারার কথা।
'তারার আলোর মাঝে দোলে চাঁদ্‌নী আলোর ঝাড়।
'পরীরা সব দেখ চেয়ে ঐ জানায় নমস্কার !
'রাতের পাখী গান ধরেছে, শুক্তি নায়ে ভেসে,
'জলবালারা তান ধরেছে আলোর রাজার দেশে।
'রাতজাগা সব রাখালেরা বাঁশের বাঁশীর সুরে,
'আলোর রাজায় 'বন্ধু' বলে ডাক পাঠালো দূরে।
'আলোর সভার কবি হবি ? কলম ফেলে আয়,
'জ্যোৎস্না ধারায় আলোর নদী বন্যা বহে যায়।'

কবি

'মিছে মেলাই বকিস কেন ? রাত হয়ে যায় ঢের,
'কচকচানি থামাও বুড়ো, মুখ খুলোনা ফের।
'আলোর রাজা চুলোয় যাবেন ? যেতে পারেন তিনি,
'চাঁদনী রাতের ইয়ার্কি থাক ! সময় ছিনিমিনি।
'রাজামশাই গীধর সিংয়ের বড় ছেলের বিয়ে
'রায়সাহেবী বাগিয়ে নিই তুসের লেখা দিয়ে।
'লাট্টু লাটের হাঁচির দিনে নসের লেখা চাই,
'গোল কোরো না' কে,সি,এস,আই' চাই-ই আমার চাই।'

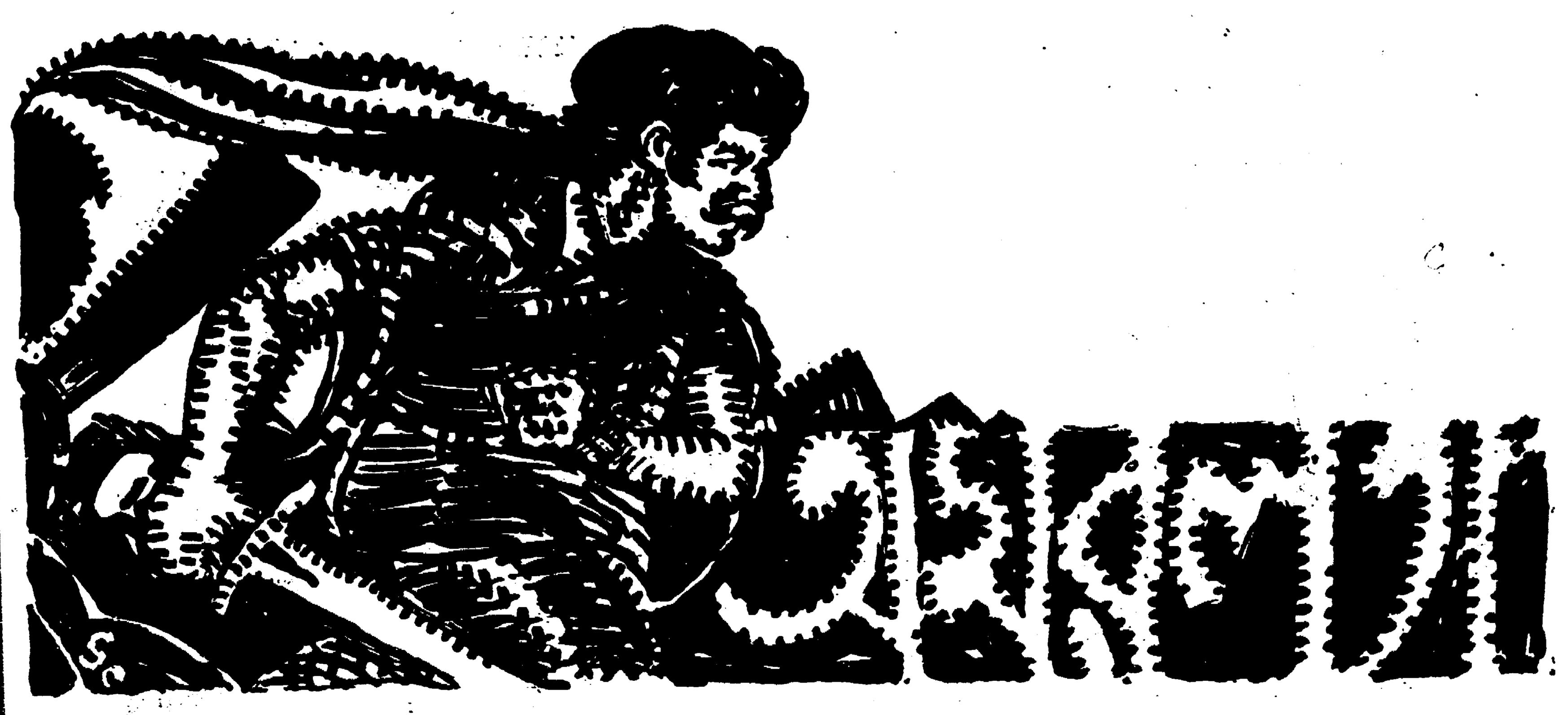

শ্রীসতীকান্ত গুহ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কি ভেবে কুণ্ডলের মুখ হঠাৎ কুৎসিত একটা নরম হাসিতে ভরে' গেল। তরোয়াল খাপে পুরে' সে খক্ করে' একটু কেশে বললে, 'বীর বজ্রনাথ ! কী আহম্মক আমরা ! বন্ধু বলে যেখানে আলিঙ্গন দেওয়া উচিত, সেখানে আমরা দিতে যাচ্ছি তরোয়ালের কোপ !'

বজ্রনাথের ভ্রূকুঞ্চিত হল।

কুণ্ডল বললে, 'বীর বজ্রনাথ ! ভেবে দেখুন, আমার কথার অর্থ খুঁজে পাবেন।'

বজ্রনাথ ধীরস্বরে বললেন, 'তুমি বলতে যাচ্ছো কুণ্ডল—'

'আমি বলতে যাচ্ছি, আমরা তিনজন মূর্খের মত হানাহানি করে' মরি কেন ? তার চেয়ে তিনজন জোট বাঁধি।'

'তারপর'—বজ্রনাথ প্রশ্নের স্বরে বললেন।

'তারপর—তারপর হটিয়ে দিই কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণের অভিযান, ব্যর্থ করে' দিই মহর্ষি পিঙ্গলের মনস্কাম !'

'কিন্তু তার-ও পর—' বজ্রনাথ সন্দেহ সংশয়ের সুরে বললেন।

'তার-ও পর—তার-ও পর বীর বজ্রনাথ ও সয়তান কুণ্ডলের ভিতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়ে' যাক, কে জেতে কে হারে। অদৃষ্ট যার কপালে জয়রেখা এঁকে দিয়েছেন সবুজদ্বীপে গিয়ে অমরলতা জয় করুক সে।'

'কিন্তু সেই যুদ্ধটা থেকেই যায় কুণ্ডল—আলিঙ্গন শেষে মৃত্যু-আলিঙ্গন হয়ে দাঁড়ায়।'

-'তবু, ব্যাপারটা কত সহজ হয়ে যায়, ভেবে দেখুন বজ্রনাথ। কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে সরিয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তমনে পরস্পরের টুটি টিপে ধরতে পারি—আমাদের ভিতরকার লড়াইটা কত সোজা হয়ে যায় !'

'আর এই পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুব আহম্মদ! এ কি তলোয়াল খাপে পুরে সারাক্ষণ বসে বসে ঝিমোবে বলতে চাও কুণ্ডল!'

'আপাততঃ ইয়াকুব আহম্মদের ঝিমোনোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের সঙ্গে সমানে তিনি কালীভূষণকে আক্রমণ করবেন। কালীভূষণ-ইতিকাহিনী ফুরোবার পর ইয়াকুব খানিকটা ঝিমোবেন—এই ফাঁকে আমরা দুজন আমাদের ভিতরকার লড়াইটা সেরে ফেলব। লড়াই যিনি ফতে করবেন তিনি ইয়াকুবকে দিল্লীর বাদশাহী তক্তে বসিয়ে দেবেন। তারপর ধীরে সুস্থে সবুজদ্বীপে রওনা হবেন।'

বজ্রনাথ গম্ভীর হেসে বললেন, 'কিন্তু ধরো কুণ্ডল, এই দুর্দ্ধর্ষ পাঠান রাজপুত্রটিকে যদি অমরলতার নেশা পেয়ে বসে, কালীভূষণকে সরিয়ে যদি তিনি কুণ্ডল ও বজ্রনাথকেও সরিয়ে ফেলতে চান!'

কুণ্ডল খক্ করে' কেশে বললে, 'আপাততঃ অমরলতার প্রতি পাঠান রাজপুত্রের বিন্দুমাত্র লোভ নেই। দিল্লীর বাদশাহী তক্তের জন্য রাজপুত্রের মনটা ছটফট করছে। এই ছটফটানি থামতে থামতে সবুজদ্বীপে হয় বীর বজ্রনাথ নয় এই তুচ্ছ কুণ্ডল গিয়ে জাহাজ বাঁধতে পারবে।'

দিল্লীর বাদশাহী তক্তের নামে ইয়াকুব আহম্মদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কুণ্ডলের মুখে একটা কুৎসিত হাসি খেলে গেল, আর বীর বজ্রনাথ একবার সাম্রাজ্যলোভাতুর রাজপুত্রের মুখখানা দেখে নিলেন।

পাঠান রাজপুত্রের জাহাজে বসে ভারত ইতিহাসের এই তিনটি মহালোভী একটা বিরাট ষড়যন্ত্র পাকাপাকি করে' নিলেন। তিনজন তিনজনের ডানহাতের কব্জি থেকে রক্তের ফোঁটা এনে কাগজের তলায় নাম স্বাক্ষর করে' দিলেন। কুণ্ডলের মুখে কালোবিদ্যুতের মত একটা কুটিল হাসি থেকে থেকে ঝক ঝক করতে থাকল, রাজপুত্র ইয়াকুব আহম্মদ বাদশাহীতক্তের স্বপ্নে একেবারে ডুবে গেলেন, তার সুন্দর সুকুমার মুখে সাম্রাজ্যস্বপ্নের বজ্র-মেঘ থেকে থেকে যেন একটা আশ্চর্য্য ছায়া ফেলতে লাগল। আর বীর বজ্রনাথ— হঠাৎ বীর বজ্রনাথের বুক যেন কেঁপে উঠল, হৃদ্‌পিণ্ড যেন ধরফর করে' উঠল, দূর দূর বহুদূর হতে, বিদ্যুৎ-মেঘেরও বহুদূরে, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের বহু উর্দ্ধে সহস্রলক্ষ কোটি কোটি যোজন দূর হতে, অন্তরীক্ষের অফুরন্ত শেষ হতে, অসীমের অনাবিষ্কৃত প্রান্ত হতে কোন্ এক উজ্জ্বল আশ্চর্য্য পুরুষ ভ্রূভঙ্গ করে' বললেন, 'মূর্খ! মূর্খ বজ্রনাথ।' বজ্রনাথ কেঁপে উঠলেন, চুক্তিপত্রের তলায় নাম স্বাক্ষর করতে গিয়ে তিনি যেন থতমত খেলেন, লিখলেন শুধু বজ্রনাথ—বীর কথাটা বাদ পড়ে' গেল।

কুণ্ডল খক্ করে কেশে ধূর্ত্তকণ্ঠে বললে, 'তাহলে দেখছি বজ্রনাথ বীর হবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পেরেছেন।'

চমকে উঠে বজ্রনাথ বীর কথাটা নামের আগে বসাতে গেলেন। কিন্তু কে যেন তাঁর হাত চেপে ধরল। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে বাধা দিল, কে যেন তাঁর ভিতর থেকে কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল, 'লিখনা, লিখনা, তুমি বীর নও, বীর নও, তুমি—'

বজ্রনাথ তাঁর বুকটা চেপে ধরে শেষ কথাটা যেন থামিয়ে দিলেন। বজ্রনাথ কারও পানে না তাকিয়ে চুক্তিপত্রটা কুণ্ডলের হাতে দিতে দিতে ক্লান্তস্বরে বললেন, 'শুধু বজ্রনাথই থাক।'

পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুব বিস্মিত হলেন, কিন্তু কুণ্ডল বিস্মিত হল না।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এখন শুধু রাতটা একবার হলে হয়।

রাখাল আর ভূতোর হাতগুলো বুঝি নিশপিশ্ করতে থাকে সিঁদকাঠি নাড়বার জন্যে। এমন সুবিধে কি আর হয়। একটা থালা সরাতে পারলেই ত জন্মের মত আর ভাবনা নেই। পায়ের ওপর পা দিয়ে দিন চলে যাবে। একটার বদলে এখানে ত থালার কাঁড়ি—সোণার থালার পাহাড়!

একটা থালার সোণা বেচলেই ত পায়ের ওপর পা। এতগুলো থালার সোণা পেলে কি যে হবে সে বিষয়ে ভূতোর রীতিমত ভাবনা ধরে যায়!—এত ঐশ্বর্য্যি নিয়ে করব কি বল্‌ত!

কি যে করবে তা রাখালও ভাল করে ভেবে পায় না। তবু ভূতোর ওপর সে চটে উঠে দাঁত খিঁচোয়—শোনো কথা! সোণা নিয়ে করব কি! রাজার মত খাব দাব ফুর্ত্তি করব।

রাজার মত খাওয়াটা যে কি ভূতোর সে বিষয়ে ঠিক ধারণা নেই। তবু এইমাত্র যে রকম খাবারের নমুনা চেখে এসেছে রাজার খাবার সেই রকম একটা কিছু হবে বলে সে ধরে নেয়, কিন্তু সোণার কাঁড়ি তাতেও যদি না ফুরোয়!—তখন!

তখন তাল তাল করে সোণা জমাব বুঝেছিস ঘর ভর্ত্তি সোণা—রাখাল তাকে বুঝিয়ে দেয়।

শুধু জমাব!—কিন্তু চুরী যদি কেউ করে নেয়!—ভূতো জিজ্ঞাসা করে।

রাখাল খেঁকিয়ে ওঠে—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। আমাদের কাছ থেকে চুরী করবে সোণা! সাত ডুব দীঘির তলায় যখ্ দিয়ে পুঁতে রাখব না!—কে ছোঁবে সে সোণা!

সোণা যদি পুঁতেই রাখল তবে তাতে আর লাভ কিসের, ভূতো ঠিক বুঝতে পারে না। তবু রাখালের কাছে দাঁত খিচুনি খাবার ভয়ে আর সাহস পায় না কিছু জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু রাত যেন আর হতে চায় না। এদিক ওদিক ঘুরে আজব দেশের নানা তাজ্জব ব্যাপার দেখেও রাখাল আর ভূতোর সময় যেন আর কাটে না। আর খুব বেশী মেলামেশা করে সব জায়গা দেখাশুনো করতে তারা ভরসাও পায় না। কোথায় কে চিনে রেখে দেবে কে জানে। তারা ঘোরাঘুরি করে,—কিন্তু আনাচে কানাচে।

রাত যদি বা হ'ল তবু এ পোড়া রাজ্যের মানুষগুলো যেন ঘুমোতে জানে না। এখানে গান ওখানে বাজনা, সেখানে হাসি হট্টগোল;—আড়াই প্রহরে চাঁদ না ডোবা পর্য্যন্ত তাদের ফূর্ত্তির আর কামাই নেই।

জ্যোৎস্না গিয়ে সব অন্ধকার হবার পর ক্রমশঃ সব যেন নিশুতি হয়ে এল।

রাখাল ভূতোকে ঠেলা দিয়ে বলে—এইবার!

ভূতো রাস্তায় ঝোপের ধারে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল—উঠে হাত তুলে বলে—কি!

রাখাল চাপা গলায় যতদূর সম্ভব খিঁচিয়ে ওঠে—কি তা জান না আহাম্মুখ, এইবার যেতে হবে না।

ওঃ, তা হবে বটে!—ভূতো উঠে পড়ে কিন্তু কেমন যেন তার আর গা নেই। রাখালের সঙ্গে হোটেলখানার দিকে যেতে যেতে একবার বলেও ফেলে—আচ্ছা, আজ আর কষ্ট না করলে হয় না?

অ্যাঁ!—রাখাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। হল কি ভূতোর! ব্যাঙের জলে ব্যাজার! বেড়ালের মাছে অরুচি! মুখে বলে—বলিস্ কি ভূতো!

ভূতো যেন বড় লজ্জায় পড়ে যায়;—না এই বলছিলাম; ও হোটেলখানা ত আছেই, সোনার থালাও যাচ্ছে না। দুচার দিন বাদে যখন খুসী সরালেই ত হ'ত, ততদিন ঘুরে ফিরে জায়গাটা একটু দেখে নিতাম। একবার পুঁটলি বাঁধলেই ত গা-ঢাকা দিতে হবে, আর দেখা শোনা ত হবে না।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে ফেলে ভূতো হাঁপাতে থাকে, রাখাল প্রথমে হতভম্ব

তারপর তেতে আগুন হয়ে বলে,—তবে থাক তুই এইখানে, আমি একাই চল্লাম।

সিঁধকাটিটা কেড়ে নিয়ে সে সত্যিই হনহন করে এগিয়ে চলে। ভূতোকে এবার পিছু নিতেই হয় ভয়ে ভয়ে। ধমক খাবার ভয়ে আর কথাটী পর্য্যন্ত কয় না।

হোটেলখানার ঠিক পেছন দিকটাতে তারা গিয়ে ওঠে। তারপর বেশ অন্ধকার ঘুপচি একটা কোণ দেখে কাজ সুরু করে দেয় রাখাল। গুণীর হাতে সিঁধকাঠি যেন মাখনের গায়ে ছুরীর মত চলে, দেখতে দেখতে পুরু দেওয়ালের অনেকখানি পাতলা হয়ে গেল।

রাখাল নিজের বাহাদুরীতে খুসী হয়ে ওঠে। ভূতোর ওপর রাগটা তার এতক্ষণে পড়ে এসেছে। তাকে ডেকে বলে,—আর কটা খোঁচা দিলেই একেবারে কাজ হাসিল। তুই ততক্ষণ একবার চারদিক ঘুরে দেখে আয় দেখি। কোথাও কেউ জেগে আছে কিনা!

রাখালের রাগ পড়েছে দেখে খুসী হয়ে ভূতো টহল দিতে বেরোয়। না কোথাও কেউ জেগে নেই। কিন্তু চারিদিক ঘুরে হোটেলখানার সামনে এসে সে একেবারে অবাক।

হোটেলখানার দরজা ত হাট! কেউ বেরিয়েছে নাকি ভেতর থেকে! তাহলেই ত সর্ব্বনাশ!

একেবারে নিঃসাড়ে সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। কারু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যায় রাখালের কাছে ব্যাপারটা জানাতে।

রাখাল তখন কাজ প্রায় হাসিল করে এনেছে। ভূতোকে দেখে খুসী হয়ে চুপি চুপি বলে—পা বাড়িয়ে দেখ দিকি ভূতো।

ভূতো সভয়ে বলে—পা বাড়াবে কি? হোটেলখানার দরজা খোলা তা জান!

দরজা খোলা! বলিস্ কিরে!

ভূতোর আর জবাব দেওয়া হয় না। তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। তার ঠিক আগে রাখালের পেছনে একটা লোক কখন এসে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায়নি।

ভয়ে অবশ হাতপাগুলোর একটু সাড় ফিরতেই চোঁ চাঁ দৌড় দেবে না, ভালোয় ভালোয় ধরা দেবে ভূতো যখন ঠিক করতে পারছে না, তখন লোকটা হঠাৎ বলে—বাঃ বাঃ খুব হাতের কেরদানী ত! এই পাথরের মত দেওয়ালে এমন নিটোল ফাঁক!—কিন্তু এ আবার কি খেলা ভাই? রাত দুপুরে দেওয়াল ফুটো?

[ক্রমশঃ

অতীত কালের ঐশ্বর্য্য

শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত

ভারতের ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্রাট শাহজহানের রাজত্বকালেই পাওয়া যায়। প্রাচ্য রাজসিক ঐশ্বর্য্য গরিমায় ভারতবর্ষ বোধহয় সেই সময় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। আব্দুল হামিদ লাহোরীর সমসাময়িক ইতিহাস থেকে ১৬৪৮ খৃ সম্রাট সাজাহানের অর্থ-সম্ভারের একটা ঠিক ধারণা করতে পারা যায়। তখনকার টাকার দাম ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ২½ শিলিং অর্থাৎ আঠার আনার সমান।

এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে এখন এক টাকায় যে জিনিষ কিনতে পাওয়া যায় তখন এর সাতগুণ জিনিষ পাওয়া যেত।

সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যে কুড়ি কোটি টাকা খাজনা আদায় হত। সম্রাটের খাসমহলের আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। তা' হতে সম্রাটের নিজের খরচ চলত।

রাজত্বের প্রথম কুড়ি বছরে শাহ্জাহান দান ও পুরস্কার কার্য্যে ৯½ কোটী টাকা খরচ করেন তার মধ্যে ৪½ কোটি টাকা নগদ আর পাঁচ কোটী টাকার জিনিষপত্র।

প্রাসাদ সৌধ প্রভৃতি তৈয়ারে তিনি কি বিরাট অর্থ খরচ করেছিলেন তা নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে।

আগ্রার সৌধমালা :—	
তুর্গভ্যন্তরস্থ মোতী মসজীদ প্রাসাদ ও প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান	৬০ লাখ টাকা
তাজমহল	৫০ " "
প্রাসাদ সমূহ	৫০ " "
জুম্মা মসজীদ	১০ " "
দিল্লী নগরীর চারিদিকে প্রাচীর	৪ " "
দিল্লীর সহর তলীর ইদ্গাহ	½ " "
লাহোরের সৌধমালা :—	
প্রাসাদ উদ্যান ও খাল	৫০ " "
কাবুলের সৌধমালা :—	
মস্জীদ, তুর্গ, প্রাসাদ ও নগর প্রাচীর	১২ " "
কাশ্মীরের সৌধমালা :—	
প্রাসাদ ও উদ্যান	৮ " "

কান্দাহারের সৌধমালা :—	
কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের তুর্গ	৮ লাখ টাকা
আজমীরের সৌধমালা :—	
আজমীর ও আহ্মদাবাদ	১২ " "
মুখলিশপুরের সৌধমালা :—	
রাজপ্রাসাদ	৬ " "
যুবরাজ দারা শুকোর প্রাসাদ	২ " "
	মোট ২৭২½ লাখ টাকা

সম্রাটের পাঁচ কোটী টাকার হীরা জহরৎ ছিল। তা ছাড়া তুই কোটী টাকার হীরা জহরৎ শাহজাদা শাহজাদী ও অন্য সকলকে দান করেছিলেন।

সম্রাট নিজে মাথায় গলায় বাহুতে ও কোমরে যে সব গয়না পরতেন তারই হীরা জহরতের দাম ছিল তুই কোটী টাকা। সম্রাটের নিজ ব্যবহার্য্য তুই কোটী টাকা দামের রত্নালঙ্কার হারেমে দাসীদের জিম্মায় থাকত। বাকি তিন কোটী টাকা দামের রত্নালঙ্কার বাইরে ক্রীতদাসের জিম্মায় থাকত।

সম্রাটের জপমালায় পাঁচ খানা চুনি ও ত্রিশটি মুক্তো ছিল। জপমালাটীর দাম ছিল আট লাখ টাকা। এই জপমালাটী ছাড়া আরও তুটী জপমালা ছিল। তারও প্রত্যেকটীতে একশো পঁচিশটী করে বড় বড় চুনি ছিল। প্রত্যেক তুটী জপের দানার মাঝখানে একটি করে ইয়াকুতও ছিল। জপমালার সুমেরুটীর (মাঝখানের বড় রুবিটার) ওজন ছিল বত্রিশ রতি। আর তার দাম ছিল চল্লিশ হাজার টাকা। আর তুটো মিলিয়ে দাম ছিল কুড়ি লাখ টাকা। এই জপমালার রুবি প্রভৃতির বেশীর ভাগই সম্রাট আকবরের সংগৃহীত।

প্রথম জপমালাটীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্নাদি ছিল। পাগড়ী ঘেরা সরপেচ্ এ সবচেয়ে দামী ও বড় রুবিগুলি ছিল। সিংহাসনাধিরোহনের (জলস) বাৎসরিক উৎসবের দিন শুধু এই বহুমূল্য সরপেচ্ সম্রাট পাগড়ীতে ব্যবহার করতেন। এতে পাঁচটী বড় রুবি, চব্বিশটী মুক্তো ছিল। মাঝখানের বড় রুবিটীর ওজন তুশো আটাশ রতি ও দাম তুই লাখ টাকা। সরপেচ্টীর সর্ব্বসমেত দাম ছিল বারো লাখ টাকা। ১৬৪৪ খৃঃ ১১ই নভেম্বর এই সরপেচের সঙ্গে চল্লিশ হাজার টাকার একটী মুক্তো গেঁথে দিয়ে এর দাম আরও বাড়ান হয়। সম্রাটের নিজের হীরা জহরতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরার ওজন ছিল চারশো ত্রিশ রতি এবং দাম তুই লাখ টাকা।

এই রুবিটী অবশ্য শিরপেঁচের বড় রুবিটীর চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। আর একটী সাত-চল্লিশ রতি ওজনের রুবি ছিল সেটীর দাম ছিল তিপ্পান্ন লাখ টাকা। ১৬৫৩ খৃ ১২ই মার্চ্চ তারিখে সম্রাট সাহ্জাহান সর্ব্বপ্রথম তাঁর বড় সাধের ময়ূরসিংহাসনে বসেন। হামিদ লাহোরী বলেন, সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান এঁরা তিন পুরুষ ধরে বহু হীরা মুক্তো সংগ্রহ করেছেন। লোকে যদি তা না দেখল তবে তার মূল্য কি ?

সম্রাট এই রকম ভেবে বা'র বাড়ীতে ক্রীতদাসদের কাছে যে তুই কোটী দামের হীরা জহরৎ থাকত তা থেকে ভাল ভাল কয়েকটী বেছে নেন। এই কয়েকটীর দাম ছিল ষোল লাখ টাকা।

সরকারী স্যাকরাকে ডেকে এই সব হীরে মুক্তোর সঙ্গে এক লাখ তোলা সোনাও দেওয়া হল। তখন এই এক লাখ তোলা সোণার দাম ছিল চৌদ্দ লাখ টাকা।

বেবাদল খাঁ ছিলেন শ্যাকরাদের প্রধান। তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে এই সোণা হীরে প্রভৃতি দিয়ে ময়ূরসিংহাসন তৈরী হল। ময়ুরসিংহাসন ৩½ গজ লম্বা, ২½ গজ চওড়া ও পাঁচ গজ উচু ছিল।

সিংহাসনের ছাদের তলা মীনা করা হল।

ছাদের ভিতর দিকে খুব কমই হীরে মুক্তো বসান ছিল কিন্তু বাইরের দিকে অসংখ্য পাথর বসান ছিল। বারোটী পান্নার থামের ওপর ছাদ। তার ওপর মণি মুক্তা খচিত তুটী ময়ূর, আর এই তুই ময়ূরের মাঝে ঐ রকম মণি মুক্তা খচিত একটী গাছ। গদিতে ওঠবার তিনটী সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি আবার রেলিং দিয়ে ঘেরা। শুধু সম্রাটের বসবার যায়গায় সাম্‌নে কোনও রেলিং ছিলনা ; অন্য এগার দিকেই রেলিং ছিল। এই এগারটী বেষ্টনীর মধ্যটীই ছিল সবচেয়ে ভাল। এই মধ্যটীতেই সম্রাট হেলান দিয়ে বসতেন, এইটী তৈরী করতে খরচ পড়েছিল দশ লাখ টাকা, এর মণিটীর দাম এক লাখ টাকা। এটী পারশ্য সম্রাট প্রথম শাহ আব্বাস সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপহার দেন। এই রুবিটীতে তৈমুর মীর শাহরক্ মীর্জ্জা উলুবেগ শাহ আব্বাস আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর ও শাহ্জহানের নাম খোদাই করা ছিল। সিংহাসনের ভিতর দিকে হাজী মহম্মদ জ্ঞান কুদ্‌শীর রচিত একটী কবিতা (৪০ লাইনে) মীনা করা অক্ষরে লিখিত হয়।

কবিতাটির শেষ তিনটি শব্দ ছিল এই—

আওরঙ্গ-ই-শাহানাশা-আদিল অর্থাৎ "ন্যায় পরায়ণ রাজাধিরাজের সিংহাসন।" তার-পর সিংহাসনটির তৈরীর তারিখ দেওয়া !

স্যাকরা প্রভৃতির মাহিনা বাদে শুধু সিংহাসন তৈরীর মাল মশলা কিনতেই এক কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।

ভারতের এই বিপুল রাজকীয় অর্থ সম্ভার লুণ্ঠিত হবার সম্ভাবনা তখনকার দিনে যথেষ্টই ছিল অতএব এই সব লুণ্ঠনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সেই রকমই বিপুল সৈন্য সামন্ত রাখতে হত। তাই দেখতে পাই ১৬৪৮ খৃঃ সম্রাট বাহিনী ছিল—

২০০,০০০ ঘোড়সওয়ার
৮,০০০ মন্‌সবদার
৭,০০০ আহদী ও ঘোড় সওয়ার তীরন্দাজ
৪০,০০০ তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ

এর মধ্যে দশ হাজার সম্রাটের সঙ্গে থাকত। বাকি ত্রিশ হাজার বিভিন্ন সুবায় থাকত। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজপুত্র ও আমীর-ওম্‌রাহের অধীনে ১৮৫,০০০ ঘোড়সওয়ার ছিল। সব সমেত ৪৪০,০০০ পল্টন ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পরগণার ফৌজদার ও ক্রোরী আম্‌লাদের অধীনে যে সব স্থানীয় পল্টন ছিল তাদের হিসাব ধরা হয়নি।

শাহজহানের বন্দী হবার অব্যবহিত আগে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে নিজেকে নয় লাখ সোয়ারের প্রভু বলে বর্ণনা করেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বরের পল্টনের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ ছিল যদিও সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর অধীন ছিল না।*

* ১৩২৯ সালের প্রবাসীতে শ্রীযতুনাথ সরকার লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

চিঠিপত্রের উত্তর পেতে হলে পাঠক পাঠিকারা ডাক টিকিট পাঠাতে ভুলবেন না।

যাঁরা তারিখমত চাঁদা পাঠান নি অনুগ্রহ করে' তাঁরা 'পৃথিবীর কথা' দাবী করে চিঠি দেবেন না।

'পৃথিবীর কথা' তিনখণ্ড প্রতি মাসে একখণ্ড করে' দেওয়া হবে জানানো সত্ত্বেও অনেকে ভুল করে একসঙ্গে তিনখানা চেয়ে পাঠাচ্ছেন।

অভিযোগ করার আগে মন দিয়ে নিয়মাবলী পড়বেন।

ভাদ্র মাসের শব্দচৌকি প্রতিযোগিতার ফলাফল

একমাত্র নির্ভুল উত্তরদাতা—

শ্রীসুবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (গ্রাঃ নং ১২৭৩) ময়মনসিংহ

যাঁদের একটিমাত্র ভুল হয়েছে—

সুনীল কুমার দত্ত, (দার্জ্জিলিং)। শ্রীমতী মণিমালা মজুমদার, (ভবানীপুর)। কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী (সিমলা শৈল)। কেদার নাথ ভড়, (চুঁচুড়া)। লতিমা সেন, (বালিগঞ্জ)। অচিন্ত্য কুমার রক্ষিত, (কলিকাতা)। বেণু ও রেণু সেন, (কলিকাতা)। শতদল দাস, (দরিয়াপাড়া)। আশীষ নাথ রায়, (পাটনা)। অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, (লাবপুর)।

যাঁদের দুটি ভুল হয়েছে—

অঞ্জলি, রজত ও প্রসূন সেন, (কলিকাতা)। সুকুমার ও রমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (শিবপুর)। পরেশ নাথ মাইতি, (ভবানীপুর)। অনিতা বসু, (কাশীপুর) সতীনাথ ভট্টচার্য্য, (নৈহাটী)। ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ (হাওড়া)। অরুণ কিরণ শীল, (শ্যামবাজার)। গৌরাঙ্গ চৌধুরী, (পাটনা)। সামশের আলি আহম্মদ, (শালখিয়া)। রণেন্দ্র কৃষ্ণ সরকার, (ভবানীপুর)।

যাঁদের তিনটি ভুল হয়েছে—

প্রসূন, অরুণ, শৈলেশ, ডলি, ঝরণা রাণি, কানটুলি ও মাসীমা, (মীরাট)। গঙ্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, (উত্তরপাড়া)। তরুণ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর)। দীপ্তি চক্রবর্ত্তী, (কলিকাতা)। কুমারী হিমানী রায়, (কলিকাতা)। শ্রীমতী মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, (বালীগঞ্জ)। জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, (আরা)। সুরথ, পিন্টু ও মিন্টু রাণী বসু, (চুঁচুড়া)। বন্দনা, সৌমেন্দ্র, নৌরেন্দ্র, দীপ্তিমান, জ্যোতিষ্মান, সমীর ও বিদ্যুৎ (ভবানীপুর)। মোহাম্মদ গুলজার আলি, (শালকিয়া)। সুধাতোষ বসু, (কলিকাতা)।

ভাদ্র মাসের শব্দচৌকি প্রতিযোগিতার ফলাফল ছাপার সময় আসল ফাইল ভুলক্রমে দেখা হয়নি। উত্তরদাতাদের কাছে চিঠিপত্র লিখে উত্তর পাঠানোর তারিখ জেনে আমরা সেই ফাইল উদ্ধার করি। ভাদ্র মাসের শব্দচৌকি প্রতিযোগিতার নির্ভূল ফলাফল এই সংখ্যায় ছাপা হল। এই ঝঞ্ঝাটে নূতন শব্দচৌকি ছাপা যাচ্ছিল না। এখন থেকে নিয়মিত ছাপা হবে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুকুমার দে সরকার

সেদিন শেষরাতে শুয়ে ঘুম ভাঙতে আমার একটু বেলাই হয়েছিল। মায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"ওঠ! ওঠ সুরথ! বেলা হয়েছে, তোর মামা ডাকছে তোকে। কেনরে?"

আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললাম, "কাল রাতে বাড়ীতে চোর এসেছিল মা।"

মা শিউরে উঠলেন।

হাতমুখ ধুয়ে মামার ঘরে গিয়ে দেখলাম উপেনবাবু বসে আছেন। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। আমাকে দেখে উপেনবাবু সকালের রোদের মত মিষ্টি হেসে বললেন, "এসো, এসো বাবাজী! জয়দ্রথের কাছে তোমার সব কীর্ত্তি শুনে ফেলেছি। বাবাজীর সাহস আছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ!"

উপেনবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

"বোস সুরথ!" মামা গম্ভীর গলায় বললেন, "দেখ, কাল রাতে চোরই এসেছিল।"

আমি একেবারে নির্ব্বোধ নই। বুঝলাম এঁরা কোন কারণে কাল রাতের ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছেন।

"চোর মামা ?"

"হ্যাঁ !" মামার গলায় দৃঢ়তা ।

"কিন্তু সেই ভুটিয়াটা ?"

"সে—সে আমার এক পুরোণ বন্ধু !"

"ও !" আমার আমার আর কি বলার ছিল ? "হ্যাঁ ! মামা সেই ভুটিয়াটা কাল একটা চিঠি দিয়েছিল আমায়, তোমাকে দিতে !"

"চিঠি ?" মামা বিস্মিত হলেন, "কিন্তু সে ত নিজেই এসেছিল আমার কাছে । আবার চিঠি কেন ? কখন দিয়েছিল ?"

"তোমার কাছে আসার আগে । বললে, তাকে দেখলে তুমি খুসী হবে না ।"

"চিঠিটা বার করলাম পকেট থেকে ।

উপেনবাবু বললেন, "খুসী হবে না জেনেও পদমপৎ এসেছিল । হঠাৎ তার এ মত বদলাবার কারণ কি ?"

মামা কোন জবাব না দিয়ে চিঠিটা খুলে ফেললেন । তাঁর মুখ দিয়ে শুধু একটা বিরক্ত ঘোঁৎকার নির্গত হোল । সবিস্ময়ে আমি দেখলাম চিঠির কাগজটায় কিছু লেখা নেই শুধু আঁকা আছে একটা চক্র ।

"হুঁ ! পদমপতের যুদ্ধচিহ্ন !" উপেনবাবু বলে উঠলেন ।

"এর মানে কি ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি, "কাল চিঠিটা দেবার সময় আমার হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন আশ্চর্য্য হয়ে ভুটিয়াটা বলে উঠেছিল—'কি আশ্চর্য্য চক্ররেখা !' আর এ চিঠিটাতেও দেখছি একটা চক্র । এর মানে কি ?"

আমার এই সরল প্রশ্নটার ফল মামা এবং উপেনবাবুর ওপর একটা অদ্ভুত ভাবে ঘটল । তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন ।

"চক্ররেখা ?" দু' জনের মুখ থেকেই যুগপৎ ধ্বনিত হোল ।

মামা তারপরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন । উপেনবাবু আমাকে ডাকলেন, "এদিকে এসো স্বরথ !"

তাঁর মুখে আর সে মিষ্টি হাসি ছিল না, স্বর কাঁপছিল উত্তেজনায় । আমার হাতটা টেনে নিয়ে তিনি জানলার ধারে ঝুঁকে পড়লেন তার ওপর ।

মামা কম্পিত স্বরে ডাকলেন, "উপেন ?"

"আশ্চর্য্য জয়দ্রথ ! আশ্চর্য্য ! শুধু চক্র নয়, পদ্মাকারে চক্র । ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম ।"

মামা বলে উঠলেন, "ওঃ ভগবান্ !"

অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তারপর ।

আমরা তখন স্থির হয়ে বসেছি ।

মামা আর একবার ডেকেছিলেন, "উপেন ?"

উপেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন, "স্বরথকে আর এর বাইরে রাখা যাবে না জয়দ্রথ কারণ এখন থেকে

পদমপতের হাতেই ওর বিপদ অনেক । সেও জেনে গেছে । এবার আর একবার আমাদেরই চেষ্টা করে দেখতে হবে । কি বল ?"

মামা ঘাড় নাড়লেন, "অদৃশ্য নিয়তির টান উপেন ! আমরা খেলার পুতুল ।"

"তা হলে তুমিই বল ।"

তখন স্থির হয়ে বসে মামা বলতে লাগলেন :

"তুই জানিস্ না স্বরথ, ভ্রমণ আমাদের বংশের নেশা । বোধ হয় কোন যুগান্তর থেকে সেই যাযাবর বেদেদের রক্ত আমাদের বংশে মিশে আছে তাই আমরা স্থির হয়ে বেশী দিন বসে থাকতে পারি না । আমার ঠাকুর্দ্দা, আমার বাবা সবাই ছিলেন তীর্থপর্য্যটক । আমার মধ্যে সে নেশা প্রকট হয়ে উঠেছিল আরও গভীর-ভাবে । আমি বিয়ে পর্য্যন্ত করি নি । আর উপেনকেও জড়িয়েছিলাম আমার সঙ্গে । উপেন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ । ওর ভ্রমণের নেশা জ্ঞানের জন্য । কিন্তু তা হলেও সেও একটা গভীর নেশা ।

"সেবার আমরা তিব্বত রাজ্যের মানসসরোবর তীর্থে গিয়েছিলাম—আমি আর উপেন । তিব্বত সীমানায় ঢুকে তীর্থ টাই আমাদের একমাত্র নেশা হয়ে ওঠে নি । হিমালয়ের সেই বৃক্ষবর্জ্জিত উচ্চ প্রদেশের রুক্ষ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য আমাদের মন হরণ করেছিল । তীর্থযাত্রীর দল থেকে আমরা পেছিয়ে পড়েছিলাম একদিন । যাত্রীদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া তিব্বতের ওপথে নিরাপদ নয় কারণ ওখানে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন যাত্রীকে পথে পেলে তিব্বতী ডাকাতরা হানা দেয় । কিন্তু আধুনিক বন্দুককে তিব্বতীরা ভয় করে । আমরা সে অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলাম । পেছিয়ে পড়বার আমাদের একমাত্র কারণ উপেন সে অঞ্চলে এক রকম পোকার সন্ধান পেয়েছিল যার কথা বিজ্ঞান তখনও জানে না ।

"পরের দিন আবার আমরা পথ ধরলাম এবং পথে এক অদ্ভুত তুষারবাহী ঝড় আমাদের আক্রমণ করল । সে কি ঝড় ! পাহাড়ের চূড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়তে লাগল । আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলাম প্রাণ বাঁচাতে । সন্ধ্যা তখন হয় হয় । রাত্রে ঝড় থেমে গেল । আমরা তখন প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাপের আড়ালে ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করছিলাম । ঝড় থামলে বাইরে এসে আমরা বিস্মিত হলাম । তুষারে পথের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই । ঝড়ের সময় ভয়ে দিগ্বিদিক হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম এক জায়গায় । তুষারে সব সাদা । আকাশ কালো ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝকে । হলদে একফালি চাঁদ তার ওপর হাসছে ।

"আমি উপেনের মুখের দিকে তাকালাম, উপেন টর্চ্চের আলোয় ম্যাপ খুলে বলল, 'ম্যাপে এ অঞ্চলের কোন চিহ্ন নেই । আমরা একটা নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডে এসে পড়েছি ।'

"আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম হতভম্ব হয়ে । পিঠে মোটমাট বাঁধা । রাতেই লোকালয়ের সন্ধানে বেরোব না খুঁজে পেতে একটা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেব ভেবে পাচ্ছিলাম না । হঠাৎ উপেন যেন চমকে উঠল ।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি উপেন কি ?"

"কিছু শুনতে পাচ্ছ ?"

আর হঠাৎ যেন স্পষ্ট একটা গোঙানি কাণে ভেসে এল । মানুষের গলার গোঙানি কিন্তু হিমালয়ের সেই ভয়ঙ্কর পার্ব্বত্য স্তব্ধতায় তাকে ঠিক যেন ভূতুড়ে একটা ক্রন্দন বলে মনে হোল । আমরা দু'জনে দু' জনের মুখ চেয়ে কেঁপে উঠলাম ।

(ক্রমশঃ)

দূরের আলো

জাপানী সভ্যতায় ডাচ্ প্রতিভা

শ্রীসুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেক দেশ আর জাতের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্যবহুল আচার, বিচার, ভাষা, শিল্প ইত্যাদি আছে—এবং সেগুলো অন্য দেশ হতে আলাদা। এইগুলো দিয়ে সেই দেশের সভ্যতা বিচার করা হয়। এতেই তাদের পরিচয়।

যেমন ধর, তোমরা ছোট কাল হতে লক্ষ্য করে আসছ যে তোমাদের বাড়ীর ঠাকুর চাকর সব অবাঙ্গালী বা বাংলার বাইরের অধিবাসী—তাদের হাব-ভাব-কথা-বার্ত্তা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাদের যাতা হায়-করতা হায়—কঁড় করোছি ইত্যাদি ভাষাগুলো আমাদের হাসির উদ্রেক করে বা হেঁয়ালী বলে মনে হয় কেমন না? অন্য দেশের অনেক কিছু আমাদের চোখে বিসদৃশ লাগে অবশ্য আমরা যেগুলো বুঝতে না পারি।

সেই রকম জাপানীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শিক্ষা-শিল্প এতদিন অন্য দেশ হতে স্বতন্ত্র এবং উপহাসের সামিল স্বরূপ ছিল। তাদের লিখন এবং পঠন প্রণালী এখনও বিদেশীর কাছে আশ্চর্য্য বস্তু হয়ে আছে। যাক্—গত অর্দ্ধ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত তারা নিজেদের সব কিছু নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে বাস করে আসছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা বুঝতে পারল যে এরকম গড্ডলিকা প্রবাহের মত চলতে থাকলে তাদের অস্তিত্ব বেশীদিন থাকবে না। অতঃপর তারা সব জিনিষ নতুন ছাঁচে ঢেলে রূপ বদলাতে সুরু করে দিল। প্রাচীন-পন্থীরা সংখ্যায় নেমে গেল আর ধীরে ধীরে বিদেশী সভ্যতা বিশেষ করে সেই সময়কার নব বলে বলীয়ান পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক জাপানে প্রবেশ করতে সুরু করল।

প্রথমে আমি সে তুজন ইউরোপিয়ানের নাম করতে চাই যাঁদের প্রভাব জাপানীদের ইতিহাসে একটা বিপ্লব এনেছে। তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন এইজন্য যে তাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং ধিশক্তির দ্বারা আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে এরা আজ সভ্য বলে পরিচয় দিতে পারে। এই তুজনেই নব্য জাপানের সৃষ্টিকর্ত্তা—আলোকের পথপ্রদর্শক।

Dr. Van Siebold ডাচ গবর্ণমেণ্টে স্বাস্থ্য-বিভাগে কাজ করতেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসেন। তিনি জাতিতে জার্ম্মান ছিলেন। তার পরের বছরেই তিনি ইদো (টোকিওর পুর্ব্বনাম) সহরে এসে চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করেন। কিছু-দিনের মধ্যেই তিনি সুচিকিৎসক এবং সুপণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ছ বছর বাদে তাঁকে জাপান থেকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল এই অপরাধে যে তাঁর নিকটে সন্দেহজনক একটী নকসা বা মানচিত্র পাওয়া গিয়েছিল। লীডেন্ মিউজিয়ামের জন্য তিনি জাপানী ethnography (মাথার খুলী বিষয়ক) এবং botany (উদ্ভিদতত্ব) র বহু তথ্যপূর্ণ বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলো সঙ্গে করে তিনি ১৮৩০ সালে নেদারল্যাণ্ডে যান। তারপর ৩০ বছর চলে গেল। এর মধ্যে তিনি হল্যাণ্ডের রাজার নিকট হতে উচ্চ সম্মানিত 'কর্নেল' পদবী লাভ করেন এবং আবার জাপানে ফিরে আসেন। তাঁর জাপান আগমনের শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল—এবং পরবর্ত্তীকালের যুবকগণ নাগাসাকিতে একটা নাতি উচ্চ পাহাড়ের ওপর তাঁর আবক্ষ পেতলের মূর্ত্তি স্থাপন করে এই শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল।

আরেকজন হচ্ছেন C. J. Van Doorn নামে একজন ডাচ ইঞ্জিনীয়ার। তিনি ১৮৭০ সালে জাপানে এসে জাপ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করেছিলেন। আর তাঁর সময় হতে জাপানের প্রকৃত উন্নতির প্রারম্ভকাল। তিনি ৮ বছর কাজ করেছিলেন। তিনিই জাপানে হাইড্রোলিকের জন্মদাতা—যার জন্যে জাপান আজ পৃথিবীর মধ্যে স্বল্পমূল্যে ইলেকট্রীক চালাচ্ছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাপান গবর্ণমেণ্ট দেশের মাঝখানে অবস্থিত ওয়াকামাতু সহরে সুমনোহর লেক আইনাওয়াসিরোর পাশে যেখানে Van Doorn তাঁর প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেখানে তাঁর একটী পূর্ণ আকৃতির পেতলের মূর্ত্তি জাপানী ভাস্কর দিয়ে তৈরী করে রেখে দিয়েছেন।

তাহ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাপানী সভ্যতার মূলে আছে ডাচ প্রতিভা এবং এদের দান জাপানীরা আজও নত মস্তকে স্বীকার করে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রজত সেন

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে গণেশ বললে, 'জহর, তোমার কথায় ছেলেবেলাকার একটা ঘটনা মনে পড়লো হঠাৎ। পড়ি তখন ফোর্থ ক্লাসে, মাথায় ছিলো বুদ্ধি আর মনে ছিলো সাহস! বাবা বেজায় বড়লোক আর ঠিক তেমনি কেপ্পন, নগদ টাকায় আর কোম্পানীর কাগজে সিন্দুক ঠাসা! অথচ মজা কি জানো? আমাকে কখনও একটি পয়সা দিতেন না! কত দিন কত জিনিষ চেয়েছি, সেই চোখ রাঙ্গানি আর ধমক। অথচ আমিই ছিলাম বাবার এক মাত্র পুত্র, একটি বোনও ছিলো না—যার বিয়েতে ভবিষ্যতে টাকা খরচের ভয় ছিলো।

'আর সে বয়েস থেকেই ব্যবসায় আমার মাথা একেবারে পাকা। বাবার অনেকগুলো দোকান ছিলো—কলকাতার নানা অঞ্চলে; সে-সব দোকানে আমার যাতায়াত সদাসর্ব্বদা। সেই তখন থেকেই নিজে একটা আলাদা দোকান দেবার ইচ্ছে আমার মনে সব সময়েই জাগতো।

'এক ক্লাশেই পড়তো আর একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। দু'জনে সব সময়েই এক সঙ্গে থাকতাম। একদিন যদি দেখা না হত আমাদের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকতো না। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বাবা দিলেন কলেজে ঢুকিয়ে। আমরা এক কলেজে একই সঙ্গে পড়াশুনো আরম্ভ করলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য লেখাপড়ায় আমাদের মোটেই উৎসাহ ছিল না। আমার বন্ধু একদিন বললে, দেখ পাঁচশ টাকা আমি জোগাড় করেছি, আর পাঁচশ হলেই আমরা একটা রেস্তরাঁ খুলবো—এই কলেজের সামনেই, দেখবি কত লাভ হয়। আমি বললাম, বেশ, কালকেই তোমায় দিচ্ছি এনে টাকা।

'টাকাটা কেমন করে যোগাড় করলাম সে গল্প বলবার জন্যই এ কাহিনী সমস্তই তোমাদের বলছি।

'বেলা প্রায় দুটো হবে। কলেজ থেকে পালিয়ে সোজা বাড়ী চলে এলাম। জানতাম সে-ই আমার

সুবর্ণ সুযোগ! বাবা গেছেন দোকানে, ছোট ভাইগুলো স্কুলে, চাকরগুলো ঘুমোচ্ছে নীচে। একেবারে নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলাম। মা ঘুমোচ্ছেন, ট্রাঙ্কের চাবি বাঁধা মা-র আঁচলে। কিন্তু তাঁর আঁচল থেকে চাবি খুলে নেওয়া সে এক বিষম ব্যাপার। দু'তিন বার চাবি হারিয়ে যাওয়ার দরুণ মা এমন এক গেরো দিয়ে চাবি বাঁধেন—যে খুলতে খুলতেই আমার সারা দুপুর কেটে যাবে। রাস্তার দোকান থেকে একখানা বড় মোম বাতি কিনে এক টুকরো কাঠের ওপর মোমটা এক ইঞ্চি পুরু করে আগুনে গালিয়ে ফেললাম। তারপর আস্তে আস্তে চাবি খানা তুলে সেই মোমের ওপর পরিস্কার একটা ছাপ তুলে নিয়ে সোজা চাবিওয়ালার কাছে। বললাম ওহে, ঠিক এই ছাঁচের মত চাবি তৈরী করে দিতে পারো? বক্‌শিস পাবে। চাবিওয়ালা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে আমার দিকে! হেসে বললাম, ভয় নেই হে! ডাকাতি করবো না, বলেই হাতে গুঁজে দিলাম একটা টাকা! কাজ শেষ হলে আর এক টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

'মাপ-সই চাবি তৈরী করতে তার সমস্ত দুপুরটা কেটে গেল। সন্ধ্যের সময় চাবিটা নিয়ে বাড়ী এলাম।

'পরদিন যথারীতি কলেজে গেলাম, আমার সেই বন্ধুকে বিশেষ করে বলে দিলাম যেন কোন ক্রমেই সে কলেজ না পালায়, এবং প্রত্যেকটি ক্লাসে আমার প্রক্সি দেয়।

'তার ওপর আমার বিশ্বাস ছিলো; নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলাম।

'সমস্ত বাড়ীতে রাত্রির মত নিস্তব্ধতা, কেউ কোথাও জেগে নেই। আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা খুলে যে ঘরে সমস্ত ট্রাঙ্ক আর সিন্দুক—সে ঘরে ঢুকলাম। আগে দেখে এসেছি মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

'চাবিটা মায়ের ট্রাঙ্কের। আস্তে কয়েক বার ঘোরাতেই তালা খুলে গেল। সেই কোথায় কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকোনো থাকতো লোহার সিন্দুকের চাবি। আমার অজানা ছিলো না, চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে সিন্দুকের কাছে গেলাম, একবার কাণ খাড়া করে শুনলাম কোন দিক থেকে কারুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না! এ-সময়ে কে-ই বা আসবে?

'চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললাম, তার মধ্যে যে টানা সেটা খুলতেও আমার আধ মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। কয়েকটা থলি-বোঝাই টাকা, কড়কড়ে টাকা! বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা লাফাতে লাগলো, নিঃশ্বাসটা যেন বন্ধ হয়ে যাবে!' অনেক কষ্টে উত্তেজনা শান্ত করে থলিগুলো বার করে মাটিতে রাখলাম, তারপরে খুললাম দ্বিতীয় টানা, থাকে থাকে সাজানো নোট, পাঁচ টাকা থেকে এক শ টাকা পর্য্যন্ত! প্রায় গোটা দশেক নোটের তাড়া! বার করে নিলাম সব। আলনা থেকে একখানা বড় গামছা নিয়ে টাকা, নোট সব এক সঙ্গে বেঁধে নিলাম।

'একে একে টানা, সিন্দুকের ডালা সব বন্ধ করে চাবির গোছাটা ঠিক তেমনি কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে অতি সন্তর্পনে রেখে দিয়ে ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে বাইরে এলাম, মা তখনও ঘুমোচ্ছেন; সৌভাগ্য আমার! চাকররাও কেউ জাগেনি। তাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটা পুঁটলি-হাতে দেখতে পেলে শেষ পর্য্যন্ত সবই প্রকাশ হয়ে যেতো সে-বিষয় কোনই সন্দেহ ছিলো না।

'রাস্তায় নেমে এলাম তাড়াতাড়ি। দেখে নিলাম আশপাশের কোন লোকও আমাকে দেখতে পেলে নাকি! নাঃ কেউ কোথাও নেই। বাঁচলাম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রজত সেন

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে গণেশ বললে, 'জহর, তোমার কথায় ছেলেবেলাকার একটা ঘটনা মনে পড়লো হঠাৎ। পড়ি তখন ফোর্থ ক্লাসে, মাথায় ছিলো বুদ্ধি আর মনে ছিলো সাহস! বাবা বেজায় বড়লোক আর ঠিক তেমনি কেপ্পন, নগদ টাকায় আর কোম্পানীর কাগজে সিন্ধুক ঠাসা! অথচ মজা কি জানো? আমাকে কখনও একটি পয়সা দিতেন না। কত দিন কত জিনিষ চেয়েছি, সেই চোখ রাঙ্গানি আর ধমক। অথচ আমিই ছিলাম বাবার এক মাত্র পুত্র, একটি বোনও ছিলো না—যার বিয়েতে ভবিষ্যতে টাকা খরচের ভয় ছিলো।

'আর সে বয়েস থেকেই ব্যবসায় আমার মাথা একেবারে পাকা। বাবার অনেকগুলো দোকান ছিলো—কলকাতার নানা অঞ্চলে; সে-সব দোকানে আমার যাতায়াত সদাসর্ব্বদা। সেই তখন থেকেই নিজে একটা আলাদা দোকান দেবার ইচ্ছে আমার মনে সব সময়েই জাগতো।

'এক ক্লাশেই পড়তো আর একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। দু'জনে সব সময়েই এক সঙ্গে থাকতাম। একদিন যদি দেখা না হত আমাদের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকতো না। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বাবা দিলেন কলেজে ঢুকিয়ে। আমরা এক কলেজে একই সঙ্গে পড়াশুনো আরম্ভ করলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য লেখাপড়ায় আমাদের মোটেই উৎসাহ ছিল না। আমার বন্ধু একদিন বললে, দেখ পাঁচশ টাকা আমি জোগাড় করেছি, আর পাঁচশ হলেই আমরা একটা রেস্তরাঁ খুলবো—এই কলেজের সামনেই, দেখবি কত লাভ হয়। আমি বললাম, বেশ, কালকেই তোমায় দিচ্ছি এনে টাকা।

'টাকাটা কেমন করে যোগাড় করলাম সে গল্প বলবার জন্যই এ কাহিনী সমস্তই তোমাদের বলছি।

'বেলা প্রায় দুটো হবে। কলেজ থেকে পালিয়ে সোজা বাড়ী চলে এলাম। জানতাম সে-ই আমার

সুবর্ণ সুযোগ! বাবা গেছেন দোকানে, ছোট ভাইগুলো স্কুলে, চাকরগুলো ঘুমোচ্ছে নীচে। একেবারে নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলাম। মা ঘুমোচ্ছেন, ট্রাঙ্কের চাবি বাঁধা মা-র আঁচলে। কিন্তু তাঁর আঁচল থেকে চাবি খুলে নেওয়া সে এক বিষম ব্যাপার। দু'তিন বার চাবি হারিয়ে যাওয়ার দরুণ মা এমন এক গেরো দিয়ে চাবি বাঁধেন—যে খুলতে খুলতেই আমার সারা দুপুর কেটে যাবে। রাস্তার দোকান থেকে একখানা বড় মোম বাতি কিনে এক টুকরো কাঠের ওপর মোমটা এক ইঞ্চি পুরু করে আগুনে গালিয়ে ফেললাম। তারপর আস্তে আস্তে চাবি খানা তুলে সেই মোমের ওপর পরিস্কার একটা ছাপ তুলে নিয়ে সোজা চাবিওয়ালার কাছে। বললাম ওহে, ঠিক এই ছাঁচের মত চাবি তৈরী করে দিতে পারো? বকশিস পাবে। চাবিওয়ালা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে আমার দিকে! হেসে বললাম, ভয় নেই হে! ডাকাতি করবো না, বলেই হাতে গুঁজে দিলাম একটা টাকা! কাজ শেষ হলে আর এক টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

'মাপ-সই চাবি তৈরী করতে তার সমস্ত দুপুরটা কেটে গেল। সন্ধ্যের সময় চাবিটা নিয়ে বাড়ী এলাম।

'পরদিন যথারীতি কলেজে গেলাম, আমার সেই বন্ধুকে বিশেষ করে বলে দিলাম যেন কোন ক্রমেই সে কলেজ না পালায়, এবং প্রত্যেকটি ক্লাসে আমার প্রক্সি দেয়।

'তার ওপর আমার বিশ্বাস ছিলো; নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলাম।

'সমস্ত বাড়ীতে রাত্রির মত নিস্তব্ধতা, কেউ কোথাও জেগে নেই। আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা খুলে যে ঘরে সমস্ত ট্রাঙ্ক আর সিন্ধুক—সে ঘরে ঢুকলাম। আগে দেখে এসেছি মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

'চাবিটা মায়ের ট্রাঙ্কের। আস্তে কয়েক বার ঘোরাতেই তালা খুলে গেল। সেই কোথায় কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকোনো থাকতো লোহার সিন্ধুকের চাবি। আমার অজানা ছিলো না, চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে সিন্ধুকের কাছে গেলাম, একবার কাণ খাড়া করে শুনলাম কোন দিক থেকে কারুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না! এ-সময়ে কে-ই বা আসবে?

'চাবি ঘুরিয়ে সিন্ধুকের ডালা খুলে ফেললাম, তার মধ্যে যে টানা সেটা খুলতেও আমার আধ মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। কয়েকটা থলি-বোঝাই টাকা, কড়কড়ে টাকা! বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা লাফাতে লাগলো, নিঃশ্বাসটা যেন বন্ধ হয়ে যাবে!' অনেক কষ্টে উত্তেজনা শান্ত করে থলিগুলো বার করে মাটিতে রাখলাম, তারপরে খুললাম দ্বিতীয় টানা, থাকে থাকে সাজানো নোট, পাঁচ টাকা থেকে এক শ টাকা পর্য্যন্ত! প্রায় গোটা দশেক নোটের তাড়া! বার করে নিলাম সব। আলনা থেকে একখানা বড় গামছা নিয়ে টাকা, নোট সব এক সঙ্গে বেঁধে নিলাম।

'একে একে টানা, সিন্ধুকের ডালা সব বন্ধ করে চাবির গোছাটা ঠিক তেমনি কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে অতি সন্তর্পনে রেখে দিয়ে ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে বাইরে এলাম, মা তখনও ঘুমোচ্ছেন; সৌভাগ্য আমার! চাকররাও কেউ জাগেনি। তাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটা পুঁটলি-হাতে দেখতে পেলে শেষ পর্য্যন্ত সবই প্রকাশ হয়ে যেতো সে-বিষয় কোনই সন্দেহ ছিলো না।

'রাস্তায় নেমে এলাম তাড়াতাড়ি। দেখে নিলাম আশপাশের কোন লোকও আমাকে দেখতে পেলে নাকি! নাঃ কেউ কোথাও নেই। বাঁচলাম।

'মাঝে মাঝে টাকার শব্দ হচ্ছিলো—আর সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিলাম কেউ শুনতে পেলে কিনা। বোধহয় আমারই মনের ভুল, আসলে কোন শব্দই হচ্ছিলো না। বড়রাস্তায় এসে একটা স্যুটকেস-ট্রাঙ্কের দোকানে ঢুকে এক টাকা এগারো আনা দিয়ে একটা এ্যাটাচি কেশ কিনে তার মধ্যে পুঁটলিটা ঢুকিয়ে সোজা কলেজে চলে এলাম ঢুকলাম না ভেতরে। একটু দূরে-আড়ালে-দাঁড়িয়ে বন্ধুটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কলেজ ছুটি হবার তখন আর কয়েক মিনিট মাত্র দেরী। আমার বইগুলোও ছিলো তার কাছে।

'ঘণ্টা বেজে গেল, যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালাম, বলা যায়না কিছু কলেজের কোন পরিচিত বন্ধু যদি এ্যাটাচি কেস-এর মধ্যে কি আছে দেখতে চায় তা হলেই ত সর্ব্বনাশ।

'যথাসময়ে বন্ধুটিকে দেখা গেল। 'কি রে! পেয়েছিস?' সে বইটা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'ব্যাগটা আবার কিসের?'

'হেসে বললাম, 'এখানে কোন কথা নয়, চল তোর বাড়ীতে!'

'বন্ধুর বাড়ীতে তার আলাদা পড়বার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে বললাম, 'দেখ্ খুলে দেখ্।'

'ব্যাগের মধ্যে পুঁটলী খুলে ও কয়েক মিনিট আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; এত টাকা এক সঙ্গে সে কখনও দেখেনি। ভয় এবং আশঙ্কায় একটা শিহরণ হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যে বয়ে গেল তার বুকের মধ্যে!

'সমস্ত টাকাগুলো গুণতে তার আধ ঘণ্টা লেগে গেল। দেখা গেল মোট টাকার সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী।

'আমাদের দু'জনার কারুর মুখে একটি কথা নেই। আগাগোড়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতেই বেশ খানিকটা সময় লাগলো। ভয়ে আর আতঙ্কে আমাদের হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কি করবো এত টাকা নিয়ে? কোথায় রাখবো? জানতে পারলেই বা কি হবে—সব এক সঙ্গে মগজের মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

'আজ আর দেরী করিস্ না, সোজা বাড়ী চলে যা, আমার বন্ধুটি বললে, তার মুখ দেখে মনে হল সে কিছুমাত্র ভয় পায়নি। কি রে! একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলি যে! কিচ্ছু ঘাবড়াবার নেই, আর দেরী করিসনি, বাড়ী চলে যা।

'বাড়ীতে চলে এলাম ঠিক সময়ে। যথা নিয়মে বাড়ীর কাজ কর্ম্ম চলছে। বাইরে বেশ হাসিখুসী থাকবার চেষ্টা করছিলাম, ভেতরে যে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো সে এক মাত্র আমিই জানি।

'রাত দশটা হবে, সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম, যতক্ষণ জেগে থাকবো ততক্ষণই দুশ্চিন্তা!

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনা, হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড আঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে বাবা ডাকছেন, আর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা যায় না, তা বলে; উঠেই আলো জ্বাললাম, সামনেই আয়না ছিলো, মুখ দেখলাম একেবারে সাদা, এক বিন্দু রক্তের ছাপ নেই। যথাসম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করলাম, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে মুখে একটা কৃত্রিম বিরক্তির ভাব আনলাম।

'দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখি সামনেই বাবা, পেছনে মা, কাকাবাবু এবং পিসিমা দল বেঁধে

দাঁড়িয়ে আছেন, অস্পষ্ট আলোকে দেখলাম তাঁরা সবাই যেন ভয়ঙ্কর এক মুহূর্ত্তের জন্যে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছেন।

'বাবাই প্রথমে কথা বললেন, 'হ্যাঁ রে আজ কলেজে গিয়েছিলি?' তাঁর মুখের দিকে না তাকালেও বেশ বুঝতে পারলাম এক জোড়া চোখের অগ্নিদৃষ্টি যেন আমাকে সেই মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত করে ফেলবে।

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম ত! কেন বল তো!' বললাম আমি, বেশ সহজ গলাতেই কেননা জানি তখন ভয় পেয়ে ছেলেমানষি কাণ্ড কিছু করা কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়, নদীতে যখন ঝাঁপ দিয়েছি তখন যতই ভয়ঙ্কর হোক স্রোত এবং ঢেউ, বীরের মত সাঁতার কাটাই উচিত—না হলে নদীগর্ভে মৃত্যু একেবারে সুনিশ্চিত। তা ছাড়া তোমরা কি ছাই সাহসী! আমার সাহসের কাহিনী শুনলে তোমরা ভাববে আমি মানুষ নই।

'ঠিক গিয়েছিলি ত?' মেঘমন্দ্র স্বরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন; স্বভাবতই তিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন।

'হ্যাঁ, যাবো না কেন?' উত্তর দিলাম, 'কি হয়েছে বল তো?'

'তোকেই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কি হয়েছে? তুই এর কিছু জানিস? ঠিক করে বল।'

'কিসের?' যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

'সত্যি বলছিস তুই কিছু জানিস না?'

'আঃ কিসের আগে তাই বল না।' গলায় দেখালাম প্রবল বিরক্তি।

'দুপুর বেলা', বাবা বললেন, 'আমার সিন্ধুক থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরী হয়ে গেছে, হ্যাঁ, দুপুরেই, কারণ সকালেও আমি সিন্ধুক খুলে কিছু টাকা তার মধ্যে রেখেছিলাম। কি ভয়ানক কাণ্ড! যেন ভৌতিক ব্যাপার!' বাবা চুপ করলেন।

'আবার অসহ্য নিস্তব্ধতা। কিছু না বললে ভালো দেখায় না তাই বললাম, 'একদিনও দেখেছো একটি পয়সা কখনও নিতে? আর এতগুলো টাকা! কি করবো আমি টাকা নিয়ে? নিজেদেরই ত টাকা!'

'আমার কথা শুনে বাবার আর কোন সন্দেহই রইলো না যে এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

'তবে নিলে কে?' তিনি আবার বললেন, 'চোরের কি এত সাহস হবে দুপুর বেলা বাড়ী ঢুকে সিন্ধুক খুলতে? সিন্ধুক ত আরও ছিলো, কৈ আর একটাতেও ত একটু আঁচড় পর্য্যন্ত পড়েনি। ঠিক যেটাতে টাকা ছিলো সেটিই খুলেছে। ঘরের মধ্যে এত ট্রাঙ্ক, একটাও ত খোলেনি। আশ্চর্য্য নয়? আর শুনেছো কখনও—চুরী করবার পর চোর আবার সিন্ধুকে চাবি দিয়ে বন্ধ করে যায়? কোথাও একটি কাগজপত্র পর্য্যন্ত নাড়েনি।' বাবা চুপ করলেন।

'আমার নিজের তখন আপশোষ হচ্ছিলো—কেন কাগজপত্র সব এলোমেলো করে দিলাম না? কেনই বা আহম্মকের মত সিন্ধুকের ডালাটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে রেখে এলাম?

'সে-রাত্রেই বাবা পুলিশে খবর দিলেন। আমি তখন একেবারে নিশ্চিন্ত।

'যথারীতি পুলিশ এলো। ঘর দুয়ার সব পরীক্ষা করলে। জিজ্ঞাসা করলে বাবাকে কাকে তাঁর সন্দেহ হয়? কাউকে না, বাবা বললেন, আর কাকেই বা সন্দেহ করবেন? চাকরগুলো খুবই নিরীহ। বাজার থেকেও কখনও একটি আধলাও চুরী করে না। আর তাদেরই ছেলে বয়স থেকে আমাদের বাড়ীতে কাজ করছে। বলতে গেলে আমাদের বাড়ীতেই তারা বড় হয়েছে। ডাইরীতে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তারা নিঃশব্দে ভেগে পড়লো। জানতাম তাদের কেরামতি ঐ পর্য্যন্তই। রাত্রিটা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটালাম। তিন চার হাজার টাকা বাবার কাছে কিছুই নয়,—ব্যাঙ্কে যার ষাট হাজার টাকা আছে।

'বাবার অবশ্য সম্পূর্ণ সন্দেহ যায়নি সে-রাত্রে। পরদিন গোপনে কলেজের কেরানীর কাছে চিঠি দিয়ে জানলেন আমি কলেজে সেদিন গিয়েছিলাম কিনা এবং প্রত্যেক ক্লাশে উপস্থিত ছিলাম কিনা। উত্তর যে কি আসবে সে ও জানতামই। আমি কি একটা কাঁচা কাজ করবার ছেলে?'

জহর, বঙ্কিম আর শিবু এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত গণেশের এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুনছিলো। তারা ভুলেই গিয়েছিলো তারা গণেশ বাবুর মুখে গল্প শুনছে।

গণেশ তখন প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করছিলো, তার মুখে মৃদু-মধুর হাসি।

'কি করলেন অত টাকা নিয়ে?' স্বপ্নোত্থিতের মত জহর জিজ্ঞেস করলে।

'কলেজের সামনে রেঁস্তরা খোলবার মতলব ত্যাগ করতে হয়েছিলো, কেননা তা হলে জানাজানি হবার ভয় ছিলো খুব। দোকানও নিলামনা, ব্যবসাও করলামনা, এতগুলো টাকা একেবারে যাকে বলে জলে গেল। মাথায় তখন সৎপরামর্শ দেবার ত কেউই ছিলো না। তোমরা হাসবে টাকাটার কেমন করে সৎগতি হল তা শুনে। করলাম কি জানো? পার্ক ষ্ট্রীটে গিয়ে দুই বন্ধুতে পছন্দ করে একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী কিনে ফেললাম। চড়া গেল খুব ক'দিন। পড়াশুনো গেল চুলোয়। ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, আসানসোল এমন কি মোটরে দিল্লী পর্য্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। তারপর সখ মিটে গেল, গাড়ীটা প্রায় জলের দরে বিক্রি করে দিলাম। টাকাটা পোষ্ট আফিসে জমিয়ে রাখলেও আজকে আর হা হুতাস করতে হত না। এখন কি আর অত বোকামি করবো ভাবছো? কিন্তু কোথায় পাই টাকা বল? আমার কাছে কিছু যে নেই তা নয়, কিন্তু তাতে কিই বা হবে! আরও টাকা চাই, রীতিমত বড় একটা দোকান না খুললে লাভ করবো কি?'

যে কথাটা বলবার জন্যে জহরের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে গণেশ তা বুঝতে পেরেছে। হঠাৎ তাই সে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জহর তোমার বাবার অনেক টাকা আছে, না?'

'তা আছে, কিন্তু সে ত সিন্দুকে!'

'তাতে অসুবিধে কিছু নেই, কিন্তু সে টাকা নেওয়া কি উচিত হবে? ধর যদি শেষ পর্য্যন্ত দোকান ফেল হয়ে যায়—আর এ ত সব সময়েই হচ্ছে, তখন হয়তো টাকাগুলোর জন্যে আফশোষের আর অন্ত থাকবেনা। তবে—আমার যেটুকু বিশ্বাস তাতে মনে হয় দোকান কখনও ফেল পড়বে না। আরম্ভ করবার তুমি আগে বেশ করে ভেবে দেখ জহর।'

'আমি আর কি ভাববো?' জহর নিশ্চিন্ত মনে বললে, আপনি যা বলেন তাই হবে; কিন্তু কেমন করে টাকা আনবো তাই বলুন?'

'সে আমি কি বলবো?' হাসতে হাসতে গণেশ বললে, 'আমি ত তোমায় চুরী করতে বলতে পারি না। সিন্দুকের চাবি কার কার কাছে থাকে?'

'মার ট্রাঙ্কে!'

'তোমার বাবার যখন টাকার দরকার হয় তোমার মায়ের কাছে থেকেই কি প্রত্যেক বার চাবি নেন!'

'হুঁ।'

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

'দেখ ভেবে কি করলে কি হয়! আমি আর কি বলবো? তোমরা ত বোঝ সবই; তবে এটুকু আমি তোমাদের বলতে পারি—টাকা পেলে বিরাট এক দোকান তোমাদের নামেই আরম্ভ করে দেবো—দেখো! তোমার মা চাবি রাখেন কোথায়?'

'আঁচলেই ত থাকে।'

'কখনও আলাদা কোথাও রাখেন না?'

'না, যদি কখনও ভুলে যান তাহলে—'

'ট্রাঙ্কটা কি লোহার?'

'হ্যাঁ।'

'তালা লাগানো থাকে?'

'না, এমনি চাবি দিয়ে বন্ধ করা।' জহর বললে, 'আমায় একটা মোমের প্যাড তৈরী করে দিন না, যা যখন দুপুর বেলা ঘুমুবে একটা ছাপ নিয়ে নেব।'

'তুমি কি পারবে অত হাঙ্গামা করতে!'

'নিশ্চয়!' সোৎসাহে জহর বললে, তার চোখে মুখে প্রবল উত্তেজনা।

ক্রমশঃ

পৃথিবীর কথা

মন দিয়ে পড়ে' দেখো

মাঘের সংখ্যার সঙ্গে পৃথিবীর কথার ২য় খণ্ড দেওয়া হবে। এখন প্রথম খণ্ড বিলি করা হচ্ছে। যারা ছ আনার ষ্ট্যাম্প পাঠিয়েছ তাদের বই রেজিষ্টারি ডাকে যাবে, যারা তিন আনার ষ্ট্যাম্প পাঠিয়েছ তাদের বই সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে যাবে। গ্রাহকদের মাশুল বাঁচানোর জন্য মফঃস্বলের বইয়ের পাতা হাল্কা দেওয়া হয়েছে, ষ্ট্যাম্প যা বাঁচবে তা পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠানোর জন্য জমা থাকবে।

পুরণো খাতা

শিশুদের জন্ত নানারকম চমৎকার লেখা এখানে তুলে দেওয়া হবে। গল্প, কবিতা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, দেশভ্রমণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই এখানে চমৎকার সঙ্কলনের ব্যবস্থা হল।

কবিতা

ঠাকুর্দ্দার ছুটি।

তোমার ছুটি নীল আকাশে,
তোমার ছুটি মাঠে
তোমার ছুটি থই-হারা ঐ
দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল তলায়,
গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপে ঝাপে
পারুল ডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে
কাঁচা ধানের ক্ষেতে
তোমার ছুটির খুসি নাচে
নদীর তরঙ্গেতে।
আমি তোমার চষ্‌মা-পরা
বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয় কাজের মাকড়্‌ষাটার
বিষম জালে বাঁধা।
আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
তোমার ছুটির সাজে।
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির
মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারি ঐ
চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
আমার ছুটি আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞান

নক্ষত্রের কথা

নক্ষত্রদের সংখ্যার কথা আগেই বলিয়াছি,—গুনিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, আমরা খালি চোখে যে-সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদিগকে গুণা যায় না। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকর্ম্মা লোক কে আছে, যে সমস্ত জীবনটা নক্ষত্র গুণিয়াই কাটাইয়া দিবে! কিন্তু অনেক দিন আগে আমাদের মত একজন মানুষ নক্ষত্র গুণিয়াছিলেন এবং সমস্ত আকাশে ছয় হাজারের বেশি নক্ষত্র দেখিতে পান নাই। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমরা এক সঙ্গে ছয় হাজারের অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন হাজারের বেশী নক্ষত্র খালি চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা একসঙ্গে অর্দ্ধেক আকাশ-টাকেই দেখি, আর অর্দ্ধেক পৃথিবীর অন্যদিকে থাকে।

কিন্তু দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখিলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। জ্যোতিষীরা এই রকমে পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিয়া দেখ, এই সৃষ্টিখানি কত প্রকাণ্ড! কিন্তু এই সংখ্যার অধিক নক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কখনই বলা যায় না। যেমন বড় বড় দূরবীণ প্রস্তুত হইতেছে, আমাদের জানাশুনা নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোটো দূরবীণে আকাশের যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, বড় দূরবীণে চোখ লাগাইয়া জ্যোতিষীরা এখন সেখানেই হাজার হাজার নক্ষত্র খুঁজিয়া পাইতেছেন। বড় দূরবীণে যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যাইত, দূরবীণ দিয়া সেখানকার ফটোগ্রাফের ছবি তুলিতে গিয়া, জ্যোতিষীরা ছবিতে হাজার হাজার নূতন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছেন। কাজেই হয় ত কোনো দিন আর এক রকম যন্ত্র দিয়া দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিবেন, নক্ষত্রের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটী নয়,—একশত কোটী। সত্যই নক্ষত্রদের সংখ্যা হয় না।

৺জগদানন্দ রায়

স্বাস্থ্য

আমাদের খাদ্য

তোমাদের মায়েদের বলিবে যে ভাতের ফেন না গালিয়া ফেনশুদ্ধ ভাত যেন তোমাদিগকে খাইতে দেন। একেইত ভাতে সার পদার্থ কম থাকে, তাহাতে আবার ফেন ফেলিয়া দিলে উহা আরো অসার হইয়া পড়ে। ফেনশুদ্ধ ভাত খাইতে বেশ ভাল লাগে। যিনি রাঁধেন, দুই চারি দিন অভ্যাস করিলে তিনি ফেন না ফেলিয়াই বেশ ঝরঝরে সুন্দর ভাত প্রস্তুত করিতে পারিবেন। মায়েদের বলিবে যেন একটু কষ্ট করিয়া রাঁধুনীকে এই কাজটী বেশ করিয়া বুঝাইয়া ও দেখাইয়া দেন।

গরম গরম খিচুড়ি খাইতে বড় ভাল লাগে, কেমন নয়? বৃষ্টির দিন খিচুড়ি খাওয়া শুধু ছেলেদের কেন, বুড়োদের পর্য্যন্ত একটা বড়ই আমোদজনক ব্যাপার। খিচুড়িতে ডাল, ঘি ও আলু থাকে বলিয়া উহা একটী উৎকৃষ্ট সারবান খাদ্য—বেশী করিয়া না খাইলে কোন অসুখ হয় না। মায়েদের বলিবে যেন সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দুই তিন দিন একবেলা তোমাদের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা করিয়া দেন, তোমাদের পেট খারাপ হইবে বলিয়া যেন ভয় না করেন।

সাহেবদের যেমন মাংস নহিলে চলে না, তেমনি ডাল না হইলে আমাদের খাওয়া হয় না। ডাল মাংসের অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর খাদ্য অথচ অনেক সস্তা। ডাল যদি ভাল করিয়া রান্না হয়, তাহা হইলে উহা হজম করিতে দেরী হয় না। ডালের সমস্ত দানা গলিয়া গিয়া ক্ষীরের মত হইয়া গেলে তবে ডাল ঠিক রান্না হয়। তোমাদের মায়েদের দেখিতে বলিবে যে রাঁধুনী যেন প্রত্যহ এই রকম ডাল তৈয়ারী করে। তোমরা দুই বেলা যথোচিত পরিমাণে ডাল খাইবে, তাহা হইলে তোমাদের গায়ে খুব জোর হইবে।

তরকারির মধ্যে আলুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তোমরা আলু খাইতে খুব ভালবাস, কেমন নয়? কিন্তু অন্য তরকারিও তার সঙ্গে কিছু কিছু খাইবে। একটু বেশী তরকারি না খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না! কাঁচকলা, মানকচু, কলাইশুঁটী, শিম, বরবটী, রাঙ্গাআলু, কাঁঠাল বীজ প্রভৃতি তরকারিও বেশ সারবান খাদ্য। লাউ, কুমড়ো, বেগুণ, পটল, মূলা প্রভৃতি তরকারির মধ্যে জলের ভাগই বেশী, সার ভাগ খুব কম। ফুলকপি ও বাঁধাকপি খাইতে ভাল, তবে অধিক খাইলে পেট গরম হয়। আমাদের কবিরাজেরা কাঁচকলা, মানকচু, পটল, ডুমুর প্রভৃতি তরকারি রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। টাটকা তরকারি এবং লেবু, তেঁতুল, কাঁচা আম প্রভৃতি অম্লদ্রব্য অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়। পলতা, উচ্ছে প্রভৃতি পদার্থ তিক্ত হইলেও আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী; তোমাদের মায়েরা তোমাদিগকে মাঝে মাঝে পল্‌তার ঝোল, উচ্ছের শুক্ত খাইতে দিয়া থাকেন, তিত হইলেও তাহা তোমরা খাইবে।

৺চূণীলাল বসু

দেশভ্রমণ

মৃজাপুর

মৃজাপুর গঙ্গার মধ্য হতে গেঁথে তোলা। কাশীর কাছে গঙ্গার বাঁকটি যেমন শিবের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের মত দেখতে, এখানে কিন্তু তা নয়, অনেকটা ধনুকের মত। এরি কাছাকাছি শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বাসনের প্রথম কিছুকাল চিত্রকুটে বাস করেছিলেন তাই বুঝি মা গঙ্গা তাঁর সম্মান রাখবার জন্যে তাঁরি ধনুকের আকার ধারণ করেছেন! এখানে কাশীর মত সুন্দর আর অতগুলি স্নানঘাট না থাকলেও যে দু একটি আছে, তাদের কথা বলা চলে। আমাদের বাসার ঠিক পাশেই একটি ছিল, তার নাম "পাক্কা-ঘাট"—এই ঘাটের পাথরের সিঁড়ি আর ঘাটের উপরে চাতাল-ঘেরা আঙিনাটি বড় সুন্দর। আঙিনার উপর ছাদ, তাতে চারিদিক হতে চারটি সিঁড়ি আছে তাই দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। ছাদের আলিশা

মানুষ প্রমান উঁচু, শাদা মার্ব্বেলের জালিকাটা কাজ। অনেকগুলি থাম মাথায় করে এই ছাদখানি ধরে আছে, থামের গায়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি। বহুকালের পুরাণ মূর্ত্তি, বেলে পাথরের তৈরি—কালের হাতের স্পর্শে ক্ষয় পায়নি। তাতে কাঁচা বয়সের টাটকা ভাব আর নেই, বয়সের সঙ্গে যেমন তরুণ মুখে ভাবের গভীরতা ফুটে ওঠে তাই হয়েছে—চোখের দৃষ্টি আরো স্নিগ্ধ, ঠোঁটের হাসিখানি স্থির হয়ে আছে করুণার মধুরতায় ভরপূর। তারা যেন অনেকদিন ধরে প্রাণ ভরে ভালবেসেছে বলে অমন সুন্দর দেখতে হয়েছে। পাশাপাশি যে জালিকাটা কি খোদাই করা কাজ আছে তার একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই, কিন্তু একটির প্রভেদ অন্যটির রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। সেই কথা মনে করেই বোধ হয় শিল্পী তাদের স্বতন্ত্র করেছিলেন, জোড় মিলিয়ে দেন নি। তবে গরমিল কোথাও হয়নি। বালি পাথরের রং অনেক দিনের আলো, জল, বাতাস খেয়ে খেয়ে চন্দন কাঠের মত হয়ে গিয়েছে, তেলে জলে মানুষের শ্রী যেমন ফেরে তেম্নি আর কি! এই ঘাটের পাশেই একটি শিব মন্দির, সাদা পাথরের বিপুল শরীর নন্দী তার দুয়ার আগলে বসে আছে; এই প্রকাণ্ড ষাঁড়-টির কি সুন্দর গঠন, নধর শরীর, মাংস পেশীতে দৃঢ় সবল, শুধু মাংস পিণ্ডি নয়। জয়পুরের সাদা পাথরের মূর্ত্তি, এক সময় প্রভু মহাদেবের মতই রজত-গিরি-নিভ ছিল বোধ হয়, এখন কিন্তু সময় তার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে পুরাণ হাতীর দাঁতের মত মাখনের মোলায়েম রং ক'রে দিয়েছে। মন্দিরের গা ঘিরে চারিধারে অনেক মূর্ত্তি, কোনটি দেবতার, কোনটি মানুষের, আবার কোন কোনটি পশু পাখীর। ভগবান দয়া করে যাদের সৃষ্টি করেছেন তারা সবাই যে আত্মীয়, বোধ হয় এই কথাটি বলবার জন্যেই এদের পাশাপাশি কাছাকাছি রাখা হয়েছে। বংশী-ধারী মাধব বামে শ্রীরাধা, মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা দুর্গা সিংহের উপর বসে বল্লম দিয়ে অসুরকে গিঁথে মার-ছেন, হলধর, বলরাম, হরপার্ব্বতী, ছেলে কোলে করে ছেলেমানুষ মা, সন্ন্যাসী, গৃহী, তপস্বী, নতুন বরকণে কোথাও দুজনে কোথাও একলা; একজন ছেলে যে মেয়েটিকে ভালবাসে তার পায়ের কাঁটা খুলে দিচ্ছে, একজনের মুখে ব্যথা আর একজনের মুখে সহানুভূতি; এ ছাড়া ময়ুর, তোতা, হরিণ, রাজহাঁস, শুকসারি, সবাই আছে, ভাব করে আছে আর সবাই সুন্দর। মন্দির হতে বেরিয়ে দুএকটি সতী-স্তূপ দেখলাম, ছোট ছোট যেন খেল্‌না মন্দির এর সম্মুখে রাশী করা ফুল, সিঁদুরে সিঁদুরে তার সর্ব্বাঙ্গে লেপা হয়ে গেছে, একটি করে ঘীএর প্রদীপ রাতদিন সমানে জ্বলে। মেয়েরা গঙ্গা নেয়ে ফিরবার সময় এখানে প্রণাম করে ভগবানের কাছে এই মানায় যেন তারাও সকলে এম্নি হতে পারে। যে-সব সতীলক্ষী মেয়ে স্বামীর সঙ্গে চিতায় সহমরণে গিয়েছিলেন তাঁদেরি স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই স্তূপগুলির প্রতিষ্ঠা। যাকে ভাল-বাসি তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মরতে পেলে সুখীই হয় সত্যি, তবু মনে হয় যে-নেই তার জন্যে বেঁচে থেকে যে কাজ করে, সে, যে, পুড়ে মরে তার চেয়ে শক্ত মানুষ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পল্লার কবিতা

ভানুরায়ের সন্ন্যাস

ভাল ছেলে ভানু রায় পড়াশুনা করে,
মাঝে মাঝে ধর্ম্ম ভাব জাগিত অন্তরে।
মেডিক্যাল কলেজেব দিকে লক্ষ্য ছিল
ভুটী পাশ দিয়ে ভানু সেখানে ঢুকিল।
জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু, সদা দেখিয়া তথায়
দেহ ভঙ্গুরতা ভাবি মনে দুঃখ পায়।
মস্তকের তত্ত্ব ভাল বুঝিবার তরে
শব-মাথা কিনে ভানু আনে নিজ ঘরে।
মাথা নেড়েচেড়ে ভানু মনে মনে বলে
"এই দশা প্রাপ্ত হব' আমরা সকলে।
জীবনের হয় যদি এই পরিণাম
তবে কেন লোকে মিছা করে ধুমধাম?
কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী নিজ ইচ্ছামত
দ্বি শত বর্ষের পরে হইলেন গত।
সন্ন্যাসে হইল তার শক্তির সঞ্চয়
তার ফলে তার দেহ ক্ষয় নাহি হয়।
সন্ন্যাস করিব আমি শক্তি-লাভ তরে
বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হলে না ফিরিব ঘরে।"
এইরূপ ভানুরায় সঙ্কল্প করিল
গৃহ ছাড়ি মার কাছে পত্তর লিখিল ঃ
"চলিলাম মাতা আমি শক্তি লাভ তরে
সিদ্ধিলাভ না করিয়া না ফিরিব ঘরে।
কোথায় কখন থাকি জানাব তোমায়
স্থির মনে দাও মাগো আশীষ আমায়।"
ট্রেণ যোগে ভানুরায় গিয়ে বারানসী
এক আশ্রমেতে গেল হইতে সন্ন্যাসী।
আশ্রমের অধিকারী জিজ্ঞাসে তাহারে
"পিতামাতা আছে নাকি বলত' আমারে!"
"আছে"—উত্তরিল ভানু স্মরিতে মা বাপে
চক্ষুকোণ আর্দ্র হয় কণ্ঠস্বর কাঁপে।
তাহার অবস্থা দেখি বলে অধিকারী
"সময় হয়নি বাবা ফিরে যাও বাড়ী।"
বিশেশ্বর দরশন তরে ভানু যায়,
"পয়সা পয়সা" বলি সবে ঘিরে তায়।
"তীর্থরাজ বারাণসী তাতে যদি এই
দূর হতে অন্য তীর্থে নমস্কার দেই।
ইহা হতে শতগুণে মোর বাড়ী ভাল
প্রথম ট্রেণেই ফিরি ঘুচাব জঞ্জাল।"
এই ভাবি ভানুরায় সেই ট্রেণ ধরে
হাবড়া পৌছিয়ে ছুটে যায় নিজ ঘরে।
মার কাছে আসি ভানু দিল দরশন
পুত্র ফিরে পেয়ে মার আনন্দ রোদন।
ভানুর সন্ন্যাস কথা অমৃত সমান
যে জানে সে রচে আর পড়ে পুণ্যবান।

আগামী সংখ্যার পুরণো খাতায় তোমরা ভুলে গেছ কিম্বা কখনও পড়োনি, এরকম অনেক চমৎকার লেখা আমরা ছাপবো। এখন থেকেই আমরা এ বিষয়ে আয়োজন করছি। আগামী সংখ্যায় পুরণো ছবিও দেওয়া হবে।

সঙ্গী-হারা

(গল্প)

রমেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস

দুইটি ছোট্ট ছেলে। একজন নিশা, আর একজন ছোট্কা। দুজনার মনের মিল ছিল যেমন বড্ড বেশী, তেমনি আবার ঐশ্বর্য্যের মিল বংশের মিল দুজনাতে ছিল না মোটেই।

ছোটকার বাপ বড়ো গরীব। বংশের মর্য্যাদা তার নাই। বাপ-মায়ে জমিদার বাড়ীর ধান ভানে। তা'তেই যা আয় হয় তা' দিয়ে তা'দের কোনরকমে সংসার চলে।

নিশা জমিদারের ছেলে, বাপমায়ের আদরের ছেলে। সমস্ত গ্রামখানা তা'দের নামে কাঁপে এমনি তাদের প্রতাপ।

নিশাদের বাড়ী আর ছোটকাদের বাড়ী এতো কাছাকাছি যে নিশা যদি তাদের বাড়ীর দোতলায় দাঁড়াইয়া ডাক দেয়, ছোট্—কা—, হয়ত ছোটকা তাদের ভাঙা কুঁড়ে ঘর হইতে উত্তর দিবে—নিশা, আমি আসছি।

ছোটকার মা পূব পোতার ঘরের বারান্দায় বসিয়া চাউল পরিষ্কার করে। ছেলেকে বাইরে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে—কিরে খোকা, কোথায় যাস্?

"বাবুদের বাড়ী যাই, নিশা আমায় ডাকে," মা আর কিছু বলে না। ছোটকা ছুটিয়া যায় তাহার সাথীর ডাকে। মায়ের মন রঙীন আশায় ও কল্পনায় উপছাইয়া পড়ে। ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া তাহার কল্পনা যে কোন্ মায়াপুরীতে চলিয়া যায় তাহা সে অনেক সময় নিজেই ঠিক পায় না। কি আশ্চর্য্য, চাউল বাছাই করা হইয়া গেছে কোন্ কালে, তবু সে কুলা হাতে বসিয়া আছে ঠিক যেন জড়মূর্ত্তির মতো।

ছোটকার বাবা আসিয়া যখন বলে—ও কি গো, অমন করে বসে আছ কেন?

মায়ের মুখ তখন লজ্জায় আরক্তিম হইয়া ওঠে। থতমত খাইয়া উত্তর দেয়, না, কিচ্ছু না।

এতক্ষণের বাছাইকরা পরিষ্কার চাউল বস্তায় ভরিয়া রাখে। তারপরে হয়ত আন্‌মনে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলে,—ওগো দেখেছ, বড়বাবুর ছেলের সাথে আমার খোকার কি ভাব!

দরিদ্র পিতামাতার মন গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ওঠে।

নিশার মনটা কি উদার, প্রাণটা কি বড়ো! তাহাদের বাড়ীতে ভাল কিছু খাবার হইলে নিশা তাহার প্রাপ্য ভাগ হইতে অর্দ্ধেকটা কেন, প্রায় সবখানিই সে রাখিয়া দিবে তাহার প্রিয় বন্ধুর জন্য—অতি সঙ্গোপনে, কেহ জানিবে না, কেহ টের পাইবে না।

তারপর হয়ত সুযোগ বুঝিয়া ছোটকাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে, সেই যে সেই সুপারিবাগানটা পার হইয়া যে পানা-পড়া পুকুরটা, তাহারই পারে যে অতি পুরাতন আমলকিগাছটা সেইখানটাতে।

নিশা লুকাইয়া নেওয়া বাটিভরা খাবারগুলা তাহার গায়ের কাপড়ের নীচ হইতে বাহির করিয়া বলে—ছোটকা, আজ আমাদের বাড়ীতে খাবার তৈরী হয়েছিল, তোর জন্য এনেছি ভাই।

ছোটকা আনন্দের আতিশয্যে আস্তে আস্তে উত্তর দেয়—কি খাবার রে ? ওঃ এ যে……… ।

একটুখানি থামিয়া বলে—ভাই, আমি কিন্তু একলাটি খেতে পারব না ।

দুই বন্ধুতে বসিয়া খাবার খায় আর যতো সব রাজ্যের গল্প করে— ।

ছোটকা বলে, জানিস্ নিশা, ঐ যে ঐ গাবগাছটা দেখছিস্ ঐখানে নাকি এক বুড়ি আছে । রাত্তির হ'লে ও নাকি রোজ কাঁদতো । কেঁদে কেঁদে হয়রাণ হয়ে এখন আর কাঁদে না ।

নিশা অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করে—কাঁদতো কেন ?

ছোটকা বলে, ভাণ্ডিবারীর কেষ্ট খুড়োর ছেলে পুটু রোজ আসতো ঐ ঢেকীবনে ঢেকীশাক তুলতে। একদিন তাকে সাপে কামড়ে মারে । কত ওঝা এলো, কত কবরেজ এলো, কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না । শেষকালে সেই শোকে পুটুর ঠাকুরমা একদিন মরে গেল । সে এখন পেত্নী হয়ে ঐ গাছটাতে আছে আর 'পুটু' 'পুটু' বলে রোজ রাত্তিরে চেঁচিয়ে কাঁদতো । বাবা বলে, এখন ও হয়রাণ হয়েছে, তাই আর কাঁদে না । বাবা কতদিন ওর কান্না শুনেছে ।

নিশা আগ্রহের সাথে বলে—আচ্ছা ভাই, সকলেই কি মরে পেত্নী হয় ?

ছোটকা বলে, কেউ ভূত হয়, পেত্নী হয়, আবার কেউ বেহ্মদত্যি হয় ।

নিশা বলে, আমরাও হবো ।

এমনি ভাবে দুই বন্ধুতে ঔৎসুক্যভরা মন লইয়া কত কি আজগুবি গল্পই না করে ।

ছোট্‌কা তাহার মাকে জানায় মা, আজ নিশা আমায় সিঙারা, কচুরি খাইয়েছে । ওদের বাড়ীতে তৈরী হয়েছিল । খেয়ে দেখো না, তোমার জন্য দুটো এনেছি ।

মা রান্নাঘরে ডাল সোম্বার দিতে ব্যস্ত । ছেলের নাছোড়বান্দা আবেদনে শেষটায় তাহাকে হার মানিতে হয় ।

আজ রাত্তিরে বিছানায় শুইয়া ছোট্‌কা তাহার মাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমরা ছোটলোক কেন মা ?

মা তাহার পুত্রের অপ্রত্যাশিত আচম্‌কা প্রশ্নে অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দেয়, কে বলেছে আমরা ছোটলোক !

ছোট্‌কা বলে, হ্যাঁ মা, আমরা ছোটলোক ।

মা ছেলের এই বেদনাপূর্ণ ধারণা উল্‌টাইতে গিয়া বলে, না, না, তুই ভাল লোক ।

মায়ের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া ছোটকা বলে, না মা, আমি শুনেছি আমরা ছোটলোক ।

"তোকে কেউ মিথ্যে বলেছে ।"

"নিশা কি মিথ্যা বলে কখনো ।"

অজানা আশঙ্কায় মায়ের বুক ধরফর করিতে থাকে ।

ছোটকা বলে, না মা, নিশা কখনো মিথ্যা বলে না । ওর বাবা ওকে ছোটলোকদের সাথে মিশতে মানা করে দিয়েছে । আমার সঙ্গেও না, আমি যে ছোটলোক, তাই ।

পুত্রের অজ্ঞাতসারে মায়ের চোখ দিয়া বুঝিবা অশ্রু গড়াইয়া পড়ে ।

কিছুক্ষণ থামিয়া ছোটকা আবার চুপি চুপি বলে, মা, নিশা কিন্তু আমার সাথে রোজ মিশবে । গোপনে মিশবে । কে-উ জান্‌বে না ।

আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলে···আমার সাথে মিশতে দেখলে ওর বাবা ওকে মারবে, না মা ! কিন্তু আমি কি কোরবো, আমি ওকে মানা করি তবু আমার সাথে ও মিশবে । বলে, বাবা বললেই হল আর কি ?

হঠাৎ আবেগভরে আবার ছোটকা তার মাকে প্রশ্ন করে—আমরা কেন ছোটলোক মা ?

মা অবোধ সন্তানের এ প্রশ্নের কি জবাব দিবে কিছুই ঠিক না পাইয়া বলে—ভগবান আমাদের ছোটলোক করে জন্ম দিয়েছেন, তাই ।

"আমরা কি নিশাদের মত হতে পারি না ?"

"ভগবানকে ডাক্‌লে আর নিত্যি পুণ্যি কাজ করলে আমরাও নিশাদের মত বড়লোক হতে পারবো ।"

"কৈ, তুমি ত রোজই ভগবানকে ডাকো ।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটে ।

ছোটকা বলে মা, আজ নিশার বাবা যে একটা লোককে মেরেছে, মারতে মারতে মেরে ফেলেছিলো আর কি !

মা বলে এই রকম করলে ওরাও একদিন আমাদের মত ছোটলোক হবে ।

বন্ধুর এই আসন্ন বিপদে ছোটকা অতিমাত্র বিচলিত হইয়া বলে—তাহলে নিশাও আমাদের মত হবে ? না মা, নিশা যেন আমাদের মত না হয় । আমি রো-ও-জ ভগবানকে ডাকৃবো ।

ছেলের যে ব্যথা কোথায় তাহা মা বুঝিতে পারিয়াই কথাটাকে ঘুরাইয়া আবার বলে—নিশা কেন ছোটলোক হবে ? ও ত কোন পাপ কায করেনি । ও বড়লোকই থেকে যাবে । লক্ষ্মীটী, এবারে ঘুমোও ।

* * * * *

আমলকি গাছের তলাতেই দুজনের আড্ডা ।

নিশা বলে ভাই আমার যেতে ইচ্ছে করছে না মোটেই । কিন্তু বাবা আমায় এখানে থাক্‌তে দেবে না । কি কোরবো আমি ! বাবা বলে, কোলকাতায় গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হতে হবে । কাকাবাবু কাকীমার কাছে থাক্‌তে হবে ।

এই আকস্মিক সংবাদে ছোটকা ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে না । তাহার মুখে কোন কথাই জোগায় না । একবার ইচ্ছা হয় বন্ধুকে তাহার বুকের মাঝে চাপিয়া ধরে । শেষটা সে নিজের মনকে সংযত করিয়া বলে—ভাই, আবার কবে দেখা হবে ?

আর সেই পূজোর ছুটীতে আস্‌বো ।

এমনি সময় নিশাদের বাড়ীর দোতলার উপর হইতে কে যেন ডাকে—খোকামণি, খোকামণি, ও খোকামণি ।

নিশা উত্তর দেয়—-কি

—শিগ্‌গীর করে এসো, বাবু তোমায় ডাক্‌ছে।

পরস্পরের পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না মোটেই। তবু যাইতে হইল। যাওয়ার সময় নিশা তাহার প্রিয় বন্ধুকে উপহার দিয়া গেল—চারিটা পাথরের মারবেল, দুইটা লাটিম, আর একটা বাঁশী। যতক্ষণ না গাছের আড়াল দিয়া নিশা বাড়ীর ভিতরে মিলাইয়া গেল ততক্ষণ ছোটকা অপলক নেত্রে চাহিয়া ছিল নিশার দিকে।

বন্ধু বিচ্ছেদ ব্যাথায় তাহার কিছুদিন কাটিল বড় কষ্টে। তারপরে সব সহিয়া গেল। তবে মাঝে মাঝে তাহার খেলার সাথীদের এখনও সে বলিয়া থাকে—দেখ গিণ্টু, এই মারবেলটা নিশা কোলকাতায় যাওয়ায় সময় আমায় দিয়ে গেছে। এই যে ভাল লাটিমটা দেখছিস এটাও ও দিয়ে গেছে। কেমন লাটিমটা? খুব ভালো, না?

এমনিভাবে অনেকদিনের অনেক খেলা-ধূলায় নিশার কথা মনে পড়িয়া তাহার প্রাণটা সময় সময় আই-ঢাই করিতে থাকে। ভাবে—পূজা কবে আসিবে।

সময় তড়িৎ বেগে চলিয়া যায়। কাহারও অপেক্ষায় সে থাকে না। কাজেই পূজার ছুটি আসিতে দেরী হইল না। একদিন ছোটকা তা'র মায়ের কাছে প্রথম শুনিল—নিশা আসিবে, পরশুদিন আসিবে। ছোটকার বাবা নাকি নিশাদের বাড়ী হইতে শুনিয়া আসিয়াছে।

নিশা আসিবে? ছোটকার অন্তরঙ্গ আসিবে? এক নিমেষে তার সমস্ত প্রাণ একটা চাপা আনন্দের উল্লাসে ভরিয়া গেল। সংসারে বুঝিবা তাহার এতো প্রিয় সাথী আর কেহ নাই। তাই সে মাকে অতি কাছে পাইয়া আস্তে আস্তে তাহার মনের কথাটি পারিল—নিশা এবার এলে ওকে আমরা নেমতন্ন করে খাওয়াবো, কেমন?

মা পুত্রের এহেন অভিলাষের কথা শুনিয়া বলে—ওযে বড়লোকের ছেলে, ওকি আমাদের রান্না খেতে পারবে?

ছোট্‌কা জেদ্ ধরিয়া বলে—কেন পারবে না? আমি বল্‌লে ও নিশ্চয়ই খাবে।

তারপর একটু তোষামোদ করিয়া বলে—তোমার রান্না কতো ভালো। ও বেশ খেতে পারবে। কেমন মা, ওকে নেমতন্ন কোরবো? বলো না?

মা ছেলেকে আদর-করা-রাগে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা, করিস্। ছোটকার মন আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়।

* * * *

আজ রাত্রে ছোটকার আর ঘুম নাই। সারা রাত্রিটা ধরিয়া বিগতদিনের বন্ধু-বিজড়িত যত কিছু স্মৃতি সে ভাবিয়াছে। পোড়ো বাড়ীতে পুকুর-পুকুর খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া আমলকিতলার ভূতের গল্প পর্য্যন্ত ইহার কিছুই বাদ যায় নাই।

ভোর হইয়াছে। ষ্টিমার আসে বেলা আটটায়! ছোটকা আর বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। পান্ত-ভাত খাইয়াই ষ্টেশনে রওনা হইল।

গ্রামের নদী। কতো কচুরিপানা নদীর স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে। কে জানে কোন্ হাটের উদ্দেশে ব্যাপারিরা তাহাদের নৌকায় পাল তুলিয়াছে। ছোট ছোট ডোঙা পাড়ের গা ঘেঁসিয়া তর্ তর্ বেগে ছুটিয়াছে। ওপার হইতে কোন্ গ্রামবাসীর ডাক্—'ও মাঝি—ই-ই-ই' ক্ষীণ শব্দে এপারে আসিয়া পৌছিতেছে। ধেনো জমিতে কৃষকেরা বলদের সাহায্যে লাঙল চালাইতেছে আর 'হেই, হেই' শব্দ করিতেছে; এই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া আবার শ্রুত হইতেছে। ষ্টেশনে লোক জমা হইয়াছে! ষ্টিমার আসিল বলিয়া। নিশাদের বাড়ী হইতে দত্ত মশায় লোকজন লইয়া আসিয়াছেন।

ছোটকার মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আর কিছু বাদেই ত সে নিশাকে দেখিতে পাইবে। নিশা—হ্যাঁ, নিশা যে তার কতো আপনার, কতো প্রিয়। সরল বালকের প্রতি মুহূর্ত্ত অতি উৎকণ্ঠায় কাটিতে লাগিল।

অবশেষে ষ্টীমার ষ্টীম ছাড়িয়া সশব্দে পাড়ে ভীড়িতে লাগিল। যাহারা এই ষ্টেশনে নাবিবে—তাহারা ডেকের উপরে—ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোটকা ঔৎসুক্যপূর্ণ নয়নে ষ্টীমারের দিকে তাকাইয়া। ওই যে নিশার কাকা, হ্যাঁ ঐত। ও কে? রামু না? হ্যাঁ রামুই ত। কিন্তু নিশা কৈ? নিশাকে যে দেখা যায় না? ওকি আসে নাই না কি? ছোটকার মন আশঙ্কায় ছটফট করিতে থাকে। কিন্তু ভীড় ঠেলিয়া যখন নিশা বাহির হয়—তখন ছোটকার মন আবার আনন্দে ভরিয়া যায়, মুখের ম্লানিমা দূর হইয়া যায়। নিশা আসিয়াছে। এই কয়েক মাসের মধ্যে ও কতবড় হইয়াছে। চুল কেমন ফ্যাসান্ করিয়া কাটিয়াছে। ওকে যেন আর চেনাই যায় না! ওর সাথে আরও কয়েকজন সমবয়সী ছেলে আছে। বোধকরি ওরা ওর কাকার ছেলে।

আচ্ছা, নিশা কি বলিয়া ছোটকার সাথে প্রথম কথা কহিবে? ছোটকা ভাবিল—আজই ওকে নেমতন্নর কথা বলিয়া রাখিতে হইবে। নিশা কি তাহার কোনও কথা ফেলিতে পারে? কিছুতেই না। নিশা নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়ীতে খাইবে। গরীব বা ছোটলোক বলিয়া অবহেলা করিবে না। কেন না সে যে তাহার অতি প্রিয়।

ষ্টীমার হইতে সকলে নামিল। ছোটকা ভাবিল এইবার নিশা তাহার সাথে কথা কহিবে। তাহার উৎসুক মন ইহাই থাকিয়া থাকিয়া আশা করিতেছিল। হায়, এ বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম যে কতো কি বিবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনের অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা সে খবর কয়জনে রাখে! তাই পদে পদে ধাক্কা খাইতে হয়, ব্যর্থতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হয়। এমনিভাবে কতো লোক যে পাগল হইয়াছে, কতো জীবন যে শেষ হইয়াছে, তাহার কেউ হিসাব দিতে পারে কি? হিসাব দিতে পারা যায় না। যদি কেহ দেয় তবে সে হিসাবে ভুল থাকিয়া যাইবে অনেক।

ছোটকা ভাবিয়াছিল নিশা তাহার দর্শনে কতো আনন্দিত হইবে, কতো কথা বলিবে, গল্প বলিবে। নিশা কথা কহিল বটে, এ কথায় প্রাণ নাই, এ কথায় আবেগ নাই। শুধু 'কেমন আছিস্!' তারপরে নিশা তার নূতন বন্ধুদের সাথে হাস্য কলরোলে সমস্ত রাস্তা মুখরিত করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ছোটকাও তাহাদের পেছন পেছন রওনা হইল। কিন্তু নিশা তাহার দিকে একবারও তাকাইল না। মাঝখানে যেন একটা কতবড় ব্যবধান, পর্ব্বতের মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক নিমেষে কি হইয়া গেল। ছোটকার

সেই ঔৎসুক্যপূর্ণ মন যেন সহসা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগিয়া আকাশ হইতে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল। সরল বালকের মন কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে ইহা কেমনে সম্ভব হইল। একদিন যে তাহার আপনার ছিল, অতি অন্তরঙ্গ ছিল, সে আজ এতোখানি পর হইল কেমন করিয়া। এই কি সেই নিশা? একদিন যে সেই আমলকি গাছের তলায় বসিয়া অতি সঙ্গোপনে তাহাকে খাবার খাওয়াইয়াছিল, এই কি সেই? একদিন যে বলিয়াছিল—বাবা আমায় তোর সাথে মিশতে মানা করলেও আমি তোর সঙ্গে রোজ মিশব, এই কি সেই নিশা? যে লাটিম দিয়াছিল, মারবেল দিয়াছিল, বাঁশী দিয়াছিল, এই কি সেই? ছোটকা কিছুতেই ভাবিতে পারিল না যে নিশা তাহাকে তাচ্ছিল্য সহকারে দেখিতে পারে, নিশা তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে। একথা বিশ্বাস করিতেও যে তাহার সমস্ত গা শিহরিয়া ওঠে। মিথ্যা কহিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে, তাই বলিয়া সত্যকে ত অবিশ্বাস করা চলে না। কালচক্রে যে সকলেই ঘুরিয়া যায়। আজ যাহাকে আপনার ভাবিতেছ কাল হয়ত দেখিবে সে পর হইয়াছে। আবার আজ যাহাকে পর ভাবিতেছ, কাল হয়ত সে তোমার অতি আপনার হইবে। এমনই চিরদিন হইয়া থাকে। কিন্তু ছোটকার মন কিছুতেই ঠাহর করিতে পারে না—এমন কেন হয়।

ছোটকা আর বাড়ীতে গেল না। গাঁয়ের সারা পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল—একি হইল! পথের ধারের গাছগুলিও যেন ছোটকাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—একি হইল! ঐ যে স্রোতস্বিনী খালটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—সেও যেন তাহার প্রতি সমবেদনা জানাইয়া কহিয়া যাইতেছে—একি হইল! ঐ যে সাদা ধব ধবে বাছুরটা তাহার মায়ের সাথে সবুজ মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে সেও যেন ক্ষণেকের তরে মাথা তুলিয়া ছোটকাকে সমবেদনা জানাইয়া বলিতেছে—এ কি হইল! সমস্ত আকাশ বাতাস যেন ছোটকার স্বরে স্বর মিলাইয়া হা হুতাস করিয়া বলিতেছে—এ কি হইল!

* * * *

বেলা অনেক হইয়াছে। ছোটকা বাড়ী ফিরিল। মা জিজ্ঞাসা করিল—নিশা এসেছে? ছোটকার মুখ থেকে হঠাৎ বাহির হইল—না।

ছোটকা আর কোনও কথা না কহিয়া বারান্দায় পাতা খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল।

* * * *

সেই পেত্নী-থাকা গাব গাছটা এখনও আছে, আমলকি গাছ, পোড়ো বাড়ী এখনও আছে। সেই ছোটকা এখনও আছে, কিন্তু তাহার প্রিয় বন্ধু নিশা আর নাই। তাই তাহাকে 'নেমতন্ন' করিয়া খাওয়ানো আর ঘটিয়া উঠিল না।

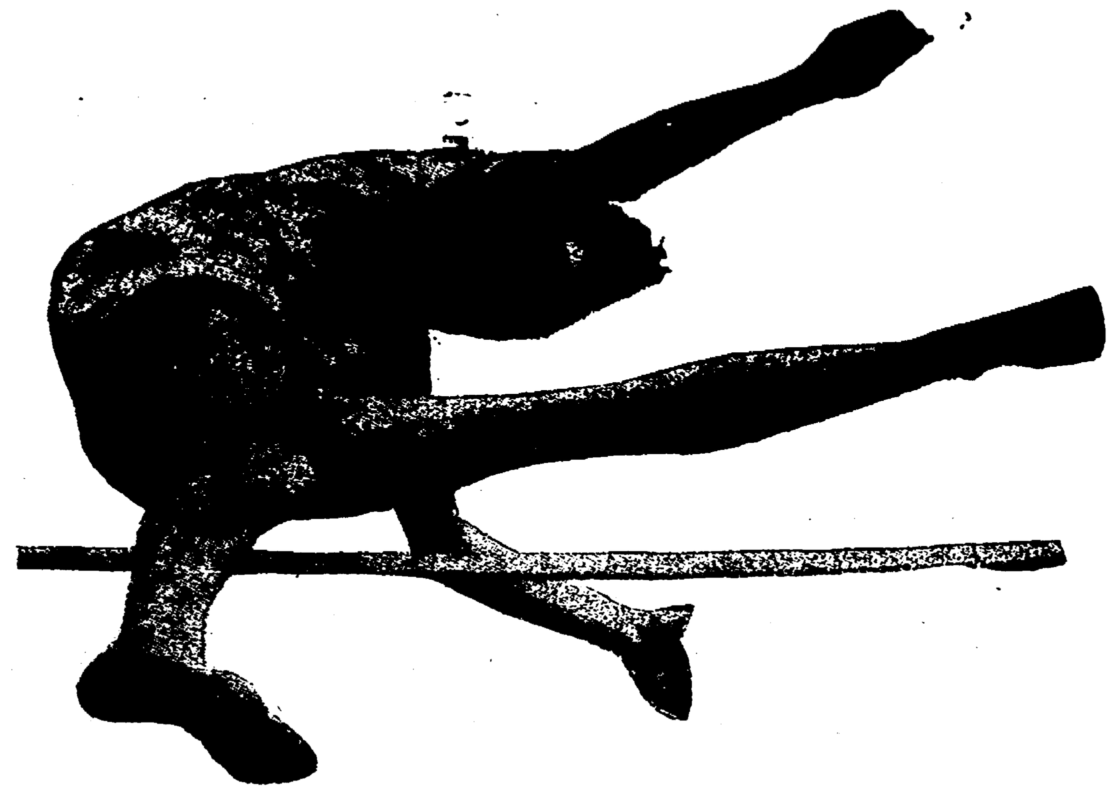

ছুটীর ঘণ্টা

'বড়দিন' এসে পড়েছে। এ সময়টায় ক্রিকেট এবং টেনিসের আকর্ষণই বেশী। কিন্তু এবার বিলিতী ক্রিকেট খেলিয়ে দল এম, সি, সি আসছে না এই খবর পেয়ে 'উড্‌বার্ণ পার্কে' ভীড় জমে উঠেছে। পূর্ব্ব-ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায়—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় এবার যোগ দিয়েছেন য়ুরোপের দু'জন নামজাদা খেলোয়ার পুনসেক্ ও মিটিক্। পৃথিবীর প্রথম দশজন এমেচার টেনিস খেলোয়ারের ভিতর পুন্‌সেকের নাম আছে। এরা ছাড়া এ দেশের যত বাছাই খেলোয়ার—সবাই এসেছেন দল বেঁধে। সুতরাং চ্যাম্পিয়নসিপ কাপ কার করায়ত্ত—এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সহজ নয়। তবে আমাদের মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত বাজীমাৎ কোরবেন ঐ অমায়িক মিশুক বিদেশী ভদ্রলোকটী—যুগোশ্লাভিয়ান্ পুন্‌সেক।

প্রথম দিকের খেলায় পুনসেক্ অতি সহজেই ভারতবর্ষের একজন নামজাদা খেলোয়ার বিটিকে হারিয়েছেন। মিটিক এখনো কোলকাতায় এসে পৌঁছান নি। গউস মহম্মদ—ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়ারের কোন খবর নেই। পূর্ব্ব-ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার কর্ত্তৃপক্ষ গউস মহম্মদকে নিয়ে একটু বিব্রত ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন।

শ্রীমান্ খসু সেন প্রবীণ খেলোয়ার মিচেলমোরকে ষ্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন। শ্রীমানের খেলায় উঁচুদরের কৌশলের আভাষ পাওয়া গেছে। শ্রীমান্ ফরাসী পেশাদার এষ্ট্রাবোর কাছে খেলা শিখেছেন। এর বয়স কম। আশা করা যেতে পারে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়ার হ'য়ে খেলার মাঠে তিনি বাঙ্গালীর লজ্জা দূর কোরবেন। তরুণ খেলোয়ার নির্ম্মল সেন যুধিষ্ঠির সিংএর কাছ থেকে একটা সেট ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন—এটা তার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

কোলকাতায় বড়দিনে এবার ক্রিকেটের আকর্ষণ না থাকলেও মাদ্রাজে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দলের মধ্যে একটা খেলা হবার কথা আছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবেন যতদূর সম্ভব মেজর সি, কে, নাইডু। কয়েক দিন আগে আন্তর্প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতি-যোগিতায় (রঞ্জী ট্রফি) অপ্রত্যাশিতভাবে দশ উইকেটে নবনগর হেরে গেছে বরোদার কাছে। নবনগরের পক্ষে খেলেছিলেন অমরসিং, এস, ব্যানার্জী, কোলা, ওয়েনস্‌লী, মুবারক আলী, ইন্দ্রবিজয় সিংজী, যাদবেন্দ্র সিংজী প্রভৃতি। অমরসিং প্রথম ইনিংসে ১০৩ রাণ করেন। বরোদার পক্ষে নামজাদা খেলোয়ার ছিলেন মাত্র সি, এস, নাইডু ও নিম্বলকর। কিন্তু প্রথম ইনিংসেই ১৬০ রাণ ক'রে অধিকারী নবনগরের ভাগ্য-বিপর্যয়ের রেখা টেনে দেন। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে সি, এস, নাইডু সামান্য কিছু রাণ দিয়ে আটটী উইকেট হস্তগত করেন। প্রথম ইনিংসেও তিনি বিপক্ষ দলের পাঁচজন খেলোয়ারকে উইকেট থেকে 'প্যাভিলিয়নে' ফেরৎ পাঠাতে ভুল করেন নি। এ পর্য্যন্ত পর পর চারটী খেলায় তিনি ৪৪টী উইকেট পেয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে তার খেলার আরোও উন্নতি হবে এবং তাকে বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়ার ভেরিটীর পর্য্যায়ভুক্ত কোরতে আমাদের দ্বিধা হ'বার কোন কারণ থাকবে না।

ক্রিকেটের কথা নিয়ে 'ক্রিকেনিয়া' নামে একটী বার্ষিকী প্রকাশিত হ'য়েছে। এর মতে গত বছরের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়ার হ'চ্ছেন—বিজয় মার্চ্চেণ্ট, অমরনাথ, উজির আলী, নিশার ও নাওমল। আমাদের মতে চৌকস খেলোয়ার হিসেবে সি, কে, নাইডু এখনো এঁদের কারো থেকে নীচুতে ন'ন।

কোলকাতায় পোলো খেলা চ'লছে। কারমাইকেল কাপ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। পোলো খেলা অনেকে না দেখে থাকলেও জয়পুর, যোধপুর এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দলগুলির নাম শুনেছো! এবার কারমাইকেল কাপে কুচবিহারের দল তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

এই সেদিন পূর্ব্ব-ভারত ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতা শেষ হ'য়ে গেলো। খেলা দেখে মনে হ'লো তারা ব্যানার্জী, ভি, ম্যাড্‌গাফকার এঁরা কৌশলী খেলোয়ার। কিন্তু লাহোরে আগামী নিখিল ভারত ব্যাডমিন্‌টন্‌ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে এঁদের আরোও ভাল খেলতে হ'বে। মেয়েদের মধ্যে একমাত্র মিস্‌ মার্সিলিনের খেলা আমাদের চোখে লেগেছে।

আন্তর্প্রাদেশিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার হয়ে দেবরাজ ভাসিন, অরুণ ঘোষ, এস্‌ ব্যানার্জী এবং এ সোম বোম্বাই গেছেন। বোম্বাইএর 'কাপাদিয়া' ভাই দুটী এবং বরফওয়ালা নামজাদা খেলোয়ার। কিন্তু পাঞ্জাবের আয়ূধই হয়ত' সকলের ভীতি সঞ্চার ক'রবেন। যাহোক, টেবিল-টেনিসের যাদুকর ভি, বার্ণার ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক ক'রে অরুণ দেবরাজকে নিয়ে বাঙ্গালা দেশের মান-ইজ্জত রক্ষা কোরবেন—এ আশা হয়ত অসঙ্গত নয়।

সন্ধানী

পদার্থ

আমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী; পৃথিবীর বুকে পিঁপড়ের মতো ঘুরে ফিরে আছি। আমাদের তুলনায় পৃথিবীটাই কত বড়, আবার পৃথিবীর মত ছোট বড় আরো কতকগুলো গ্রহ ঘুরছে সূর্য্যের চারিদিকে। ওদিকে সূর্য্য তার পৃথিবীর ১৩ লক্ষগুণ বড় দেহ নিয়ে ভেসে আছে আকাশের কোণে। কিন্তু আরো কত বড় বড় সব জিনিষ রয়েছে আকাশে, সূর্য্য তো কোন ছার! এই যে সব নক্ষত্র আমরা আকাশে দেখি, এগুলো এক একটা সূর্য্যের চাইতে অনেক বড়; তবে অনেক দূরে আছে বলে এত ছোট দেখায়।

আলো চলে সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে। সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে লাগে প্রায় ৮ মিনিট, কিন্তু সব চেয়ে কাছে যে নক্ষত্রটি তার আলো আমাদের এখানে আসতে লাগে তিন বছর এবং এমন সব নক্ষত্র আছে যাদের আলো পৃথিবীতে আসতে কয়েক শত বৎসর লাগে। কি ভীষণ দূরত্ব? আমরা যত নক্ষত্র দেখছি আকাশে তা' নিয়ে হ'লো মাত্র একটা নক্ষত্র নগরী (Star City)। এ রকম কত নক্ষত্র নগরী যে এ বিশ্বে আছে তার সংখ্যা নেই। এখন বুঝে দেখ কত বড় এ বিশ্ব; বুঝবে আর কি? এ বোঝা মানুষের শক্তির বাইরে বল্লেই চলে। এখান থেকে নক্ষত্রগুলিকে মনে হয় পরস্পরের খুব কাছাকাছি অব-স্থিত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা মোটেই নয়। এ পৃথিবীতে যদি থাকতো মোটে চার জন মানুষ—আমি এশিয়ায়, তুমি আফ্রিকায়, আর দু'জন ইউরোপে ও আমেরিকায়—তবে আমাদের পক্ষে পৃথিবীটা যেমন নির্জন লাগতো, তারাগুলোও তাদের দেহের তুলনায় তেমন নির্জনতার মধ্যেই আছে। যাক্‌ এই তো গেল বড়র দিকের কথা, এখন ছোটর দিকের কথা ধরা যাক্‌।

তোমরা বোধ হয় জান যে কোন বস্তু একাধিক পদার্থের সমষ্টি না হ'য়ে একই পদার্থ হ'তে পারে; যেমন একগ্লাস জল। আবার বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি হ'তে পারে যেমন এক কাপ চা; এখানে চায়ের কাপটী একই পদার্থের তৈরী, সেটি হচ্ছে চীনামাটী। কিন্তু কাপের ভেতর যে চা আছে, তা জল, চা এবং চিনি ও দুধ মিশিয়ে তৈরী হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে প্রত্যেক অমিশ্রিত (simple) পদার্থ (যেমন জল বা চীনেমাটী) একই প্রকার অণুর (Molecules) সংযোগে গঠিত। পদার্থকে ভাগ করতে করতে এমন এক অবস্থায় আনতে

পারা যায়, যখন সেই পদার্থের গুণ বজায় রেখে তাকে আর ভাগ করা চলে না। যেমন পাঁঠা কাটলে মাংসকে আর পাঁঠা বলা চলে না সেইরূপ কোন পদার্থের অনুকে (Molecules) ভাগ করলে, তা আর সেই পদার্থ থাকে না। একেই বলা হয় পদার্থের আধুনিক অবস্থা (Moleculer state)। অতি অল্প পরিমান পদার্থের বহু বহু অনু থাকে। একটা সাধারণ চায়ের কাপে প্রায় একশো কোটি কোটী কোটী (১০০,০০০০০০০,০০০০০০০, ০০০০০০০) চীনেমাটীর অনু এবং এক কাপ জলে এর বহু কোটী গুণ অনু থাকে। প্রত্যেক পদার্থের অনু বিভিন্ন প্রকার।

অনুকে আবার আরও ভাগ করলে পাওয়া যায় পরমাণু (Atom)। রাসায়নিক জগতে পদার্থকে হু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ—মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ। একই রকম পরমাণু দুই বা ততোধিক সংখ্যায় মিলিত হ'য়ে মৌলিক পদার্থের অনুর সৃষ্টি করে এবং দুই বা ততোধিক বিভিন্ন রকম পরমাণু মিলিত হ'য়ে যৌগিক পদার্থের অনুর সৃষ্টি করে। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ৯২ রকমের পরমাণুর দেখা মিলেছে। আমরা চারিদিকে যে এত জিনিষ দেখি তা সবই এই ৯২ রকম পরমাণুর কোনটার না কোনটার সংযোগে তৈরী। যেমন জলের অণুতে (Molecule) আছে,—উদজানের (Hydrogen) হু'টী পরমাণু এবং অম্লজানের (oxygen) একটী।

রংমশালের নিয়মাবলী

১। "রংমশাল" মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে। মাসের ১৫ তারিখের পর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ২০ তারিখের পর, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পত্র লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠানো হয় না।

২। রংমশালের বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সহ) ২৷৵০, ছয় মাসের মূল্য ১৷০ এবং প্রতি সংখ্যা।০। যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন সংখ্যার মূল্য—প্রতি সংখ্যা।৵০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৩। রংমশালের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া কাগজের একদিকে লিখিবেন ও কপি রাখিবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

৪। যাঁহারা গ্রাহক বা গ্রাহিকা তাঁহারা তাঁহাদের চিঠিপত্রের সহিত অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নং লিখিবেন।

কার্য্যালয়—

১০ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন, সাউথ ৪৭৯

চলন্তিকা

শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসল। পররাজ্যের ওপর লেনিনের রুশিয়া লোভ করবে না এই ছিল আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু টিক্‌লো না, লোভেরই হল জয়। ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ড যার লোকসংখ্যা রুশিয়ার লোকসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ তবু লড়ছে এবং তার পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ অনেক জায়গায় ব্যর্থ করেছে। ফিনল্যাণ্ডের দুর্দ্দশায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই তাকে সহানুভূতি জানিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সোভিয়েটকে সঙ্ঘের সভ্যপদ থেকে বঞ্চিত করেছে। তবুও টাকা-কড়ি ও লোকজনের সাহায্য না পেলে ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে আর বেশী দিন টিকে থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। জয়ী হলেও এ যুদ্ধ সোভিয়েটের জাতীয় ইতিহাসে এক কলঙ্কের অধ্যায় রচনা করবে। এর লজ্জা রুশিয়ার প্রতিটী নাগরিককে কাঁটার মত বিঁধবে।

অল্প কয়েক দিনের ভিতর পর পর জার্ম্মেণীর একখানা পকেট যুদ্ধজাহাজ এ্যাড্‌মিরাল গ্র্যাফ্‌স্পী এবং বিশাল লাইনার কলম্বাস আত্মহত্যা করেছে। ছোট ছোট তিনখানা ব্রিটিশ ক্রুজারের আক্রমণে আহত হয়ে গ্র্যাফ্‌স্পী মণ্টিভিডিও বন্দরে আশ্রয় নেয়। উরুগুয়ে সরকার গ্র্যাফ্‌স্পীকে তিন দিন সময় দেয় যার ভিতরে গ্র্যাফ্‌স্পীকে হয় বন্দর ছেড়ে যেতে হবে কিম্বা যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন মণ্টিভিডিও বন্দরে অন্তরীণ থাকতে হবে। তিনদিনের শেষে গ্র্যাফ্‌স্পী মণ্টিভিডিও বন্দরের বাইরে এসে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গ্র্যাফ্‌স্পীর কমাণ্ডার কাপ্তেন ল্যাঙ্গস্‌ডর্ফ আত্মহত্যা করেন। কলম্বাস জার্ম্মাণীর একখানা বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজ প্রায় ৩৩,০০০ টন। একখানা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কাছে আসতেই কলম্বাস ধরা পড়বার ভয়ে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর যাত্রী কেউ মারা যায়নি।

যুদ্ধের শোনাবার মত আর কোনও খবর পাইনি। একটা হাল্কা খবর বলছি। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনের প্রায় সব কাগজেই খবর বেরোয় যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব ভুলে ছাতা না নিয়েই ফ্রান্সের রণক্ষেত্র পরিদর্শনে চলে গেছেন। ছাতাহীন চেম্বারলেন সাহেবকে কি তোমরা ধারণা করতে পার? সম্ভব নয়। খবর পেয়ে তিনজন জার্ম্মাণ বৈমানিক নিজেদের জীবন বিপন্ন করে একটী খাঁটী ব্রিটিশ ছাতা চেম্বারলেন

সাহেবকে উপহার দিয়ে গেছে—যেখানে তিনি সৈন্য পরিদর্শন করছিলেন ঠিক সেখানেই উপর থেকে ফেলে দিয়ে গেছে। যাক্ হিটলারের দেশের লোকেরও তাহলে রসবোধ আছে। তোমাদের বোধ করি ধারণা তারা সবাই খুব কাটখোট্টা।

এতো গেল বিদেশের কথা। দেশের অবস্থা যেন দিনে দিনেই খারাপ হচ্ছে। কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে কোনও মিটমাট এখনও হয়নি। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর অনৈক্য যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। কত দিনে যে এ অবস্থা কাটবে সে শুধু ভগবানই জানেন। মন্ত্রী সভার সঙ্গে মতভেদ প্রবল হওয়ায় বাংলার অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন।

তোমাদের একটা তুঃসংবাদ দিচ্ছি। রামায়ণী কথা, বাংলা ভাষার ইতিহাস প্রভৃতির রচয়িতা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পরলোক গমন করেছেন। দীনেশচন্দ্রের নিকট বাংলা সাহিত্য অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনি খুব সামান্য অবস্থার থেকে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে জীবনে এতটা উন্নতি লাভ করেছিলেন। ভগবান তাঁর আত্মার সদ্গতি করুন।

আজ এখানেই শেষ করছি।

কৈফিয়ৎ

কাগজের নিদারুণ হাঙ্গামায় পৌষ সংখ্যা পূর্ব্বসংখ্যার মতই বিলম্বে বার হল। তোমরা যারা অসন্তুষ্ট হচ্ছ, তাদের আমরা কোনো দোষ দিই না। রংমশালের চলার পথে বাধার আর অন্ত নেই।

মাঘ সংখ্যায় সময়ের দিক থেকে আমরা কতটা গুছিয়ে নিতে পারবো বলতে পারিনা। তবে যাতে বিশেষ বিলম্ব না হয়, সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে।

সম্পাদকের কথা

গতবার আমরা বৈঠক বসাতে পারিনি। কাগজ নিয়ে যে হাঙ্গামা গেল তাতে কোনদিকে নজর দেবার ফুরসত আর ছিল না। এবার কোন প্রকারে বৈঠক বসানো গেল। আশা করি আগামী সংখ্যায় বৈঠক আবার জমে উঠবে।

কৈ, গ্রাহক-গ্রাহিকারা তো তেমন একটা লেখা পাঠাচ্ছো না। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই যেন একটা তন্দ্রার ভাব।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আলোচনা

জবাব

শ্রীসমর রায় (গ্রাঃ নং ১৫৫৫) শ্রীমতী প্রতিমা বসু কার্তিকের রংমশালে কলকাতায় বোমা পড়ার ভয় দেখিয়েছেন। জাপান তো চীন নিয়ে ব্যস্ত, রুষ দেশকেও তো তার আশেপাশের ছোট দেশগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, আর জার্ম্মানী তো ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের টাল সামাল দিতেই যাই যাই অবস্থা। ঝট করে' কে আর আমাদের দেশে উৎপাত করতে আসছে! বোমা পড়তে ঢের দেরী।

শ্রীমতী লতা বসু (গ্রাঃ নং ১৯০১) খবরের কাগজেও একটা সংবাদ উঠেছিল বটে যে তুটি এরোপ্লেন জার্ম্মানদের হলুদ রশ্মি গায়ে লেগে বিকল হয়ে পড়ে' যায়। তবে, আমি তো অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি, সাময়িকপত্রগুলিও তন্ন তন্ন করে' দেখেছি। এরকম একটা রশ্মি জার্ম্মানীর থাকলে সে কি এখন চুপ মেরে থাকত! না, মণ্টু সেন যে রশ্মির কথা বলেছেন তা সাংবাদিকদের কল্পনা মাত্র।

প্রশ্ন

শ্রীবাসুদেব ঘোষ (গ্রাঃ নং ২১০৩) পৃথিবীর কোন্ দেশের মেয়েরা সবচেয়ে সুন্দরী? কোন্ দেশের পুরুষরা সবচেয়ে অলস? কোন্ দেশের গরু সবচেয়ে বেশী তুধ দেয়? কোন্ দেশের সাপের বিষ সবচেয়ে মারাত্মক?

শ্রীমতী গীতা দে (গ্রাঃ নং ২০০০) এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে মেয়েরা যে কোন সময়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হতে পারে?

মুক্তির ডাক

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

বিশ্রী তেতো ওষুধগুলো লাগেনা আর ভাল,
হেথায় এসে বস মাগো নিভিয়ে দিয়ে আলো।
চাঁদের আলো জানলা দিয়ে পড়ছে লুটিয়ে,
স্নেহের পরশ দেহে আমার দিচ্ছে বুলিয়ে ;
তালগাছটার মাথার উপর চাঁদ উঠেছে অই,
এমন সময় কেমনে মাগো হেথায় শুয়ে রই !
জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখ আকাশ পানে চেয়ে,
আলো হয়ে আকাশ পরী আস্‌ছে যেন ধেয়ে।
তারাগুলি মিট্‌মিটিয়ে আমার পানে চায়,
হাতছানি দে ডাক্‌ছে যেন বলছে "খোকা আয় !"
আকাশ বাতাস আকুল হয়ে গাইছে ছুটীর গান,
হেথায় আমার ঘরের মাঝে আকুল করে প্রাণ,
বাঁধন হারা পাখীর মত মন যে আমার চায়,
ছুটে গিয়ে মিলিয়ে যেতে আকাশের ওই গায়।
আকাশ যেন বল্‌ছে ডেকে ছুটি—ছুটী, ছুটী,
আয়না তোরা সবাই ছুটে মায়ার বাঁধন টুটি।
দাও মা আমায় ছুটী, ওমা, তুটী পায়ে পড়ি
শূন্য পথে মিলিয়ে যাব ফুলের রথে চড়ি।
মেঘগুলো সব জম্‌বে যখন আকাশখানি ঘিরে,
বৃষ্টিধারা হয়ে আমি আস্‌ব আবার ফিরে ;
বিত্যুতেরই আলোর ঝলক্‌ বাদল ধারার সনে,
কথা কত শোনাব তোমায় মেঘের গরজনে।
দেরী মাগো আর কোরনা বুজ্‌ছে নয়ন ঘুমে,
বিদায় তবে দাওগো আমায়—আস্তে নয়ন চুমে।

সবই সত্যি

নমিতা গোস্বামী

কাল ছিল রবিবার—আমার প্রতি রবিবারেই কারুর না কারুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকে। কাল ছিল রায় বাবুদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রন।

একটা দিনের কথা, আজ মনে বড় ব্যথা জাগায়—রায় বাবুদের বাড়ীতেই এক বর্ষার দিনে কি আনন্দে আমার ছোট বোন আর আমি গিয়েছিলাম নিমন্ত্রন রক্ষা করতে, সে দিনও এসেছিলাম অনেক রাত্রে—মাঝ পথে গিয়েছিল মটর গাড়ীটা খারাপ হয়ে—ড্রাইভার গাড়ী ঠিক করতে সেই জলঝড়ের মধ্যে নেমেছিল—আর আমরা তু' বোনে মেতেছিলাম হাসিতে।

কাল সে বোন তো আমার সঙ্গে যায় নি। তাই বোধহয় আমাকে আনন্দ দিতে কেউ পারে নাই।

রায় বাবুদের বাড়ীতে একটী নূতন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো তারও চুলগুলো আমার ছোট বোনের মতই সুন্দর। তার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ীতে এসে পৌছালাম। রাত্রি তখন ১১টা।

খাওয়ার ইচ্ছা নাই জানালাম—শুয়ে পড়লাম। সেই যে শুয়েছি একেবারে উঠেছিলাম ভোরে।

* * * * *

আমি এখন পৃথিবীর বাহিরে। আমার ছোট বোন হাত ধরে একটী ছোট হ্রদের ধারে নিয়ে এলো—সে আমায় বল্লে—মা বাবাকে আমার জন্য তুঃখ করতে বারণ ক'রো—আমি এখানে বেশ সুখে, শান্তিতে আছি—মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য কষ্ট হয়, কিন্তু এখানের শান্তি তাদের সব ভুলিয়ে দেয়—আগে পৃথিবীতে কত সুখ পেয়েছি—ভাবতাম সেই সুখ বুঝি আর কোথাও পাওয়া যায় না—কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টো। পৃথিবীতে যে সুখই পেয়েছি—তা নয়—জীবনে কত তুঃখ পেয়েছি ! সে আরও বলে মরতে সকলে ভয় পায়, আমিও ভয় পেয়েছিলাম—কিন্তু যখন জানলাম ভয় পেলেও মরতে হবে—তখন ভয়ে, বিস্ময়ে, অজ্ঞান হয়ে গেলাম—তোমরা জানলে যে মরে গেলাম—কিন্তু তা নয়।

এই সব বলতে বলতে সে সেই ছোট হ্রদের ধারে এসে দাঁড়াল—আস্তে আস্তে নেমে গেল সেই হ্রদে। তারপর তার রূপ গেল বদলে—ভাষাও গেল অন্য হয়ে—সে চলে গেল।

মায়ের ডাকে উঠে দেখি—কোথায় সেই শান্তিপূর্ণ স্থান—কোথায় সেই হ্রদ ! আমি যে বিছানায়।

তবুও কিন্তু আমার মন সে দিন ভারি খুশী হয়ে উঠলো—যা'কে যা পেরেছি দান ক'রে ফেললাম। আকাশে সুখ তারাটাও বোধহয় আমার এই স্বপ্নের কথা ভেবে আমায় চোখ মিট্‌মিট্‌ করে বলছে—সবই সত্যি !

পৌষুলি

বাণী সেন
(১০।১২)

পৌষের পৌষুলি—মিঠে কড়া দিনগুলি
রৌদ্র মেঘ বৃষ্টি—সব অনাসৃষ্টি।
মধু মাস পোষ্ তুমি
ফুল বনে মরশুমি
বেল জুই—আকন্দ—
আনে কত সু-গন্ধ।

এতরূপ এতগুণ এত তোর ছন্দ
সব চেয়ে লাগে মনে ভোজের আনন্দ
পৌষের পৌষুলি—মিঠে কড়া দিনগুলি
চুপি চুপি শোন্ বলি, খেতে কেমন পিঠেপুলি ?

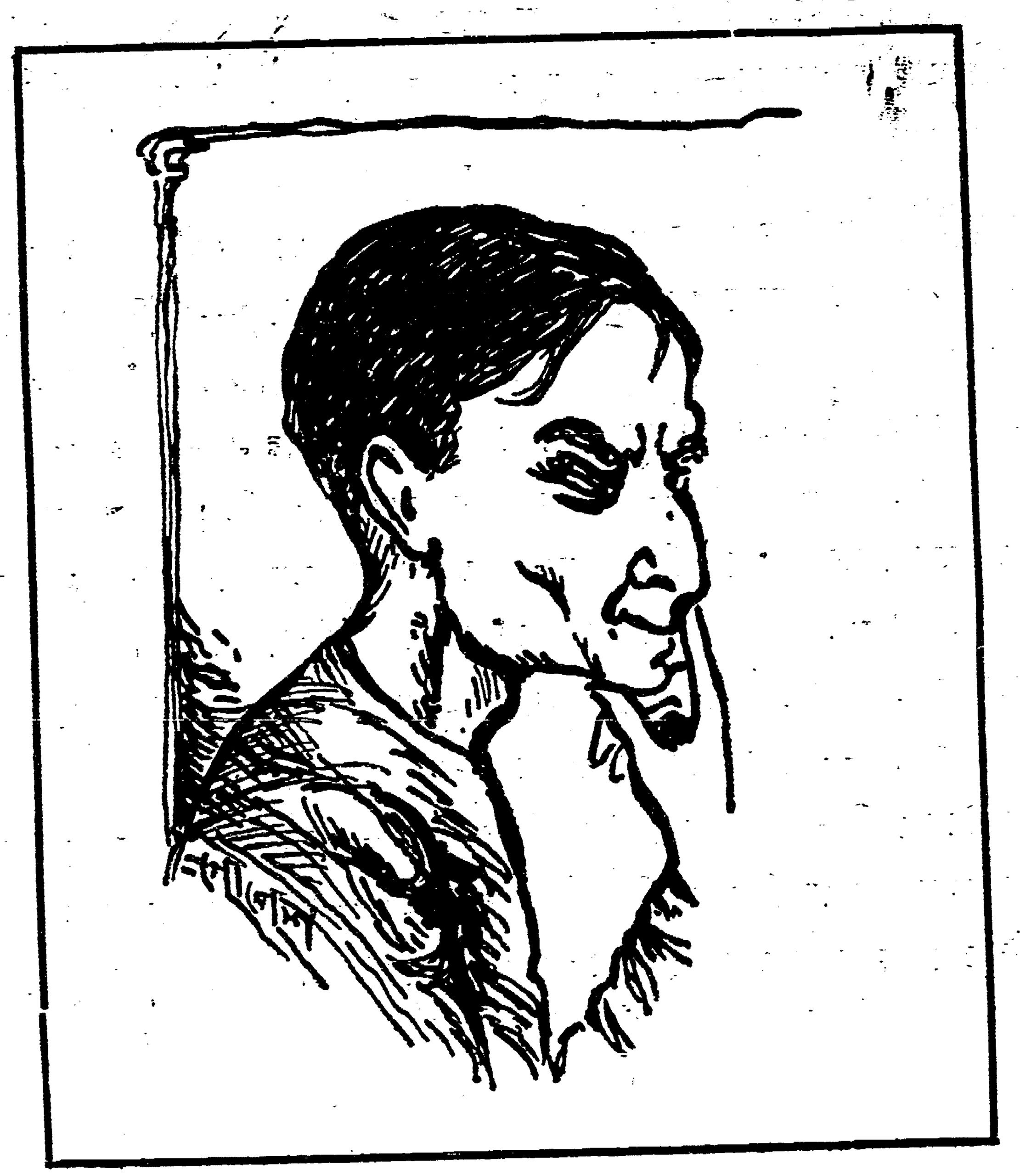

ঘুঘু

পদ্মহস্তে সরস্বতী

গঙ্গার অভিশাপে বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতী
ধরাতলে নদীরূপে পরিণতা হ'ল।

শ্রীভারতীর সৌজন্যে

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ | মাঘ ১৩৪৬ | চতুর্থ সংখ্যা

চট জলদী কবিতা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—দেখ্ ব্রাহ্মণকে কাহিল শরীরে বকাস্‌নে, বল্ কি বলবি !
—"ভল পঁওরটি !"
—"আরে, ভালো নয় তো কি মন্দ চাই বলবি ?
নাও, বলে যদি বরবটি দেয়, কিম্বা কলাই শুঁটি ?
—"কলইয় সুন্টি না লিব।"
—"আরে না লিব তো কি লিব তাই বল্‌না—গাধার চর্ব্বি ?"
—"গধাকা চরবি তো না ছুব !'
—"তবে কি ছুঁবি, বল্‌না মুখ ফুটি।
—"ভল পঁওরুটি !"
—"তোমার মুণ্ডুটি ! যদি দেয় শ'বাজারের পাঁউরুটি ?
—তখন কি করবি ?"
—"চারি পয়সা কাটি লিব !"
—"তারপর সেই পাঁউরুটি চিবাতে আমার দাঁতো কপাটি লাগিব,
তুমি বাকি পয়সা কটি গাঁটি করব,
তারপরে আমায় নিমতলায় নিয়ে দাহ করবি !

বলে ফেলনা চট্ জলদী কি বলবি ?"

—"তক্কলঙ্কার বড় ক্ষুধা লাগুচি,

ডগ্‌দার লুচি মনা করুচি,

একসের তুগ্ধ, একখনা পাঁওরুটি —"

—"আরে মূর্খ, রাখ এইখানে ত্বধের ঘটি,

তক্কলঙ্কার মর্লঙ্কারে তোর কাজ নেই

বল্‌বি, উইল্‌সন্ হোটেলের পাঁউরুটি ।"

—"উলিসান হোটলর পাঁওরটি

হোটলের পাঁওরটি !"

—"বাবুরা যা রোজ খায় বলবি !"

—"হো তো মুই জানি।"

—"তবে কেন বকালে এতখানি ?

বামুনের দোকানের না হয়—

খিদে লেগেছে, যা বাবা চট্‌জলদী !"

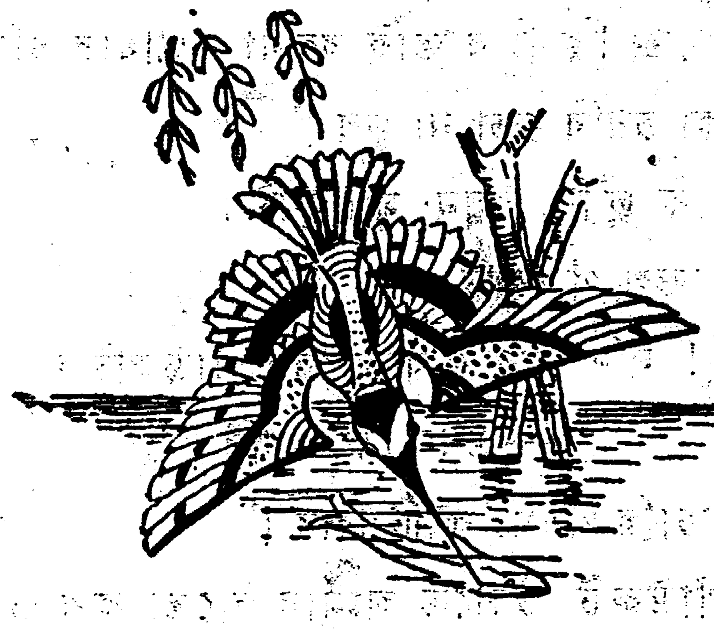

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর — ধারাবাহিক উপন্যাস

রজত সেন

রবিবার। স্কুল যাবার তাড়া নেই।

গনেশের মাটির ঘরটা কয়েক মিনিটের জন্যে স্তব্ধতায় গম্ গম্ করছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে। গনেশ একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে, নীল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। আড় চোখে সে লক্ষ্য করছে সুকুমার ছেলে তিনটির মুখে রেখার পর রেখা কেমন করে ঘটাচ্ছে ভাব-পরিবর্ত্তন !

'দেখ, শুভানুধ্যায়ী হয়ে আমি তোমাদের কোন বিপদে ফেলতে চাইনা,' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গণেশ বললে, 'আমি চাইনা তোমরা কোন হাঙ্গামায় পড় বা লোকে তোমাদের মন্দ বলুক ; বাড়ীতে যাঁরা তোমাদের পূজণীয় এবং যাঁদের সঙ্গে আজীবন তোমাদের থাকতে হবে তাঁদের সন্দেহভাজন হয়ে কোন লাভ নেই।'

'কিসের সন্দেহ ?' জহর জিজ্ঞাসা করলে।

'এই ধর---টাকা কড়ির ব্যাপার ত ? আর তোমরাও নেহাৎ বলতে গেলে ছেলেমানুষ, বুদ্ধি খাটিয়ে সব কাজ করতে না পারলে জানাজানির ভয়ও ত আছে।'

'না, কিছু জানাজানি হবে না, আমাদের কি একেবারে বোকা ভাবেন নাকি আপনি ?' জহরের কণ্ঠে প্রকাশ পেলো দৃঢ়তা।

'না, তা ভাববো কেন ?' গণেশ হো হো করে হেসে উঠলো, 'কিন্তু পারবে সব ঠিকঠাক করতে ? ভয় পেয়ে শেষকালে কাপুরুষের মত পেছিয়ে আসবে না ত ?'

কাপুরুষ কথাটা শিবু শুনেছিলো আগে অনেকবার—কিন্তু অর্থটা শিখেছে সম্প্রতি। 'আমাদের কাপুরুষ বলছেন ?' সে বললে।

তার অভিমান দেখে গণেশ আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু চেপে গেল, 'তোমাদের কাপুরুষ বলছি কোথায় ? কাজ করতে আরম্ভ করে ধর যদি না পেরে পালিয়ে আস—সেটা কি ভালো হবে ? তুমিই বল জহর ?'

'পেছিয়ে আসছি কোথায় ? বলুন না আপনি কি করতে হবে ?'

'যদি মোমের প্যাড তৈরি করে দিই—পারবে সিন্ধুকের চাবির ছাপ নিয়ে আসতে, কেউ দেখতে পেলে কিন্তু সর্ব্বনাশ, মনে থাকে যেন।'

'কেউ দেখতে পাবে না।'

কয়েকটা মিনিট।

'বঙ্কু, ঐ কাঠের সিন্ধুকটা একবার খোল ত! এই নাও চাবি।' গণেশ তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা পুরোণো, মরচে-ধরা চাবি বার করে দিলে।

বঙ্কু প্রকাণ্ড কাঠের সিন্ধুকের ডালাটা খুলে ফেললে, কট কট করে শব্দ হল। জহর আর শিবু সিন্ধুকটার দিকে তাকিয়ে রইলো, না জানি ওটার মধ্যে কত আশ্চর্য্য জিনিষ সঞ্চিত করেছেন গণেশবাবু।

'দেখ দিখি—এক কোনে একখানা মোম বাতি আছে নাকি, অনেকদিন আগে কিনে রেখেছিলাম কাজে লাগবে ভেবে।'

সিন্ধুকটার মধ্যে রাজ্যের জিনিষ ভর্ত্তি! বাজে কাগজের বাণ্ডিল, পুরোণো বই পত্র, পেরেক, দড়ি, একটা ছেঁড়া মসারী, এমন কি দোয়াত কলম পর্য্যন্ত!

জিনিষ পত্র ঘাঁটাঘাটি করে বঙ্কু শেষকালে একখানা আনকোরা নুতন মোম আবিস্কার করলে, দেখলে মনে হয় সম্প্রতি কেনা হয়েছে।

'পেয়েছি।' বঙ্কু নিয়ে এলো। জহরের বুকের মধ্যে লাগলো রক্তের একটা ধাক্কা কিন্তু মুখে প্রকাশ পেলোনা বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা।

ঘরের কোনায় আশ্চর্য্য ভাবে এক টুকরো মাপসই কাঠও মিলে গেল, আর যোগাড় হল একটা কেরোসিনের কুপি!

বাতির আগুনে মোম গলিয়ে গলিয়ে কাঠের ওপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু একটা প্যাঁড তৈরী হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

'চাবির ছাপ নেবার আগে কিন্তু একটু গরম করে নেবে, বুঝলে ? না হলে দাগ পড়বে না। গরম করতে গিয়ে আগুণে আবার নষ্ট করে ফেলো না যেন, এই নাও, সাবধানে রাখবে।'

জহর জিনিষটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

'আমি কিন্তু আবার বলছি,'—গণেশ বললে, 'এখনও ভেবে দেখবার সময় আছে। বিপজ্জনক কাজ।'

'কিচ্ছু বিপজ্জনক কাজ নয়,' জহর প্যাডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'আপনিই দেখছি শেষকালে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন।'

গনেশ উত্তর দিলে না, তার মুখে মৃদু হাসির আভাষ দেখা দিল।

'এই দেখ, আমার টাকার যোগাড় হয়ে গেছে;' পকেট থেকে গণেশ এক তাড়া নোট বার করে দেখালে; আরও কিছু সংগ্রহ হলে স্বচ্ছন্দে একটা ছোটখাটো দোকান আরম্ভ করে দেয়া যাবে।'

'মঙ্গল বুধবারে আমি আপনাকে টাকা দেবো;' জহর বললে।

'কিন্তু যতটা সহজ তুমি ভাবছো ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়।'

'পারবো ঠিক আপনি দেখবেন।'

'দেখা যাক;' হেসে গণেশ বললে, 'তোমার সাহস আছে, তুমি পারবে ঠিক। যদি ছাপটা কোন রকমে নিতে পারো আমি তোমায় নিখুঁত চাবি তৈরী করে দেবো। তুমি আবার কোথায় না কোথায় দেবে—শেষকালে সব জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ।'

'কেমন করে জানাজানি হবে ?' জহর ঈষৎ শঙ্কিত গলাতেই জিজ্ঞেস করলে!

'এই ধর—টাকা যদি তোমার বাবা সিন্দুক খুলে না পান—তিনি কি চুপ করে থাকবেন ভাবছো ? তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেবেন, পুলিশের লোক বেজায় ধূর্ত্ত। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত চাবিওয়ালাকে তারা খুঁজে বার করতে পারে, সে-জন্যেই বলছি—'

'বেশ, চাবির ছাপটা আপনাকেই এনে দেবো।'

কয়েক মিনিটের ছেদ।

বেলা বেড়ে চলেছে।

'কি—বঙ্কু আর শিবু তোমরা চুপ করে আছো যে ?'

বঙ্কিম কোন উত্তর দিলে না, উত্তেজনায় তারও বুকটা কাঁপছে; আর শিবুর মুখের কাছে যে-সব কথা ভীড় করছে তা গণেশ জানে।

শিবু ভাবছিলো—দেখাই যাক্‌না জহর কটা টাকা আনে! তার বাবার চারটে সিন্দুকে সোনারূপো আর টাকার থলি।

বঙ্কুর বাবার হাঁক শোনা গেল; বঙ্কু উঠে পড়লো।

খাবার সময় হয়ে গেছে; 'তোমরাও বাড়ী যাও জহর, আবার বিকেলের দিকে দেখা হবে। দুপুরে একটা বায়োস্কোপ দেখা যেতে পারে, কি বল ? একটা ভালো ফিল্‌ম্ দেখানো হচ্ছে। যাবে ?'

ওরা সানন্দে যাবার সম্মতি জানালে।

গণেশ উঠলো; 'সাবধান কিন্তু জহর, খুব হুঁসিয়ার।'

'বলতে হবে না কিচ্ছু।'

ম্যাটিনে শো-তে ওরা গণেশের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখলে। ফেরবার পথে ও তাদের নিয়ে গেল একটা ভালো রেস্তরাঁয়। খাবারের পর আরও খানিকটা এদিক-সেদিক করে তারা বাড়ী ফিরলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেল, জহর এখনও পড়তে বসেনি; রবিবারে তার মাষ্টারও আসে না। বাবা বাড়ী ফিরবেন সেই রাত দশটার পর।

BLEED THROUGH.

জহর এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো।

'কি রে! এখনও পড়তে বসিসনি?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'এই যাচ্ছি, বড্ড মাথা ধরেছে একটা ক্যাফিয়াস্‌পিরিন দিতে পারো?'

'ম্যাস্‌পিরিনের দরকার নেই', মা একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললে, 'এখন থেকে অভ্যেস করছো! যাও, ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে এসো।'

জহর মাথা ধুয়ে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লো বিছানায়। কাল' সুবিধে হবে না, স্কুল আছে! সে জানে মা পূজোর ঘরে আহ্নিক করতে যখন যান পরনের কাপড়টা বাইরে ছেড়ে রেখে যান, আর সেই শাড়ীর আঁচলে বাঁধা থাকে ট্রাঙ্কের চাবি।

চুপ করে শুয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

শাঁক বেজে উঠলো, মা ঢুকেছেন তা হলে পূজোর ঘরে।

পা টিপে টিপে সে এলো। কাপড়টা পড়ে আছে খাটের ওপর, ঘরে বাতি জ্বালা হয়নি, হাত দিয়ে সে অতি সন্তর্পণে গেঁট খুলে চাবিটা পকেটে পুরে রাখলে, তারপর সোজা চলে এলো বাথরুমে। পকেট থেকে মোমের প্যাডটা বার করলে; দেশলাই-এর বাক্স সঙ্গেই ছিলো। কাঠি জ্বেলে জ্বেলে সে মোম গরম করতে লাগলো; আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে বেশ নরম হয়েছে। তোড়া থেকে চাবিটা বেছে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে চেপে ধরলে নরম মোমের ওপর। বাথরুমের আলোয় সে দেখতে পেলে বেশ সুন্দর, স্পষ্ট একটী ছাপ।

[ক্রমশঃ

হট্টমালার দেশ, অমরলতা ও চিঠির বাক্স এ সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হল না। ফাল্গুনের রংমশাল শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ও সে সংখ্যায় এগুলি নিয়মিত থাকবে।

কবিতার অপমৃত্যু

শ্রীরমা নিয়োগী

শোন্ শোন্ গেন্টু মেন্টু ভোঁদা বিন্টু পান্না
কবিতা যে লিখবোই গোলমাল আর না।
এইখানে—ঠিক্ ঠিক—ছাদের এ কোণাটায়
বয় যেন অনেকটা কবি কবি মিঠা বায়।
ছুররে—বেড়ে ভাব—দূর ছাই! ওই য্-যাঃ!
প্রথমেই ভেঙে গেল বেরসিক পেন্‌টা!!
ওটা কি? পেন্‌সিল্? পেন্‌সিল্‌ই সই ত—
পেন্‌সিলে লিখে লিখে ছাপাবই বই ত।
এই বিন্টু,—চড় দেবো এলে পরে এই ধার;—
পালা তোরা; সব ঠিক—সুরু করি এইবার—
"চঞ্চল সমীরণে বই খাতা উড়ে যায়
ভাব-তেলে মন মোর লুচিসম ফুলে হায়।"
পটলা যে—হাতে কি? গজা দই দরবেশ?
পোয়াটাক্ চেখে দেখি—শোন্ তুই ছেলে বেশ।
কি বল্লি? দিবিনা ত? বয়ে গেল চাই না—
দরবেশ পচা আমি কক্ষনো খাই না।
যা-যা-ভাগ্—বাড়ী গিয়ে খাগে কসে টক দৈ,
বাসি গজা খাওয়া রেখে লেখা আমি ছাপাবই।
"কলমের খোঁচা লেগে সেই লুচি কেটে যায়
ভাব যত ভাগ্ হয়ে কাগজেতে জমে যায়।"
কে রে তুই? ভোঁদা নাকি? হতভাগা জ্বালালো,—
বাছা বাছা ভাব সব মন ছেড়ে পালালো।
কি বলিস্! জাল ছাড়ে বোসেদের পুকুরে?
সব রুই ধরবেই আজকের দুপুরে!!
ছরর্‌র্—খাতা যায়—এই ছোটে পেনসিল,—
আমি ছুটী বোস্‌পাড়া কেয়া মজা খোস্ দিল্।

মিকি ও এক-কো

শ্রীধর

যে গল্পটা আমি আজ তোমাদের বলছি আমার বিশ্বাস নিজের অস্বস্তিকর হলেও এটা সত্যি, অথচ সত্যি বলে বিশ্বাস করতেও আমার ভাল লাগে না। গল্পটা আমাকে বলেছিল এক-কো। এক-কো একজন ভেনট্রিলোকুইষ্ট।* আমরা একটা ভাড়াটে বোর্ডিং বাড়ীতে একসঙ্গে থাকতাম, আমার ঘরে পাশেই তার ঘর। মাঝে মাঝে মনে হয় সে মিথ্যে গল্প বলেছে বা হয়ত সে পাগল। সত্যি পৃথিবীতে মিথ্যেবাদী আর পাগল তো বড় কম নেই এবং কেউ দিব্যি করে বলতে পারে না যে হয় ওটা মিথ্যে কি ওটা সত্যি!

যাহোক; যদি কোন মানুষের মুখে দানয় পাওয়া ছাপ থাকে, তো সে মানুষ এই এক-কো। লোকটা ছোট খর্বাকৃতি ও চটপটে আর দুদণ্ড তার সঙ্গে বসেছ তো তোমার অবস্থা কাহিল। যেমন ধর, কথার মধ্যিখানে হঠাৎ এমনি চুপ করে যাবে আর ফিসফিস করে বলে উঠবে—'স্-স্-স্-স-স্'—ভয়ে ভয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কি যেন দেখবে ও নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন শুনবে! একটু কিছু শব্দতেই সে লাফিয়ে ওঠে।

অথচ আমি তার মত এত বড় ভেনট্রিলোকুইষ্ট আর দেখিনি। আশ্চর্য্য তার প্রতিভা! অনেকে দিব্যি গেলে বলত ওর যে ডামিক ওটা সত্যি ডামি নয়—ওটা নিশ্চয় একটা বেঁটে বামন বা ছেলে, মুখটা কেবল পেন্ট করা আর ঐটেই পেছন থেকে কথা বলে—এক-কো বলে না। কিন্তু এটা সত্যি নয় আমি দেখেছি ওর ডামির ভেতরটা বেশ ভাল রকম খড়ে ভরা আর ওটা পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। এক-কো তাকে মিকি বলে ডাকে—এবং মিকিকে নিয়ে তার যে খেলা দর্শকদের দেখায় সে খেলার নাম—মিকি ও এক-কো।

সব ভেনট্রিলোকুইষ্টদের ডামি দেখতে অতি কুৎসিৎ হয় কিন্তু মিকির মত অত কুৎসিৎ মুখ পৃথিবীতে কারুর দেখিনি। তার নীল চোখ দুটো যেন গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে আসছে আর কি বিশ্রী বিদ্‌ঘুটে যে সে চাউনি তা বলবার নয়। আর তার কাঠের লাল ঠোঁট যখন সেটা খুলতো ও বুজতো—সে এক অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য। সাক্ষাৎ সয়তানের মত তাকে দেখাত।

এক-কো যেখানেই যেতো মিকিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো—এমন কি তার সঙ্গে এক বিছানায় শুতো। মিকিকে ধরে এক-কো যখন সিঁড়ির ওপর উঠত—সে দৃশ্য দেখে ভয়ে আমার গাটা কেমন করে উঠত। ডামি মিকি মোটা সোটা ও প্রকাণ্ড—আর এক-কো ছোট খর্ব্বাকৃতি। অল্প আলোতে মনে হবে: ডামিটাই মানুষটাকে যেন ধরে নিয়ে চলেছে।

বলেছি আমার ঘরের পাসের ঘরে সে থাকতো। কিন্তু বড় সহরে তুমি ঘরে বেঁচে থাক কি মরে থাক তোমার পাশের ঘরে লোক তার কোন খবর রাখে না। এক-কোর সঙ্গে হয়ত আমার পরিচয় হোত না।

---

* গরুড়বাদী; যে ব্যক্তি মুখবন্ধ রাখিয়া উদরাভ্যন্তর থেকে কথা বলিতে পারে—মনে হয় যে অন্যে কেউ দূর থেকে বা অন্যত্রে কথা বলিতেছে।

† কৃত্তিম-মুক; সাক্ষী গোপাল।

কিন্তু রাত্রেও অনবরত গলার আওয়াজে আমি বিরক্ত হতাম। এক একদিন অবস্থা সত্যি অসহ হয়ে উঠত। মনে হোত বাড়ীটা ছেড়ে চলে যাই। বাস্তবিক রাত্রিগুলো ভয়ানক হয়ে উঠতো। তোমরা ভেনট্রিলোকুইষ্টের ডামির তীক্ষ্ণ কর্কশ মিথ্যে গলার আওয়াজ চেনো। কিন্তু মিকির আওয়াজ সে রকম ছিল না,—তীক্ষ্ণ কর্কশ ছিল বটে—কিন্তু গলাটা যেন সত্যি ও মানুষের স্বাভাবিক গলা মনে হোত। এক-কোর বিকৃত গলা নয়—গলাটা একেবারে আলাদা রকম। শুনলে তুমি শপথ করে বলতে যে ঘরে দুটো লোক—তারা ঝগড়া করছে। আমি ভাবতাম: লোকটা তো ভালই মনে হয় আর লোকটা পাকা ভেনট্রিলোকুইষ্টও বটে। কিন্তু একদিন আমার মনে একটা অস্বস্তিকর ধারণা জন্মালো: এর মধ্যে একটা নয়—দুটো লোকই আছে।

রাতদুপুরে গলার আওয়াজ আসত:

"এস, আবার চেষ্টা কর"

"পারব না"

......"নিশ্চয় পারবে"

"আমার ঘুম পেয়েছে"

"এখন নয়, চেষ্টা কর আবার"

"তোমাকে বলছি, আমি ভয়ানক ক্লান্ত; আমি পারব না"

"আমি বলছি, আবার চেষ্টা কর"

তারপর অদ্ভুত গোলমেলে গানের সুর ভেসে আসত এবং শেষে এক-কোর চীৎকার শোনা যেতো: সয়তান! সয়তান! ভগবানের নাম নিয়ে বলছি আমাকে একলা থাকতে দাও!

একরাতে এই রকম ব্যাপার ঘণ্টাতিনেক চলবার পর আমি এক-কোর ঘরের দিকে গিয়ে তার দরজায় শব্দ করলাম। কোন উত্তর নেই তখন আমি দরজা খুলে ফেল্লাম। দেখি—পাংশু মুখে এক-কো বসে আছে আর তার হাঁটুর ওপরে রয়েছে মিকি!

"কি হে"—এক-কো আমার দিকে না চেয়েই বলে, কিন্তু মিকির রংকরা প্রকাণ্ড চোখদুটো সোজা আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চাইতে লাগল।

বললাম: দেখ আমি অন্যায় কিছু বলতে চাইনা—কিন্তু এই গোলমাল—

ডামির দিকে চেয়ে এক-কো বললে: এই ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছেন। আমরা এবার শেষ করব?

মিকির প্রাণহীন রক্তবর্ণ ঠোঁট শব্দকরে উঠলো—"হাঁ আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো।"

এক-কো তাকে তুলে নিয়ে গেল—তার খড়-পোরা পাদু'টো এপাশ ওপাশ নড়তে লাগল। তারপর তাকে শুইয়ে এক-কো তার গায়ে চাদর দিয়ে স্প্রিং টিপে দেবা মাত্র—স্ন্যাপ! আর তার চক্ষু বুজে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে এক-কো তার কপালের ঘাম মুছে ফেললে।

'অদ্ভুত তোমার সঙ্গী'—আমি বললাম।

'হাঁ। কিন্তু.........দয়া করে... .....' এই বলে এক-কো মিকির দিকে তাকাল ও তার ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললে—স্-স্-স্-স্!

'চল না একটু কফি পান করা যাক'—আমি বললাম।

'চল, আমার গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে'—এক-কো বললে।

কফি পান করতে করতে একটু যেন সুস্থ হয়ে সে বললে, 'তুমি ভাবছ আমি পাগল, না?'

আমি বললাম, 'না, একেবারেই না। কেবল তুমি অদ্ভুতভাবে তোমার ঐ ডামিটার অনুগত।'

'ওটাকে আমি ঘৃণা করি'—বলে এক-কো কি যেন শুনলে!'

'তাহলে তুমি ওটাকে পুড়িয়ে ফেল না কেন?'

'ভগবানের দোহাই'—এক-কো চেঁচিয়ে বলে আমার মুখটা হাত দিয়ে চাপা দেয়। তার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমার কেমন অস্বস্তি লাগল।

'তুমি কিন্তু একটি অসাধারণ ভেনট্রিলোকুইষ্ট!'—আমি বললাম।

'আমি? না তেমন নয়—তবে হাঁ, আমার বাবা। তিনি এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রফেসর ভক্সএর নাম শুনেছ? হাঁ তিনি আমার বাবা। যা আমি জানি সব তিনিই শিখিয়েছেন। এখনও ত শেখান.......... তিনি না থাকলে, বুঝেছ আমি কিছুই নয়! তাঁর আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। আমি কিছুতেই ওসব করতে পারতাম না। বুঝেছ তিনি নিরাশ হতেন.........জান তিনি কি করতেন? তিনি বসে বসে মাংস চিবোতেন আর মিকি তাঁর কোলে বসে গান করত.........অদ্ভুত নয়?.........রাতদিন ঠোঁট বন্ধ করে আমাকে বলতে অভ্যাস করতে হত—'বি,এফ,এম,এন্, পি, ভি, ডবলু,'—ঠোঁট একটুও নাড়াতে পাব না।... কিন্তু আমি পারতাম না।.........আমাকে শাসন করতেন—এমন কি মারতেন.........সকলে তাঁকে ভয় করত। তিনি দেখতে ছিলেন.........দেখবে কিরকম......?

এক-কো একটা ব্যাগ থেকে এক ফটো বার করলে। ফটোটা ময়লা ও পুরোনো বটে কিন্তু মুখের বিশেষত্ব নষ্ট হয়নি। ভক্সএর মুখ দেখতে কুৎসিৎ, প্রকাণ্ড, দাড়ীওয়ালা—দেখলেই ভয় করে। চোখ দুটো গোলগোল ও যেন জলছে।

এক-কো বললে—'এ থেকে ঠিক বুঝতে পারবে না। কিন্তু যখন কাল কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে তার ওপর লাল সিল্ক পরে ষ্টেজে নাবতেন—তখন তাঁকে সাক্ষাৎ সয়তানের মত দেখাত। তিনি যেখানেই যেতেন মিকি সঙ্গে থাকত। আর অদ্ভুত গলার স্বর তিনি পরিবর্ত্তন করতে পারতেন— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভেনট্রিলোকুইষ্ট ছিলেন তিনি।......আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে হত—আর যেখানেই থাকি না কেন—প্রতি রাত্রে আমাকে অভ্যাস করতে হত......'বি, এফ, এম, এন, পি, ভি, ডবলু'......বারবার, বারবার, যতক্ষণ না কালরাত্রি শেষ হত!...ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়েছে—না?"

"না, না, কেন তা আমি ভাবব?"—আমি বললাম।

"তারপর—এ রকম রোজ চলতে লাগল—শেষে...স্-স্-স্-স্-স্!...কিছু শুনতে পেলে তুমি?"

"না, কিছুই না, তুমি বলে যাও!"—আমি বললাম।

"এক রাতে আমি...মানে একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটল। আমি...তিনি এক দেশের রাজধানীতে এক বড় হোটেলে...লিফটের মধ্যে পড়ে গেলেন। লিফটের গেটটা কেউ খুলে রেখেছিল। তিনি মারা গেলেন।"

এক-কো কপালের ঘাম মুছে ফেলে আবার বলতে লাগল—"সে রাতে আমি ভাল করে ঘুমুতে পেরেছিলাম। তারপর এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম তিনি ফিরে এসেছেন! বুঝতে পেরেছ—কিন্তু স্বশরীরে তিনি নয়—কেবল তাঁর গলার স্বর! সেই স্বর বলতে লাগল—'ওঠ, ওঠ, ওঠ, চেষ্টা কর আবার—পাজী, ওঠ! আমি তোকে ভেনট্রিলোকুইষ্ট করে ছাড়বোই। উঠে পড়!—"

"আমি জেগে পড়লাম! তুমি ভাবছ আমি সত্যি পাগল। কিন্তু দিব্যি গেলে বলছি—আমি সে স্বর শুনেছি ও সে স্বর আসছে......"

এক-কো থেমে গিয়ে হাঁপাতে লাগল।

আমি বললাম, 'মিকি?'

মাথা নেড়ে সে সায় দিলে।

'তারপর?'

'তারপর আর কি! সে গলার স্বর মিকির কাছ থেকে আসছিল। তারপর থেকে বরাবর আজও তাই আসছে! দিন নেই রাত নেই! সে আমাকে কখনো একলা থাকতে দেবে না। মিকিকে 'আমি' কথা কওয়াই না। ঐ মিকিই আমাকে কথা বলায়। রোজ আমাকে সে অভ্যাস করায়—রাত দিন...উঃ সে যদি আমাকে ছেড়ে দেয়...ওঃ ভগবান...আমি তাকে ছাড়তে পারি না।"

আমি মনে মনে ভাবলাম: এই হতভাগ্য লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। আপন মনে নিজের সঙ্গে বকবক করা বোধ হয় এর অভ্যাস। আর সে মনে করে..."

—হঠাৎ, একটা গলার আওয়াজ আমার কানে এলো! স্বরটা খুব পাতলা কিন্তু বিদ্রূপব্যঞ্জক; স্বরটা যেন এলো এক-কোর ঘর থেকে—যেন ডাকলে—"এক-কো!!"

এক-কো লাফিয়ে উঠল। ভয়ে সে কাঁপতে লাগল।

"—ঐ শুনেছ? শুনেছ? ঐ এসেছে আবার! আমি এক্ষুণি যাই, এক্ষুণি যাই! মাপ কর! পাগল নই আমি—সত্যি পাগল নই। আমি এক্ষুণি..."

দৌড়ে সে চলে গেল। তার ঘরের দরজা খুলে গেল, বন্ধ হল, শুনতে পেলাম। তারপর আবার কথাবার্ত্তার আওয়াজ এলো—এবং একবার আমার মনে হল—এক-কো যেন কাঁদছে আর বলছে:—"বি, এফ, এম, এন, পি, ভি, ডবলু..."

ভাবলাম: না সন্দেহ নেই, লোকটা পাগল, নিশ্চয়ই পাগল।...এবং আগে সে নিশ্চয় নিজেই তার গলার স্বর দূরে নিয়ে গিয়ে নিজেকেই ডাকছিল......

কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তে আসতে আমার অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল এবং সমস্ত রাত আমার ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। সত্যি বলছি, তারপর ভোর হতে দেখে আমার যেমন আনন্দ হয়েছিল, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তেমন হয়নি।

জেরাল্ড কার্স এর গল্প।

BLEED THROUGH.

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

ধারাবাহিক উপন্যাস

সুকুমার দে সরকার

মামা একটু থেমেছিলেন গড়গড়ায় টান দিতে। একটু পরেই সুরু করলেন তিনি।

"ভীতু আমরা কেউই ছিলাম না শুধু সেই অজানা মানচিত্রহীন দেশে মানুষের গলার গোঙানিতে শিউরে উঠেছিলাম আমরা। আচমকা নেশাটা কাটলে উপেন আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল—মানুষ?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

আবার সেই অস্ফুট গোঙানি কাণে এল। আর কাউকে কিছু বলতে হোল না। শব্দটা লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে চললাম। কাহিনী বেশী বাড়াব না। খানিকটা গিয়েই নজরে পড়ল একটা প্রকাণ্ড পাথরের নীচে একটা লোক। নিম্নাঙ্গ তার থেঁতলে গেছে—প্রাণ বের হতে আর দেরী নেই। সেই বীভৎস দৃশ্যে আমরা শিউরে উঠলাম। লোকটার দেহে গৈরিক বাস।

মরবার আগে কোন কোন লোকের জ্ঞান হয়। পাথরটাকে প্রাণপণে আমরা সরিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের ফ্লাস্কে গরম চা ছিল, তার মুখে ঢেলে দিলাম। মরবার আগে সে আমার হাতে একটা পুঁথির পাতা দিয়ে বলেছিল শুধু—স্বর্ণপুরী—আশ্চর্য্য! চক্ররেখা গমনাধিকারী! হাতটা বাড়িয়ে আমাদের

চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল। সে হাতে অদ্ভুত আশ্চর্য্য চক্রাকারে পথরেখা। তারপরে সে বলেছিল—পদমপৎ থেকে সাবধান! লোকটা চোখ বুজল।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে উপেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর এক গোঙানির সঙ্গে সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সন্ন্যাসী বলে উঠল অবিশ্বাসী! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? নাগ পর্ব্বতের উপত্যকায় আশ্চর্য্য স্বর্ণ নগরী আছে। পুঁথির পাতায় তার ঠিকানা।" লোকটা হাঁফাতে লাগল "পদমপৎ পাতাটা কেড়ে নিতে চায়।"

'পদমপৎ কে?' উপেন জিগেস করল।

"আমার সময় নেই। সে দেশের কথা পৃথিবী জানে না। পুরোন সভ্যতা। চক্ররেখাধিকারী সেখানে যেতে পারবে। শান্তি শান্তি!"

সন্ন্যাসী সজোরে হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ বুজল। তার গলায় একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠল। আর সে চোখ মেলে নি।

মামা থামলেন।

"তারপর মামা?" রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম।

এবার উপেনবাবু জবাব দিলেন "আমরা মোটের ওপর বুঝতেই পারি নি যে লোকটা মরবার আগে প্রলাপ বকেছিল কিনা! জয়দ্রথ জিগেস করল—ব্যাপার কি উপেন?

বললাম—এখানে ত আগুন নেই তবু লোকটার একটা সদ্গতি করা দরকার। উপায়াভাবে তাকে আমরা সেই তুষারের মধ্যে সমাধি দিয়েছিলাম। তাকে নাড়বার সময় দেখা গেল তার উত্তরীয়তে ভারী কি যেন বাঁধা রয়েছে। উত্তরীয় খুলে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কয়েকটা সোনার চাঁই—আর সে রকম গুরুত্বের সোনা আমরা জীবনে দেখিনি। আমি জয়দ্রথের মুখের দিকে তাকালাম, জয়দ্রথ তাকাল আমার মুখে। লোকটা তাহলে প্রলাপ বকেনি।

সেই রাতে কবর দেওয়া শেষ করে আমরা একটা গুহায় আশ্রয় নিলাম। তখন আর লোকালয়ের খোঁজ করার চেষ্টা বৃথা। টর্চ্চের আলোয় পুঁথির পাতাটা খুললাম। পাতাটা কোন একটা গাছের পাতা, কাগজ নয় এবং তাতে একটা ম্যাপ এবং কয়েকটা লেখা সব সংস্কৃতয়।"

উপেনবাবু থেমে মামাকে বললেন "পাতাটা আছে জয়দ্রথ?"

মামা নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে একটা পোকায় খাওয়া প্রায় মিলিয়ে আসা কালীর দাগ সমেত পাতা বার করে দিলেন।

"পড়তে পারবি?"

আমি সবিস্ময়ে দেখলাম:

অস্তি নাগ পর্ব্বতাধিত্যকায়াম······স্বর্ণনগরী ·····অত্র মানবাঃ······পঞ্চশতবর্ষপরমায়ূস······

লেখাটা পাতার একেবারে তলা থেকে আরম্ভ। মাঝে মাঝে পোকায় কেটে অপঠিতব্য করে তুলেছে। যেটুকু উদ্ধার করা যায় ওপরে দিয়েছি। তার ওপরে মানচিত্র। তারও একটা প্রতিকৃতি

দেবার চেষ্টা করলাম। সবই সংস্কৃত অক্ষর কিন্তু সুবিধার জন্য আমি এখানে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করলাম—

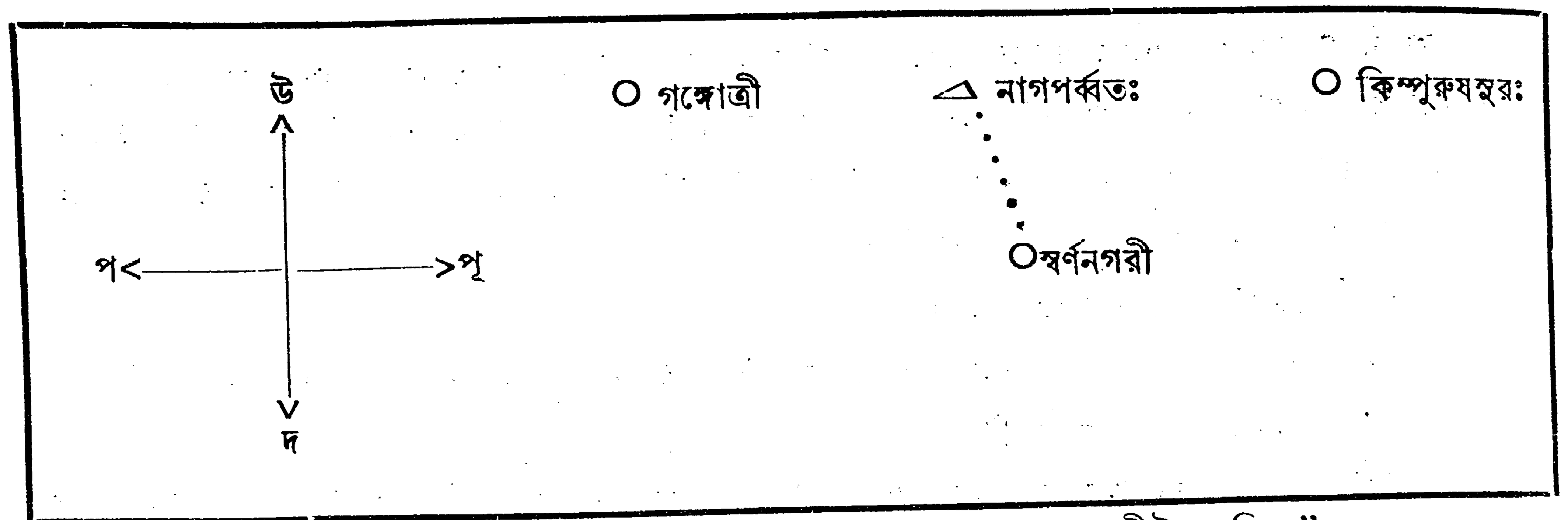

"এর মানে কি ?" আমি জিগেস করলাম "কিম্পুরুষপুর কি ? গঙ্গোত্রীই বা কি ?"

উপেনবাবু হাসলেন "কিম্পুরুষপুর তিব্বতের পুরোণ নাম। আর গঙ্গোত্রী গঙ্গার উৎপত্তি স্থল।"

"তা'হলে", আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "তাহলে তিব্বত আর গঙ্গোত্রীর মাঝে সেই অদ্ভুত নগর —যার খবর পৃথিবীর ইতিহাস জানে না ?"

উপেনবাবু একটু হেসে আবার বলতে লাগলেন "সেই রাতে, সেই হিমালয়ের পার্ব্বত্য স্তব্ধতায় বসে আমরাও তোমার মত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম সুব্রত! স্বর্ণ নগরী! পৃথিবীর ইতিহাস যার অদ্ভুত কথা জানে না! তা ছাড়া আর একটা জিনিষ পুঁথিতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেখ এক জায়গায় আছে—অত্র মানবাঃ পঞ্চশতবর্ষ পরমায়ু ··! ওটা আমাকে বিস্মিত করেছিল। ওর মানে কি ? মানুষের পাঁচশো বছর পরমায়ু না আর কিছু ? আমরা ঠিক করে ফেললাম পরদিন ভোরেই আমরা নাগপর্ব্বতের খোঁজে বের হব। সেই রাতে পাহাড়ের গুহায় আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে যাত্রার আলোচনা করছিলাম। মনের মধ্যে খানিকটা বিশ্বাস খানিকটা অবিশ্বাস। প্রথমতঃ একজন মানুষের মৃত্যুকালীন উক্তি দ্বিতীয়তঃ পুঁথির প্রমাণ এবং সেই অদ্ভুত সোনার চাঁইগুলো। মনের মধ্যে লোভও জেগেছিল। গুহার মুখে একটুখানি কালো আকাশ ইস্পাতের মত ঝকঝক করছিল। তাতে সীমাহীন অসংখ্য জ্যোতিস্ক। বাতাসে রুক্ষ তীক্ষ্ণতা। চারিদিক সাদা, দূরে বরফান মুলুক মড়ার মত শ্বেত। পশ্চিমে হলদে একফালি চাঁদ দেখা দিল আর পাহাড়ে রাতের থেকে থেকে অদ্ভুত রহস্যময় শব্দ ভেসে আসছিল। হঠাৎ গুহার মুখে যেন একটা কালো ছায়ামূর্ত্তি নড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে জয়দ্রথ লাফিয়ে উঠল—কে ? কে ওখানে ?

টর্চ্চের আলোর তীরটা অন্ধকারের বুক চিরে গুহার মুখে গিয়ে পড়ল আর দেখা গেল গুহার মুখে কালো টুপি মাথায় একটা ভুটিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট চোখ দুটো যেন তার জ্বলছে।

"ওং মণিপদ্মে হুং"! ভুটিয়াটা আমাদের দিকে চেয়ে বলল। ওটা ওদেশীয় সম্ভাষণ।

আমাদের কাছে কোন জবাব না পেয়ে তখন পরিস্কার হিন্দীতে লোকটা বলল "সেলাম বাবুজী!" চোখে তার কুটিল হাসি।

"এদিকে বেড়াতে আসা হয়েছে ?"

জয়দ্রথের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "পদমপৎ ?"

ভুটিয়াটা এবার তো হো হো করে হেসে উঠল "নামটাও জেনে গেছেন দেখছি!"

ততক্ষণে জয়দ্রথ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সন্ন্যাসীর কথার আর একটা প্রমাণ পেয়ে সে আর বিস্ময় চাপতে পারে নি।

এবার আমি জবাব দিলাম "তুমি কে ? কি চাই তোমার ?"

পদমপৎ এগিয়ে আসছিল কিন্তু আমার হাতটা রাইফেলের ওপর পড়ায় সে থমকে দাঁড়াল "ঠাট্টা করছেন বাবুজী ? কি চাই ভাল করে জানেন! লাশটা সরালেন কোথায় ?"

"জানি না।" জবাব দিলাম।

"দেখুন বাবুজী" পদমপৎ হেসে বলল "আমি আপনাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলব। বিশ্বেশ্বর সন্ন্যাসী এই তির্থতে যে সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে তার ম্যাপটা দিয়ে যেতে হবে। তিব্বতে আপনাদের অধিকার থাকতে পারে না।"

"কিসের সোনার খনি ? জয়দ্রথ এইবারে বলে উঠল।

"চালাকী করবেন না বাবুজী। সন্ন্যাসী আমার ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল। পালিয়ে আসে। কিন্তু পদমপতের হাত থেকে পালান সোজা নয়। পাহাড়ে পাথর আছে।"

অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর মৃত্যুর কারণ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। ঝড়ে পাথর চাপা সে পড়েনি।

জয়দ্রথ গর্জ্জে উঠল "যাও বেরিয়ে যাও!" পদমপাতের চোখ দুটো উঠল জ্বলে—"ম্যাপটা দেবেন না ?

"যাও বেরোও!" জয়দ্রথ বন্দুকে হাত দিল আর হঠাৎ পদমপৎ হাসল, "বাবুজী, চক্ররেখা আপনাদের হাতেও নেই!"

এইবার পদমপতের মত আমিও ধাপ্পা দিলাম "তোমারও হাত নেই পদমপৎ!"

চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হোল "পদচক্র তিব্বতের জিনিষ বাবুজী!"

জয়দ্রথ আবার গর্জ্জে উঠল "যাও!"

"দেবেন না তাহলে ?"

জয়দ্রথ বন্দুক ওঠাল আর নিঃশব্দে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল পদমপৎ।

সেই থেকে সেই স্বর্ণ নগরীর স্বর্ণ মরিচীকার পেছনে আমাদের ছোটা সুরু হোল। বছরের পর বছর হিমালয় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি আমরা কিন্তু কোথায় বা সে দেশ আর কোথায় বা কি! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা তবু আশা ছাড়তে পারিনি আমরা। মনের মধ্যে থেকে থেকে কে যেন বলে যায়—আছে আছে আছে। আর অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চে গা শিউরে ওঠে। আরও আশ্চর্য্য যে তীব্বতী বুড়োদের কাছে হিমালয়ের কোন অঞ্চলে এক অদ্ভুত বর্ফান তুফান মুলুকের কথা শোনা যায়। সে নাকি এক মায়াপুরী। তিব্বতী বুড়োরাই পিতামহ প্রপিতামহ ক্রমে ওই প্রবাদ শুনে এসেছে, সে মুলুকের পাত্তা তারা জানে না।

আর আরও আশ্চর্য্য হোল পদমপতের ধৈর্য্য। ওর জন্যে কতবার প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে গেছি আমরা। যতবারই আমরা হিমালয়ে গেছি কোন না কোন উপায়ে সে আমাদের সব খবর রেখে অনুসরণ

BLEED THROUGH.

করেছে। একবার, সে কুলী হয়ে আমাদের দলেই ছিল। অবশ্য পুঁথির পাতাটা আমাদের সঙ্গে থাকত না, ওটা মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল।

শেষবার আমরা তিব্বতে ঢুকে কুলীদের বিদায় করে দিই। নিজেরাই গঙ্গোত্রী আর তিব্বতের মধ্য অঞ্চলে বহু উঁচুতে ঘুরে মরছি। আকাশ সেদিন নির্মেঘ। জয়দ্রথ সে অঞ্চলের ম্যাপ তৈরী করছিল, আমি বসেছি জিরোতে। হঠাৎ কি যেন একটা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনুভূতি আমাদের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ওপর পানে চেয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়ছে। নীচেই জয়দ্রথ। আমি সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—জয়দ্রথ শিগ্‌গির সরে যাও। কিন্তু এক মুহূর্ত দেরী হয়ে গেল জয়দ্রথের। ঈশ্বরের দয়া, পাথরটা জয়দ্রথের কব্জিটা মাত্র গুড়িয়ে দিয়ে গেল। জয়দ্রথ অজ্ঞান হয়ে গেল আর আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। আমি ছিলাম একটা পাথরের আড়ালে। কি যে করব ভেবে পাইনি কিন্তু একটু পরেই ওপরের পাহাড়ে পদমপতের মূর্ত্তি উঁকি দিল কুটিল। মাথায় তখন আগুন জ্বলছে ভবিষ্যতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। রাইফেলটা তুলে ঘোড়া টিপে দিলাম। কাণে ভেসে এল একটা চীৎকার! ব্যস, আমি তখন জয়দ্রথকে নিয়ে ব্যস্ত।"

একটু থেমে উপেনবাবু আবার বলে চললেন "সেবার কি কষ্টে যে আমরা আলমোড়ায় ফিরে আসি আমরাই জানি। জয়দ্রথের হাতটায় তখন পচ্ ধরেছে। আলমোড়ায় জয়দ্রথের হাতটায় অ্যাম্পুটেট করাতে হোল। আর পদমপতও একেবারে অক্ষত যায় নি। তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। আমার গুলিতে তার একটা পা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল।"

উপেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

"তবুও পদমপত আশা ছাড়েনি। এখন মনে হয় ছাড়লেই যেন আশ্চর্য্য হতাম। শত্রুতার মধ্যে দিয়েই ওর সঙ্গে কোথায় যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে উঠেছে আমাদের সঙ্গে। তারপরে এই ভারতবর্ষে এই প্রথম আমাদের এখানেই ওর আক্রমণ সুরু। দেখা যাক এর শেষ কোথায়!" [ক্রমশঃ

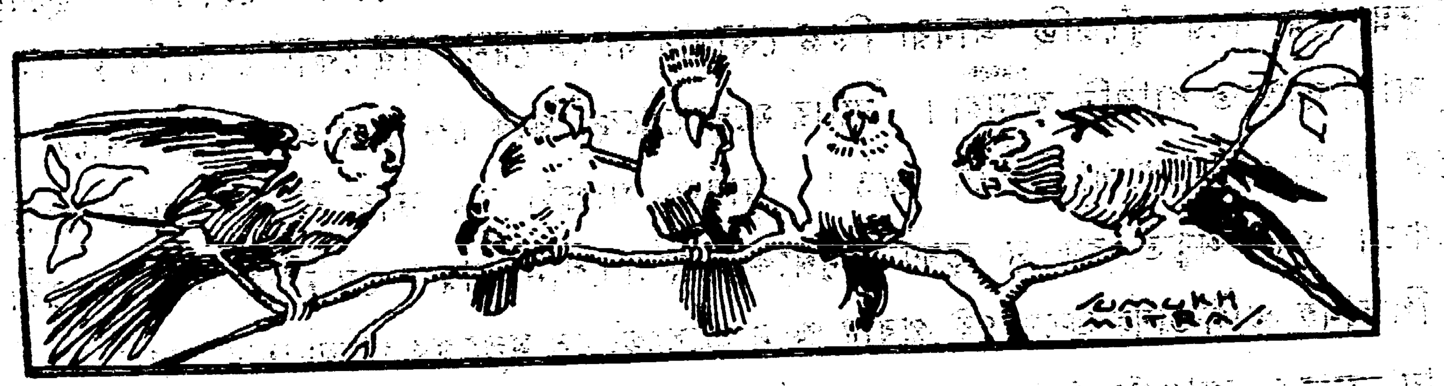

রিক্‌শওয়ালা

পূর্ণেন্দু সেন

রাত বারোটা ঃ
নিঝুম সহর,
সবার চোখে ঘুমের বহর।
টুনটুনঝুন বাজনা বাজে
রিক্‌সাওয়ালা ফিরছ বুঝি,
আদুল গায়ে ক্লান্ত পায়ে
একটি ছুটি
—এবার ছুটি,
যাচ্ছ ডেরায় সোজাসুজি
—রিক্‌সাওয়ালা?
সেই সকালে
যখন আলোয়
রাতের কালোয়
ঝগড়া বাধে
তখন তুমি বেরিয়েছিলে
গামছা কাঁধে
রিক্‌সাওয়ালা।
তারপরেতে সারাটি দিন
পায়ের তলায় হোল বিলীন
—নয়কো ফাঁকি;
সকাল
বিকাল
দুপুর
রাত
—সময়ের এই চারটে ধাপে

ঘাড় ফিরিয়ে
না জিরিয়ে
দম খাটিয়ে
—সহজ বাত
গুড়িয়ে দিলে পায়ের চাপে
সত্যি নাকি,
—রিক্‌সাওয়ালা ?

এখন তোমার লম্বা ছুটি
রিক্‌সাওয়ালা
অড়রডাল ও আটার রুটি
থাবার পালা
হন্‌হনিয়ে
ডেরায় গিয়ে
সর্ব্বসহা রিক্‌সাওয়ালা।

সটান ঘুমে তারপরেতে
শীতের রাতে
ঢোলের সাথে
কাট-প্যাকাটির জ্বলছে আগুন
আগুন ধারে
যুক্তগলায় গানটা হলেও
হতেই পারে,
রামসীতা কি কবির ভাইর,
মীরা বাঈর,
গান গাবে কি রিক্‌সাওয়ালা ?
তাইতো চলো জোরে জোরে—
রিক্‌সাওয়ালা ,
আমি জানি আবার ভোরে
উঠবে তুমি রিক্‌সাওয়ালা,
—রিক্‌সাওয়ালা।

দূরের আলো

সম্রাট মেইজী

শ্রীসুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী

নব্য জাপানের স্থষ্টিকর্ত্তা সম্রাট মেইজী। কলকাতার দোকানে, বাজারে, অলিতে গলিতে মেইজী কোম্পানীর তৈরী চকোলেট, বিস্কুট, ক্যারামেল ইত্যাদি তোমরা এন্তার দেখতে পাও আর খেয়েছ নিশ্চয়। তার ওপর ১৯৪০ সালের এই কোম্পানীর দেওয়া ক্যালেণ্ডার আর ডায়রী প্রত্যেকের বাড়ীতে এতদিনে পৌছে গেছে হয়ত। কোম্পানীর নাম শুনে বলেছ ঃ বা—চমৎকার নাম ত। শুধু এই বিস্কুট কোম্পানীর নাম মেইজী তা' নয়। এ ছাড়াও আরো প্রতিষ্ঠান বা আরাধনা করবার জায়গা আছে এই সম্রাটের নামানুসারে যেমন ঃ মেইজী স্রাইন বা মন্দির, মেইজী ব্যাঙ্ক, মেইজী প্লে গ্রাউণ্ড ইত্যাদি।

এখন সম্রাট মেইজী কে ছিলেন এবং কি জন্যে তাঁর নাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে ?

সম্রাট মেইজী ১৮৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় সারা দেশময় বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি পূর্ণ ছিল। রাজার প্রজার সদ্ভাব ছিল না। কারণ তোকুগাওয়া সোগুন সম্প্রদায় ৩০০ বছর ধরে এবং তখন পর্য্যন্ত দেশ শাসন করে আসছিল। তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালনাই তখন প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সেই সনাতন শাসননীতিতে জনসাধারণ ক্ষুন্ন হয়ে পড়ছিল। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তার গুণাবলীও তারা শুনতে পেয়েছে। তার ওপর আছে আবার সামুরাই সম্প্রদায়ের আভিজাত্য। যখন এরকম অবস্থা তখন আশার আলোক তারা দেখতে পেল। উপস্থিত হ'ল তাদের এত আকাঙ্ক্ষিত দিন। হঠাৎ একদিন ১৮৫৩ সালে অতর্কিত ভাবে উরাগা নামক জায়গায় আবির্ভূত হল মার্কিন সেনাপতি কমোডোর পেরীর

(Commodore Mathew Calbraith Perry) পরিচালনায় একটা নৌ-বহর এবং তিনি অস্ত্র তুলে জানিয়ে দিলেন যে এখন থেকে বিদেশের সাথে সহযোগিতা না করলে ফল ভীষণ দাঁড়াবে। জাপান আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল নিত্য নতুন রূপে। সেই সময় সোগুন গবর্ণমেণ্টও শক্তি-হীন হয়ে পড়েছিল। তার সুনাম ও আধিপত্য কমে গিয়েছিল অনেকখানি। ইয়োসিনোবু তোকুগাওয়া যিনি ১৮৬৬ সালে পঞ্চদশ সোগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, ১৮৬৭ সালে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেই সময় হতে রাজকীয় ক্ষমতা সম্রাটের অধীনে এসে পড়ল। সে এক ভীষণ পরীক্ষার দিন গেছে জাপানের। যদি সে সময় এরকম ব্যবস্থা না হত তা' হলে আজ হয়ত জাপানের ইতিহাস অন্যরূপে দেখতে পেতুম। সেই সঙ্কটময় কালে ১৮৬৬ সালে সম্রাট মেইজী তাঁর পিতা সম্রাট কোমেঈ এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। কিওতো হতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে ভূতপূর্ব্ব সোগুন গবর্ণমেণ্টের রাজধানী তোকিও তে আনা হয়।

কমোডোর পেরীর আক্রমণ হতে সম্রাট মেইজী বুঝতে পারলেন যে পশ্চিম-শক্তির কাছে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা তাঁদের নেই। সেজন্য চাই অস্ত্র শস্ত্র, চাই আধুনিক উন্নত রণতরী, আধুনিক শিক্ষা এবং সেই রকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষা। পেরী শত্রুরূপে এসে জাপানকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, তাঁকে ভগবানের আশীষ মনে করে জাপানীরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রয়ে গেল।

কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, কি রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে জাপানকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিয়েছেন সম্রাট মেইজী। তিনি দেশবিদেশে তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের পাঠিয়ে দিলেন নব নব জ্ঞান শেখবার জন্যে যাতে করে দেশের উন্নতি হয়।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সামুরাই সম্প্রদায়ের ন্যায় তলোয়ার-ধারণ প্রথা তুলে দিলেন। সৈন্য ও নৌ বিভাগ ইউরোপীয় প্রথায় এবং শাসন কার্য্যে আমূল পরিবর্ত্তন করে নতুন করে গড়ে তুললেন। বড় হলে তোমরা জানতে পারবে তাঁর শাসন নীতি। তবে জেনে রেখে দাও যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জাপানীরা সব কিছু কাজ করে। জাপানী পার্লামেণ্টের নাম 'দায়েত্' এবং এখানেই বিশ্বের সাথে প্রীতি ভালবাসা রাগ বিদ্বেষের খসড়া তাঁর সময়ে রচিত হয়। ১৯০৪ সালে রুষ-জাপ যুদ্ধ বেধেছিল আর পোর্ট আর্থার বিজয়ী বীর জাপান সভ্য জগৎকে বজ্র-নির্ঘোষে জানিয়ে দিল: প্রাচ্য ভূখণ্ডে নতুন যুগের আবির্ভাব হয়েছে। অন্য শক্তিবর্গের আধিপত্য সে ক্রমে ম্লান করে দেবে। চীনের সাথেও তার যুদ্ধ হয়েছিল সেই সময়ে। পোর্ট-আর্থার বিজয়ী বিখ্যাত বীর জেনারেল মারে সুকেনোগি ছিলেন সম্রাট

মেইজীর দক্ষিণ হস্ত, সম্রাটের মৃত্যুর পর নিজের জীবন অনাবশ্যক মনে করে তিনি ও তাঁর স্ত্রী একসাথে হারাকিরি* করে আত্মহত্যা করেন।

সম্রাট মেইজী রাজকার্য্য ছাড়াও অনেক কবিতা লিখে রেখে গেছেন। তিনি জন্ম কবি ছিলেন জাপানী কবিতা বা ছবি খুব অল্প কথায় বা ভাবে প্রকাশ করা হয়। তাঁর একটি কবিতা এখানে তুলে দিলুম:

"কুনি নো তামে
আদা নাস্থ আদা ওয়া
কুদাকু তোমা
ঈচুকুসিমু বেকি
কোতো না ওয়াস্থরেসো।"

এর মানে: তোমার দেশে আগত শত্রুকে (যদিও তাকে পরাজিত করতে পারে) বধ না করে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় স্বরূপ তার প্রতি সৌজন্য দেখাবে।

* * * *

তারপর—যে আগুন একদিন দপ্ করে জ্বলে উঠে সারা দেশকে উদ্ভাসিত করে আলোকের পথ দেখিয়েছিল সেই মহাগ্নি আস্তে আস্তে নিভে গেল। নিভে যায় যাক্— এমন তো রোজ যাচ্ছে—কত যাচ্ছে—এ স্বাভাবিক। কিন্তু এ আগুন আর জাপানে জ্বলবে না। এত বড় জাতের নিয়ন্ত্রাতা আর হবে না। ১৯২২ সালের ৩০শে জুলাই জাপানীরা কোনোদিন ভুলতে পারলে না। হাজারে হাজারে লোক ভিড় করে রাজপ্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নির্ব্বাক নিস্পন্দ, সকলেই উদগ্রীব, সম্রাটের খবর জানবার জন্য। তিনি অসুস্থ। ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে ৮টার সময় শবযাত্রা তোকিও ত্যাগ করে এবং কিয়োতোয় 'মোমাইয়ামা' পাহাড়ে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে আছেন। তাঁর সমাধিস্থল আজ তীর্থস্থান হয়েছে।

---

* তলপেটে ছুরী একপাশ থেকে আর এক পাশে চালিয়ে দেওয়া।

একটী ছোট চারকোণা বাক্সের কাহিনী

শ্রীসুবল চন্দ্র ভড় বি, এস, সি

"সব যাত্রী উঠেছে ?" ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন।

"হঁা সকলেই উঠেছে।" মেট জবাব দিলে।

"তাহলে জাহাজ ছাড়বার ব্যবস্থা কর।"

বুধবার সকাল ৯টা, যাত্রার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে "স্পার্টান" জাহাজ বোষ্টন বন্দরে নঙ্গরে করে আছে, জাহাজের শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, বাষ্প ও এঞ্জিনের শব্দে বোঝা যাচ্ছে যে তিন হাজার মাইল যাত্রার জন্য জাহাজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত, জাহাজের মুখ ইংলণ্ডের দিকে ফেরান।

আমার দুর্ভাগ্য—আমি অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির, আমার সাহিত্যিক জীবন আমাকে নির্জ্জনতা প্রিয় করে তুলেছে, নাবিকদের চীৎকারে ও যাত্রীদের গোলমালে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এমন কি মনের ভিতর আমি যেন এক অজানা বিপদের আভাষ পাচ্ছিলাম। আমি বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি যে এরকম বিপদের পূর্ব্বাভাষ—আমরা অনেক সময়েই পাই এবং কখনও কখনও তা সত্য হতেও দেখা যায়। এসম্বন্ধে মনোবিদদের মতবাদ এই, যে এটা একরকম অন্তর্দৃষ্টি—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আমাদের সচেতন করে তোলে। নিম্নশ্রেণীর জীবেরা আসন্ন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বহু পূর্ব্বেই জানতে পারে—এ সর্ব্বজনবিদিত। মনে আমার চাঞ্চল্য এসেছিল সত্য কিন্তু ১২ ঘণ্টার মধ্যেই আমার যে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ ঘটবে, তখনো ঘুণাক্ষরেও জান্‌লে আমি সেই শেষ মুহূর্ত্তেই তীরে লাফিয়ে পড়ে ঐ অভিশপ্ত জাহাজটী ত্যাগ করতাম।

"সময় হয়ে গেছে"—ক্রণোমিটারের ডালাটী বন্ধ করে সেটা পকেটে পুরে ক্যাপ্টেন বললেন।

"হঁা—সময় হয়েছে"—মেট জবাব দিলে।

বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনরা তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। জাহাজের নোঙ্গর তোলা হল, এমন সময় দূরে দুটি মূর্ত্তিকে চীৎকার করতে করতে দৌড়ে আস্‌তে দেখা গেল। জাহাজ থামাবার জন্য তারা ব্যাকুলভাবে হাত নাড়ছিল। ক্যাপ্টেনের আদেশে জাহাজ থামান হল। লোক দুটী লাফিয়ে উঠলো এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জাহাজ তীরভূমি হতে দূরে সরে গেল। ডেকের উপর উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। তীরে অসংখ্য রুমাল উড়তে লাগল।

আমাদের ১৫ দিনব্যাপী যাত্রা এইখানেই সুরু। বার্থ ও লাগেজ সন্ধানের জন্য যাত্রীদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। সেলুনগুলোয় ছিপি খোলার শব্দে বোঝা গেল—তারা বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করছে। ডেকের একপাশে একরাশ লাগেজ ছিল। স্থানটা নির্জ্জন দেখে

আমি সেইখানে আশ্রয় নিলুম আর উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপক যেরকম সমালোচনার দৃষ্টিতে ফুল পর্য্যবেক্ষণ করেন ঠিক সেভাবে সহযাত্রীদের দেখতে লাগলুম। হঠাৎ পেছনে কার চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল—

"এই জায়গাটা বেশ নির্জ্জন। আমরা এখানে নিরাপদে কথা বলতে পারি"।

দুটো প্রকাণ্ড লাগেজের ফাঁকে চোখ রেখে উঁকি মারলুম, শেষ মুহূর্ত্তে যে দুটো লোক জাহাজে উঠেছিল তাদের দেখতে পেলাম। যে কথা বললে, সে লম্বা ও ক্ষীণকায়—প্রকাণ্ড চাপ দাড়ি ও নীল চোখ। তাকে যথেষ্ট উত্তেজিত বলে মনে হল। অপর লোকটী স্থূল ও অপেক্ষাকৃত বেঁটে, তার মুখ কঠোর ও প্রভুত্বব্যঞ্জক। লাগেজের আড়ালে থাকতে লোকগুলি আমাকে দেখতে পায় নি। বেঁটে লোকটী একটী সিগার ধরিয়ে নিল তারপর চারিদিকে চেয়ে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বল্‌লে "হঁা, এই উপযুক্ত স্থান।" লগেজে ঠেস দিয়ে তারা বসে পড়ল।

পরের গুপ্ত পরামর্শ শুন্‌তে বাধ্য হওয়ায় আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"ভাগ্য ভাল যে জাহাজটা ধরতে পেরেছি—কি বল মূলার", লম্বা লোকটী বললে।

"হঁা—তা না হলে আমাদের সব মতলব ফেঁসে যেত", বেঁটে উত্তর দিলে।

"সেটা ঠিক আছে ?"

"হঁা ফ্লানিগান।" মূলার বললে "কিন্তু কেউ দেখছে না ত ?"

"না না, সকলেই নীচে" ফ্লানিগান জবাব দিলে।

মূলার তার আলষ্টারের পকেট থেকে একটা কৃষ্ণবর্ণ ছোট পদার্থ বার করে ডেকের উপর রাখলে। জিনিষটা একবারমাত্র দেখেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু নিজেকে সামলে নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে, নিজেদের ব্যাপারেই তারা এত নিবিষ্ট ছিল যে আমার উপস্থিতি মোটেই জান্‌তে পারলে না। গোড়া থেকেই ওদের ওপর আমার দারুণ সন্দেহ হয়েছিল। কালো জিনিষটা দেখে সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। জিনিষটা একটা কাঠের বাক্স মাত্র। কালো পালিশ করা আর পাশে পিতলের বনাত দেওয়া, মাপ এক বর্গ ফুট বলেই আমার ধারণা হল। ওটা দেখলেই প্রথমে পিস্তল কেশ বা ক্যামেরার কথা মনে পড়ে। বাক্সের ওপরে বন্দুকের ঘোড়ার মত একটা অংশ ছিল—সেটার সঙ্গে ছোট্ট একটা স্প্রিং আঁটা। টিগার ছাড়াও বাক্সের উপর আর একটী ছোট চারকোণ গর্ত্ত ছিল। ফ্লানিগান গর্ত্তটায় চোখ রেখে কয়েকমিনিট কি দেখলে, যখন মুখ তুললে তখন তার মুখে ব্যাকুলতার চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"সব ঠিক আছে ত ?" সে মূলারকে প্রশ্ন করলে।

"মনে ত হয়"—মূলার পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করলে ও সেটা থেকে একমুঠো সাদা গুঁড়ো তুলো নিয়ে গর্ত্তে ছুড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রটীর মধ্য হতে অদ্ভুত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা গেল।

"হঁা তাহলে ঠিকই আছে" দুজনের মুখই প্রফুল্ল হল।

"কে যেন আসছে" মূলার ফ্লানিগনকে সম্বোধন করে বল্‌লে। "বাক্সটা সাবধানে কেবিনে নিয়ে যাও। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ না করে।"

বাক্সটা ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফ্লানিগান উঠে দাঁড়াল। "রাত্রের পূর্ব্বে আর এটার কোন দরকার হবে না।" সে বললে।

ঐ রহস্যপূর্ণ বাক্সটি নিয়ে মূলার ও ফ্লানিগান ডেক অতিক্রম করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ওদের কথাবার্ত্তার মধ্যে রহস্য ও চক্রান্তের আভাষ পেয়ে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়লুম। পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা আমার মনে এল। তারা কিরূপ শেষ মুহূর্ত্তে জাহাজে উঠেছিল এবং সেজন্য শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারীরা তাদের জিনিষপত্র পরীক্ষা করবারও সময় পায় নি। ওরা ফেনিয়ান বলেই আমার ধারণা হল। কোন রাজনৈতিক কারণে যাত্রীসমেত জাহাজটীকে বিনাশ করতে চায়। সাদা গুঁড়োটা বিস্ফোরণে সাহায্য করবে। ওদের কথায় বুঝলাম আজ রাত্রেই ওরা ভীষণ একটা কিছু করবে—। আমার মনে হল আজ রাত্রেই ঐ ভীষণ বোমাটা ফাটবে। আমি রহস্যভেদে কৃতসংকল্প হলুম এবং চক্রীদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলুম।

"কে—হ্যামণ্ড নাকি ?" হঠাৎ পিছনে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম।

"এ্যাঁ তুমি—ডিক মার্টিন", এরকম বিপদের বিপদের মাঝে একজন বন্ধু পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলুম।

"তোমাকে যথেষ্ট বিচলিত বলে মনে হচ্ছে, কি ব্যাপার বলত ?" হ্যামণ্ড বল্‌লে।

ডিককে বলতে বাধা ছিল না, তাকে কেবিনের মধ্যে টেনে এনে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম। কিন্তু তাকে হাসতে দেখে বিস্মিত হলাম।

"তুমি ছাড়া অন্য কেউ একথা বললে যথেষ্ট ভীত হতাম" ডিক বললে, "মনে আছে—স্কুলের হলঘরে তুমি একবার দিনদুপুরে ভূত দেখেছিলে। পরে দেখা গেল ওটা একটা আয়নায় তোমারই ছায়া।"

"তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ না—আশা করি আজ রাত্রেই তোমার ভুল ভাঙ্গবে।"

সারাদিনের উত্তেজনায় আমার যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক করেছিল। ফার্ষ্টক্লাস খাবার ঘরে ইতি পূর্ব্বেই শ' খানেক যাত্রী জড়ো হয়েছে। আমি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পাশে বসে পড়লুম। খেতে খেতে নানা আলোচনা সুরু হল। রাজনীতি, খেলাধূলা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার প্রবল স্রোত বইল। হঠাৎ আলোচনার স্রোতে একটু ভাটা পড়ল। মনে হল আলোচনার সাধারণ বিষয়গুলি যেন ফুরিয়ে গেছে। উপযুক্ত অবসর বুঝে আমি কথা পাড়লুম।

"ফেনিয়ান আন্দোলন * সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা", ক্যাপটেনকে আমি প্রশ্ন করলাম--

ক্যাপ্টেন ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করলেন—"যত সব ভীরু বদমাসের কাণ্ড", তিনি বললেন। আমার পার্শ্বোপবিষ্টা বৃদ্ধাটী জান্‌তে চাইলেন তারা বোমা ফেলে কোনও জাহাজ উড়িয়ে দিতে পারে কি না।

"নিশ্চয়ই পারে" ক্যাপ্টেন বললেন "কিন্তু আমার জাহাজ নয়।"

এদের সম্বন্ধে কি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় আর একজন যাত্রী জান্‌তে চাইলেন।

* ফেনিয়ান আন্দোলন—ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান করিয়া আয়র্লাণ্ডে স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এই আন্দোলন সুরু করেন জন ও'ম্যহনি নামক একজন আইরিশম্যান। আমেরিকায় উৎপত্তি হইলেও এই আন্দোলন ক্রমে সমগ্র পৃথিবীর আইরিসদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইহারই ফলে ইংলণ্ডে ফিনিক্স ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হয়। এখন ইহা প্রশমিত হইলেও ইহাকে আয়ারের বর্ত্তমান সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।

"জাহাজে প্রত্যেক জিনিষ খুব ভাল করে পরীক্ষা করে তোলা হয়"—ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন।

"কিন্তু যদি কোন যাত্রী কোন বিস্ফোরণ দ্রব্য সঙ্গে করেই ওঠে" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ওভাবে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেবার সাহস ওদের নেই" ডিক আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে।

আমাদের এই আলোচনায় ফ্লানিগান ও মুলার সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিল। তাদের এই অবিচলিত ভাব আমার প্রশংসার উদ্রেক করলে। ডিকের কথায় ফ্লানিগান মুখ তুললে :

"আপনি তাদের সম্বন্ধে খুব নীচু ধারণা পোষণ করেন দেখছি" সে ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললে। "প্রত্যেক গুপ্ত সমিতির মধ্যেই দু' একজন বেপরোয়া লোক দেখা যায়—এক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?"

তার এই আত্মসমর্থনের ধৃষ্টতায় আমি বিস্মিত হলুম। খাওয়া শেষ হলে ডেকে পায়চারী করতে লাগলুম।

সেদিনের সন্ধ্যাটী চমৎকার। পশ্চিমাকাশে অস্তগমোনোম্মুখ সূর্য্যের রক্তিম ছটার মধ্যে দিগন্তের কোলে একটা জাহাজ ছোট একটী কাল বিন্দুর মতই দেখাচ্ছিল। আকাশে মাত্র একটী তারা মিটমিট করছিল কিন্তু প্রপেলারের প্রতিটি বিক্ষেপে আকাশের ঐ একটী তারায় সহস্র প্রতিচ্ছায়া জলে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সহসা কিছুদূরে দুটী ছায়াময় মূর্ত্তি দেখলাম। ডেকের অস্পষ্ট আলোতেও চিন্‌তে কষ্ট হল না। ওরা মূলার ও ফ্লানিগান। হঠাৎ কাঁধে কার স্পর্শ অনুভব করলাম—ফিরে দেখি ডিক। "কই হে এখনও ত জাহাজ উড়লো না" সে বললে।

"না এখনও ওড়েনি—কিন্তু আজ যে উড়বে না তার কোন প্রমাণ আছে ?" আমি বললাম।

"আচ্ছা বোকা ত। তোমার মাথায় যে কি করে এসব ঢুকলো তা আমি বুঝতে পারছি না। তোমার যদি এতই সন্দেহ ত ক্যাপ্টেনকে গিয়ে সব বল্লেই পার—কিন্তু এই হাস্যকর ব্যাপারে আমার নাম জড়িও না যেন"—ডিক উপদেশ দিয়ে চলে গেল।

আমি সকালের সেই নির্জ্জন স্থানটী বেছে নিয়ে বসে পড়লুম। অদূরে ক্যাপ্টেন আর একজন যাত্রী (পূর্ব্বে ইনিও একটী জাহাজের অফিসার ছিলেন) গল্প করছিলেন। তাদের সিগারেটের আগুন অন্ধকারের মধ্যে দুটী অগ্নিবিন্দুর মত দেখছিল। ক্যাপটেনকে একা পেলেই সমস্ত বলব বলে স্থির করলুম।

ক্রমে এক ঘণ্টা কেটে গেল। ক্যাপ্টেন তখনও গল্পে ব্যস্ত, ডেক নির্জ্জন হয়ে গেছে। এমন সময় মূলার ও ফ্লানিগানকে আসতে দেখে আমি একটা পোষ্টের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম। অন্ধকারেই দেখতে পেলুম মূলারের গায়ে সেই আলষ্টার। ওটার পকেটে কি আছে তা আমি ভালরকমই জানি, হতাশ হয়ে আমি বসে পড়লুম। হঠাৎ আমার মনে হল আমিই দুইশত লোকের ধ্বংসের কারণ।

লোকদুটী কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে--

"হ্যাঁ এই ঠিক জায়গা" মূলার বললে।

ট্রিগার ঠিক কাজ করবে ত ?" ফ্লানিগান জিগেস করলে !

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবে"।

"ট্রিগার টানার শব্দ নিশ্চয়ই ওরা শুনতে পাবে।"

"তাতে কিছু আসে যায় না। ওরা কোন বাধা দিতে পারবে না"।

"আমাদের আমেরিকার বন্ধুদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হবে কি বল?"

"হাঁ তা হবে বৈকি, কিন্তু কখন তারা খবর পাবে বল ত?"

"বোধ হয় আজ মাঝ রাতেই—ক' মিনিট সময় আছে?"

"পাঁচ মিনিট—ঠিক দশটায় আমরা ট্রিগার টানব"—মূলারের হাতের তালুর উপর একটা পকেট ঘড়ি রয়েছে।

আমার হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে চলতে লাগল। মূলার পকেট থেকে সেই কাল বাক্সটা বার করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ডেকের উপর রাখলে।

"আর মাত্র তিন মিনিট" মূলার ঘড়ি দেখে বললে।

ফ্লানিগান খানিকটা সাদা গুঁড়ো গর্ত্তে ঢেলে দিলে। সকালে যেরকম শব্দ শুনেছিলাম যন্ত্রটার ভেতর থেকে ঠিক সেইরকম শব্দ উঠল।

"মাত্র দেড়মিনিট—কে টান্‌বে আমি না তুমি?" ফ্লানিগান বললে।

"আমি টানব" মূলার জবাব দিলে।

আমি আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলাম না।

"থাম্—নরাধম, দুর্ব্বৃত্তের দল"—আমি চীৎকার করে উঠলাম "দুশ জন লোক হত্যা করবার তোমাদের কোন অধিকার নেই।"

ওরা চমকে উঠলো। "পাগল" ফ্লানিগান বললে। "যাক্ সময় হয়েছে—মূলার ট্রিগার টান।"

"খবর্দ্দার"—আমি চীৎকার করে উঠলুম।

"কোন্ অধিকারে তুমি আমাদের বাধা দিচ্ছ?" মূলার প্রশ্ন করলে।

"সবরকম অধিকারে।"

"এ ব্যাপারে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই—চলে যাও তুমি এখান থেকে"—মূলার আদেশ দিলে।

"কখনই না" আমি বল্‌লাম।

"আচ্ছা বিপদ যা হক—আমি ওকে ধরে রাখছি, তুমি ট্রিগার টান" ফ্লানিগান মূলারকে বললে।

"ফ্লানিগান আমাকে জাপ্টে ধরলে, বলিষ্ঠ আইরিশটার বাহুর মধ্যে আমি শিশুর মতই অসহায় বোধ করলাম। মূলার বাক্সের উপর ঝুঁকে পড়লো। আমার মনে হল মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছি। আমি ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা জানালাম।

টিক্ করে শব্দ হল। ট্রিগার পড়ে গেল আর বাক্সের একদিক উন্মুক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে এক জোড়া ধূসর রঙের পায়রা বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত আকাশে উড়ে গেল।

পাঠকদের আর বেশী কিছু বলবার দরকার নেই। তারা নিজেরাই একদিন পরের "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড" থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটা পড়ে নিন—

অদ্ভুত পায়রা দৌড় প্রতিযোগীতা :

"বিখ্যাত পায়রাবিৎ জন, এইচ, ফ্লানিগান ও জেরেমিয়া মূলারের দুইটী শিক্ষিত পায়রার মধ্যে এক

অভূতপূর্ব্ব দৌড় প্রতিযোগীতা হইয়া গিয়াছে। স্পার্টান নামক জাহাজ হইতে পরশু রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ষ্টার্ট দেওয়া হয়। জাহাজটী তখন ডাঙ্গা হইতে ৬০ মাইল দূরে ছিল। এই দৌড় প্রতিযোগীতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল কারণ জাহাজের ক্যাপটেনদের একটা কুসংস্কার আছে যে তাদের জাহাজে কোন পক্ষীক্রীড়া হইলে, জাহাজের অমঙ্গল ঘটিবে। সেইজন্য মূলারের স্বকল্পিত একটী বাক্সে পায়রা দুইটী জাহাজে তোলা হইয়াছিল। উপরের একটী ছোট গর্ত্ত দ্বারা তাহাদের খাওয়ান হইত। শেষ মুহূর্ত্তে সামান্য বিঘ্ন ঘটিলেও তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নেই ষ্টার্ট দিয়াছিলেন। মূলারের পায়রা পরদিন সকালে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় 'লাওয়েল'-এ উপস্থিত হইয়াছে। ফ্লানিগানের পায়রার এপর্য্যন্ত কোন সন্ধান মিলে নাই। এই প্রতিযোগীতা লইয়া জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে।"

সংকল্প

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ

আসুক সন্ধ্যা আসুক রাত
শক্তি দেহের হোক নিপাত
দৈন্য আসুক আসুক ভয়
মৃত্যু করুক শরীর ক্ষয়
বক্ষে তিলেক থাকিতে প্রাণ
চাহিনা তোমায় হে ভগবান।

উঠুক ঝঞ্ঝা উঠুক বায়
বৃষ্টি বাদল হোক নিশায়
উল্কা পড়ুক পড়ুক বাজ
বিশ্ব ডুবুক সাগর মাঝ
বক্ষে তিলেক থাকিতে প্রাণ
চাহিনা তোমায় হে ভগবান।

লভুক ধর্ম্ম লভুক জয়
চিত্ত আমার জীবন ময়
শক্তি থাকুক ধরায় মোর
কর্ম্মে জীবন হোক বিভোর
বক্ষে তিলেক থাকিতে প্রাণ
চাহিনা তোমায় হে ভগবান।

বিশ্বে যখন আমার বাস
কর্ম্মে তখন মোর বিকাশ
ইচ্ছা আমার তাই সদাই
কর্ম্মি হ'য়ে রইতে চাই
বক্ষে তিলেক থাকিতে প্রাণ
চাহিনা তোমায় হে ভগবান।

মরণের পথে সুয্যিমামা

মল্লিকা মিত্র

উপরের ঐ নামটা দেখেই তোমরা হয়তো খুবই আশ্চর্য্য হচ্ছ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা ভাবছো—বলে কি! নিশ্চয় মাথা খারাপ। সুয্যিমামা ম'রতে ব'সেছেন! এ হ'তেই পারে না।' কিন্তু সত্যিই তাই; সুয্যিমামা একদিন পৃথিবীকে কাঁদিয়ে চিরনিদ্রায় মগ্ন হবেন। তাঁর আয়ু দিন দিন ক'মে আসছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স জীন্‌স সেই কথাটাই আমাদের বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তোমরা বোধহয় এঁর নাম শুনে থাকবে। ইনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তীতে যোগদান ক'রবার জন্যে। অনেকে হয়তো দেখেও থাকবে। বড় হয়ে তোমরা যদি বিজ্ঞান আলোচনা ক'রো,—সৌর বিজ্ঞান, তখন এঁর সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ট পরিচয় হবে। আমাদের এই পৃথিবী আর সুয্যিমামার কপালে কি লেখা আছে সেই সম্বন্ধে ইনি যা ব'লেছেন, আজ কেবল তোমাদের সেইটুকুই খুব সহজ এবং অল্প কথায় ব'ল্‌তে চেষ্টা ক'রছি। শোনো—

আমরা ভাবি, আমাদের এই পৃথিবীটা না জানি কতো বড়ো! পাঁচ পাঁচটা প্রকাণ্ড মহাদেশ, সাত সাতটা সমুদ্র, কতো উঁচু উঁচু পাহাড় পর্ব্বত, কতো বড়ো বড়ো নদী, কতো হ্রদ, কতো বিস্তৃত বনজঙ্গল, কতো বিশাল মরুভূমি, কতো মাঠ, কতো সহর কতো লোকজন, কতো রকমের পশুপক্ষী, আরও কতো কী সব রয়েছে এই পৃথিবীর মধ্যে—না জানি, এর চেয়ে বড়ো কিছু আছে কি না! কিন্তু তোমরা শুন্‌লে অবাক হ'য়ে যাবে যে, ঐ আকাশে যে তারাগুলো মিট মিট ক'রে জ্বলে, ওগুলোর কাছে আমাদের এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটা নিতান্ত ছোটো। পৃথিবীর মতো ছোটো বা এর চেয়ে একটু বড়ো তারা খুব কমই আছে; নাই ব'ল্‌লেই চলে। বেশীভাগ তারাগুলো এতো বড়ো যে, দশলক্ষেরও বেশী পৃথিবী এক সঙ্গে তাদের এক একটার কোলে চ'ড়ে খেলা ক'রতে পারে। তারাগুলোর মধ্যে আবার এক একটা এতোই বড়ো যে, তাদের কোলের ভিতর কোটি কোটি পৃথিবী মিলে বেশ চোর-পুলিশ খেল্‌তে পারে। এইবার একবার ভেবে দেখ দেখি—ঐ মিটমিটে তারাগুলো কতো বড়ো আর আমাদের পৃথিবী কতো ছোটো! আকাশে ঐ রকম কতো তারা আছে জানো? আমাদের পৃথিবীর সমুদ্রের তীরে যত বালি আছে, তারার সংখ্যা তত। সমস্ত বিশ্বসংসারের গ্রহতারাদের জড়িয়ে তুলনা ক'রলে, আমাদের এই বিরাট পৃথিবী একটা বালিকণার মতো। আর পৃথিবীর আয়তনের সঙ্গে তুলনা ক'রলে মানুষ একটা ধূলিকণার সমান। এখন

তোমরা বলো দেখি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তাহলে মানুষ কতটুকু ? একটা বালিকণার কণার চেয়েও ছোটো, তার মানে কিছুই নয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই খুদি কণাই অর্থাৎ সামান্ত মানুষ, একটা বালিকণার উপর দাঁড়িয়ে, তারমানে, এই পৃথিবীর উপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খুটিনাটি খবর রাখছে। এখন কথা হ'চ্ছে, এই যে ক্ষুদে বুদ্ধি-দানব মানুষ এলো কি ক'রে এই পৃথিবীতে, আর পৃথিবীটাই বা কোত্থেকে হ'লো এবং কী করেই বা সে নিজে বেঁচে রয়েছে সেই সঙ্গে সমস্ত প্রাণীজগৎ বাঁচিয়ে রেখেছে !

পৃথিবীর জন্মকথা তোমাদের অনেকে নিশ্চয় শুনে থাকবে। যাইহোক, সংক্ষেপে বলি—

আকাশে যে-সব তারা রয়েছে, সেগুলো কতো বড়ো তোমরা শুন্‌লে। দূর থেকে মনে হয় ওরা খুব কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু তা মোটেই নয়। তারাগুলো পরস্পর এতো দূরে দূরে রয়েছে যে কেউ কোনো দিন কারও দেখা পায় না। দেখা হ'লেই বিপদ, একটা না একটা অনর্থ বাধবে। তার কারণ আকর্ষণ শক্তি এদের খুবই প্রবল—কাছাকাছি হ'লেই ঠোকাঠুকি ভয়। তাই বোধহয় ওদের ঐ রকম দূরে দূরে থাকার ব্যবস্থা। ওই একটা তারা ঘুরতে ঘুরতে, বোধহয় পথ ভুলে, এক সময় আমাদের এই সূয্যিমামার কাছে এসে প'ড়েছিল। কাছে ব'ললুম ব'লে তোমরা হয়তো ভাবছো—হাত দশেক তফাতে বা ডাক শোনা যায় এমনি তফাতে এসেছিল ! তা মোটেই নয়, কাছে মানে, তখন সূয্যিমামা আর সেই ভবঘুরে পথ-ভোলা তারাটার মাঝে ব্যবধান কোটি কোটি মাইল। এতো দূরে থেকেও রেহাই নেই ; তার টানে আমাদের সূয্যিমামার বুক দুরদুর ক'রে উঠল, সমস্ত অঙ্গ তোলপাড় হ'তে লাগলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। তারা যখন সরে গেল তখন তার আকর্ষণের ফলে সূয্যিমামার বুক থেকে তাঁর দেহের খানিক অংশ ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে শূন্যে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গিয়ে তাঁরই চারধারে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌লো—আর তাঁর বুকে ফিরে যেতে পারলে না। সেই টুক্‌রোগুলোর একটা হ'লো পৃথিবী, আর বাকিগুলো হ'লো চাঁদ, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ। এদের নিয়েই হ'লো সূয্যিমামার সংসার, তাঁর স্নেহের বাঁধন এড়িয়ে এরা বাইরে যেতে পারলে না, তাঁরই চারধারে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। এই হ'লো সৌর জগৎ। সূয্যিমামার দেহ থেকেই পৃথিবীর জন্ম। সূয্যিমামা এদের জন্ম দিয়েছেন ব'লে তাঁকে আমরা সবিতা বলি। সবিতা মানে জন্মদাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই রকম কতো সূর্য্য আর কতো সৌরসংসার যে আছে তা বলা যায় না। তাহ'লে আমরা ব'ল্‌তে পারি একটা দুর্ঘটনার ফলে পৃথিবীর জন্ম হ'য়েছে।

সূয্যিমামাই আমাদের পৃথিবী আর গ্রহ উপগ্রহদের মা-বাপ ; এরা যখন তাঁর দেহ থেকে ছিটকে আসে তখন তাঁর মতোই এদের দেহগুলো ছিল টগ্‌বগে জলন্ত আগুনের একটা একটা গোলা। কোটি কোটি বৎসর ধরে এদের দেহ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'তে লাগ্‌লো। কেউ কেউ ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে বরফ হ'য়ে গেল ; যেমন চাঁদ, সেখানে সব সময়ে বরফে ঢাকা। আর কেউ কেউ এখনও টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। তার উপর যারা সূয্যিমামার কাছে রয়েছে তাদের ত কথাই নেই, ঠাণ্ডা হবার যো নেই। পৃথিবীও ফুটন্ত ছিল, কোটি কোটি বছর ধ'রে ঠাণ্ডা হ'বার পর এতে গাছপালা জন্মালো, কীটপতঙ্গ হলো, পশুপক্ষী জন্মালো, সবার শেষে দেখা দিল মানুষ—শ্রেষ্ঠ জীব। এই যে উদ্ভিদ আর জীবজগতের সৃষ্টি তাও এক দুর্ঘটনা ব'ল্‌তে হবে, অন্য কোনো গ্রহ উপগ্রহে নেই, কেবল মাত্র পৃথিবীতে। অপর কোনো গ্রহে প্রাণের সংস্পর্শ নেই কেবলমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই আছে তার কারণ, প্রাণীরা প্রচণ্ড উত্তাপেও বাঁচতে পারে না, দারুণ

ঠাণ্ডাতেও বাঁচতে পারে না ; পরিমিত শীত আর উত্তাপ পেলে তবে থাক্‌তে পারে। পৃথিবী আগেকার চেয়ে শীতল হ'য়ে গেলেও সূয্যিমামার কাছ থেকে এমন দূরে আছে যেখানে ঠিক দরকার মতো উত্তাপ পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রহগুলোর কেউ তাঁর এতো কাছে যে তাপে ঝল্‌সে যাচ্ছে, আর কেউ বা এতো দূরে যে শীতে জমে রয়েছে। এই হ'লো পৃথিবীতে প্রাণী থাক্‌বার প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হ'চ্ছে, যে-সব মালমসলা দিয়ে জীবন বা প্রাণ শক্তি তৈরী হয় সেগুলো নাকি এই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এই দুটো কারণে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া কোথাও জীবের অস্তিত্ব নেই। তাহ'লে বল্‌তে পারি, আমরা এই বিশ্বসংসারে একা ! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেন শত্রুপুরীতে বাস করছি, প্রতিবাসী গ্রহউপগ্রহগুলো সব আমাদের শত্রু, তা নইলে সেখানে প্রাণী থাক্‌বে না কেন ? সেই জন্যে আমাদের ভয় হয়, আমাদের অসহায় পেয়ে বুঝি ওরা কোনোদিন শেষ ক'রে ফেলে। জনশূন্য প্রান্তরের মাঝে একটা বিশাল অট্টালিকায় একা থাক্‌লে যে-আতঙ্ক হয়, পৃথিবীবাসী আমাদেরও সেই আতঙ্ক।

যাক্‌ সে কথা, তোমরা তাহ'লে বুঝতে পারলে যে, পৃথিবী সূয্যিমামার কাছ থেকে মাঝামাঝি দূরে র'য়েছে এবং এতে প্রাণ থাকবার মতো উপযুক্ত মালমসলা আছে ব'লেই জীব রয়েছে অর্থাৎ আমরা আছি—বেশ সুখে আছি। বেঁচে থাক্‌তে হ'লে যা কিছু দরকার সে সবই পাচ্ছি, নয় কি ? বেশ তাহ'লে সূয্যিমামার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা কতো ঘনিষ্ট একবার ভেবে দেখো। তাঁর উত্তাপই প্রাণীদের বেঁচে থাক্‌বার একমাত্র উপায় নয় কি ? তিনি আমাদের দরকার মতো তাপ সরবরাহ ক'রছেন ব'লেই আমরা বেঁচে আছি, গাছপালা জন্মাচ্ছে। সূয্যিমামা কোনোরকমে চ'টে গিয়ে আমাদের বরাদ্দ বন্ধ ক'রলেই চক্ষু চড়ক গাছ, কি বল ? সেই কথা জেনেই বোধহয় আমাদের দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরা সূয্যিমামার পূজার ব্যবস্থা ক'রেছেন, তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কতো স্তব স্তোত্র রচনা ক'রেছেন। কিন্তু তিনি না চ'টলেও আমাদের এ-সুখ চিরকাল থাক্‌বে না।

সূয্যিমামা আবহমান কাল ধ'রে তাপ সরবরাহ ক'রছেন আমাদের সুখে রাখবার জন্যে। কিন্তু তাঁর তাপের ভাণ্ডার ত অফুরন্ত নয়, পরিমিত। কুঁজোর জল যেমন পরিমিত, গড়িয়ে নেবার মাঝে মাঝে সেটায় জল না ভ'রে দিলে যেমন সেটার জল শেষ হ'য়ে যায়, বার কয়েক গড়িয়ে নেবার পর সূয্যিমামার তাপের বেলাও সেইরকম। চারিদিকে উত্তাপ ছড়াবার ফলে প্রতিনিয়ত যে পরিমান উত্তাপ খরচ হ'চ্ছে তা পূরণ হ'চ্ছে না বা পূরণ হবার উপায়ও নেই। তিনি দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছেন। কালে, সুদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আস্‌বে যখন সূয্যিমামা তাঁর তেজ হারিয়ে চাঁদামামার মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবেন। তখন আমরা থাক্‌বো কোথায় কে জানে ? সূয্যিমামার মৃত্যুটা আমাদের দেখতে হবে না এই যা সৌভাগ্য কারণ, তার বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ উনি নিভে যাবার বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বেই আমরা শেষ হ'য়ে যাব ; আমাদের এই সুন্দর ধরাতল তুষার ধবল হ'য়ে যাবে।

সূয্যিমামার তাপ কম্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রীতিমত তাপ পাবো না, একই জায়গায় থেকে। তাঁর তাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৃথিবী যদি তাঁর দিকে অল্প অল্প ক'রে এগুতে থাকে তবেই তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত, আমরাও বেঁচে থাক্‌তে পারি। কিন্তু পৃথিবী এগুচ্ছে না, এগুবার উপায়ও নাই ;

শুধু কি তাই? বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ ক'রেছেন যে, পৃথিবী দিন দিন সূয্যিমামার কাছ থেকে তিল তিল ক'রে সরে যাচ্ছে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তাপ থেকেও বঞ্চিত হ'চ্ছে। পৃথিবীও মরণ পথের পথিক।

মনে ক'রলে অত্যন্ত কষ্ট হয় যে আমাদের চারিদিকে সব উত্তপ্ত টগবগে জলন্ত প্রতিবাসী থাকতে থাকতে আমরা ম'রবো কি না উত্তাপের অভাবে! আমাদের মরণটা হ'বে ঠিক জলের মধ্যে থেকেও তেষ্টায় মরার সামিল। নয় কি? তোমরা বোধহয় বুঝতে পারলে যে, সূয্যিমামা কি ক'রে মরণের পথে এগুচ্ছেন আর সেই সঙ্গে তাঁর ভাগ্নেভাগ্নী আর তাদের পৃথিবীর অবস্থা কি করবেন। পৃথিবীকে একদিন তিনি বরফের পিণ্ড ক'রে দেবেন; আমাদের তখন কোনো চিহ্নই থাকবে না। এ-কথা জেনেও ইউরোপ কেন লড়াই বাধিয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি সুরু ক'রে দিল ভেবে বিস্মিত হচ্ছি। দু'দিন পরে আপনা হ'তেই ত সব শেষ হ'য়ে যাবে; আগে থাকতে মারামারি ক'রে ধ্বংস না হয়ে এই দু'দিন হাসিখুসি আমোদেই ত কাটান উচিত; তোমরা কি বল?

দু'দিন পরেই পৃথিবী জমে বরফ হ'য়ে যাবে এই কথা ভেবে তোমরা কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে, যে এখন থেকেই খেলাধূলা আমোদ প্রমোদে দিন কাটাবে তা মনেও ক'রো না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ঐ দু'দিন পরে মানে, কোটি কোটি বছর পরে। সে দুরবস্থা আসতে এখনো কোটি কোটি বছর দেরী। তোমরা মন দিয়ে লেখাপড়া খেলাধূলা ক'রে যাও। সূয্যিমামার হাসি এত কোটি বছরেও একটুও ম্লান হয় নি; যেটুকু হয়েছে তাও টের পাওয়া যায় না। *

* স্যার জেমস জীনস—'দি ডাইং সান' দ্রষ্টব্য।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

শ্রীঅনিল কুমার দাশগুপ্ত

ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র। একধারে আহত সৈনিকদের হাসপাতাল। তখন গভীর রাত্রি। মাঝে মাঝে রোগীদের কাতরানি শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে সময় সময় দেখা যায় একটি নারীকে—পরণে তাঁর নার্সের পোষাক ও হাতে একটি আলো। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রোগীদের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। তিনি প্রত্যেকটি রোগীর কাছে যেয়ে দেখেন, তা'কে সান্ত্বনা দেন, তারপর তিনি ফিরে যান তাঁর কোয়ার্টারে। এই নারীটি কে জান? এঁর নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। রাত্রিতে আলো হাতে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন বলে এঁর নাম হয়েছে 'লেডি অফ দি ল্যাম্প'। ইনি ছিলেন এক লক্ষপতি ইংরেজ ধনীর আদরে পালিতা কন্যা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপের নার্সদের নাম কলঙ্কে কালিমালিপ্ত ছিল। এই কালিমা দূর হয়েছিল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলেরই আপ্রাণ চেষ্টায়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অন্যান্য বোনদের সঙ্গে বিলাস ব্যসনের মাঝে থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে বেড়ে উঠছিলেন। পিতার ঐশ্বর্য্য তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, বহুমূল্য পোষাক তাঁকে বিলাসী করতে পারেনি, আর পারেনি বাইরের আনন্দ-কোলাহল তাঁকে টেনে নিতে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শুশ্রূষা করতে ভালবাসতেন। যখন আর আর বোনেরা পুতুল খেলতে খেলতে তা'দের হাত পা ভেঙ্গে ফেলতেন তখন তিনি সেই সব পুতুলের হাত পা জোড়া দিয়ে তা'দের শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকতেন। অত ছোট্ট বয়সে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের আকর্ষণ এড়িয়ে নিভৃতে এই মেয়েটি শুশ্রূষায় রত থাকে কেন? যাকে উত্তরকালে শুশ্রূষা-জগতে যুগান্তর আনতে হ'বে তা'র মধ্যে শৈশব থেকেই সে লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমনি অবস্থাই হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের, এমনিই হয়েছিল হজরত মহম্মদের। ছেলেরা যখন খেলায় রত, যখন তা'রা শীকারে মেতে থাকে, তখন গৌতম থাকেন ধ্যানে মগ্ন, তখন তাঁর হৃদয় হয়ে ওঠে নিরীহ প্রাণীদের ব্যথায় ব্যথিত; আবার যখন আরবের বালুরাশির ওপর ছেলেদের চলে হুড়োহুড়ি, তখন হজরত মহম্মদ এক কোণে বসে গভীর ধ্যানস্থ।

পুতুল খেলার মধ্যেই তাঁর স্বপ্ন। তা'দের সেবা করতে করতে তাঁর মানস পটে ফুটে ওঠে প্রকাণ্ড এক হাসপাতাল, চারিদিকে রোগীদের আর্ত্তনাদ, শত শত নার্স এদের যন্ত্রণার উপশমের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁরই পরিচালনায়। তিনি স্বপ্নে এমনই বিভোর হয়ে থাকেন যে খেলাধূলো সবকিছুই ভুলে যান, এমন কি খাওয়া পর্য্যন্ত ভোলেন। তাঁর এমন ভাব পিতামাতাকে আকুল করে তোলে। তাঁরা ভাবেন—ওর কেন এমন হ'ল? অবশেষে সেই মামুলী ওষুধের ব্যবস্থা হ'ল অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া। তাঁরা ভাবলেন সুন্দর একটি যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিলে হয়ত তিনি ঘর-সংসারী হ'য়ে এ'সব চিন্তা ভুলতে পারেন। কিন্তু বাইরের ডাক যার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁচেছে তাকে আটকাবার

সাধ্য কার? চৈতন্যদেব যখন এ' ডাক শুনতে পেয়েছিলেন তখন কি বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন, না—গৌতমের কাছে যখন মুক্তির আহ্বান এসেছিল তখন তাঁকে তা'র নবজাত শিশুর মায়া বাঁধতে পেরেছিল? ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকেও সংসার বাঁধতে পারলোনা। তাই তিনি পিতা, মাতা, ভাই ও ভগ্নীর স্নেহ পাশ ছিন্ন ক'রে, পিতার ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে চলে গেলেন বাহিরে।

শীঘ্রই তাঁর শুশ্রূষা বিদ্যা শেখার এক সুযোগ মিলে গেল। জল চিকিৎসার জন্য তাঁর মাতা ও ভগ্নী বিদেশে গেলেন, এই ফাঁকে তিনি কাইসারস্ওয়ার্থ নার্সিংহোমের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে চলে গেলেন। বিদায়ের সময় তাঁর মাতার অশ্রু তাঁকে বিচলিত করতে পারলনা।

এক বছর কাজ করার পর রাশিয়ার অন্তর্গত ক্রিমিয়া প্রদেশে (১) ইংরেজ ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। সেখান থেকে তাঁর ডাক এলো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না; ৩৮ জন নার্স সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন।

স্কুটারী হাসপাতালে গিয়ে তিনি দেখলেন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। শুশ্রূষার অভাবে সৈনিকদের জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। তিনি সেখানে গিয়েই শুশ্রূষা কৌশলে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৪২ থেকে কমিয়ে শতকরা ২ এ দাঁড় করালেন।

শোনা যায় একবার মিলিটারী হাসপাতালে কর্ম্মাধ্যক্ষ ঘরে চাবি দিয়ে চলে গেছেন। এদিকে একটি রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক দাঁড়িয়েছে। নাইটিঙ্গেল এলে সকলে বল্ল—"চাবি নেই ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব।" তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা না করে আদেশ দিলেন—"তালা ভেঙ্গে ফেল, এর জন্য আমি দায়ী রইলুম।" তখন তালা ভাঙ্গা হল। নাইটিঙ্গেল তখন ঘরে প্রবেশ করে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে তুললেন।

সৎকাজে অসংখ্য বাধা, প্রতিপদে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলেরও শত্রু জুটতে বিলম্ব হল না। কিন্তু প্রকৃত মহৎ যাঁরা তাঁদের কোন বাধাই দুর্ব্বল করে ফেলতে পারে না। তাঁদের কাছে এ বাধা যতই প্রবল হয়ে আসতে থাকে তাঁদের কর্ম্মশক্তিও ততই প্রবল হতে থাকে। নাইটিঙ্গেলের বিরুদ্ধে শত্রুরা কি ভাবে লেগেছিল তারই একটা ঘটনা বলি। একবার এক অজানা দেশে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে শুশ্রূষা করতে গেলেন। তাঁর প্রধান শত্রু ডাক্তার হল—তাঁদের খাদ্য বন্ধ করে দিলেন। এমনি বিপদের সম্মুখীন তাঁকে হতে হবে বুদ্ধিমতি নাইটিঙ্গেলের আগে থেকেই এ ধারণা হয়েছিল; সেই জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। দশ বার দিন ধরে তিনি নিজেই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে চালালেন। এই সময় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীরা জানতে পেরে ডাক্তার হলের আদেশ বদলে দিয়ে খাবার পাঠাতে লাগলেন। এমনি ভাবেই চক্রী ডাক্তারের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পরিণত হল।

পরশমণির ছোঁয়া লেগে যেমন সব কিছুই সোণা হয়ে যায় তেমনি তাঁর সংস্পর্শে যে-ই এসেছে সে-ই ভাল হয়ে গেছে। তারই চেষ্টায় পশু প্রকৃতি সৈন্যদের মনে মানুষ হবার স্পৃহা জেগে উঠেছিল। তিনিই

(১) ক্রিমিয়া রাশিয়ায় অবস্থিত হলেও আসলে কিন্তু তুরস্কের শাসনাধীনে ছিল। এখন যেমন পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করবার জন্য ইংরেজ ও ফরাসীরা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেবেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যখন ঝগড়া লাগে তখনও তাঁরা অর্থাৎ ইংরেজ ও ফরাসীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

তাদের মদ্যপানের অভ্যাস কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেই তাদের কোষাধ্যক্ষরূপে কাজ করে, লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে দেশে পাঠিয়েছিলেন।

এমনি ভাবেই আজীবন তিনি মানব সেবায় রত থেকে ৯০ বৎসর বয়সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের তেরই আগষ্ট প্রাণত্যাগ করেন। মানুষ মরে কিন্তু তার স্মৃতি থাকে! ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের স্মৃতি রক্ষার জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নাইটিঙ্গেল ফণ্ড নার্সিং ট্রেণিং স্কুল এবং তারপরে অনেকগুলো নার্স ট্রেণিং স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় রেড ক্রস্ সোসাইটি তাঁরই নামে এক পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এই পুরস্কার তিন মাস অন্তর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারীকে দেওয়া হয়।

তাঁরাই মহৎ যাঁরা সমস্ত ছেড়ে মানব সেবার জন্য দুঃখকে বরণ করে নিয়েছেন—যেমন করেছেন, চিত্তরঞ্জন, ঈশ্বরচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী। তাঁদের কিসের অভাব ছিল? অথচ তাঁরা দেশ সেবার জন্য সমস্তই ত্যাগ করেছেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলেরও ছিল সবই, কিন্তু মানব সেবার জন্য নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিলেন।

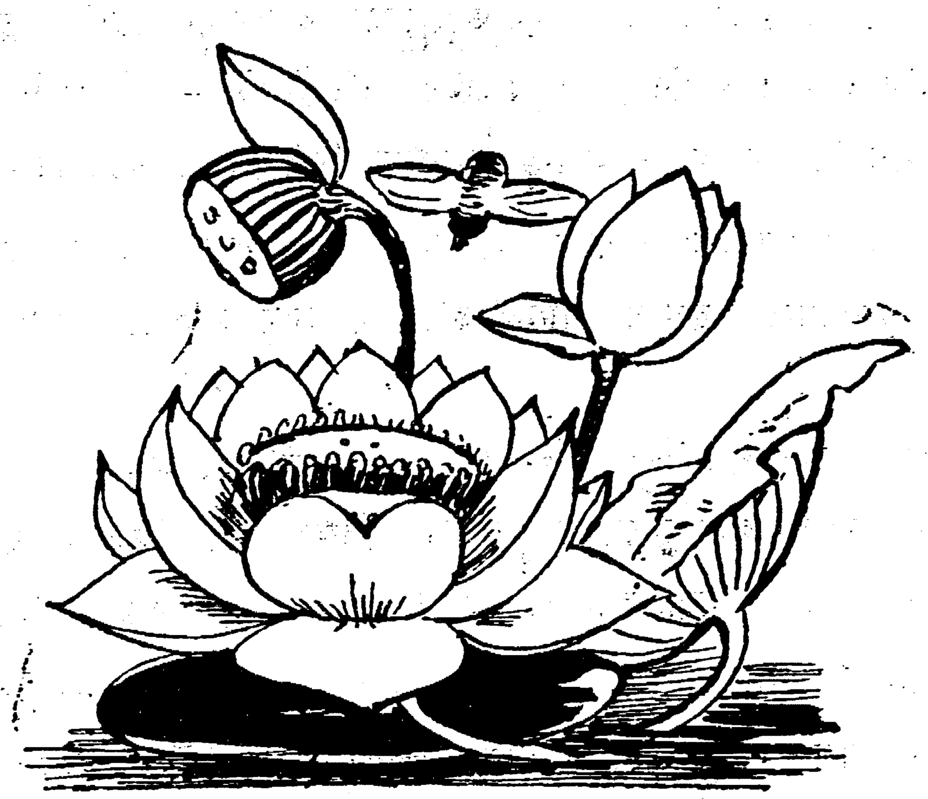

জয়পুরে দু'দিন

অরুণ কুমার রায়

(গ্রাঃ নং ৯৮১)

বেশ ছোট বেলা থেকেই ভারতের নানা জায়গায় বেড়িয়েছি। বেড়ানোটা তখন ছিল, বেড়ানোর জন্য, দেখবার জন্য। বেড়ানোর মধ্যে যে শিক্ষা, আনন্দ আছে, তা' তখন বুঝতাম না। সেজন্য কোনও ছবিও তুলিনি বা ডায়েরীও লিখিনি। এখন তার প্রয়োজন কিছু কিছু বুঝছি। মনের ডায়েরীতে যা' লেখা আছে, তাই লিখতে চেষ্টা ক'রছি। সব মনেও নেই; আর মনে প'ড়লেও তখন লেখা হ'য়ে ওঠে না। নিজে অনেক বেড়িয়েছি তাই জানি না কিন্তু অনেকে বলেন যে ছোট ছেলেরা ভ্রমণ কাহিনী শুনতে খুব ভালোবাসে। আমি আমার একটী জায়গার ভ্রমণ কাহিনী লিখবো। যদি তোমাদের আরও শুনতে ইচ্ছে করে ত সম্পাদক মশাইকে ব'লো,—আমি তোমাদের কিছু লিখে দিতে চেষ্টা ক'রবো।

তোমরা অনেকেই বোধহয় জয়পুর, যোধপুর, আর উদয়পুরের নাম জান,—বিশেষ ক'রে যারা ম্যাট্রিক দেবে। এবারে আমার জয়পুরে দু'দিনই হ'চ্ছে তোমাদের কাছে লেখবার বিষয়। খুব ছোট ক'রে লিখে দিচ্ছি।

প্রথম বার আমাদের ভ্রমণ পথ ছিল, দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বদিক, অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের কাছাকাছি। মাদ্রাজ, মাদুরা, তাঞ্জোর ইত্যাদি হ'য়ে রামেশ্বর পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় বারে ছিল গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশ এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের কিয়দংশ। গয়া, কানপুর, আগ্রা দেখে আমরা রওনা হ'লাম জয়পুরের দিকে।

আগ্রা কোর্ট অবধি গিয়েছিলাম ই. আই. আর. এর ট্রেনে। সেখান থেকে বি. বি. ও সি. আই. আর. এর গাড়ীতে ক'রে আমরা আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলাম। গাড়ীতে উঠলাম বিকেল বেলায়। গোধূলির ম্লান আলোয় তাজমহলের সৌন্দর্য্য আমাদের চোখের সামনে দিয়ে গাছের আড়ালে মুছে গেল। সন্ধ্যা নেবে এলো একটু পরেই। কাজের অভাবে সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে দেয়ে ঘুম দিলাম। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলেও ঘুমের বিশেষ কোনও ব্যাঘাত হয়নি। চাঁদের আলোতে বিখ্যাত আবু

পাহাড়কে ঝাপসা ধোঁয়ার মত দেখেছিলাম। রাত্তির তখন বোধহয় দু'টো। ষ্টেশনের নাম দেখলাম 'আবু রোড'।

জয়পুরের আগের ষ্টেশনে উঠলাম। মালপত্র গুছিয়ে এক জায়গায় জড়ো ক'রলাম। জয়পুরে যখন পৌছলাম তখন রাত্তির চারটে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি গাড়ী একটা মাঠের মধ্যে এসে থেমেছে। তারপর ভালো ক'রে চেয়ে দেখি যে আমাদের গাড়ীর খানিকটা প্ল্যাটফর্ম্মে রয়েছে বটে কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মের তুলনায় গাড়ী এত বড় যে সেটাকে পুরোপুরি প্ল্যাটফর্ম্মে রাখা যায় নি। যথেষ্ট মালপত্র নিয়ে নামলাম। গ্রীষ্মকাল হ'লেও বেশ শীত পড়েছে। তোমরা বোধহয় অনেকেই জান যে রাজপুতানায় দিনে যেমন গরম পড়ে রাত্রে তেমনই ঠাণ্ডা পড়ে। একটা কোট চাপিয়েও বেশ শীত ক'রতে লাগলো। সেই গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা রাত্রেই একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে ধর্ম্মশালার খোঁজে বেরিয়ে প'ড়লাম। ধর্ম্মশালায় পৌছে জিনিষপত্র গুছিয়ে ঠিক হ'য়ে ব'সতে ব'সতেই পূবআকাশে আবছা ভোরের আলো ফুটে উঠলো। সেই ভোরের আলোতেই আমি জয়পুরকে প্রথম পরিষ্কার দেখলাম।

জয়পুরের একজন বিশেষ জনপ্রিয় লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল। তাঁর নাম করার বিশেষ দরকার নেই। সকালে তাঁর খোঁজে বেরুলাম। তিনি ত আমাদের দেখে খুব খুসী। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম অনেক কথা। পরে ব'ললাম, "দেখুন, আমরা tour এ বেরিয়েছি। হাতে সময়ও নেই বেশী অথচ দেখতে হবে অনেক। জয়পুর দেখতে সব চেয়ে কম কত দিনে হয়?" তিনি ব'ললেন, "প্রথম দিনে দেখুন জয়পুরের ভেতরের সব এবং দ্বিতীয় দিনে দেখুন জয়পুরের বাইরের সব।" তিনি আরও ব'ললেন, "কতগুলো কাজ পড়াতে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলাম না। তবে এই লোকটাই আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।" তিনি রাস্তা থেকে একটা গাড়োয়ানকে ডেকে আমাদের চিনিয়ে দিলেন। ফিরবার সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম যে জয়পুরে কোনও কাক নেই। সেখানে কেবল ময়ূর। সব চেয়ে কুৎসিত পাখীর বদলে সবচেয়ে সুন্দর পাখী জয়পুরের রাস্তায় বাড়ীর ছাতে ভর্ত্তি। তাদের সেই বিচিত্র পেখম যখন খুলে দেয়, রামধনুর সাতরং লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়। তা'দের সেই বিরাট দেহ নিয়ে যখন এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যায় তখন একটু আশ্চর্য্য মনে হয়।

বেশ একটু বেলা থাকতেই বেরিয়ে প'ড়লাম। প্রথমে গেলাম observatory বা মান-মন্দির দেখতে। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা মাঠ। তার মধ্যে রয়েছে বাড়ীর মত বড় বড় সব কালো সাদা পাথরের যন্ত্রপাতি। তাই দিয়ে তিথি, বার, মাস, সব বলে দেওয়া যায় (যদি নিয়ম জানা থাকে)। একটা পাথরের উপর সরু সরু কতগুলি দাগ কাটা। তার পাশের একটা দেওয়ালের ছায়া প'ড়েছে ওই পাথরের দাগগুলির উপর। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম; ওটা কি? সে বললো, ওটা দিয়ে সময় দেখা যায়। আমি বললাম, "এখন কটা বেজেছে?" সে বললো, "ঠিক ছ'টা।" এবং বুঝিয়ে দিলো, কি করে তা বোঝা যায়। সেই সরু সরু দাগগুলিতে ১, ২, ৩, ৪, ক'রে সংখ্যা দেওয়া আছে। তখন সেই দেওয়ালের ছায়াটা ঠিক ছটার উপরে পড়েছিল। কাজেই বুঝলাম যে তখন ঠিক ছটা বেজেছে। কাছেই একটা বড় ঘড়ি ছিল, তাতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো। এসব ছাড়া আরও অনেক সুন্দর পাথর কাটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখেছিলাম সেখানে। তোমরা কাশীতে বা অন্য কোথাও সে রকম মান-মন্দির বোধহয় দেখে থাকবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে করে আমরা চল্লাম গোবিন্দজীর মন্দির দেখতে। ঐ মন্দিরটি বড় সুন্দর। সবচেয়ে প্রথমেই নজর পড়ে তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে। একেবারে ঝক্ ঝক্ করছে সমস্ত জায়গা। একটা পবিত্রতার ছাপ সে মন্দিরে লেগে রয়েছে। সেখানে যখন পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা। সন্ধ্যা আরতি দেখলাম। সে আরতির বিশেষত্ব কিছু নেই। তবুও সেটা মনে বেশ ভাল লেগেছিল। সবচেয়ে ভাল লাগছিল ময়ূরের সেই একটানা ডাক। জয়পুরের সমস্ত ময়ূর একসঙ্গে ডাকছে ক্যাঁ-্যা-ও-ও, ক্যাঁ-্যা-ও-ও। সেই ডাক মন্দিরের পবিত্রতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে কিছু খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ী নিয়ে। গল্‌তা আর অম্বর কোট দেখা তখন বাকি। গলতা একটা ঝরণা। তার সম্বন্ধে শুনেছিলাম অনেক। সেইজন্য গলতা দেখার ইচ্ছা ছিল প্রবল। প্রায় মাইল পাঁচেক গিয়ে একটা পাহাড়ের গোড়ায় গাড়ী থামলো। আস্তে আস্তে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। সেখানে গিয়ে গলতার যা' রূপ দেখলাম তাইতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। ছাতের থেকে এক গ্লাস জল নিচে ঢাললে যে রকম দেখায় গলতাকে অনেকটা সেইরকম দেখতে। কল্পনা-প্রবল পাণ্ডারা বলে যে ওটা হচ্ছে মূল গোমুখী নদী। তার কারণ ঝরণাটা যেখান দিয়ে পড়ছে সেখানে একটা পাথরের গরুর মুখ বসানো রয়েছে। ভেবেছিলাম স্নান করবো। কিন্তু স্নানের জায়গা দেখেই সে ইচ্ছা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে বাধ্য হলাম। গোমুখীর সেই ময়লা সবুজ জল এসে একটা কুণ্ডের মধ্যে জমা হচ্ছে। ছোট কুণ্ড। তার মধ্যে লোকের ঠেসাঠেসি। আবার তাদের স্নানের জল গিয়ে পড়ছে আর একটা কুণ্ডের মধ্যে। সেখানে মেয়েরা স্নান করে। গলতা দেখা সেইখানেই শেষ হ'ল। ইচ্ছে হচ্ছিল, সহর শুদ্ধ ব'লে যাই, "আপনারা যদি মানুষ হ'ন ত' স্নান করতে গলতায় যাবেন না।"

গলতা থেকে নেমে, গাড়ীতে করে চললাম অম্বর পাহাড়ের দিকে। গলতার পাহাড় থেকে অম্বরের পাহাড় দেখা যায়। মধ্যের সেই পথটি বড় সুন্দর। পথের দু'ধারে আম গাছের মত বড় বড় গাছ। পথটিতে লোক চলাচল বেশী নেই। বেশ আরাম লাগছিল পাহাড়ের গা ঘেসে যেতে। থাকি বাংলা দেশে,—তাও ক'লকাতায়। পায়ের তলায় কালো পিচের রাস্তা, এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু ভাবতে পারি না আমরা। পাহাড়ের গায়ে লাল মাটির পথ স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

অম্বর পাহাড় একটি সুরক্ষিত দুর্গ। তার মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে ; এমন কি কালী বাড়ী পর্য্যন্ত আছে। অম্বর পাহাড়ের পথের উপর একটা গেট আছে। পাহাড়ের কাছে যেতে হলে সেই গেট দিয়ে যেতে হয়। সেই গেটটা পার হয়েই বেশ সুন্দর লাল রাস্তায় এসে পড়লুম। সেই রাস্তাটীকে পাহাড় কেটে সমতল করা হয়েছে। সেই পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে পাহাড়ের গোড়ায় একটা বাড়ীর কাছে এসে। সেখানে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, প্রভৃতি দাঁড়াবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে গুটীকতক ঘর আছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে অবধি কিছু খাইনি। সেখানে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর সুরু হল পাহাড় চড়া। পাহাড় চড়াও খুব শক্ত নয়, কারণ পথ একেবারে করাই আছে। সেই পথের ধারে একেবারে লাইন ক'রে কতগুলি রক্তের ফোঁটা দেখতে পেলাম। বুঝলাম না, ও কিসের রক্ত। সেই পথ দিয়ে বরাবর উঠে একেবারে অম্বরের কালীবাড়ীতে পৌছলাম। সেখানে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বল্লে

ওই রক্ত পাঁঠার। কালীবাড়ীতে যে পাঁঠাগুলো বলি দেওয়া হয়, সেগুলো নিচে নিয়ে প্রসাদ বলে বিক্রি করা হয়। মন্দিরে যখন পৌছলাম তখন একজন সাধক খুব জোরে গলা ছেড়ে গাইছেন শ্যামা-সঙ্গীত। সেখানে ওই কালী সম্বন্ধে শুনলাম অনেক কথা। ওই কালীর নাম 'যশোরেশ্বরী কালী'! মুসলমানরা যখন বাংলা আক্রমণ করলো তখন অম্বর-রাজ-মানসিংহ যশোরের ঐ কালীকে অম্বরে এনে সযত্নে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালী পূজোর জন্য তিনি যশোর থেকে হিন্দু পুরোহিত পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা বাংলা ভাষা ভুলে যেতে লাগলেন এবং হিন্দি বলতে লাগলেন। এখন যিনি পুরোহিত তিনি তাঁদেরই বংশধর, বাঙালী হিন্দু, কিন্তু তিনি বাংলা বলতে জানেন না। তা ছাড়া আরও অনেক গল্প শুনলাম ও কালীর দৈব শক্তি সম্বন্ধে। সে সব লিখে তোমাদের আর বিরক্ত করবো না।

তারপর আরম্ভ হল আরতি। একটা বিরাট ঢাক আর অনেকগুলো বাজনা মিলে একটা ভীষণ আওয়াজ হতে লাগলো সেখানে। সে আরতি শেষ হ'লো প্রায় ৪৫ মিনিট পর। তখন বুঝলাম, কেন লোকে বলে, "ঢাকের বাদ্দ্যি থামলে মিষ্টি শুনায়।" মন্দির দেখা শেষ করে যখন বেরুতে যাচ্ছি, তখন মন্দিরের দরজার দিকে নজর পড়লো। সেটা সম্পূর্ণ রুপোর পাতে মোড়া এবং তাতে দশমহাবিদ্যা এবং দশ অবতার প্রভৃতি নানা রকম ছবি রয়েছে। তার কাজও খুব পরিষ্কার।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা আরও উঠতে লাগলাম অম্বর রাজপ্রাসাদের দিকে। পথে একটী গাইড ও জোগাড় করে নিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর সেই বিরাট প্রাসাদ দেখে সত্যিই একটু অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। কারা কত বছর ধরে এবং কত টাকা ব্যয়ে তৈয়ারী করেছে এই বিরাট দুর্গ-প্রাসাদ ? যাক্, সেই গাইডকে সঙ্গে নিয়ে উঠলাম সেই প্রাসাদে। একটা সাধারণ রাজপ্রাসাদে যা থাকা দরকার তার কোনটাই অভাব নেই সেখানে। খাস্‌মহল, দরবার, মন্ত্রণাগৃহ, অন্দরমহল, কিছুরই অভাব নেই সেখানে। তাছাড়া ওখানে একটা বিশেষ জিনিষ দেখলাম সেটা এর আগে আর কখনও দেখিনি। সে জিনিষটিকে ওরা বলে শিষমহল। একটা ঘরের চারটে দেওয়ালে অসংখ্য ছোট ছোট আয়না লাগান রয়েছে। ঘরে ঢুকলেই নিজের অসংখ্য ছায়া দেখা যায় তাতে। সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায় যদি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালান যায়। ঐ একটী কাঠির আলোতে সমস্ত ঘরটা ঝক্ ঝক্ করতে থাকে। মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ লোক লক্ষ লক্ষ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলেছে। বড় আশ্চর্য্য লাগলো। যেদিকেই তাকাই নিজের অসংখ্য ছায়া দেখতে পাই।

খুব আশ্চর্য্য লাগলেও বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না ; আরও অনেক জিনিষ দেখতে হবে তো। দোতলা থেকে তেতলায় উঠে গেলাম। সেখানে একটি ছোট শ্বেত পাথরের ঘর আছে, চারদিকে তার খোলা জানালা। সব সময় সেখানে হুহু করে হাওয়া বইছে। মাটি থেকে সে ঘরখানার উচ্চতা প্রায় ৬০০ ফিট। সেখান থেকে একেবারে সোজা নিচের দিকে তাকান যায়। অম্বরপাহাড়ের গোড়ার দিকটা ঢালু এবং গর্ত্তের মত। গ্রীষ্মকালে জল থাকে না বটে কিন্তু বর্ষাকালে যখন ওখানে জল জমে, তখন সে ঘর থেকে নিচের দিকে দেখতে নাকি খুব চমৎকার দেখায়। নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম আমাদের গাড়ীখানা আর কয়েকজন লোক যাতায়াত করছে। বড় সুন্দর লাগছিল। ওখান থেকে আর নামতে ইচ্ছে করছিল

না। অম্বরের মহারাণী নাকি ওখানে মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে আসতেন। ওখান থেকে নেমে ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়ীটা দেখতে লাগলাম। কি মজবুত পাথরে তৈরী এই সব ঘরগুলি! ঘরগুলি তখন সব খালি। মনটা যেন কেমন একটু হাল্কা হয়ে গেল। মনে হল এখানেই হয়ত কত রাজা রাণী বংশানুক্রমে তাঁদের সুখ দুঃখের কথা বলাবলি করেছেন। আজ তাঁরা কেউই নেই। কিন্তু দেয়ালগুলো মৌনীসাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবে অনেক যুগ।

একটু বেলা থাকতে থাকতেই নিচে নাবলাম। গাড়ী ঠিক ছিল। সন্ধ্যার আগে বাড়ী পৌছাতে হবে। গাড়ী চলতে লাগলো পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে। অম্বর কোট বা অম্বর প্যালেস্ তখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। বিকেলের সেই শেষ আলোতে অম্বর প্যালেস্ এবং পথের ধারের গাছগুলোকে দেখাচ্ছিল স্বপ্নে গড়া জিনিসের মত। বাড়ী যখন ফিরলাম, অবিরাম কেকা রব তখন থেমে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ডেকে উঠছে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে। রাত্তিরে আর বিশেষ বেড়ালাম না কোথাও। সামান্য দু'চারটে জিনিষ কিনে বাড়ী ফিরে এলাম। ঠাকুর তখন ভাত চড়িয়ে দিয়েছে। অন্য জিনিষগুলো রান্না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কেনা জিনিষগুলোর হিসাব মেলাতে লাগলাম। খেয়ে দেয়ে যখন শুয়ে পড়লাম তখন ন'টা। যে ট্রেনে জয়পুরে এসেছি সেই ট্রেনেই যেতে হবে আরও পশ্চিমে। উদয়পুর দেখা আর হয়ে উঠলো না। বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় সকল জিনিষ পত্রই বাঁধা গোছান ছিল।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ষ্টেশনে পৌছলাম। রাত তখন অনেক। ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও আমি মাথায় কিছু দেইনি। লক্ষ্য করে দেখলাম যে আমরা ছাড়া সেই ষ্টেশনের সবাই মাথায় টুপি বা পাগড়ি একটা না একটা কিছু দিয়েছেই। আমরা বিদেশী, বাঙালী—টুপি বা পাগড়ি পরার রেওয়াজ আমাদের নেই। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকলো। ট্রেনে করে যেতে হবে পশ্চিম দিকে আরও অনেক নতুন জিনিষ দেখতে।

সম্পাদকের কথা

এবার প্রশ্ন আর প্রশ্নের উত্তর এসেছে ভিড় করে'। কিন্তু কোনো উত্তরই নির্ভুল নয় এবং সত্যিকারের সার্থক প্রশ্ন একটাও পাইনি। এক্ষেত্রে এবার প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তরে ছেদ পড়ল। ইতিমধ্যে যদি যথাযোগ্য প্রশ্ন ও জবাব না আসে, তাহলে আগামী সংখ্যায় আমাদের দপ্তর থেকে প্রশ্ন করা হবে ও উত্তর দেওয়া হবে।

ছুটীর ঘণ্টা

ক্রিকেট খেলার মাঠে দুপুরের চন্‌চনে রোদে কালো মাথার সারি বছরের পর বছর বার্দ্ধক্যগ্রস্তের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এবারও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু বাংলার ক্রীড়ামোদীদের নিরাশ করেছেন আমাদের দেশের বাঙ্গালী খেলোয়াড়বর্গ। যুক্তপ্রদেশের কাছে বাংলা হেরে গেছে। খেলার শেষ দিন ঘড়িতে যখন পাঁচটা বাজলো তখন যুক্তপ্রদেশের ২য় ইনিংসে ৮টী উইকেট পড়ে গেছে এবং যুক্তপ্রদেশের মোট রাণসংখ্যা বাংলার মোট রাণ-সংখ্যার চেয়ে ৬ কম। খেলা আরো দশ মিনিট চললে কি হ'তো বলা যায় না। যা'হোক অমীমাংসিত খেলার নিয়মানুসারে প্রথম ইনিংস বিপক্ষ দলের চেয়ে বেশী রাণ করার জন্য যুক্তপ্রদেশ বাংলাকে হারিয়ে হায়দ্রাবাদের সঙ্গে খেলেছেন রঞ্জী-ট্রফীর ইন্টার-জোন ফাইনালে। দু'টো জিনিষ আমাদের ভাল লাগে নি। খেলার শেষের দিক যখন সময় নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ চলেছে, তখন মাঠ থেকে যাওয়া আসার আলস্য দেখিয়ে যুক্তপ্রদেশের খেলোয়াড়দের কাল হরণের অশোভন প্রয়াস।—এবার আমরা পরিস্কার দেখলুম যে বাংলা গত বছর দক্ষিণ পাঞ্জাবের মত দুর্দ্ধর্ষ দলকে হারিয়ে দিলো অবলীলাক্রমে, কয়েকটী শেতাঙ্গ খেলোয়াড়ের অভাবে যুক্তপ্রদেশের মত অত্যন্ত সাধারণ একটা দলের কাছে তার কী লাঞ্ছনা। বাংলার অধিনায়ক কার্ত্তিক বসু দু' ইনিংসেই শূন্য রাণ তুলে আমাদের চমৎকৃত করেছেন!

মাদ্রাজে বাৎসরিক আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলায় ভারতীয়রা ইয়ুরোপীয়দের হারিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় দলের সি, রামস্বামী ১০৩ রাণ করেন। সি, এম, নায়ুডুর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ৩১৬ রাণ করেও আউট না হওয়া সহজ কথা নয়। রঞ্জী-ট্রফির খেলায় মহারাষ্ট্রের

হ'য়ে বরোদার বিরুদ্ধে ভি, এস, হাজারে এই 'অসহজ' কাজটাকে নিজের কৌশল দিয়ে সহজ ক'রে ফেলতে বিশেষ বাধা বোধ করেন নি। রঞ্জী-ট্রফীর খেলায় এর আগে সবচেয়ে বেশী রাণ করেছিলেন—উজীর আলী বাংলার বিরুদ্ধে ২২২ নট আউট। রঞ্জী-ট্রফীর খেলায় হাজারে আরো একটা রেকর্ড করেছেন—নবম উইকেট জুটিতে ২৪৫ রাণ। এ ছাড়া এ পর্য্যন্ত রঞ্জী-ট্রফীর যত খেলা হ'য়েছে—তার ভিতরে মহারাষ্ট্র দলই সবচেয়ে বেশী রাণ তুলেছে—নয় উইকেটে ৬৪০ রাণ।

অষ্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ড খেলা শেষ হ'লো। শীল্ড পেলো নিউ সাউথ ওয়েলস্। শীল্ড খেলায় ব্র্যাডম্যানের গড়পড়তা রাণসংখ্যা প্রায় ছু'শোর কোঠায় গিয়ে উঠেছে।

লাহোরে নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের জি, লুইস এবং কার্ত্তার সিং এর কাছে যথাক্রমে বাংলার মার্সিলিন এবং তারা ব্যানার্জী সেমি-ফাইনালে হেরে গেলেন। ফাইনালে লুইসের তীব্র মারের শাসনে কার্ত্তার সিং ভেঙ্গে পড়লেন। লুইস চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন হ'লেন। মেয়েদের ফাইনালে পাঞ্জাবের মিসেস ইসডনের কাছে বাংলার মিস কুক (যাকে গত সংখ্যায় ভুলক্রমে মিস মার্সিলন বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো) হেরে গেলেও সুনাম হারান নি।

বোম্বাইয়ে আন্তর্প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত টেবিল টেনিশ প্রতিযোগিতা শেষ হ'য়ে গেছে। সবগুলো খেলা জিতে বোম্বাই প্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হলো। বাংলা,—দিল্লী, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও হায়দ্রাবাদকে হারিয়েছে, কিন্তু বোম্বাইয়ের কাছে হেরে যাওয়াতে তাকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রতে হয়েছে। নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের এম, আয়ুব বোম্বাইয়ের কে, এচ, কাপাদিয়াকে হারিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ন হ'লেন। খেলার ফলাফল বিচার ক'রে খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় ক'রলে অনেকটা এ রকম দাঁড়াবে—১। এম আয়ুব, কে, এচ, কাপাদিয়া ; ২। ডি, আর, ভাসিন ; ৩। এ, ঘোষ, ডি, এচ, কাপাদিয়া।

শীগ্‌গিরই বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুরু হ'বে। বোম্বাইয়ের উডকক ১০০ মিটার ১০'৮ সেকেণ্ডে দৌড়েছেন। বাংলার চ্যাম্পিয়ন দৌড়বাজ জেড্, এচ, খাঁ এখনও ১০০ মিটার দৌড়ে ১১ সেকেণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম কোরতে পারেন নি। তার কাছ থেকে একটা নতুন রেকর্ডের প্রতীক্ষায় আমরা রইলুম।

নিখিল ভারত এ্যামেচার বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় প্রত্যুষ দেবকে হারিয়ে এস, এচ, লিথ এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হ'লেন। খেলার শেষে দেব মাত্র ৭ পয়েণ্ট পিছনে ছিলেন। এর আগে লিথের সঙ্গে দেবের ছু'বার সাক্ষাৎ হ'য়েছে—ছু'বারই দেব জিতেছেন। নিখিল ভারত স্নুকার প্রতিযোগিতায় স্মিথকে হারিয়ে প্রত্যুষ দেব চ্যাম্পিয়ন হলেন।

চাঁদের দেশে

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক

১

ওই দেখ মা মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
আয় গো মা, তোর কোলে বসে চাঁদের কথা কই,
চাঁদামামার কথা যত,
তুই আমারে বলিস্ তত,
তোর মুখে মা শুনে, শুনে অবাক্ হয়ে রই,
ওই দেখ মা, মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই।

২

চাঁদের বাড়ী কোথায় মাগো কোনখানে চাঁদ থাকে
সন্ধ্যা বেলা ছাতের উপর খুঁজতে আসে কাকে,
তারায় ভরা আকাশ তলে,
মেঘরা যখন ভেসে চলে,
যকের পাঁতি মালা শরায় সারা আকাশটাকে
সন্ধ্যে বেলা ছাতেতে চাঁদ খুঁজতে আসে কাকে।

৩

দেখ চেয়ে ওই আকাশ পানে কেমন আলোর ফাঁদ
চাঁদের বাড়ী আছে কি মা আরও অনেক চাঁদ,
তারাও কি ঐ চাঁদের মত
জোছনা ঝরায় অবিরত,
তারাও কি মা এমনি উজল এমনি রূপের ছাঁদ
দেখ চেয়ে ওই আকাশ পানে কেমন আলোর ফাঁদ

৪

যেখানটাতে আমিও যাই সেইখানে চাঁদ যায়
আমারই এই মুখের পানে, পলক হারা চায়
আলোর হাসি ঝরে পড়ে
প্রাণ যে আমার কেমন করে
আমার এ'মন কেমন যেন চাঁদের পানে ধায়
যেখানেতে আমি ও যাই সেইখানে চাঁদ যায়।

৫

তোর সাথে মা যখন আমি মামার বাড়ী যাই
সন্ধ্যেবেলায় ছাতে উঠেই আকাশ পানে চাই
সেখানেতেও এমনি দেখি,
এই চাঁদকেই, ও'মা, একি
হাতি ছানি দে ডাকছে যেন আয় চলে আয় ভাই
মামার বাড়ীর ছাতে যখন আকাশ পানে চাই।

৬

আমি বলি ও চাঁদ আমি কেমন করে যাব
মা যদি না কাছে থাকে, কার কাছে দুধ খাব
কে আমাকে ঘুম পাড়াবে
জামা কাপড় পরিয়ে দেবে
মায়ের মত এমন আদর কার কাছে ভাই পাব
আমি শুধোই মাকে ছেড়ে কেমন করে যাব।

৭

আমার কথা শুনে তখন চাঁদ আমাকে কয়
"একলা যদি ভয় করে ত মাকেও নিয়ে আয়
চাঁদের মধু খেতে দেব
চাঁদের দোলায় দুলিয়ে দেব
চাঁদ সাগরে নাইয়ে দেব থাকবে না'কো ভয়"
আমার কথা শুনে তখন চাঁদ আমারে কয়।

চলন্তিকা

'অল্টমার্ক' নামে একটি জার্ম্মান জাহাজ জার্ম্মাণীদের বিখ্যাত 'গ্রাফ স্পী' যুদ্ধজাহাজকে মাল সরবরাহ ও তার বন্দীদের আটক রাখার কাজে লুকিয়ে নিযুক্ত থাকত। ইংরাজদের হাতে 'গ্রাফ স্পী'র যুদ্ধলীলা শেষ হবার সময়, এই 'অল্টমার্ক' জাহাজটি ব্রিটিশ নাবিক বন্দীদের নিয়ে পলায়ন করে এবং নানা চালাকি করে ইংরাজ যুদ্ধজাহাজদের এড়িয়ে চলে। প্রায় তিনমাস ধরে ইংরাজরা 'অল্টমার্ক'এর কোন পাত্তা আবিষ্কার করতে পারে না। ১৬ই ফেব্রুয়ারী জার্ম্মাণীরা রেডিয়োতে খুব আনন্দ প্রকাশ করে বলে যে 'অল্টমার্ক' চারশ ব্রিটিশ নাবিক বন্দী করে ইংরাজদের ফাঁকি দিয়ে জার্ম্মাণীতে ফিরে আসছে। কিন্তু জার্ম্মাণীর জয়ের এ আনন্দ স্থায়ী হল না কারণ তার কিছু আগেই নরওয়ের উপকূলে অল্টমার্ককে একটি ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজ দেখতে পায়—নরওয়ের উপকুল থেকেই অল্টমার্ক জার্ম্মাণীতে পালাবার মতলব করছিল।

*　　*　　*　　*

কিন্তু এখানে এক দারুণ গোলোযোগের সৃষ্টি হয়—যার ফলাফলে নরওয়ে ইংরেজ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিজেকে আজ প্রায় টেনে এনেছে। নরওয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় নি—কারুর পক্ষ অবলম্বন না করে সে নিরপেক্ষী হয়ে আছে। ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ—'কসাক' অল্টমার্ক এর কারণে নরওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে কারণ নরওয়ের উপকূলে অল্টমার্ককে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়। নরওয়ে সে সাহায্য দিতে অস্বীকার করে' বলে তাহারা পরীক্ষা করে দেখেছে অল্টমার্কে কোন ব্রিটিশ বন্দী নেই। তখন 'কসাক' যুদ্ধজাহাজটি নরওয়ের উপকূল থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় কিন্তু পরামর্শের পর রাত্রে ফিরে এসে অল্টমার্ককে আক্রমণ করে ও তাকে পরাজিত করে সমস্ত ব্রিটিশ নাবিক বন্দীদের মুক্ত করে তাদের নিজেদের জাহাজে নিয়ে আসে। এই বন্দীদের মধ্যে ৫৬ জন ভারতবর্ষীয় নাবিক ছিল। 'কসাক' নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌঁচেছে।

জার্ম্মাণীর এই অল্টমার্ক জাহাজটিকে 'নাৎসি হেল সিপ' বলা হয়। তার কারণ এখানে বন্দীদের ওপর নাকি নানা অত্যাচার করা হয়।

* * * *

কিন্তু এই নাটকের যবনিকা এখানেই শেষ হয়নি। নরওয়ে ইংরাজদের কাছে ঘোরতর প্রতিবাদ করেছে ও জানিয়েছে ইংরাজ নরওয়ের নিরপেক্ষতার ওপর অত্যাচার করেছে। জার্ম্মাণীর কাছেও নরওয়ে প্রতিবাদ করে পাঠিয়েছে যে জার্ম্মাণী নরওয়ের উপকূলে যুদ্ধ টেনে এনেছে। ব্রিটিশ নাবিকবন্দীদের নরওয়েতে এখনই ফিরিয়ে দেওয়া হোক—নরওয়ে ইংলণ্ডকে জানিয়েছে। ইংলণ্ড নরওয়ের এ দাবী অগ্রাহ্য করেছে। ইংলণ্ডের মতে নরওয়ে শুধু একবার নয়—তিন-চার বার উপযুক্ত খোঁজখবর নেয়নি এবং জার্ম্মাণী নরওয়ের উপকূলের যে নিজেদের স্থবিধে করে নিতে পারে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়েছে। নরওয়ের মতে অল্‌টমার্ক যুদ্ধজাহাজ অতএব তাকে পরীক্ষায় নিজেদের অর্পন করতে তাদের আপত্তি থাকা ন্যায় সঙ্গত। জার্ম্মাণীও ইংরেজদের এই কাণ্ডতে হুমকি দিয়েছে যে তারা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। তাদের মতে ইংরাজ অল্‌টমার্কের ওপর নির্ম্মম অত্যাচার করেছে, নরওয়ের নিরপেক্ষতায় জবরদস্তি করেছে—এবং এর মূলে ইংরাজদের নাকি ভয় যে নিরপেক্ষ দেশগুলির সাহায্য এরকম জোর করে না নিলে তারা যুদ্ধে হারবে। এ ব্যাপারের কোন নিষ্পত্তি হয় নি—তিনপক্ষ থেকেই চোকা চোকা হুমকি ও বাক্যবান নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এর ফলে নরওয়ে বোধ হয় আর নিরপেক্ষি হয়ে থাকতে পারবে না—টানা-টানির ফলে এই যুদ্ধে হয় তাকে জার্ম্মাণীর পক্ষ নয় ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। ভবিষ্যতে এমনও দাঁড়াতে পারে যে কোন দেশই নিরপেক্ষ থাকবে না এবং তখন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে।

* * * *

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ও শান্তিনিকেতন দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে ঢাকা যাবার পথে মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে দুদিন কাটিয়ে যান। বাংলা ও তথা ভারতবর্ষের আজকের এই দুর্দ্দিনে এই দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ যোগ শুভ হয়েছে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাগান্ধীকে যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন—মহাত্মাগান্ধীও তেমনি বিশ্বকবিকে অতি শ্রদ্ধা করেন। শুধু তাই নয় শান্তিনিকেতন জায়গাটিও তাঁর পরম প্রিয়। গান্ধীজি বলেন শান্তিনিকেতন তাঁর দ্বিতীয় দেশ—রাজনৈতিক কোলাহল থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে শান্তিনিকেতনে দৌড়ে আসতে তাঁর মন চায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় পর্ণ কুঠির—'শ্যামলী' গান্ধীজিকে উপহার দেবেন বলেন যদি গান্ধীজি বৎসরে অন্ততঃ একবার শান্তিনিকেতনে এসে থাকতে প্রতিশ্রুত হন। গান্ধীজি আনন্দে স্বীকার করেন। বিশ্বকবির আপন আদর্শে গড়া শ্যামলী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষির শান্তিকুঠীর হয়ে রইল। এথেকে বোঝা যায় এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে কত বড় বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিরালায় বসে গান্ধীজি অনেক বিষয় আলোচনা করেন। আমরা আশাকরি এই আলোচনার ফল অতি শুভ ছাড়া অশুভ হবে না। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা গান্ধীজির সামনে "চণ্ডালিকার" অভিনয় করেন। সেদিন গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। গান্ধীজির সেদিন 'নির্ব্বাক' দিন ছিল। গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ আলোচনা আমরা বিশ্বকবির কাছ থেকেই শুনতে পাবো এই আশা করে রইলাম। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পরম আদরের—আমরা প্রার্থনা করি আজ বাংলার ও ভারতবর্ষের দুর্দ্দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাণী দিয়ে ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করুন।

* * * *

একজন ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মিশর দেশে ফ্যারোয়া সিসাকএর এক কবর আবিষ্কার করেছিলেন। এই ফ্যারোয়া নাকি তাঁর সত্তর বছর বয়সে জেরুসালেম অবরুদ্ধ এবং ইসরায়েল ও জুডাকে পরাজিত করেছিলেন। মিশরের করণাক প্রদেশের প্রকাণ্ড মন্দিরের দেওয়ালে এর কাহিনী লেখা আছে। এর ইতিহাস বাইবেলেও লেখা আছে। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকটি সম্প্রতি ঐ জায়গাতেই আর একটী কবর আবিষ্কার করেছেন। এই কবরটী নাকি রাজা সলোমনের শ্বশুরের। এই শ্বশুরটীও একজন ফ্যারোয়া। কবরের মধ্যে সোনা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত থেকে প্রাচীন প্যালেষ্টাইনের অনেক খবর পাওয়া যায়। সলোমনের এই শ্বশুরটীর নাম—সিউসেনেস্।

* * * *

সরীসৃপরা কি খায়? তারা পোকামাকড় খেয়ে থাকে না আরও কিছু খায়? সম্প্রতি আসামের এক চা বাগানে একটা ছোট সরীসৃপ পাওয়া যায়—একটা কুকুরের পাল্লায় পড়ে সরীসৃপটা ক্ষতবিক্ষত প্রায় অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়ে। চা বাগানের একটী লোক ঐ কুকুরের মালিকটী তাকে সম্পূর্ণ মৃত মনে করে—তার ছবি তোলবার জন্য তার লেজ ধরে এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ পরে এই অবস্থাতে সরীসৃপটার প্রাণ ফিরে আসে ও এপাস ওপাস দুলতে থাকে। তারপর হঠাৎ সে হাঁ করাতে দেখা গেল তার মুখ দিয়ে একটা মুরগীর ছানা মৃত অবস্থায় বেরিয়ে এল; সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙ্গা ডিমও বেরিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে আর একটা মুরগীর ছানা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ও আর একটা ভাঙ্গা ডিম। তারপরেই যে জিনিষ বেরিয়ে এল—সেটা আশ্চর্য্য! একটা আস্ত ডিম! এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল—এই সরীসৃপগুলো মুরগীর ডিম চুরি করে খায়।

* * * *

ইংরেজরা এতদিন যে যুদ্ধ করছে সে শুধু জার্ম্মানীর সঙ্গেই। কিন্তু ইউরোপের যে রকম ভাবগতিক ও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটছে তাতে মনে হয়, ইংরেজদের আরো অনেকের সঙ্গে লড়াইএ নামতে হবে। জার্ম্মানদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে রাশিয়াও ইংরেজদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এর আগেও রাশিয়া ও ইংলণ্ড ভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাপন্ন দেশ ছিল। সম্প্রতি রাশিয়ার নিকটবর্ত্তী উপকূলে নাকি ইংরাজদের যুদ্ধ জাহাজ দেখা দিয়েছে এবং এতে নাকি রাশিয়াতে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ করতে রাশিয়া সব দিকেই প্রস্তুত হয়ে আছে কিন্তু ইংরাজদের যুদ্ধ জাহাজ থেকে যুদ্ধের কোন রকম সাড়া না পেলে নাকি তারা উঠে পড়ে লাগবে না। ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে রাশিয়ার দুর্ব্যবহারে ইংলণ্ড রাশিয়াকে জব্দ করবার ফন্দী ভাঁজছে। কিন্তু ইংলণ্ড কি এত খোলাখুলিভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? জার্ম্মান ও রাশিয়ানদের অভূতপূর্ব্ব মিতালিতে ইউরোপে আজকাল যে কোন কিছু ঘটতে পারে। তাই ইংলণ্ড চতুর্দ্দিক বেঁধে ছেঁদে—শত্রু দেশগুলির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তার চালগুলি চালছে। ইউরোপের ছোট স্বাধীন দেশগুলিকে 'বড়ে' করে এই যে দাবার চাল চলছে—এতে অশুভ ভিন্ন শুভ হতে পারে না। ছোট রাজ্যগুলিকে আজ নির্ম্মমভাবে তাদের স্বাধীনতার বলি দিতে হচ্ছে।

ইম্পিরিয়ালএর পিরামিড চা খেতে খুব সুস্বাদু; আমরা ব্যবহার করে দেখেছি। তোমরাও ব্যবহার করে দেখতে পার।

শীতে কাশ্মীর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন · ১৩৪৬ | পঞ্চম সংখ্যা

চট জলদী কবিতা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—"উলিকম্বল ছিঁড়ে গনিচট একশীতে ভাই,
কাবুলিটা যে কিছুতে ছাড়ে নাই,
ও গোঁসাই দাস কোথা পাই ট্যাকা এককুড়ি ?"
"—ভেক নিয়ে ফেল, ধর নেংটি,
করে ফেল মস্তক মুণ্ডন, আর দে দৌড় বৃন্দাবন,
—সেখানে কৃষ্ণ ভজন আর মাধুখুরি ।
সাধু বনে যা, খঞ্জুরি বাজা চুকিয়ে বালাই !"
—"রোসো গোঁসাই, ভবিষ্যত ভেবে কাজ করা চাই ;
এ ফাটকে কাবুলি, ও ফাটকে পাহাড়া'লা,
গোবৰ্দ্ধনেরও গজগিরি দেহ—ভাবি কোন ফাঁকে যায় গলা ?
আচ্ছা, যাক গোবৰ্দ্ধন নোতনবাজারে হাতে খালুই,
তারপরে খালুই ফিরল নটবরের সাথে—গোবৰ্দ্ধন নাই :
—কি বল গোঁসাই ?"
—"এটা মন্দ পরামর্শ নয় ভাই !"
—"বাবুদের একটা কিছু তো বলে যাওয়া চাই ?

জানতো চাকরী করে খাই ?
মাইনে কাটান দেবে বৌমা অকারণে হলে কামাই !”
—“কেন নটবর বলবে দেশের লোক এসে গেছে, কালীঘাটে গেছে দাদা ভাই !”
—“গোঁসাইদাস, দে দাদা তোর পদধুলি ;
কাবুলিটা ছুটুক কালিঘাটে, আমি সেই ফাঁকে মদন মোহন তলাতে,
গা ঢাকা হয়ে দুদিন মালপো ভোগ খেয়ে বাড়াই ভুঁড়ি,
তারপরে একছুটে রাশমনির ঘাট,
সেখানে করে কিছু উদরসাৎ,
খড়দ গোঁসাই পাট, মূলাজোড়, জগদ্দল পয়দলে মেরে—
অগ্রদ্বীপের মুখে পাল দিই তুলি।
অগ্রদ্বীপের মেলায় বোষ্টমী তুলতে সাত সিকের শূণ্যঝুলি,
তারপরে যদি বেঁধে যায় বোষ্টমী বোষ্টমেতে চুলোচুলি ?
—তখন গোবর্দ্ধন কোথায় যাবেন
কাশী না বৃন্দাবন ?—না হক পটল তুলি !
বাবা অমনি ধরা নয় ভেক,
বোষ্টমীর জ্বালা যথেক,
নয় ততেক শেখ কাবুলি ;
কম্বলের ধকল মেটাতে বাবুর বিয়েটা ছাড়া
চট আর কিছু পাই না উপাই !”

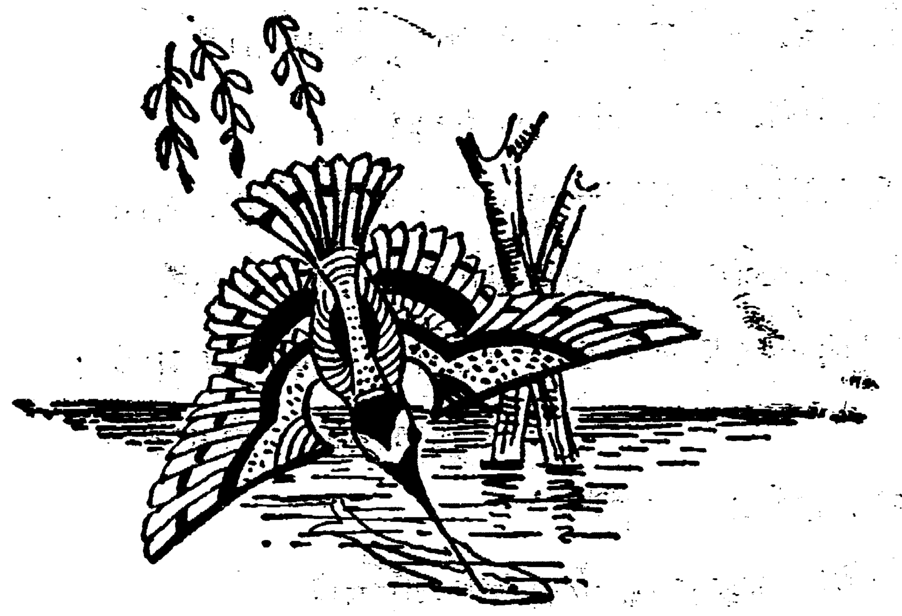

শীতে কাশ্মীর, কাশ্মীরে শীত

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

“এই শীতে কাশ্মীর ? পাগল হয়েছেন নাকি মশাই ? বরফে ঢাকা সে দেশ। কী-ই বা দেখ্‌বেন ?” যাকেই আমাদের প্ল্যানের কথা বলি এক বাক্যে সেই আপত্তি জানায়। কিন্তু কাশ্মীর ? শীতে কাশ্মীর ? বরফে ঢাকা দেশ ? যাবো কি যাবো না যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, লোকের কথায় তাও মিলিয়ে গেল। যাবোই, ঠিক করে ফেল্লুম। যা কেউ করে না, তাতেই আমাদের উৎসাহ।

পিণ্ডি (রাওলপিণ্ডির এ দেশী আদুরে ডাক নাম পিণ্ডি) থেকে আমাদের দল দু ভাগ হয়ে গেল। এক দলে লাহোর হয়ে সোজা চললো কোলকাতা, আর আমরা চল্লুম কাশ্মীর। পিণ্ডিতে এক হোটেলে চাদরের মত বড় আর পাতলা ফুল্‌কো’র সঙ্গে মাংস দিয়ে আমাদের রাত্রের পিণ্ডির চমৎকার ব্যবস্থা হল। সেখান থেকে ষ্টেশনে। লেফট লাগেজে আমাদের জিনিষপত্র জমা ছিল। বিল দেখিয়ে সেগুলো নিলুম। রাত দশটা বেজে গেছে। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আর বেশী রাত করা অভদ্রতা হবে। এদিকে লাহোরগামী গাড়ী আস্‌বে রাত্তির সাড়ে বারোটা নাগাদ। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারলুম না। অন্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলুম। তাদেরও আমাদের সঙ্গে কাশ্মীর আসার বিশেষ ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অন্য অতি প্রয়োজনীয় কাজ হাতে থাকায় তা সম্ভব হল না। আমাদের দু জনকে বারবার তারা যেতে বারণ কর্‌লে। শেষ পর্য্যন্ত গালাগালিতে এসে থাম্‌লো। বল্‌লো, “যাচ্ছিস্‌ যা, আর তো তোদের সঙ্গে দেখা হবে না। শীতে জমে যাবি। মর্‌বি।” তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ জানালুম। আশ্বাস দিলুম তুষারের দেশে হাউসবোটে বসে গরম গরম চিঠি দেবো।

স্থানীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে ফিরে এলুম। আমাদের জন্যে তিনি অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। রাত্রে চমৎকার ঘুমুবার ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। আগামী কাল সকালে আমরা শ্রীনগর যাত্রা কর্‌বো। এখনো গাড়ী ঠিক হয় নি। এখন off season ! নিয়মিত অনেক কোম্পানির গাড়ীই আজকাল যায় না। গাড়ীর জন্যে সত্যি আমরা চিন্তিত ছিলুম। ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন। বল্‌লেন সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। ভাবনার কিছু নেই।

রাওলপিণ্ডিতেই বেজায় শীত। হোল্ডঅল খুলে বিছানা বিছিয়ে নিলুম। কোল্‌কাতা থেকে বেরিয়ে কতবার যে বিছানা খুলেছি আর বেঁধেছি ! এ রকম যাযাবর জীবনের অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। কেবল ঘোরা আর ঘোরা। কেবল হৈ-চৈ, হল্লা। গত দু-তিন দিন স্নান হয় নি। নিয়মিত খাওয়া হয় নি। হিসেব করে দেখলুম পাঁচ রাতে সত্যি করে বল্‌তে আট ঘণ্টার বেশী ঘুমুই নি। অথচ আশ্চর্য্য। শরীর একটুও খারাপ হয় নি। দিব্বি আছি।

কিন্তু কাশ্মীরে যাওয়ার গাড়ী পাওয়া গেল না। বরফে পথ ঢেকে গেছে। খুব ল্যাণ্ডস্লাইড হচ্ছে। ডাক যাতায়াত বন্ধ। খবরের কাগজে বেরুলো কাশ্মীর পৃথিবী থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। সেখানকার

কোনো খবর আসছে না। পথ এত বিপদজনক হয়েছে যে সরকার থেকে সেই দুর্গম পথে যাবার অনুমতি দিচ্ছে না। মন খারাপ করে বাঁধা-বিছানার পর আমরা বসে আছি। ফিরে যেতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত এই ছিলো কপালে ?

"মিঃ চ্যাটার্জ্জী, মিঃ চ্যাটার্জ্জী…"

উঠে বস্‌লুম। তখনো বাইরে ঘন অন্ধকার। শীতে হাত পা জড়িয়ে যাচ্ছে। দেখলুম সেই ভদ্রলোক আমাদের ঠেল্‌ছেন। দেরী হয়ে গিয়েছে। গাড়ীর খোঁজে এখুনি বেরুতে হবে।

চক্ষের নিমেষে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। চক্ষের নিমেষে। কী ঘুমই ঘুমিয়েছি !

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। এমনো দুঃস্বপ্ন মানুষে দেখে !

এর পর দশ মিনিটও নয়। জামা কাপড় বদলে, মুখ-হাত ধুয়ে, বিছানা বেঁধে আমরা প্রস্তুত। ভদ্রলোক তাঁর মোটার বার করলেন। আমরা বেরুলুম।

পিণ্ডির লোকেদের ঘুম তখনো ভাঙে নি। মোটার কোম্পানির লোকেদের দরজা ঠেলে ঘুম ভাঙাতে হল। অনেক দরজা ঘুরলুম। দেখা গেল বাসে গেলে সস্তা পড়ে কিন্তু শ্রীনগর পৌছুতে দু দিন। কিন্তু ট্যাক্সি আজ সন্ধ্যেই পৌছে দেবে! খরচ কিছু বেশী। কিন্তু হাতে আমাদের সময় ভারী কম। বিশে ফেবরুয়ারী সকালে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছুতে না পারলে বাড়ীতে অভ্যর্থনা খুব মুখরোচক হবে বলে আমরা কেউই ভরসা করতে পারলুম না। আজ ১৩ই। অতএব একটা ট্যাক্সি ঠিক করা হল, যাতায়াতী গাড়ী।

এরপর তাড়াহুড়া করে পিণ্ডি সহর দেখে বাড়ী ফির্‌লুম। অতি যত্নে ভদ্রলোক আমাদের খাওয়ালেন। এতো সকালে তো আর লাঞ্চ খাওয়া যায় না। আমরা প্রচুর পরিমাণে ডিম, গাজরের হালুয়া আর চা খেয়ে নিলুম। জানি না পরে আবার কোথায় কি পাওয়া যাবে। তাই এখনি পেট ভরে খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ভদ্রলোক নিজে চা করে আমাদের ফ্লাস্ক ভরে দিলেন। বাড়ী থেকে বেরুবার আগে শুধু মা'র কাছেই এ' ধরণের যত্ন পেয়েছিলুম। এ দেশী লোকদের আতিথেয়তা জ্ঞান অদ্ভুত সুন্দর। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ। এতো অল্প সময়ে এতো নিজের হয়ে যাওয়া যে সম্ভব মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিলো।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক গল্প শুন্‌লুম। এর আগে একাধিকবার তিনি সেখানে গিয়েছেন। অনেক বছর আগে লোকে হেটে কিংবা ঘোড়ার পিঠে কাশ্মীর যেতো। তারপর টাঙা যাবার রাস্তা হয়। এখন মোটর চলে। আগে কাশ্মীর যেতে মাস খানেক সময় লাগ্‌তো। এখন একদিন! ধন্যবাদ বিজ্ঞানকে। আগে কাশ্মীরে জিনিষপত্র নাকি আশ্চর্য্য শস্তা ছিল। ভদ্রলোক বললেন তিনি প্রথম যে সময় সেখানে যান মাত্র একটা আধলায় বেশ বড় সংসারের এক সপ্তাহ খরচের উপযুক্ত প্রচুর শাকশব্জী পাওয়া যেত। এখন সেদিন আর নাই। বাইরে থেকে অনেক লোক এখন যায়। জিনিষপত্র রপ্তানির এখন কত সুবিধে। সেখানকার লোকেরা নাকি চালাক হয়ে গেছে। ভদ্রলোক দুঃখ করলেন।

কাশ্মীর এক দিক দিয়ে এতো ধনী, আবার অন্য দিক দিয়ে ভারি দরিদ্র। এখানকার প্রকৃতি অদ্ভুত সুন্দর। গাছের ডাল ফলফুলে নুয়ে পড়েছে. রূপকথার রাজ্য যেন ছিঁড়ে এনে পাহাড়ের পাচিলে ঘেরা সমতল জায়গায় কে বসিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, এখানকার লোকেদের গায়ে ছেঁড়া অপ্রচুর জামা-কাপড়, ময়লা। আর তার ভেতর থেকে তাদের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ফেটে পড়ছে।

এই সমস্ত গল্প হতে হতে আমাদের গাড়ী এসে পড়লো। ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিলুম। ধন্যবাদ জানালুম।

ট্যাক্সীতে চারজনের বসার ব্যবস্থা আছে। আরো দু'জন কাশ্মীরি ভদ্রলোক আমাদের সহযাত্রী হলেন। ভারি হাসিখুসি লোক। চমৎকার মিশুকে। এই দুশো মাইল পথ ভালোই কাটবে বলে মনে হল। রাওলপিণ্ডি ছাড়লুম। সকাল তখন সাড়ে ন'টা।

খানিকটা সমতল পথ। দু পাশে ক্ষেত। দূরে নীল পাহাড়। ওই সমস্ত পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। অনেক অনেক দূর। একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় আমরা দু বন্ধু ভেতরে ভেতরে চঞ্চল। কাশ্মীরে যাবার ইচ্ছে, শুধু "ইচ্ছে" বললে অবশ্য কিছুই বলা হয়না. অনেক দিন থেকেই ছিল। আগে আমার দু'বার কাশ্মীর যাওয়া ঠিক হয়। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার জন্যে বাঁধা বিছানা আর সাজানো সুটকেশ খুলে ফেলতে হয়েছিল। দু'বারই। যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। এবারে কোলকাতা থেকে বেরুবার সময়েই ঠিক করেছিলুম কাশ্মীর যাবোই। এবার আর ফস্কাতে দেবো না। কিছুতেই না। কিন্তু মনে মনে ভয় ছিল। অতীতের সেই সব দুর্ঘটনার স্মৃতি বারেবারে হানা দিয়েছে : যদি না হয়, এবারেও যদি না হয়! কিন্তু লক্ষ্য আমাদের বদলায় নি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কত জায়গা ঘুরলুম। গেলুম দিল্লী, গেলুম লাহোর, অমৃতসর, তক্ষশীলা, রাওলপিণ্ডি। কত নতুন মাটি দেখলুম। দেখলুম কত নদী আর পাহাড় আর অতীতের ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু অর্জ্জুনের মত লক্ষ্য আমাদের স্থির হয়েই আছে। আমরা দেখেও দেখি নি কিছু। অন্য সব কিছু আমাদের মন থেকে মিলিয়ে গেছে। শুধু পাহাড়ে ঘেরা তুষার দেশের না দেখা ছবিই আমাদের মনে বারেবারে এসেছে : সেই পৌরাণিক যুগের অর্জ্জুনের পাখীর চোখের মত। আমরা আর কিছু দেখিনি এতোদিন। শুধু না দেখা দেশের স্বপ্নই দেখেচি !

এখন থেকেই বাইরে হি-হি হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। সবাই আমরা আপাদমস্তক গরম জামা-কাপড়ে মোড়া। মাথার চুল থেকে, আঙুলের ডগা থেকে, পায়ের নোখ থেকে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে ঠাণ্ডার শনি আমাদের ভেতর আসতে পারে। সবাই আমরা ছোটোখাটো এক একটি গরম জামা-কাপড়ের পাহাড়। এর ওপর সবাইকার কোমর পর্য্যন্ত ভালো করে পুরু রাগ-এ ঢেকে নিয়েছি। নড়বার বিশেষ সুবিধে নেই। ধর এক জায়গায় গাড়ী থেকে নামতে হবে। সে দস্তুর মত কুস্তি আর কি ! আমরা এমন এঁটে গেছি, এমন ঠেসে গেছি যা ভাবা যায় না।

পাহাড়ী পথ সুরু হল। আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু। কোথাও বুকভাঙ্গা চড়াই, কোথাও শীর্ণ মরুপথ। প্রতি বাঁকেই সাবধানী চিহ্ন, বারবার চালককে মনে করিয়ে দেয় গুরুদায়িত্বের কথা। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই, পান থেকে চূণ খসলেই পাহাড় তাকে ক্ষমা করবে না। হাজার হাজার ফিট গভীর খাদ হাঁ করে আছে। সামান্যতম ভুলের জন্যে কোথায় যে তলিয়ে যাবে কেউ জানে না। এ ধরণের পাহাড়ী-পথ অবশ্য

খুব কিন্তু নতুন নয়। যারা দার্জিলিং, শিলং, মুসৌরী বা সিমলা গেছেন তাঁরাই অনেকটা এ ধরণের পথের সঙ্গে পরিচিত। তবে পাহাড়ী পথ কখনো পুরোনো হয় না। তার বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত। মনে হয় ঠিক এমনিটি কখনো চোখে পড়ে নি। পথে টোল-গেট আছে একাধিক। প্রত্যেক যাত্রীকেই মাশুল দিতে হয়। তা ছাড়া জিনিষপত্রও খানাতল্লাস করে অনেক সময়ে। অনেক জিনিষপত্রের ওপরেই মাশুল লাগে।

রাওলপিণ্ডি থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে পাহাড়ের ওপর মারি সহর। বেজায় উঁচু সে জায়গা। সহযাত্রীরা বল্‌লে সেখানে তুষার পাওয়া যাবে। তুষার? কিছু পরেই তুষার দেখতে পাবো? বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হল না।

তখনো মারি পৌঁছয় নি। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন বোঝাচ্ছেন বাঙলা'র সঙ্গে কাশ্মীরী ভাষার কি রকম নিকট সম্পর্ক, এমন সময় পথের ধারে খানিকটা ময়লা সাবানের ফেনার মত কি পড়ে রয়েছে দেখলুম। শোফারকে জিজ্ঞেস করলুম, "ওই কী হে?" নিতান্ত সহজ ঠাণ্ডা গলায় সে উত্তর দিলো, "Snow, Mr."——স্নো? এতো কাছে? আমরা দু'জনেই লাফিয়ে উঠলুম। বললুম, থামাও গাড়ী। আমরা একবার হাত দিয়ে দেখবো। সামান্য হেসে সে আমাদের অপেক্ষা করতে বলল। কিন্তু অপেক্ষা আর করতে হল না। গাড়ীটা ডান দিকের পাহাড়ে মোড় নিলো আর চক্ষের নিমেষে, যেন কোনো যাদুযষ্ঠির স্পর্শে সব কিছু সাদা হয়ে গেল। চোখ ঝলসানো, তাজা রূপোর মত তীব্র। আমরা প্রথমে নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। এ-ও কি সম্ভব? কোথায় গেল পাহাড়ের সেই রুক্ষ, গেরুয়া বেশ? কোথায় গেল সেই সব হাড়-বার-করা নির্ম্মম পাথরের স্তূপ? এখানে সব কিছু সাদা। ওপরে, নীচে, সামনে, পেছনে—যে দিকে চাই। ভরে গেছে পাহাড়ের ভাঁজ, ভরে গেছে গাছের গুঁড়ি, ডাল, পাতা, ভরে গেছে পথ, ক্ষেত, বাড়ীর চাল। এতটুকু জায়গা ফাঁকা নেই। আর কি সুন্দর নিখুঁতভাবে তারা জমে রয়েছে। বাড়ীর ছাদ থেকে তারা ঝুলছে, গাছের ডাল থেকে তারা ঝুলছে। আর এতো অদ্ভুত সুন্দর সাদা না দেখলে বোঝা যায় না। এই রঙ দেখলে মনে হয় এর চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই, কিছু হতে পারে না। উত্তেজনায় আমরা গরম হয়ে উঠেছি। এখন আর অসহ্য ঠাণ্ডা লাগছে না। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলুম। শুধু দেখতে লাগলুম। মনে হল আমাদের আসা সার্থক হয়েছে, আমাদের আশা সার্থক হয়েছে! সত্যি কথা বলতে কি জীবনে এরকম বিস্মিত খুব কমই হয়েছি।

মেঘলা দিন। এখানে মেঘলা। কোনো রকমে একটা গাড়ী যাবার মত সরু পথ করা হয়েছে তুষার সরিয়ে। পাহাড়ী কুলিরা হাতে পুরু দস্তানা পরে পথ থেকে তুষার সরাচ্ছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে তুষারের পাঁচিল। মাঝে মাঝে ধূলো কাদা লেগে সেগুলো ময়লা হয়ে গেছে। ময়লা তুষার দেখতে এতো খারাপ লাগে! তুষারে সামান্যতম ময়লাও সহ্য হয় না।

মারিতে পৌঁছুলুম। গাড়ী থামলো। কোনো রকমে নিজেদের শান্ত করে এতোক্ষণ বসেছিলুম। গাড়ী থামতেই দরজা খুলে লাফিয়ে নামতে গেলুম। কিন্তু, ও হরি! আমরা নড়তে পারছি না, আমরা উঠতে পারছি না। আমরা ঠেসে গিয়েছি, আমরা আটকে গিয়েছি। শোফার এসে বহু কষ্টে একজনকে

টেনে নামালো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তারপর ছুটলুম বরফের দিকে। দস্তানা খুলে আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিলুম তুষারের ভেতর। কি রকম যে ঠাণ্ডা তা বুঝতেই পারলুম না। ধারণা ছিলো তুষারের কাছে গেলে বুঝি হাড়গুলো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপবে। তুষার হাতে নিলে বুঝি আঙুলের ভেতর রক্ত জমে যাবে। তুষারের ওপর বস্‌লে বুঝি জামা-কাপড় ভিজে যাবে। এই সমস্ত অদ্ভুত ভুল ধারণা অনেক ছিলো। সেগুলো ভাঙলো। এতো তুষার! কি করবো আমরা এদের নিয়ে? কি করবো? মুঠো মুঠো তুলে নিলুম আমরা। মুঠো মুঠো ঝিরঝিরে তুষার। খানিক মুখে মাখলুম। খানিক খেলুম। তারপর বল পাকিয়ে পরস্পরের মুখে-পিঠে-গায়ে-জামায় ছুঁড়ে মারতে লাগলুম। তুষার আমাদের সবাইকার বয়েসের ব্যবধান কেড়ে নিলো, বয়েস যেন কমিয়ে দিলো। আমরা ছেলেমানুষ হয়ে গেলুম।

কিন্তু সময় খুব বেশী হাতে নেই। গাড়ীতে উঠে বসলুম। কাঁচ তুলে দিলুম, দস্তানা পরলুম। গাড়ী চললো। দু' পাশে অজস্র তুষার আর তুষার আর কিছু নয়। এক এক সময় বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না। মনে হয় সাদা তূলো বুঝি পড়ে রয়েছে, নিতান্ত নিরীহ তাদের চেহারা। পথের পাশে মাঝে-মাঝে বস্তার মত করে স্তূপ করা রয়েছে তুষার। মানুষের হাতের চিহ্ন তাদের ওপর স্পষ্ট। একটু ময়লা লেগেছে, সেগুলোকে কিছুতেই তুষার বলে ভাবা যায় না। মনে হয় ঠিক যেন ভেড়ার লোমের বস্তা।

বেশ ক্ষিধে পেয়ে গিয়েছে। শোফারকে জিজ্ঞেস্ করে জানলুম যে পাহাড়ী গ্রামে আমরা লাঞ্চ খাবো এখনো ঘণ্টাখানেক আছে পৌঁছুতে। গতকাল সন্ধ্যায় পথে ব্যবহারের জন্যে ছোট একটা বাস্কেট করে ফল মেওয়া কিনেছিলুম। চারজনে ভাগ করে সেগুলোর গতি করলুম।

এর পর ঝিলাম নদী দেখা গেল। দু দিকে প্রহরীর মত উঁচু, নির্ম্মম পাহাড়। মাঝখান দিয়ে সবুজ ঝিলাম বয়ে চলেছে। এখন শীতকাল। জল অনেক কমে গেছে। তা হলেও বেশ স্রোত আছে, জলও কম নয়। অনেক কাঠের টুকরো ঝিলামের স্রোতে নাচতে নাচতে চলেছে। মানুষ প্রকৃতির অন্ধ শক্তিকে চমৎকার কাজে লাগিয়েছে। শ খানেক শ দেড়েক মাইল দূরের পাহাড়ী বন থেকে গাছ কেটে সেগুলো ঝিলামের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিনা খরচায় ঠিক তারা গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছয়।

এবার অনেকটা নামতে লাগলুম। ক্রমশঃ তুষার মিলিয়ে গেল। আবার সেই রুক্ষ পাহাড়। ঘাস নেই, গাছে পাতা নেই, শুধু অদ্ভুত একটা ঔদ্ধত্য, একটা পৌরুষ। আমরা নেমে চললুম। ঝিলাম ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। মাথা নীচু করে গাড়ীর জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়োগুলো দেখতে লাগলুম। সেখানে রূপোর পাতের মত তুষার। সেখানে রোদ পড়েছে এখন। সূর্য্য তুষারের রূপোয় পালিশ লাগিয়েছে। অদ্ভুত উজ্জ্বল পাহাড়ের চূড়ো। নিরাভরণ পাহাড়ের মাথায় এ ধরণের কাজ করা রূপোর মুকুট সত্যিই আশ্চর্য্য লাগলে। একটু কেমন যেন খাপছাড়া, যেন বেমানান। যেন কোনো সন্ন্যাসীর মাথায় দামী রূপোর মুকুট পরানো হয়েছে।

আর একটা টোল-গেট পেলুম। এখানে গাড়ী থামানো হল। আমরা নেমে কাষ্টমস্ অফিসে বড়-বড় ব[illegible] ফিল্-আপ করলুম। আমাদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি সব কিছু লিখতে হল। এক জায়গায় লেখা আছে, object of visit। সেখানটায় দুজনেই আমরা লিখলুম to see snows in the moonlight। অফিসার

সেটা পড়ে তো হেসেই খুন। তাঁর সঙ্গে আমাদের বেজায় ভাব হয়ে গেল। ভদ্রলোক যখন শুনলেন বাঙলা দেশ থেকে মাত্র তিন দিনের জন্যে আমরা দুজনে এতোদূর পথ পাড়ি দিয়েছি জ্যোৎস্নায় তুষার দেখতে তখন তাঁর আন্তরিক বিস্ময় আর চাপা রইলো না। আমাদের একগোছা পপিফুল ভদ্রলোক দিলেন আর বললেন আমরা যেন অন্তত আর একবার বসন্তের সময় এখানে আসি। যে পথ এখন রুক্ষ, শুকনো, উদ্ধত, ফলে-ফুলে তা তখন অদ্ভুত সেজে ওঠে। সেটা না দেখলে কাশ্মীরের কিছুই দেখা হল না। উত্তরে আমরা বললুম নিশ্চয়ই। এই বসন্তেই এখানে আসার ইচ্ছে আমাদের আছে। ফেরার সময় আবার দেখা হবে এই আশ্বাস দিয়ে আবার আমরা গাড়ীতে উঠলুম। এখানে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পরিধি শেষ হল। কাশ্মীর গভর্ণমেন্টের টেরিটরি আরম্ভ হল।

দুপুর দেড়টা নাগাদ পাহাড়ী একটা গ্রামে এসে গাড়ী থামলো। এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন চট্ করে সেরে নিতে হবে। কাশ্মীরী ভদ্রলোকেরা আমাদের একটা সরাইখানায় নিয়ে গেলেন। কাঠের বাড়ী পুরোনো, ঝিলামের ওপর খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতা। অপরিষ্কার ও ময়লা। আমরা বসলুম। দূরে তুষারে-মোড়া পাহাড়ের ঝিকিমিকি চুড়ো দেখা যাচ্ছে। আমরা অনেক নীচে নেমে এসেছি। আবার উঠতে হবে।

অনেক রকমের মাংস আর রুটি এলো। মাছও পাওয়া গেল, বিখ্যাত ট্রাউট মাছ। দুটি ছোটো ছোটো ছেলে আমাদের খাবার এনে দিচ্ছিল। কী অপরূপ সুন্দর দেখতে তাদের। বড় বড় টলটলে নীল চোখ; তাদের চোখের হ্রদ দীর্ঘ আর ঘন কালো পল্লবে ঢাকা। গায়ের রঙ ঠিক যাকে দুধে আল্‌তায় মেশানো বলে। নিখুঁত গড়ন: চোখ-মুখ-নাক-চোখ। সেদিন বুঝেছিলুম সত্যিকারের সৌন্দর্য্য কি। ভারি হাসিখুসি আর ভারি তারা গরীব। তাদের ছেঁড়া অপ্রচুর জামা-কাপড় দিয়ে তাদের প্রচুর সৌন্দর্য্য তারা ঢেকেছে।

খাওয়া শেষ হল। কাশ্মীরী ভদ্রলোকরা কিছুতেই আমাদের খরচ দিতে দিলেন না। তাঁরাই দিলেন। বল্‌লেন, আপনারা যখন কাশ্মীর যাচ্ছেন তখন তো আমাদেরই অতিথি। এ সব দেশে অতিথিদের আশ্চর্য্য সম্মান। আমাদের এই দীর্ঘ ভ্রমণের ভেতর কত লোকেরই যে অতিথি আমরা হয়েছি! আজ হয়তো তাদের সবাইকার নামও মনে নেই।

আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।

পরীর প্রতিশোধ

শ্রীউপেন্দ্র কুমার নন্দী

রোমের জলাভূমিতে এক পাল মেষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর তারই কিছু দূরে বুড়ো মেষপালক আপন মনে বসে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। এমন মধুর তার বাঁশীর স্বর যে মুগ্ধ হয়ে বনের পশুপাখীরা শুন্‌তো। তার অপূর্ব্ব বাঁশীর মোহন সুর রোমের জলাভূমিতে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করতো। একদিন একটী সুন্দরী পরী তন্ময় হ'য়ে শুন্‌ছিলো মেষপালকের সেই অপরূপ বাঁশীর সুর।

যখন মেষপালক তার বাঁশী বাজান থামালো, মুগ্ধা পরী তাকে অনুনয়ের স্বরে বল্লে—"আমায় তুমি বিয়ে করবে কি? জলাভূমির শেষ প্রান্তে আমার প্রাসাদে তুমি বাজাবে বাঁশী আর আমি তন্ময় হয়ে শুন্‌বো।" সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজী হয়ে গেল। পরী নিজের আঙুল থেকে একটী দামী আঙটী খুলে মেষপালককে উপহার দিল। মেষ-পালক সেটী পরার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব সৌম্য শান্ত সুদর্শন যুবাপুরুষে পরিণত হয়ে গেল।

তারপর মেষপালক পরীকে বল্লে—যে তাকে তার আত্মীয়দের কাছে বিদায় নিতে যেতে হবে। পরীর দেওয়া বারো ঘোড়ায় টানা একখানা সুন্দর টম্‌টমে করে রোমে গিয়ে সে রাণীর অতিথি হোল, রাণীর সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠলো—ওদিকে পরী রোজই মেষপালকের আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকে তার প্রাসাদ চূড়ায়, কিন্তু সে যখন দু' তিন দিনের মধ্যে ফিরলো না তখন পরী ভীষণ রেগে গেল—সে তখন প্রতিশোধ নিতে চাইল। ওদিকে একদিন রাণী মেষপালককে তাকে বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ জানালো। মেষপালক তখন পরীর কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। যেমনি সে সানন্দে সম্মতি জানাতে যাবে—অমনি সে আবার আগেকার মত কদাকার, বুড়ো, নোংরা মেষপালকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। রাণী হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। তারপর ভয়ে ভয়ে বল্লে—"এই ভীষণ ধূর্ত লোকটা এখানে কি জন্যে এসেছে? ওকে মারতে মারতে তাড়িয়ে দাও।"

রাণীর কথামতই কাজ করা হোল। সেই হতভাগ্য লোভী মেষপালক আবার ফিরে এলো রোমের সেই জলাভূমিতে দু' দিনের আবু-হোসেনী করবার পর। পরীর খোঁজ সে খুবই করেছে কিন্তু তার দেখা সে আর পায়নি। বাঁশী সে এখনো বাজায় কিন্তু সে বাঁশীতে আর সে মোহন সুর বাজে না—তাতে বেজে ওঠে করুণ সুর।......*

* ইংরাজী গল্পের ছায়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর — ধারাবাহিক উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

কালীভূষণ ভেসে চলেছে।

চাঁদনীরাতে দক্ষিণের হাওয়া দিয়েছে, মহাসমুদ্র উথলে উঠেছে, ঢেউয়ের চূড়োয় চূড়োয় চাঁদনী আলোর মুকুট জ্বলছে—একখানা অফুরন্ত আশ্চর্য্য ছবি। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঐ কালীভূষণ, বোম্বেটে-বাদ্‌সা কালীভূষণ, হাত পা যার বাঁধা, আশ্চর্য্য অমরলতার পুঁথি যার শিয়রে, অসহায়ের মত ছোট একটা ডিঙির দোলায় দুলতে দুলতে লক্ষকোটি ঢেউয়ের অফুরন্ত মিছিলে যে চলেছে।

হটাৎ, কখনো তার তন্দ্রা উবে যায়, সে ভাবে—কোথায় এলাম! বোম্বেটে জাহাজ কতদূরে কোথায়! রেশমী ওড়ণার অপরূপ সেই সুন্দরী মেয়েটি কে! সে কতদূরে কোথায়!

কখনো তার মন উদাসী হয়ে ওঠে, সে একবার বাঁধা হাতপার দিকে তাকাতে যায়, তখন চোখের উপর ভেঙে পড়ে নিষ্ঠুর মহাসমুদ্রের ঢেউ; মহাসমুদ্রের কূলে কূলে কত দেশ, কত পল্লী, কত রাজধানী, সে শুনতে চায় মানুষের কণ্ঠস্বর, দূর হতে ভেসে আসা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, তখন কানের কাছে মাতাল গর্জ্জনে ফেটে পড়ে মহাসমুদ্র।

সে ভাবে এই ভেসে চলার কি শেষ নেই! এই ঢেউয়ের মিছিলে নিষ্ঠুর ঢেউয়ের হাততালি শুনতে শুনতে ভেসে চলা কি ফুরিয়ে যায় না! মহাসমুদ্রের কি শেষ নেই, আর এই ঢেউয়ের মিছিলেরও কি শেষ নেই!

এক একবার তার মনে হয় আজ পর্য্যন্ত যত মানুষ সে হত্যা করেছে, সেই প্রেতের দল যেন উঠে এসেছে। তারা যেন নিঃসাড়ে তার ডিঙির চারিধারে ভিড় করে চলেছে। সেই অসংখ্য প্রেতের ছায়ায় মহাসমুদ্রের চাঁদনী রাত আবছা হয়ে যাচ্ছে; মহাসমুদ্রের অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে যাচ্ছে। প্রেতেরা একটি কথা কয় না, শুধু তাদের তুষার শীতল নিঃশ্বাস এসে গায়ে লাগে, দেহের রক্ত কেঁপে ওঠে! বোম্বেটে কালীভূষণকে নিয়ে কোন্ মহাপ্রেতলোকে তারা চলেছে কে জানে!

বোম্বেটে কালীভূষণ তার অতীত ভুলে যেতে চায়, হঠাৎ ক্ষীণকণ্ঠে সে বলতে চায়, ঈশ্বর! বলতে গিয়ে সে চমকে ওঠে! কিন্তু আবার সে বলে ওঠে, ঈশ্বর! বারবার ঈশ্বর ঈশ্বর উচ্চারণ করে সে, আকুল হয়ে উচ্চারণ করে। সেই প্রেতেরা যেন নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে, তারপর গভীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বলে, ঈশ্বরকে ডাকো কালীভূষণ। মুক্তি হোক তোমার! মহাপ্রেতলোকের অভিশাপ হতে মুক্তি হোক!

মহাভয়ে, মহাদুঃখে কালীভূষণ চেঁচিয়ে ওঠে! কিন্তু, তার কণ্ঠস্বর মহাসমুদ্রের দিগন্তে পৌঁছয় না, ঢেউয়ের চূড়োয় চূড়োয় ফুরিয়ে যায়।

হঠাৎ চাঁদ্‌নী আলোয় কার দীর্ঘ ছায়া পড়ে! ছোট ডিঙির অসহায় বন্দী কালীভূষণ দেখে জোছ্‌না আকাশে ঝড়ের পিঙ্গল মেঘ কেশর ফুলিয়ে হেঁকে হেঁকে আসছে। মহা-ঝটিকার সেই মেঘ-সিংহের রথে কার দীর্ঘদেহের আভাষ, কার মণি-মুকুটের বিদ্যুৎ ইসারা। সেই ঝড়ের মিছিল আকাশ থেকে মহাসমুদ্রে নামতে থাকে, কালীভূষণের কাণের পাশে মহাসমুদ্র হঠাৎ যেন চুপ করে যায়! কে যেন মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জ্জন ইসারায় থামিয়ে নেমে আসেন। কালীভূষণ ভয়ে ভয়ে শিয়রে তাকাতে চায়, তার মনে হয় লক্ষযোজন ব্যাপী ছায়া ফেলে কে সেখানে দাঁড়িয়ে। কালীভূষণ বলে, 'কে তুমি!' আর একবার ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে, 'ঈশ্বর'! কালীভূষণের শিয়রে গভীর ফিসফাসের মত শোনা যায়, 'আমি এসেছি কালীভূষণ!' কালীভূষণ মনে মনে কেঁদে কেঁদে বলে, 'ঈশ্বর বাঁচাও! বাঁচাও আমায়!' সেই গভীর ফিস্‌ফাসের স্বরে উত্তর হয়, 'তুমি বাঁচতে পারো। তবে তার আগে বোম্বেটে কালীভূষণকে যে মরতে হয়।' 'আমি, আমিই বোম্বেটে কালীভূষণ! আমি মরে গেলে বাঁচবো কি করে!' গম্ভীর হেসে ফিস্‌ফাসের মত কে উত্তর দেয়, 'না! তুমি আর বোম্বেটে নও! বোম্বেটে মরবে। বাঁচবে তুমি।'

এই গভীর রহস্যের কোনো অর্থ খুজে না পেয়ে কালীভূষণ হাহাকার ক'রে উঠতে

গেল। কিন্তু হঠাৎ মহাসমুদ্র স্তব্ধ করে' দিয়ে বাজ পড়ল, চরাচর চমকে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকালো! কালীভূষণ মহাসমুদ্রের কোলে ছোট ডিঙ্গিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল!

* * * *

সেই মহাঝটিকার কাহিনী ইতিহাসে লেখা নেই। ঝড় উঠে একটা মহাতাণ্ডবের পর—গেল ফুরিয়ে। সেই সঙ্গে কালীভূষণের কাহিনী কি গেল ফুরিয়ে! হয়তো ফুরোল না, হয়তো ফুরোল, হয়তো ঢেউয়ের অতল সমাধি—পাতালে সে কাহিনীর শেষ অক্ষর লেখা হয়ে গেল। শুধু মহাসমুদ্রের উপকূলে সর্দ্দার-মাঝি রঙন সর্দ্দার একদিন অবাক হয়ে মহাসমুদ্রের বালু-তীরে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন ভোরের আলো আকাশে ঝলমল করে ফুটে উঠতে চাচ্ছে, মেঘের পর্দ্দার আড়ালে সোনালী ঝিকমিক্ ইসারা দিচ্ছে। রঙন সর্দ্দার দেখলে ভোরের হলদে আলো বালুর উপর কী একটা জিনিষের উপর জ্বলছে। রঙন আস্তে আস্তে এগিয়ে দেখল, একটা নক্সা কাটা বাক্স। বাক্স খুলতে গিয়ে রঙন ভাবলে খুলি কি না খুলি। সাহসে ভর করে ডালাটা খুলেই রঙনের বুক ভয়ে বিস্ময়ে দুলে উঠল—রঙীন হিজিবিজি আঁকা, সোনালী কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁথি। ভয়ে পুঁথিটা মাথায় ছুঁইয়ে রঙন বাক্সের ডালাটা বুজিয়ে দিলে। বাক্সটা নিয়ে এক পা দুপা এগোতে রঙন হঠাৎ থেমে গেল—সে দেখলে বালুর উপর রেখা এঁকে কী একটা কথা লেখা। বুড়ো রঙন মাঝি হাঁটু গেড়ে বসে ভোরের কাঁচা রোদে পড়লে—'কালীভূষণ মরল! কালীভূষণ বাঁচল!' বুড়োসর্দ্দারের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। মনে মনে বারবার সে আওড়াল, 'মরল, বাঁচল।' চারিদিকে একবার সে তাকিয়ে দেখল—কোথাও কেউ নেই। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল জাহাজ কিংবা নৌকাডুবি হয়ে কেউ ডাঙায় এসে পড়েছে কি না। কিন্তু জনমানুষের চিহ্ন নেই। শুধু সেই রহস্যময় লেখা ও রহস্যময় বাক্স—আর কোথাও কিছু নেই।

রঙন সর্দ্দাদের মনে রহস্যলোকের কবাট কে মেলে ধরল। রঙন সর্দ্দার মাছ ধরার জালটা একপাশে ফেলে ভাবতে বসল।

সেদিন আর তার মাছধরা হল না।

(ক্রমশঃ)

বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও প্রেমেন বাবুর কাছ থেকে আমরা তাঁর লেখা আদায় করতে পারলাম না।

গল্পের শেষ

ছেলেমেয়েদের মস্ত মজলিস বসেছে। সব রকম চেহারার সব রকম মেজাজের ছেলেমেয়েরা এসে জটলা করেছে। কে তাদের ডেকেছে কে জানে? কিন্তু দলে আছে ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে, শান্ত ছেলে, দুষ্টু মেয়ে, পড়ুয়া, খেলুয়া, ডানপিঠে বাপিঠে, গোবেচারা, গণ্ডার পাজী—সব, সব আছে। কিন্তু ব্যাপার কী?

হুঁ, ব্যাপার কিছু নয় তেমন। আপাততঃ ব্যাপারটা একটা গল্প—গল্পের শেষটা। আগের রবিবারেও তাদের—এই ছেলেমেয়েগুলোকে কে ডেকে—একটা গল্প বলেছিল। কিন্তু রাত বেড়ে যাওয়াতে গল্পের শেষটা নাকি হয়নি, আসলটাই বাকি আছে—পরের রবিবারে বুঝি শেষ হবে।

আজ সেই পরের রবিবার।

গল্পটা জমে গিয়েছিল বেশ সে রাত্রে। আজ কি না কি হয়!

ডানপিঠে হাতকাটা সাটপরা অমিত বললে: ঐ তারিণী ঘোষালের জন্যই আমি ভাবছি। আশ্চর্য্য তার সাহস, ভয় কাকে বলে সে জানে না, ও নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত বাজী জিতবে।

খেলুয়া চণ্ডীচরণ হেঁড়ে গলায় বললে: কিন্তু ঐ হাই-জাম্পএ রেকর্ড-করা নিতাই চৌধুরী—তুমি মনে করেছ ও কম যায়? আমার ধারণা তারিণী ওর কথাটা শুনলে ভাল করত। ও যা বলেছিল লাফ মেরে ঐ উত্তরপশ্চিম দিকের জানলাটা দিয়ে চেষ্টা করা উচিৎ ছিল।

দুষ্টু মেয়ে অমিতা অর্থাৎ অমু আর থাকতে না পেরে বিউনি দুলিয়ে বললে—আর তোমরা প্রতিভার কথাটা ভুলেই যাচ্ছ। সমস্ত ব্যাপারটা তার মাথা থেকেই এসেছে। আঁচলটা কোমরে বেঁধে—চুড়িগুলো হাতের ওপর উঠিয়ে সেই যে জয়ন্তকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তার কথা তোমরা ভাবছ না।

চশমা-পরা পড়ুয়া মেয়ে লাবণ্য অর্থাৎ বণ্যা আস্তে আস্তে বললে: কিন্তু ওরা কেউ কমলার কথা শুনলে না—অথচ কমলাই বই ঘেঁটে বার করেছে—এ ব্যাপারের তল্ কোনদিকে মিলতে পারে। চারটে পরিস্কার সমাধানের রাস্তা সেই তো দেখিয়েছে।

তারপর ক্রমশঃ প্রত্যেকেই একটা না একটা কিছু বলতে লাগল। কোনটাই কিন্তু কারুর মনঃপুত হয় না।

কিন্তু শেষ তো একটা আছে। রাজপুত্র ও রাজকন্যা দৈত্যকে মেরে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে তো শেষ হয়নি—কারণ ঐ দৈত্যটার একটা ভাগ্নে ছিল..... ।

যে ঘরে এরা সব বসেছিল তার ছাতের দিকে কোনে একটা রেডিওর মাইক্রোফোন রাখা ছিল। কিন্তু এ রেডিও কলকাতা বা বম্বের রেডিও নয়—কারণ দলের সবাই জানে—কলকাতার রেডিওতে এখন আল্লা বকস্ এর ধ্রুপদ গান হচ্ছে আর বম্বের রেডিওতে বাজার দর ও আবহাওয়ার হিসেব দেওয়া হচ্ছে। যাক—তার জন্য কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। গল্পটা যেটা সুরু হয়েছিল, তার শেষ চাই।

মাইক্রোফোনটাতে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ আসতে লাগল। কে যেন আস্তে আস্তে কি যেন বলছে!

সবাই কান খাড়া করল। শেষটা কি হয়, শেষটা কি হয়—

গল্পটা কিন্তু চমৎকার। এ রকম গল্প অনেকদিন শোনা হয় নি—

কিন্তু কৈ ঘড়ঘড় আওয়াজ—আস্তে আস্তে কি বলা—আর তো কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি? বোঁ কট কট করতে করতে মাইক্রোফোনটা নিস্তেজ হয়ে গেল। কেন?—

গল্পের প্লটটা অমন জমেছিল। Crisis বা পরিণতিতে গল্পটা প্রায় পৌঁচেছে—কিন্তু তারপর?

গোবেচারা গৌরগোপাল যার বৈঠকখানায় সবাই এসে জটলা করেছে, এতক্ষণ গোবেচারী হয়ে সে বসে ছিল, হঠাৎ একটা হাই তুলে বললে—ভাই, আমি ও গল্পটা ঠিক বুঝতে পারিনি। সেদিন মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। লাবণ্যের দিকে চেয়ে বললে—ভাই বণ্যা, তুই বলবি ছোট করে আমাকে ঐ গল্পটা?

খেলুয়া পড়ুয়া ডানপিঠে বাঁপিঠে সকলেই কটমট করে গৌরগোপালের দিকে চায়। এ ছেলেটা তো দেখছি আচ্ছা বোকা ছেলে!

লাবণ্য বললে: যাক্ না বাপু। আমি বেচারীকে গল্পটা বলে দিচ্ছি, মানে গল্পের আরম্ভটা যতদূর হয়েছে—

"—প্রতিভা বলে একটি দুষ্টু মেয়ে ছিল আর তার মাথায় নানা রকম মতলব খেলত। একদিন তার একটা মতলব এল আর সে তার দাদা তারিণীকে সে কথা না বলে পারল না। প্রতিভা জানত তারিণীকে বললেই কাজ হবে কারণ তারিণী ছিল পাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোক। বললে, দাদা—আমাদের রাস্তার কোণে ঐ বাড়ীটা দেখেছ—কোন ভাড়াটেরা সে বাড়ীতে সাতদিনের বেশী থাকে না। কত ভাড়াটে এল, কত ভাড়াটে গেল—কিন্তু কেউ সাতদিনের বেশী নয়। ব্যাপার কী তুমি বোধ হয় জান না? তারিণী বললে—কেন কি হয়েছে সেখানে? প্রতিভা বললে, আমার, দাদা, মনে হয় ও বাড়ীটায় কিছু ব্যাপার আছে।

"তারিণী কিছু না বলে চলে গেল নিতাই চৌধুরীর বাড়ী। এই নিতাই খুব ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল—দৌড় ঝাঁপে অনেক প্রাইজ পেয়েছে। তারিণী নিতাইর বাড়ী গিয়ে দেখে—নিতাই ও তার বোন কমলা—সে বছরে কে বেশী প্রাইজ পেয়েছে তাই নিয়ে দারুণ তর্ক করছে। কমলা ক্লাশের ফাষ্ট মেয়ে—প্রত্যেক বিষয়ে ফাষ্ট হয়ে সে বহুৎ প্রাইজ এনেছে। নিতাইর সব স্পোর্টসএর প্রাইজ—লেখাপড়ায় সে ঢুণ্ডুগণেশ। যাক্—তারিণী গিয়ে সব ব্যাপারটা তো বেশ দারুণ করে বললে—ঐ বাড়ীটার রহস্য আমাদের ভাঙ্গতে হবে—বাড়ীটাতে কোন ব্যাপার চলছে। নিতাই উৎসাহে হৈ চৈ করে উঠল—আজই—আজই রাত্রে চলো সবাই যাব। কমলা একটু হেসে বললে—তোমরা আবার কিছু করতে পারবে! তোমরা সকলে 'মুখেন মারিতং হস্তী।' নিতাই ও তারিণী একসঙ্গে বলে উঠল—বাজি—এই কথা! আজই যাবো। কমলা বললে—তাহলে আমিও যাবো। তারিণীও নিতাই সেকথা শুনে একটু মুষড়ে পড়লো।

"ওরা চলে গেলে কমলা একটা বই নিয়ে বসে পড়ল।

"ওদিকে জানলা দিয়ে ও-বাড়ীর জয়ন্তীকে ডেকে বকেশ্বরী প্রতিভা সব কথা বললে। জয়ন্তীও রাজী। কা'র না ইচ্ছে হয় রহস্যটা দেখতে—আর যখন এতগুলো ছেলেমেয়ের দল রয়েছে। ভয় নেই কিছু! খানিক বাদে কমলাও এসে জুটলো প্রতিভার কাছে।

"সন্ধ্যে প্রায় হয়ে গিয়েছে।

"আরও চার পাঁচজন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডাকা হয়েছে। নিতাই তারিণী প্রতিভা কমলা জয়ন্তী—ইত্যাদি সব জড় হয়েছে। সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। প্রতিভাই যেন সব চেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে—যেন তার মাথা থেকেই এটা বেরিয়েছে! কমলা বলছে—ছেলেগুলো কেবল এডভেঞ্চার এডভেঞ্চার করে—আর বইগুলো গোগ্রাসে গেলে। অথচ বাড়ীর কাছে—পাড়াতেই·····।

"হাতে কারুর কিছু নেই টর্চ্চ ছাড়া। বাড়ীর সামনাসামনি পৌঁছে দেখে—বাড়ী একেবারে যেন নিশুথি, সাড়াশব্দ নেই। সদর দরজায় মস্ত তালা ঝুলছে। কেবল দোতালায় দু কোণে দুটো জানলা খোলা। নিতাই ফিস্ ফিস্ করে বললে—ঐ উত্তর-পশ্চিম দিকের জানলাটা চেষ্টা করা যাক। কিন্তু তারিণী বললে—না না ওটা নয়—এদিককার জানলাটাই সুবিধে মনে হচ্ছে। কারণ·····দেখ দেখ—একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তারিণী দলের নেতা—ঐ জানলা দিয়েই—তারিণী ও নিতাই যাবে ঠিক হল। আর দুজন গলি দিয়ে গিয়ে বাড়ীর পেছনটা চেষ্টা করতে গেল। এই দুজনও—নামটা মনে নেই—বেশ এডভেঞ্চার দুরন্ত। তারিণী ও নিতাই—প্রতিভা ও জয়ন্তীর দিকে চেয়ে বললে—তোমরা বরঞ্চ ঐ অন্য দিককার জানলা দিয়ে চেষ্টা কর। 'আচ্ছা দেখা যাক' বলে প্রতিভা জয়ন্তীকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। কমলা বললে—আমার সঙ্গে কারুর যেতে হবে না—আমি নিজের বুদ্ধিতে যাবো। প্রতিভা অন্ধকার থেকে বললে—'তাই যা।'—বলে সেও অদৃশ্য হোল। কিন্তু কমলার রকম দেখে প্রতিভা একটু আশ্চর্য্য হল।

"অন্ধকারে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

"তারপর দেখা গেল—মুড়িঝুড়ি দেওয়া একটা লোক—ছেলে কি মেয়ে বোঝা গেল না। অন্ধকারের কোত্থেকে যে এল তাও দেখা গেল না! সে এদিক ওদিক চেয়ে একটা চাবি বার করলে—তারপর খুট করে আওয়াজ করে তালাটা খুলে মস্ত দরজাটা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আবার কিছুক্ষণ কাটল।

"তারপর সেই অন্ধকারেই দেখা গেল—একটা ছায়ামূর্ত্তি বাড়ীটা ছেড়ে পোঁ পোঁ করে উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে। পালিয়ে রাস্তা পার। কে বোঝা গেল না। তবে যাবার সময় তার পেছনে বিউনীটা এ পাশ-ও পাশ করে দুলছিল।

হঠাৎ বাড়ীটা থেকে একটা বিকট হাসির আওয়াজ—দুমদাম দড়াস করে শব্দ। গলিতে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। আবার একটা ভারী গলার আওয়াজ। তারপর নিস্তব্ধ আর কিছু নেই।—"

গল্পটা শুনতে শুনতে গৌরগোপালের যেন প্রায় ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। শেষের কথাটা তার কানে গিয়েছিল—অ্যাঁ, আর কিছু নেই—?"

মজলিসের সকলেই—শান্ত ছেলে, দুষ্টু মেয়ে, পড়ুয়ারা, পেটুয়ারা, ডানপিঠে বাঁপিঠেরা——এই শেষের কথাটায় সব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ গুম্। তারপর সবাই একসঙ্গে হেসে যেন ফেটে পড়ল।

কি আশ্চর্য্য গল্পটা তো শেষই হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

আবার একচোট হাসি। প্রতিভা ও জয়ন্তী তাহলে তারিণী ও নিতাইকে তো খুব জব্দ করেছিল।—আর এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের—

আবার হাসি। গৌরগোপালের হাসি নেই—তার আবার ঢুলুনি এসেছে। এমন সময় একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজলো। সবাই তখন হুড়মুড় করে মজলিশ ভেঙ্গে উঠে পড়েছে বাড়ী যাবে বলে। তখন সবার অলক্ষ্যে গৌর জানলায় উঠে মাইক্রোফোনটা নিয়ে কি যেন করলে। হঠাৎ মাইক্রোফোনটা ঘড়ঘড় কোঁ কোঁ কট্ করে ডেকে উঠল—তারপর এলো একটা গলার আওয়াজ—

Hallo Everybody !

সবাই ভয়ে যেন একেবারে চমকে দাঁড়াল। গৌর তখন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—ওরে সব, এবার পালা—পালা—মাইকে এবার বাজার দর বলতে সুরু হবে। আমি জানি আজ ন'টার সময় বাজার দর সুরু হবে, খবরের কাগজে দেখেছি।

ওরে বাবা—বাজারদর শুনে আর কাজ নেই!

আবার হাসতে হাসতে সবাই যে যার বাড়ী চলে গেল।

এবার গোবেচারী গৌরগোপাল প্রথমে দাঁড়িয়ে খুব হী হী করে হাসতে লাগল। তারপর সে গিয়ে রেডিওটা ভাল করে বেঁধে দিয়ে বসে পড়ল আর আবার খুব হাসতে লাগল। খবরের কাগজে সেদিন সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম ছিল। ন'টার সময় একটা গল্প হবার কথা। সেটা এবার আরম্ভ হল—আরম্ভ না, শেষ সুরু হল।

এবার মাইকটা বলে যেতে লাগল—আর গৌর মুচকি হেসে বসে বসে শুনতে লাগল:

"তারপর দেখা গেল এক লণ্ঠন হাতে কোরে একটা বুড়ো বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে আসছে—আর তার পেছনে গুড়িগুড়ি আসছে নিতাই, তারিণী, প্রতিভা ও জয়ন্তী ও আরো দুটো পাড়ার ছেলেমেয়ে। তারা ভয়ে একেবারে জড়সড়—মুখ সবার শুকিয়ে গিয়েছে। লণ্ঠন হাতে বুড়োটা আর কেউ নয়—সে ঐ বাড়ীওয়ালা। সন্ধ্যার একটু আগে সে একটা হ্যারিকেন জ্বেলে চলে গিয়েছিল। তারপর রাত্রে জানলাটানলা বন্ধ করে বাড়ীটা দেখে নিতে সে এসেছিল। এসে দেখে এই কাণ্ড—

"কিন্তু দলের সবাইর মুখে একটা প্রশ্ন—কমলাটা কোথায় গেল? কেবল প্রতিভা বুঝতে পারলে—সব নষ্টের গোড়া ঐ কমলা পোড়ারমুখী!

"হুমকী দিয়ে বাড়ীওয়ালা বললে—জানো, তোমাদের আমি সব পুলিশে দিতে পারি! গল্পের বই পড়ে সব এডভেঞ্চার করতে এসেছেন। যাও, যাও সব।—

"সুড়সুড় করে নিতাই তারিণী প্রতিভার দল বাড়ী চলে গেল।"

"কমলা এদিকে বাড়ী গিয়ে তার মাকে বলছিল—জানো মা, আজ দাদাকে, প্রতিভাদিকে, তারিণীদাকে জয়ন্তীটাকে—আরও ওদের কয়েকজনকে খুব জব্দ করেছি। এডভেঞ্চার এডভেঞ্চার করে কিন্তু বুদ্ধি যদি

ঘটে ওদের একটু থাকে। কাল প্রতিভাদিকে আমি একটু গেয়ে রেখেছিলাম—রাস্তার ঐ কোনের বাড়ীটায় সাতদিনের বেশী ভাড়াটে থাকে না। কিন্তু আসলে তা নয়—যারা ছিল তারা উঠে গিয়েছে—তাদের ছেলের কোথায় চাকরী হয়েছে বলে। বাড়ীটা খালি পড়ে আছে—কেবল রোজ একবার করে বাড়ীওয়ালা এসে দেখেশুনে বাড়ীটা বন্ধ করে আবার চলে যায়। ঐ বুড়োটা নিশ্চয় ওদের একচোট নিয়েছে। কমলার মা বললেন—তুই তো ভারী দুষ্টু—দিনরাত তো বই নিয়ে বসে থাকিস—তোর মাথায় কখন্ এসব আসে? কমলা হেসে বললে—ঐ ত মজা—।"

এবার মাইক্রোফোন থামল। পরে আর একটা গলা মাইক্রোফোনে আবার বলতে লাগল…'নমস্কার আমাদের 'অজানা' মহাশয়ের গল্প এইখানেই শেষ। এবার বাংলায় খবরগুলো ও বাজারদর বলা হবে।' খুট করে রেডিওটা বন্ধ করে এবার গৌরগোপাল প্রকাণ্ড একটা হাই তুললে—তারপর বাড়ীর ভেতর খেতে চলে গেল।

পরের দিন সকাল। সকালে সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হয়েছে। অমিত বলে উঠল—এই গাধা গৌরটার জন্যই আমাদের গল্পের শেষটা শোনা হল না। ওটা ভারী বোকা। গৌর বললে, বোকা আমি, না তুমি আর তোমরা সকলে—তুমি চণ্ডীচরণ অনিতা লাবণ্য সব। আমি মিছিমিছি বলেছিলাম—'ওরে পালা পালা, এবার বাজার দর বলবে' তখন তোমরা যদি একসেকেণ্ড দাঁড়াতে, তোমরা গল্পের শেষটা শুনতে পেতে। তখন অনিতা বললে—যা আমরা সকলেই বোকা—কখন্ গল্পটা সুরু—শেষ হবে তার সময় আমরা বুঝে দেখিনি এই ত! যাক্ গল্পটা সকালে উঠেই মার কাছে শুনে আমি হেসে বাঁচি না। কিন্তু যাই বলিস কমলাটা খুব ঠকিয়েছে সব কটাকে।—

গৌর কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়—বললে, আর গৌর তোমাদের সবকটাকে ঠকিয়েছে। তোরা যে সব নিতাই তারিণী প্রতিভাদের চেও বোকা হবি তা আমি কিন্তু জানতাম না। আর বোকা মানে—একেবারে বোকা। তোমরা গল্প শোনবার জন্য এতই উদ্‌গ্রীব যে, প্রথমতঃ গল্পটা কখন্ হবে তা তোমাদের খেয়াল নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রেডিওটা নতুন নভেল কিছু নয়—আমিই ওটাকে ইচ্ছে করে বিগড়ে রেখেছিলাম নইলে আল্লা বক্সের গান হোত তখন। তৃতীয়তঃ, গল্পটা কতটা পর্য্যন্ত হয়েছিল আমি বেশ জানতাম আর মজা হচ্ছে—বেশ চমৎকার এমন একটা জায়গায় গল্পটা থেমেছিল যেন সত্যিই শেষ। তাই আমি লাবণ্যকে গল্পটা বলতে বলেছিলাম। তোমরা ভাবলে ঐ খানেই শেষ! তারপরও শেষ কীর্ত্তি আমি দুষ্টুমি করে বলে উঠলাম—ন'টার সময় বাজার দর বলবে। তোমরা তাই শুনে হুড়মুড় করে উঠে গেলে। আর তোমরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের শেষটা সুরু হল!

অনিতা, অমিত, চণ্ডীচরণ ও লাবণ্য এবার একসঙ্গে বলে উঠল—বাবা তুমি গোবেচারী হাঁদা সেজে সব সময় বসে থাকো—তোমার পেটে যে এত বিদ্যা তা কোত্থেকে জানব! লাবণ্য বললে, তুমিই-তো বললে "অ্যাঁ আর কিছুই নেই?" আমরা ভাবলাম—সত্যিই তো আর কিছু নেই।

গৌরগোপাল বললে—ঐঃ ত মজা।

শ্রীধরণী সেন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর — ধারাবাহিক উপন্যাস

সুকুমার দে সরকার

কয়েক মিনিট ঘরে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। উপেনবাবুর কথা শেষ হলেও তাঁর গলার আবেগ নিস্তব্ধ ঘরটায় যেন গম গম করছিল। জানালা দিয়ে বাইরে কাঁচা সোনা রোদের আভাস, দূরান্তরের হাতছানি, মায়ামধুর।

"তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত ?" মামা যেন খানিকটা পুরাণো দিনের মায়া ঝেড়ে ফেলে ব্যবহারিক গলায় বললেন।

উপেনবাবু তাকালেন মামার দিকে, দৃষ্টি তাঁর দৃঢ়। চোখে চোখে কি কথা তাঁদের হোল জানিনা। মামা ঘাড় নাড়লেন।

"তাই হোক! নিয়তি টেনেছে আবার, আমরা খেলার পুতুল—কি করব ?"

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম "মামা, তোমরা যদি যাও ত এবার আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"তুই ?" মামা যেন চমকে উঠলেন।

"ও কে ত যেতেই হবে জয়দ্রথ !" উপেনবাবু বললেন "পদচক্র ত ওরই হাতে।"

"তাইত ভাবছি উপেন! এ পথের বিপদ ত তোমার অজানা নেই, আমরা নিজেরা জড়াতে পারি কিন্তু ও ছেলেমানুষ।"

"হুঁ!" উপেনবাবুর স্বরে চিন্তার আভাস। আমি বলে উঠলাম "মামা, আমার বয়স সতেরো হয়ে গেছে। এই বয়সে বিদেশী ছেলেরা কত বিপজ্জনক কাজের ভার নেয়! বিপদের ভয় করলে কি মানুষ, মানুষ হতে পারে ?"

উপেনবাবু হেসে উঠলেন "বেশ বলেছ বাবাজী! তা ছাড়া জয়দ্রথ ভেবে দেখ, পদমপৎ স্থরথের হাতের পদ্মচক্রের কথা জেনে গেছে। এখন থেকে তার হাতেই ওর বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী। ওকে এখানে রেখে গেলেই কি পদমপৎ ছেড়ে দেবে ভেবেছ ? আমাদের সঙ্গেই ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এবারেও আর পদমপৎ কুলী হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে না। ওর খোঁড়া পা ওকে চিহ্নিত করে দিয়েছে জন্মের মত।"

এই অকাট্য যুক্তির পর ঠিক হয়ে গেল আমার যাওয়ার একমাত্র ভয় ছিল মা যদি রাজী না হন কিন্তু মামা নিজে মাকে বলায় মা আর আপত্তি করেন নি। তিনি জানতেন আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। তাছাড়া একটা শোকের পর আমার নিঃসঙ্গতা তাকেও পীড়া দিচ্ছিল, তিনি ভেবেছিলেন বায়ু পরিবর্ত্তন আমার মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনবে। ঠিক হয়ে গেল সব, চলতে লাগল যাত্রার আয়োজন।

বৈশাখী পূর্ণিমা, শুভদিন—সেইদিনই আমাদের যাত্রারম্ভ। মধ্যের দিন কটা কি করে আমার কেটেছিল আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। যে স্বপ্ন ছিল আমার মনের মধ্যে তা আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। চতুর্দ্দশীর দিন থেকে বুকটা দুরু দুরু করছিল, অজানা মায়ায়, রহস্যে আশঙ্কায়। বাইরে দুপুরের রোদ উদাস ঝিম ঝিম। গাছের পাতা শির শির করে কাঁপছে, কোথায় একটা কোকিল ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল। আকাশের হুমকি দেওয়া মেঘ অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়ে ভেসে চলেছে অনুকূল পবনে—উত্তরে, উত্তরে আরও উত্তরে।

রং—রং, কাঁপছে, ঝিম ঝিম করছে ?

কোথায় ঘণ্টা বাজছে—ঢং ঢং—ঢং ঢং। ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে, দূরে আরও দূরে। ঝোড়ো হাওয়া ঠাণ্ডা কনকনে; আর আমার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত তুষার আর তুষার! হাঁপাচ্ছি আমি, বুক ফেটে যাচ্ছে, ঘামে জামা ভিজে উঠেছে আর সেই ঘামই মুহূর্ত্তে তুষারে পরিণত হয়ে হাত শুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলেছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড পাহাড় দাঁড়িয়েছে পথ রোধ করে। পাহাড়টা অকস্মাৎ যুগান্তরের ধ্যান ভঙ্গ করে হেসে উঠল—খল খল, খল খল। সে হাসি ক্রূর, মরণের বীজ মেশানো তাতে। আর পাহাড়টা পাহাড় নয়,—একটা প্রকাণ্ড সাপ ফণা তুলে দুলছে,—ডাইনে, বাঁয়ে, বাঁয়ে, ডাইনে! আর পারিনা, বুক ফেটে যাবে। বসে পড়লাম, তন্দ্রা আসছে, জানি এই তন্দ্রাই জীবনের শেষ,—চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, পাতায় জমেছে তুষার।

আর অকস্মাৎ সেই ঘন্টার শব্দ—ঢং ঢং! এবার অত্যন্ত কাছে। প্রাণপণে চোখ খুললাম! কি আশ্চর্য্য ছাগলের দল চলেছে গলায় ঘন্টা বাঁধা। অকস্মাৎ চমকে উঠলাম এক গুরু গম্ভীর স্বরে। দীর্ঘ দেহ এক বিশাল পুরুষ, সামনে যেন সূর্য্য উঠেছে—"কস্তং?"

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। বাইরে দরজায় শব্দ হচ্ছে না? এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম? কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

কিন্তু বাইরে দরজায় কে টোকা দিচ্ছে? দ্রুত পদে বাইরের দরজা খুলে দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে পদমপৎ। সেই ঈষৎ খঞ্জ দাঁড়াবার ভঙ্গী মুখে সেই মৃদু হাসি। আমাকে দেখে টুপিটা তুলে অভিবাদন করল সে।

"নমস্কার সুরোথ বাবু!"

আমার মুখের বিস্মিত ভাব দেখে হেসে উঠল পদমপৎ।

"কি চাই তোমার? মামাকে খবর দেব?"

পদমপৎ হেসে জবাব দিল "জোয়দ্রথ বাবু বাড়ী নেই। আমি আপনার কাছে এসেছি সুরোথবাবু!"

আমি আরও বিস্মিত হলাম। মামা বাড়ী নেই সে খবরও রাখে আর আমার সঙ্গে কি দরকার?

হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে পদমপৎ বলল "চিঠীটা দিয়েছিলেন জোয়দ্রথবাবুকে?"

ঘাড় নাড়লাম।

"আমার কথা কিছু বলেছেন তিনি?

অবস্থাটা ভেবে নিতে আমার দশ সেকেণ্ড লাগেনি, দেখা যাক ওর মতলব কি!"

বললাম "হাঁ, বলেছেন তুমি ওর বন্ধু।"

পদমপৎ হো হো করে হেসে উঠল "ঠিক বলেছেন বাবুজী, বড় আচ্ছা কথা বলেছেন।" তারপরে স্বর নামিয়ে "সুরোথ বাবু আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। জোয়দ্রথ বাবুর ড্রয়ারে একটা পুরোণ পোকা কাটা পুঁথির পাতা আছে সেটা আমাকে এনে দিতে হবে।"

লোকটার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম।

"বারে, মামার পুঁথি ....." আমি বলতে যাচ্ছিলাম, পদমপৎ বাধা দিল "সুরোথ বাবু আপনি খুব ভাল ছেলে। আমিও আপনার একটা উপকার করব। পুথির পাতাটা এনে দিলে আমি আপনাকে একটা জিনিষ দেব যাতে তিব্বতীরা আর কখনও আপনার অনিষ্ট করবে না। আপনার হুকুম মেনে চলবে।"

"কি সে জিনিস?"

পদমপৎ তার ঝোলা পকেট থেকে একটা আংটি বার করে আমার হাতে দিল। সবিস্ময়ে দেখলাম অদ্ভুৎ ঝকমকে মিশ্রিত ধাতুর একটা আংটি। আংটির মাথায় একটা সাপের ফণা, ফণার নীচে সংস্কৃতয় ছোট ছোট লেখা "ওং মণি পদ্মে হুং।"

'যান সুরথ বাবু আসুন।" পদমপতের স্বরে আদেশ, চোখ দুটো দিয়ে তার আগুন বেরোচ্ছিল।

আমাকে একটা দ্রুত চিন্তা করতে হোল। মুহূর্ত্ত পরেই আমি বললাম "দাঁড়াও আনছি।"

পদমপতের মুখে সহসা একটা হাসি ছড়িয়ে গেল।

মামার ঘরে একটু খানি আমার দেরী হয়েছিল। পুথির পাতাটা এনে পদমপতের হাতে দিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্ত্তে দেখেছিলাম সে কাঁপছে উত্তেজনায়। পুথিটার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল "এর ভেতরের অর্থ উদ্ধার করতে মঠে যেতে হবে। ধন্যবাদ সুরোথ বাবু! আপনাকে আমি ভুলব না!"

পরমুহূর্ত্তেই পথে নেমে সে হাঁটতে সুরু করে দিল এবং নেংচাতে নেংচাতে পথের বাঁকে বৃক্ষসারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তখন চিত্রার্পিতের মত দরজায় দাঁড়িয়ে।

(ক্রমশঃ)

পরিবর্ত্তন

শ্রীনিখিলেশ সেন

সালটা ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় ১৯১৬ কি '১৭ সাল। সেই সময় সোমড়া হাই স্কুলে অত্যন্ত হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। নরেন নামে এক অত্যন্ত দুষ্ট ছেলে সে স্কুলে পড়ত এবং সেই সময়ে মণিবাবু নামে এক অত্যন্ত গোঁয়ার মাষ্টার সেই স্কুলে চাকরী নিলেন। স্কুলের সমস্ত মাষ্টার ভয় করতেন নরেনকে এবং সমস্ত ছেলে ভয় করত মণিবাবুকে। এতদিন নরেনই স্কুলে আধিপত্য করে এসেছে। মণিবাবু এসে তার সে আধিপত্যে বাধা দিলেন। সুতরাং দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, এবং সে দ্বন্দ্বে নরেনকেই অবশেষে স্কুল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়ে পালাতে হল।

ব্যাপারটা এই রকম ঃ

সে সময়ে স্কুলের থার্ড ক্লাসে মণি নামে একটী ছেলেও পড়ত। একদিন মণি মাষ্টার যখন ক্লাসে এলেন, তখন নরেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো,—একটী চড়ে তোমার গাল ফাটিয়ে দেব, মণি।

কথাটা শুনে মণিবাবু অত্যন্ত চটে উঠলেন। হাঁকলেন,—You, second boy, last bench!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বেশ সহজভাবেই বললে,—আমায় বলছেন, স্যার?

হ্যাঁ, ও কথা তুমি বললে কেন?

কেন বলব না স্যার? মণি আমার বইয়ে হাত দিয়েছে—বইগুলো সাজান ছিল, ঘেঁটে দিয়েছে।

Who is Mani?—মাষ্টার হাঁকলেন।

মণি মাথা নীচু করে উঠে দাঁড়াল।

তুমি? ও: তা তুমি ওর বই ঘেঁটে দিয়েছ কেন?

ইংরেজীর 'মানে' বইটা একবার নিয়েছিলাম, স্যার—মণি বললে।

একবার নিয়েছিলাম, স্যার—ভেংচে নরেন বললে,—এ যেন ওঁর নিজের বই যে যখন ইচ্ছে তখন নেবেন। আমাকে না বলে তুমি আমার বই নাও কেন?

এ কথার ওপর আর কথা চলে না, সুতরাং মণিকে বাধ্য হয়েই বলতে হল,—অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা আমি তোমায় অনেক আগেই করেছি, না হলে বহুক্ষণ আগেই আমি তোমায় শিক্ষা দিয়ে দিতাম মণি—নরেন বললে।

এবার আর মণিবাবু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যেন ফেটে পড়লেন,—তুমি আমার কাছে এস।

নরেন ভাল মানুষের মত আস্তে আস্তে মণিবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মণিবাবু বল্লেন,—আমি ক্লাসে থাকাতে তুমি ওরকমভাবে চেঁচিয়ে কথা বল্লে কেন? তুমি আমার কাছে কমপ্লেন করতে পারতে, কিন্তু তুমি তা করনি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্লাসে ডিসটার্ব করাই তোমার মতলব।

—স্যার, এই সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে যদি টিচারের কাছে ক্লাস ফ্রেণ্ডের এগেনষ্টে কমপ্লেন করতে হয়, তাহলে ত অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এ সব ব্যাপার ত নিজেরাই মিটমাট করে নিতে হবে,—নরেন বললে।

মণিবাবু কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধ হয় বুঝলেন যে ছেলেটী বড় সোজা নয়। তারপর বল্লেন,—তুমি যখন এতটা বোঝ, তখন এটাও তোমার বোঝা উচিত ছিল যে ক্লাসে গোলমাল করাটা উচিত নয়। এর জন্যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

শাস্তি যদি আপনি দেন ত আমি মাথা পেতে নেব, স্যার। তবে বিচার করে শাস্তি দেবেন—শাস্তি যেন কম বেশী না হয়।

—যাও, দরজার বাইরে চেয়ার হওগে।

চেয়ার হবার মত কোন কাজ ত আমি করিনি, স্যার।

মণিবাবু খুব রেগে উঠেছিলেন। বললেন,—তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

নরেন আর কোন কথা না বল্লে বাইরে গিয়ে চেয়ার হল।

শিগ্‌গিরই মণিবাবুর পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল। তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন ক্লাসে এসে ঢুকল। তখন যত ছেলে ভিড় করে দাঁড়াল তার পাশে। তার মুখ চোখ তখন লাল হয়ে গেছে। সে বলতে লাগল,—আমি এর প্রতিশোধ নেব তবে ছাড়ব। আর যদি না পারি ত আমার নাম নরেন নয়।

কতকগুলো পাজী ছেলে নরেনের কথায় সায় দিয়ে বললে,—নিশ্চয়, উনি তোমাকে অপমান করবেন, আর তুমি কিনা ছেড়ে দেবে; সে কিছুতেই হয় না।

সেদিন সারা দিনটাই গোলমালে শেষ হল।

পরদিন নরেন একটু আগে থেকেই স্কুলে এল। তার পকেটে কতকগুলো আস্ত সুপুরি। সুপুবিগুলো সে চেয়ারের পায়ের তলায় রেখে দিলে, যাতে একটু চাপ পড়লেই চেয়ারটা উল্টে যেতে পারে।

ফার্ষ্ট পিরিয়ডেই মণিবাবুর ক্লাস। তিনি ক্লাসে ঢুকতেই ছেলেরা দাঁড়িয়ে উঠল। নরেনও ভাল মানুষের মত তাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তারপর মণিবাবু খাণিকক্ষণ "good conduct" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বসতে গেলেন।

যেমনি চেয়ারে বসা অমনি চেয়ার উল্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও 'পপাত ধরণীতলে।'

ক্লাসের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল।

তারপর মণিবাবু যখন উঠে চেয়ারের পায়ের কাছে কতকগুলি আস্ত সুপুরি দেখতে পেলেন, তখন ব্যাপারটা বুঝতে আর তার দেরী হল না। তিনি রাগে চীৎকার করে উঠলেন,—Who is the boy that has done the mischief?

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ—যেন ভয়ে থমথম করছে, এখুনি কি না কি ঘটে!

মণিবাবু আবার চীৎকার করে উঠলেন,—এখনও বলছি কে এ কাজ করেছ বল?

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ।

তখন তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই আবার ক্লাসে ঢুকলেন। তার হাতে একটা বেত।

বেত দেখে ভয় পেয়ে একটী ছেলে বলে ফেললে,—নরেন করেছে, স্যার! এই ছেলেটী অন্য ছেলেদের চেয়ে আগে ক্লাসে এসেছিল, এবং চেয়ারে বসতে গিয়েছিল। কিন্তু নরেন তাকে সুপুরি সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়, এবং সে যে প্রতিশোধ নেবার জন্যই ওরকম করেছে তাও বলে।

মণিবাবু যখন শুনলেন যে নরেন এ কাজ করেছে, তখন তাঁর রাগ আরও বেড়ে গেল, যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়ল। তিনি রাগে আত্মহারা হয়ে নরেনকে বেত মারলেন।

নরেন তখনকার মত কিছু করলে না। পিরিয়ড শেষ হবার পরই বাড়ী চলে গেল।

তারপর সেদিন বিকেলবেলা যখন মণিবাবু বাড়ী ফিরছিলেন, তখন একটা নির্জ্জন মোড়ের মাথায় নরেনকে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তার মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে। নরেনকে ওই রকম অবস্থায় দেখে তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তবুও মুখে ভয়ের ভাব না দেখিয়ে তিনি এগোতে লাগলেন।

নরেনের কাছে পৌঁছুতেই সে বলে উঠল,—এবার কি হয়? আর বেত মারবেন?

বেত মারার ফলটা একবার দেখুন না।—এই বলে মণিবাবুর পায়ে লাঠি দিয়ে এক ঘা মেরেই ছুট দিলে। মণিবাবুও চীৎকার করে সেখানে বসে পড়লেন। চীৎকার শুনে লোক জমে গেল। তারা তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ী পৌঁছে দিলে। ডাক্তার এসে দেখে বললে,—পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে। এখন কিছুদিন ভোগাবে।

নরেন এদিকে এক ছুটে বাড়ী পৌঁছে গেল। কিন্তু সেখানেও তার ভয় যায় না, কারণ সে বেশ জানে যে শীঘ্রই খবরটা তাদের বাড়ীতে পৌঁছবে। আর তার বাবার কানে যখন এ কথা উঠবে, তখন তার পিঠের চামড়া আর আস্ত থাকবে না।

তখন তার রাগ আর নেই। সে বুঝতে পেরেছে যে কি ভীষণ অন্যায় কাজ সে করেছে। বাবাকেও সে বিলক্ষণ ভয় করে। তাই সে তখন কি করবে তা ঠিক করতে পারলে না। অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে বাড়ী থেকে পালানই ঠিক করলে।

তারপর অনেক বৎসর কেটে গেছে। নরেনের কথা সোমড়ায় তার মা ছাড়া আর সকলেই ভুলে গেছে। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও কেউ জানত না।

১৯৩০ সাল। ১৬ই মে। সোমড়া হাইস্কুলে প্রাইজ দেবার দিন। প্রেসিডেণ্ট হয়ে প্রাইজ দিতে আসছেন মিঃ নরেন্দ্র নাথ ঘোষাল, এম্, এ, পি, আর, এস্। এ ছাড়া কতকগুলি বিদেশী ডিগ্রীও তাঁর নামের পেছনে আছে। ভদ্রলোক ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি ইউরোপের বহু দেশ ঘুরে জ্ঞান-সঞ্চয় করে কিছুদিন হল দেশে ফিরেছেন।

ক্রমে বিকাল হল। হেডমাষ্টার মশাইএর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট এলেন।

প্রাইজের কাজ আরম্ভ হল। প্রাইজ দেবার আগে অন্যান্য ছোটখাট সব কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বলতে লাগলেন—

প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের স্কুলে আজ আমাকে দিয়ে প্রাইজ দেবার জন্য আনা হয়েছে, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই জন্যে যে ছোট ছেলেদের আমি ভারি পছন্দ করি—বিশেষতঃ দুষ্টু ছেলেদের। জগতে উন্নতি করতে গেলে দুষ্টু হওয়া দরকার। আজ আমি তোমাদের কাছে আমার জীবনের কতকগুলি ঘটনা খুলে বলব। আমার নিজের বাড়ী এই সোমড়ায়ই, কিন্তু ওই দুষ্ট হওয়ার জন্যেই আমাকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। কেন পালাতে হয়েছিল সে কথা এখানকার যে কোন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।......বাড়ী থেকে যখন আমি চলে গেলাম, তখন আমার মনে একটা পরিবর্ত্তন এল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে যদি মানুষ হতে পারি তবে আমার বাড়ী ফিরব।......আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমি ট্রেণে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। তিনি যেন আমাকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে আমি বাড়ী থেকে পালাচ্ছি। সব

কথা একে একে জিজ্ঞাসা করে নিলেন। আমিও তাঁর কাছে সব খুলে বললাম। শুনে তিনি বললেন যে আমি অন্যায় করেছি। আমি স্বীকার করলাম এবং আমি অনুতপ্ত একথাও তাঁকে বললাম। শুনে তিনি খুসী হয়ে আমাকে আশ্রয় দিতে চাইলেন। সেই থেকে আমি তাঁর কাছেই থেকে গেলাম। তিনি আমাকে ছেলের মত মানুষ করতে লাগলেন। তাঁর কাছে থেকে আমি লেখাপড়া শিখতে লাগলাম। তাঁরই অর্থে আমি ইউরোপ ঘুরে এলাম......সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে আমি দুষ্ট ছিলাম বলেই জীবনে একটা বড় ভুল করেছিলাম এবং সেই ভুল করেছিলাম বলেই আমি মানুষ হতে পেরেছিলাম।......কিন্তু সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের সামনে আজ আমি করতে চাই—এই বলে প্রেসিডেন্ট গিয়ে মণিবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। তারপর তার পা জড়িয়ে বললেন,—আপনি কি আজ আমাকে ক্ষমা করবেন না, স্যার ?

এ মেয়ে কার মেয়ে ?

রঙ হোলো তার আলোর মতন
ভোরের আলোয় নেয়ে
চোখ হোলো তার রঙ্গীন আকাশ
রঙীন আশায় পেয়ে।
রামধনু রঙ হাসির খেলা
ঠোঁট দুটী তার বেয়ে !
এ মেয়ে কার মেয়ে ?

তেপান্তরের তপ্ত বালুর
অগ্নিদাহের শেষে
ব্যাকুল মনের ক্লান্ত আশা
থামলো হেথায় এসে,
সোনার বরণ রাজকুমারী
মেললো নয়ন হেসে,
রূপ কথার এ দেশে

মনের কোনের কাঁদন যত
ফুরোয় এবার সব,
নিভলো এবার দুখের রাতের
ঝড়ের কলরব ;
ছোট্ট চোখের একটু আলো
একটু হাসির রব,
জাগায় মহোৎসব !

শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত

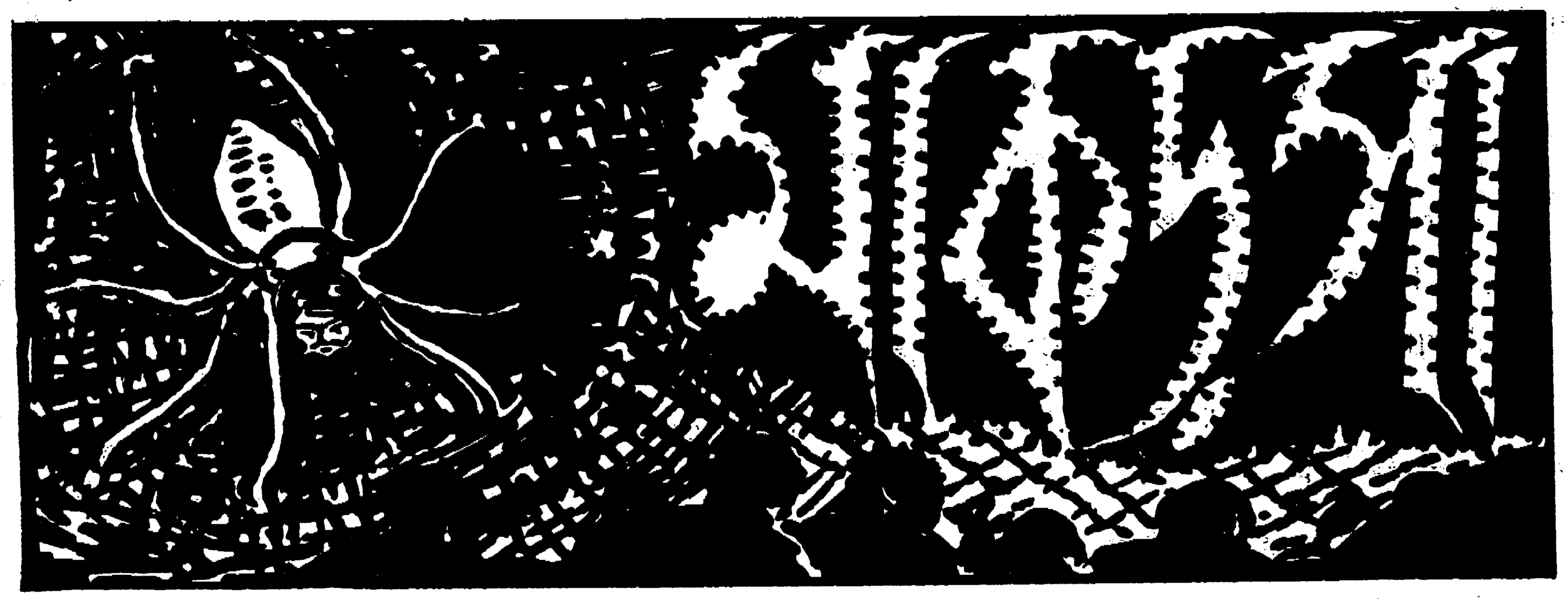

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ধারাবাহিক উপন্যাস

রজত সেন

চাবিটা যখন সে মায়ের আঁচলে বেঁধে রাখতে গেল, তখন তার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে কি সে করছে নিজে সে জানেনা। প্রায় অজ্ঞাতে চাবিটা যথাস্থানে রেখে সে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো।

পড়ার ঘরে ঢুকে সে বাতি জ্বাললে। আজ তার মাষ্টার আসবে না। দেরাজটা খুলে সে মোমের ছাঁচটা অতি সন্তর্পণে কাগজের নিচে রেখে চাবি দিয়ে দেরাজটা বন্ধ করলে। তারপর চোখের সামনে মেলে ধরলে একটা বই। উত্তেজনা তার তখনও ক্ষান্ত হয় নি। সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল অত সহজে কাজটা হোল কি করে ! আর এ সামান্য ব্যাপারটায় কিই বা এত ভয়ের আছে ? আর একটু হলে তার দাঁতে দাঁতে শব্দ আরম্ভ হত ! তাহলে গণেশবাবু বোধহয় ঠিকই বলেছেন—যতই তারা বাহাদুরি করুক, আসলে তাদের সাহস নেই, তারা ভীতু ! আর একটু হলেই ত সব ফেলে সে পালিয়ে আসছিলো, তাহলে' কাল সকালে সে তাদের মুখ দেখাতো কেমন করে ?

ধীরে ধীরে জহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো, শান্ত হল হৃদপিণ্ডের দ্রুত চলাচল। সে ভীরু নয়, কাল সে দেখিয়ে দেবে গণেশবাবুকে কত তার সাহস ! দেখিয়ে দেবে শিবু আর বঙ্কুকে ! বয়সে গণেশবাবুর চেয়ে ছোট হলেও কোন বিপদকেই সে ভয় করেনা।

বইটা বন্ধ করে দেরাজ খুলে সে ছাঁচটা আবার বার করলে। এবার আর ভয়ে নয়—বেশ নির্ভয়েই সে আলোর নীচে জিনিষটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। বাঃ বেশ চমৎকার। বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল ; শোনা যাক, পায়ের শব্দ কেন, কোন শব্দকেই সে গ্রাহ্য করে না !

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঘরের মধ্যে কেউ এলো না।

বেশীক্ষণ সে আর বই নিয়ে বসে থাকতে পারলেনা। উঠে পড়লো সে। বোধহয় গণেশবাবু ফিরেছেন এতক্ষণে, আজ রাত্রেই সে তার কীর্ত্তিটা গণেশবাবুকে দেখিয়ে দেবে, রাত্রিটার সে অপেক্ষা করতে পারছেনা।

অন্ধকার গলি দিয়ে সে গণেশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো, ঘর বন্ধ; ভেতরেও আলো জ্বলছে না।

হতাশ হল সে।

বাইরে থেকে সে বঙ্কিমকে ডাকলে। বঙ্কিম বেরিয়ে এলো।

'কি রে! কি করছিলি?'

'আঁক কষছিলাম' বঙ্কিম উত্তর দিলে।

'এখন থাক, আয় আমার সঙ্গে' জহর বললে।

বঙ্কিম একটু আশ্চর্য্য হল, রাত্রে জহর কোনোদিন তাকে ডাকতে আসেনি। 'কি রে? কি হয়েছে?' সে জিজ্ঞেস করলে।

'আয়না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে জহর।

বঙ্কিম জহরের পেছনে পেছনে এলো রাস্তায়।

'শিবুকে ডাক ত!' জহর বললে।

'কি হবে?'

'ডাক না তুই।'

'বকবেনা ওর বাবা?'

'বকবে কেন? বলবি অঙ্কের বই আনতে গেছিস।'

শিবুকে ডাকা হল।

ওর বাবা বাড়ী ছিলেন না তাই রক্ষে, যা খামখেয়ালি লোক।

'চল গলির মোড়ে।'

অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা জায়গায় এসে জহর বললে, 'এই দেখ!'

দেখলো ওরা দুজনেই; এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঝতে পারলে ব্যাপারটা কি!

'কেউ জানতে পারেনি ত?' ভয়ে ভয়ে বঙ্কিম জিজ্ঞেস করলে।

জহর তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগলো। 'হ্যা, জানতে পারবে! তোদের মত কাঁচা ছেলে পেয়েছিস নাকি?'

'ভারি! ও সবাই পারে, আমি ও-রকম একশো খানা ছাপ নিতে পারি,' শিবু বলে বসলো, 'আসল কাজের সময় বোঝা যাবে।'

'আচ্ছা দেখিস।'

রাত্রে ঘুম আসতে তার অনেক দেরী হল। ঘুম আসে আর ভেসে যায়।

রাত্রিটা যদি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষ হয়ে যেতো। তাহলে শুয়ে শুয়ে তাকে আর এ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হতনা!

এখন বোধহয় গণেশবাবু বাড়ী ফিরেছেন, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। কাল সকালে সে গণেশবাবুকে আশ্চর্য্য করে দেবে।

জহর যখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো তখন মধ্যরাত্রি!

সে স্বপ্ন দেখছিলো: প্রকাণ্ড একটা সিন্দুকের সামনে বসে সে ডালা খোলবার চেষ্টা করছে, তার সামনে বিরাট একটা চাবির তোড়া; একটার পর একটা চাবি সে ঢোকাচ্ছে কিন্তু লাগছেনা একটাও! অথচ হাতে তার সময় নেই একেবারে। চাবি সে লাগিয়েই চলেছে কিন্তু ডালা আর কিছুতেই খুলছেনা।

পেছনে যেন কাদের গলার শব্দ শোনা গেল, চাবিগুলো লুকোতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেল……।

ঘুম তার ভেঙ্গে গেল।

বেশ বেলা হয়ে গেছে; তার মাষ্টার আসেন সন্ধ্যেয়। যদিও সকাল বেলাটা তার পড়াশুনোর ওপর তার বাবাই নজর রাখেন।

মুখ হাত ধুয়ে সে ছুটলো গণেশবাবুর উদ্দেশে।

গণেশ তখন ময়লা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে, আর গুণ গুণ করে কি একটা তান ধরেছে।

জহর ঘরে ঢুকতেই গণেশ লক্ষ্য করলে তার সমস্ত চোখে মুখে প্রবল এক উত্তেজনার ছাপ। 'ব্যাপার কি হে?'

কোন উত্তর না দিয়ে গণেশের পাশে সে বসে পড়লো; পকেট থেকে ছাঁচটা বার করে বললে 'দেখুন।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গণেশ তড়াক করে উঠে বসলো, সশব্দে জহরের পিঠে চাঁটি মেরে বললে, 'সাবাস্! তুমিই ঠিক পারবে।'

তারপর জহর আস্তে আস্তে গণেশকে পূর্ব্বদিনের কাহিনী আদ্যোপান্ত বললে।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসে তার গল্প করবার সময় নেই, সে উঠে পড়লো, বেশীক্ষণ পড়ার টেবল্ থেকে অনুপস্থিত থাকলে তার বাবা আবার সন্দেহ করবেন। সে উঠে পড়লো, 'এখন আমি যাচ্ছি। বিকেলে—'

গণেশ বাধা দিয়ে বললে, 'কিস্ছু বলতে হবেনা, বিকেলে আমি তোমায় চাবি এনে দিচ্ছি!'

জহর চলে গেল।

চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বাড়ী পর্য্যন্ত তাকে যেতে হলনা, রাস্তার ও-ফুটে দাঁড়িয়ে গণেশ সিগারেট টানছিলো।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তারা একত্র হল।

'এই নাও চাবি!' গণেশ পকেট থেকে একখান চাবি বার করে জহরের প্রসারিত হাতের ওপর রাখলে।

(ক্রমশঃ)

চাণক্য

শ্রীরেণু গুপ্তা

তখনো অস্তে যায়নি তপন নামেনি তখনো আঁধার কালো
অস্তাচলের পথে যেতে রবি পশ্চিমাকাশ করেছে আলো,
আসছে সন্ধ্যা দিবা অবসান
চলেছে যাত্রী শ্রান্ত পরাণ
সারা দিবসের হিসাব এবার ম্লান গোধূলিতে সাঙ্গ হ'লো।

কেহ বা চলেছে ত্রস্তচরণে কেহবা চলেছে আপন মনে
কে পথিক তুমি একেলা হেথায় কুশ অঙ্কুর তুলিছ টেনে ?
একিগো খেয়াল কভু নাহি শুনি
কুশহীন তুমি করিবে ধরণী
পাগল বিনা কি একথা কখনো বলিয়াছে কোন জনে?

ক্লান্তচরণে কে আসি দাঁড়াল সুদূরের পথ বাহি
ক্ষণেকের তরে থামিল চমকি সমুখে দেখিল চাহি,
দেখিল চাহিয়া পাগল খেয়াল
হেরিল তাহার ভ্রুকুটি ভয়াল
কহে, "ব্রাহ্মণ প্রণাম তোমায় পদধূলি তব চাহি।"

"জয়স্তু বলি হাত তুলি দ্বিজ করিলা আশীর্ব্বাদ
কহিল যুবক "প্রভুর আশীষে যাবে দূরে পরমাদ,
কিন্তু হে প্রভু নিবেদি চরণে
এ খেয়াল তব কিসের কারণে
দয়া করি যদি কহ বিবরণ, ক্ষম মোর অপরাধ।"

কহে ব্রাহ্মণ "পিতৃশ্রাদ্ধে এই কুশকাঁটা চরণে বেজে
করিয়াছে হায় ব্যর্থ আমার সব আয়োজন নিমেষ মাঝে,
তাই সে ভীষণ শপথ আমার
মুক্ত করিব ধরণীর ভার
তুলি অনাচারী কুশের বংশ অবহেলা যেবা করিল দ্বিজে।

চিন্তার মেঘ নিমেষে সরিয়া ফুটিল যুবার আননে হাসি
কহিল, "শপথ রাখিবে এ দাস কর দূর তব চিন্তারাশি,
হে প্রভু তোমার আজ্ঞা পালন
পূর্ণ করিবে এ মোর জীবন,
করিল প্রণাম, আননে তাহার অতি অদ্ভুদ্ কুটিল হাসি।

এই সে যুবক চন্দ্রগুপ্ত লাঞ্ছিত রাজ সভার পরে
ফেলিয়া এসেছে আপনার সব জ্বালাভরা হৃদে শপথ করে
করিয়াছে পণ নিজ বাহুবলে
মুছাবে মায়ের নয়নের জলে
রাজ্যেশ্বর হয়ে পুনরায় এই সে মগধে আসিব ফিরে।

তুষ্ট বিপ্র যুবার বচনে পুনঃ সে আশীষ জানাল তারে
কহিল যুবক, "নৃপের আদেশে আনিয়াছি প্রভু তোমার দ্বারে,
চরণ পদ্মে এই নিবেদন
রাজসম্মান করহ গ্রহণ
পিতৃশ্রাদ্ধে তোমা বিনা আর ঋত্বিক পদে বরিব কারে।

মগধ বাসীরা হে প্রভু তোমার স্নেহ পরসাদ চায়
হে দেবতা তুমি আকুল এ আশা ব্যর্থ কোরোনা হায়,
ব্রাহ্মণকুলে শ্রেষ্ঠ রতন
বৈদিক ঋষি তোমার মতন
চাহে সম্রাট দানিতে অর্ঘ্য বাঞ্ছিত ওই পায়।

ওদিকে নৃপের পিতৃশ্রাদ্ধে মহা উৎসব রাজ্যমাঝে
মন্ত্রী হইতে দ্বারে দ্বারীপাল সকলে ব্যস্ত আপন কাজে।
মুক্ত আজিকে রাজভাণ্ডার
প্রার্থী বিমুখ নহে আজি আর
এ হেন সময়ে জীর্ণ বসনে কে আসি দাঁড়াল সভার মাঝে !

কহে, "সম্রাটে সংবাদ দেহ প্রধান বিপ্র এসেছে দ্বারে
আমি সেই দ্বিজ পিতৃশ্রাদ্ধে ঋত্বিক পদ দিয়াছি যারে,
হাসিয়া উঠিল সভাস্থ সবে
পাগল বিনা কি ইহা সম্ভবে
ভিখারীর হেন স্পর্দ্ধা হেরিয়া সবে উপহাস করিল তারে।

রাজার আদেশে প্রহরী আসিয়া স্পর্শ করিল বিপ্র শিখা
কেশ শিখা নহে, স্পর্শ করিল মহাধ্বংশের অগ্নিশিখা
ছিন্ন করিয়া উপবীত তার
কহিল বিপ্র শপথ আমার
চাণক্য করে সৃষ্ট হইবে মগধের নব ভাগ্যলিখা

চন্দ্রগুপ্তবীর্য্যের সনে কূট চাণক্য মিলিল আসি
মহাবিপ্লবে মগধরাজ্যে জ্বলিল বিপুল অগ্নিরাশি
প্রতিহিংসার সেই হোমানলে
পতঙ্গ সম পুড়িল সকলে
বিজয়লক্ষ্মী চন্দ্রগুপ্তে বরণমাল্য পরাল হাসি।

রংমশালের নিয়মাবলী

১। "রংমশাল" মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে। মাসের ১৫ তারিখের পর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ২০ তারিখের পর, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পত্র লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠানো হয় না।

২। রংমশালের বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সহ) ২॥৵০, ছয় মাসের মূল্য ১॥০ এবং প্রতি সংখ্যা ।০। যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন সংখ্যার মূল্য—প্রতি সংখ্যা ।৵০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৩। রংমশালের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া কাগজের একদিকে লিখিবেন ও কপি রাখিবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

৪। যাঁহারা গ্রাহক বা গ্রাহিকা তাঁহারা তাঁহাদের চিঠিপত্রের সহিত অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নং লিখিবেন।

কার্য্যালয়—
১০ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন, সাউথ ৪৭৯

করবে কাদের জয়গান

শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সেন, বি-এস্ সি

কাদের ভয়ে পৃথ্বী টলমল,
জগৎ জুড়ে কিসের অভিযান!
শুধাই তোমায় ওগো শিশুর দল,
করবে আজি কাদের জয়গান?

যাদের ছোট ইঙ্গিতে বা কথায়
হাজার কামান সজীব হয়ে উঠে,
পল্লী নগর গুমরে উঠে ব্যথায়,
আকাশখানি আর্ত্তনাদে টুটে;

গ্রামের বুকে আগুন বুঝি লাগে।
নগর খানির সকল স্মৃতিটুক,
ইতিহাসের স্বপ্ন যেথায় জাগে,
জ্বালিয়ে দিতে যাদের মহা সুখ;

তাদের পূজা চলবে জগৎ জুড়ে,
শান্তি যাদের ভয়েই ম্রিয়মাণ!
বিশ্ববাসীর ঐক্যতানিক সুরে
উঠবে বেজে তাদের জয়গান?

এদের ছেড়ে ঐ যে লক্ষ জনা,
ছড়িয়ে আছে নিত্য হাটে মাঠে,
যাদের কোন হয়না আলোচনা,
জীবন যাদের অলক্ষ্যেতে কাটে;

বদ্ধ যাদের এই ধরণীর আলো,
বর্ষা রোদ যাদের সহচর,
কলের ধোয়ায় বসন যাদের কালো,
মুহূর্ত্তেকের নাইকো অবসর;

সভ্যতার ও টানছে যারা রথ,
বইয়ে আনে কৃষ্টি আলোর বান,
বিজ্ঞানেতে দেখায় যারা পথ
করবে নাকি তাদের জয়গান?

চলবে আজও অসির মাতামাতি,
মুষ্টিমেয়র সবার পরে স্থান!
কবে সেথায় উচ্চ আসন পাতি
লক্ষ লোকের করবে জয়গান।

দূরের আলো

জাপানী সৈনিকের এক পাতা

শ্রীসুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী

একজন জাপানী সৈনিক চীনে এসেছে। 'তেন্নোহেইকা'র (সম্রাটের) আদেশে। তাঁর অভিজ্ঞতা তোমাদের শোনাবার জন্যে তাঁকে ডেকে এনেছি রংমশাল আসরে। শুনে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেও যেন এঁর মহান জয়যাত্রায় বাধা দিও না। তোমাদের মিষ্টি-কচি মুখের পরে যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি ইনি ফুটিয়ে তুলতে চান না। তাঁর জীবনের অন্য দিকটা শোনাবার জন্যেই আজ এসেছেন :—

নিপ্পং আমার কৈশোরের ও যৌবনের আভাসভূমি, আমার পিতৃপুরুষের পদরেণুতে পূর্ণ দেশ। তাকে ছেড়ে এসেছি। তার কথা মনে হলে বুকখানা আমার গর্ব্বে ফুলে ওঠে। আমিও যুদ্ধ করতে এসেছি কিন্তু আমার বিগত দিনের সহযোগীদের কষ্ট ও সহিষ্ণুতার স্মৃতি ভুলতে পারছি না। তাদের বীরত্বের কাহিনী আমাকে অনুপ্রেরণা এনে দিচ্ছে। তারা অমর।...

হ্যাংচাউ থেকে সাংহাই, সাংহাই থেকে সুচাউ, যেখানেই গেছি দেখতে পেয়েছি : শত শত জীবন-প্রদীপ চোখের সম্মুখে নিভে যাচ্ছে। হাজার রূপে তাদের দেহ ছিন্ন হয়েছে। তাদের কাতর আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। আর ভেবেছি : এরকম জীবন-উৎসর্গের উৎসবে আমায় যে কোন মুহূর্ত্তে যোগ দিতে হবে। হয়ত বান্‌জাই* বলে চেঁচিয়ে ওঠবার সময় পাব না।

কি আশ্চর্য্য, আমিও বেঁচে থাকতে চাই--জীবনকে উপভোগ করতে চাই—আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গ পাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই। এটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা নয়—. কি বল তোমরা? শত্রুর দিকে জলস্রোতের মত এগিয়ে যাবার সময় তাদের মুখ ভেসে ওঠে জলছবির মত চোখের সামনে।

* Long live the Emperor.

আজ তিনটের সময় মোটরে হোয়াংসান তৌউ ত্যাগ করব। যাতায়াতের ভাল রাস্তা না থাকায় মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সৌভাগ্যের বিষয় এ কদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ধুলো ছাড়া আর কোনও অসুবিধেয় পড়তে হবে না। যেতে যেতে নিশি বলতে লাগল : আজকাল বুলেটে আর আমার ভয় নেই। তোমায় কি বলব ভাই প্রথম প্রথম ওপর দিকে শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলেই মাথা আপনিই কাঁধের 'পরে নুয়ে আসত। আমরা এখন মরিয়া। মোটরটা আমরা উইলো গাছের ডালপাতা দিয়ে (Camouflaged) সবুজ করে ঢেকে দিয়েছিলাম। পাছে শত্রু না দেখতে পায় এই ভয়ে। পথ বড় বন্ধুর। চারিদিকেই মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হচ্ছে। মাটীর রং লাল। দূরে দূরে চাষাদের বাড়ী। বাড়ীর বুনিয়াদ সব পাথরের। জায়গাটা পর্ব্বত বহুল। মাটী শক্ত হলেও আলু, রসুন আর বার্লি এন্তার জন্মেছে। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের ৬টা 'সূর্য্য মার্কা' সামরিক বিমান খুব নীচ দিয়ে উড়ে যাবার সময় হঠাৎ কতকগুলি ধুঁয়োর চক্চকে কি ছেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে ওগুলি প্যারাস্যুট। মাটীতে এসে নামতে দেখতে পেলাম যে আমাদের ব্যবহারের জন্যে বাক্স-ভরে বারুদ আর মেশিন গানের গুলি দিয়ে গেল। প্যারাস্যুট দেখেই উমেমোতো উল্লাসিত হয়ে পড়ল। ও জানত যে প্যারাস্যুট সিল্কের তৈরী। আর তখনই তার হিসাব হয়ে গেল ক'জোড়া নাইট-স্যুট আর রুমাল হবে ঐ দিয়ে। কিন্তু হায়, কাছে গিয়ে বুঝতে পারল সিল্কের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম কাপড়ের তৈরী। মানুষের আশা সব সময়ে পূরণ হয় না। সঙ্গের খাবার সব ফুরিয়ে গেছে। কাজেই সীম আর পচা আলু খেয়ে থাকতে হচ্ছে। যেখানেই গেছি চীনারা আমাদের সাথে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে! মালপত্তর টানা—আহত জাপানী সৈন্যের শুশ্রূষা করা ইত্যাদি তারা যত্ন নিয়ে করে দিয়েছে।

সন্ধ্যের সময় আমরা পেংপু সহরে এসে পড়লাম। শরীর ক্লান্ত তার চেয়ে মন আরো অবসন্ন। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে! সহর ফাঁকা। পথচারীর উপদ্রব নেই। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ওপরে জাপানী পতাকা পৎ পৎ করে উড়ছে। সহর বর্ত্তমানে আমাদের অধিকারে। চীনাদের পরিত্যক্ত একটী বাড়ীতে আমাদের ক্যাম্প ঠিক হ'ল। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম কয়েক বাণ্ডিল কাগজপত্তর ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে। কৌতূহলবশতঃ একটী কাগজ তুলে নিয়ে পড়লাম : record of the 17th Brigade of the 6th Division. একটী চিঠি আমার দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করেছিল। চেংচুপু নামে একজন সৈনিক সেনাপতি দেশে তার ছেলেকে লিখেছে ভাল করে পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে এবং এই রকম আরো উপদেশ দিয়ে। সে চিঠি তার ছেলে আজও পায়নি...বেচারা।

মাঝ রাত্তিরে কয়েকটী চীনেকে আমাদের কাছে বন্দী করে আনা হয়েছে। তাদের অপরাধ: সন্দেহজনকভাবে ঘোরা ফেরা করতে দেখা গিয়েছিল রেল লাইনের ধারে। বয়েস তাদের কুড়ি বছরের বেশী নয়। একজনের বোধ হয় চল্লিশের ওপরে। মনে হ'ল ওদের নেতা। মেজর তাকাহাসি গুলি করে মারবার হুকুম দিলেন তাদের। চোখ আমার আপনি বুজে এল আর মনে মনে বললাম: আমি বোধ হয় এখন পাগল হয়ে যাইনি। ভগবান............

পুরণো খাতা

শিশুদের জন্য নানারকম চমৎকার লেখা এখানে তুলে দেওয়া হবে। গল্প, কবিতা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, দেশভ্রমণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই এখানে চমৎকার সঙ্কলনের ব্যবস্থা হল।

ছড়া

ন্যাংলা ব্যাংএর ছানা

দ্রুম্ তারে তুম্ তানা নানানা
ন্যাংলা ব্যাংএর ক্যাংলা ছানা
ঢ্যাপ্‌সা পেট ট্যাপ্ চেপ্‌টে জনেক তিনে
"ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় যাবি
গঙ্গাফড়িং কাম্‌ড়ে খাবি"
গান্ গেয়ে তান্ ছাড়্‌তে বাদল্ দিনে।

ভয়টি পেলেই পুকুর ধার
একটি লাফেই পগার পার।
আড় চোখে চায় ডিগ্‌বাজী খায় উল্টো করে' ঠ্যাং
(আর) গায়্ কট্ কট্ গ্যাংরা গ্যাঙোর ক্যাংলা
কোলাব্যাং॥

শ্রীজীবনময় রায়।

ভ্রমণ কাহিনী

সোন নদ

আমরা থাকি এই কলকাতা সহরেই, তবে বড়-বাজার কি হ্যারিসন রোডের হট্টগোলের মধ্যে নয়। সহরের দক্ষিণ কোণ-ঘেঁষা আধ পাড়াগাঁ একটি জায়গায়। সেটা প্রায় ঘুম-বুড়ির দেশ, বেশ সবাই দিব্যি চুপ চাপ আরাম করে আলস্য চর্চ্চা করে, সেখানে নড়াচড়া চলা-ফেরা কম। পথ বেশী দূর এগিয়ে মাঠের বুকে মেঘের কোলে হারিয়ে যায় না। তাই মনের চোখে যখন, গণ্ডী হারান অপার সবুজ মাঠ, দিগন্তে এলিয়ে-পড়া নীল আকাশ, আর তারি গা ঘেঁষে পাহাড়ের ঢেউ, কাজলের প্রলেপ দিয়ে আঁকা বনের ছবি, কিনারায় সোণার আলো, তুলিতে করে দেওয়া সোণার জলের টানের মত ঝিক্ মিক্ করছে, এরি উপর দিয়ে, দুধের মত সাদা ধপধপে বকের সার, আর কচি দুর্ব্বাঘাসের মত কাঁচা সবুজ রংএর টিয়ে পাখীর ঝাঁক উড়ে চলেছে, কোথাও বা পেখমতুলে ময়ুর নাচছে, পাটকিলে রংএর উপর জ্যোৎস্নার আলোর গুল্‌বসান হরিণের পাল ছুটে চলেছে, এই সব ছবি একে একে দেখা দিতে লাগল, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রইল না। দেখতে পাব ভারত-বর্ষের কত পবিত্র মন্দির, কত বীরের প্রাণের রক্ত দিয়ে উজ্জ্বল-করা দুর্গ; কত ঋষি মুনির ধ্যান-ধরা গুহা গহ্বর, কত নদী পাহাড়, বন তপোবন, তাদের স্নানে পরিশুদ্ধ কত তীর্থ ঘাট! এতদিন পুরাণে ইতিহাসে, কাব্যে উপন্যাসে যে সব জায়গার কথা পড়েছি, আর ঘরের কোণে বসে বসে কল্পনায় দেখেছি, তাই দুটি চোখ ভরে দেখব ভেবে আমার চোখের ঘুম ছুটে গেল।

তখনও রেলগাড়ীতে পূজার প্রবাস-যাত্রীর ভিড় হয়নি। আমরা রাতের বেলায় বম্বে মেলে যাত্রা করলাম। এই রেলগাড়ীর কি বিপুল বেগ, সমুদ্র-তীরের বন্দরটি কিনা এর শেষ থামবার জায়গা; বারবার আনাগোনা করে সমুদ্রতরঙ্গের রীতিনীতি দেখে ঠিক্ তেম্নিটি করা অভ্যাস হয়েছে, তাই যখন আমাদের স্থির পৃথিবীর মাটীর উপর পাতা, লোহার বড় বড় ভারী লাইনে টেনে নিয়ে ছুট দিলে, তখন ঢেউএর উপর ছোট্ট নৌকাগুলিকে সমুদ্র যেমন আছড়ান তেম্নি করে আপ্‌সাতে আপ্‌সাতে নিয়ে যেতে ভুল হল না। চামড়া আঁটা বেঞ্চির গদির উপর শুয়ে শুয়ে আমাদের মনে হতে লাগল আমরা জলে পড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছি;—তেম্নি গর্জ্জন আর কল্লোল আমাদের কর্ণকুহকের তোলপাড় করে তুলতে লাগল। আমরা রেলের যে লাইনে যাচ্ছিলাম তার নাম গ্রাণ্ড কর্ডলাইন (Grand Chord Line), এটা নতুন খোলা হয়েছে। গয়ার পাশ দিয়ে যেতে হয় ভোরের বেলাকার সবে-ফুটে-ওঠা আলোতে চারি-দিকের ক্ষেতে আফিমের টকটকে রাঙা আর মোমের মত নরম সাদা ফুল হাজারে হাজারে দুল্‌তে দেখে বড় চমৎকার লেগেছিল। আমরা ক্রমে শোণ ব্রিজের উপর এসে পড়লাম। আমাদের সঙ্গী একজন বল্লেন, —"এই ব্রিজের চেয়ে লম্বা ব্রিজ পৃথিবীতে আর একটি মাত্র আছে। ব্রিজের ক্লাসে সেই ফার্ষ্ট, এ সেকেণ্ড। এমন আশ্চর্য্য কারিগরি আর বড় দেখা যায় না।" আমি জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখ্‌লাম শোণের রাঙা জল সবুজ পানা-পড়া হয়ে

গেছে। মাঝে মাঝে বালিয়াড়িতে স্রোত একেবারেই আটকা পড়ে গেছে, জলের ঢেউএর সে নাচানাচি, লাফালাফি, কাণ কথা আর হাসাহাসি নেই;—তারা যেন ম্যালেরিয়ার আধমরা ছেলের দল ফূর্ত্তিহীন, বিবর্ণ, নিতান্তই কোন রকমে আপনাদের টেনে নিয়ে চলেছে। যে জলস্রোত প্রাণের আনন্দে ভরা ছিল, কত গানই গাইত, কতই না দৌড়ত, তাদের এম্নি করে মস্ত মস্ত লোহার শূল দিয়ে বিঁধে শিকল দিয়ে বেঁধে মরমর করে তোলার বাহাদুরিটা আমার ভাল লাগল না। শোণ নদের সঙ্গে অতীত ভারতের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে; শুনেছি দেবী সরস্বতী স্বর্গ হতে শাপভ্রষ্ট হয়ে এরি তীরে কিছুকাল বাস করেছিলেন। কবি বাণভট্ট এইখানে বসে বসে কাদম্বরী রচনা করেছিলেন, মহাশ্বেতার কল্পনা এই খানেই তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল, শ্রীহট্টের দিগ্বিজয়ী সেনা এইখানে এসে বিশ্রাম করে ছিল। এত যার পদমান, সেই শোণের এমন দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ হল।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

উদ্ভিদ তত্ত্ব

গাছের বন্ধু ও শত্রু

গাছের শত্রু ঢের আছে। অধিকাংশ জন্তু জানোয়ারে গাছ খায়, কাজেই গাছদেরও আবার তাদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার উপায় বের কর্ত্তে হয়েছে। তারা ত শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারে না, কাজেই তারা অনেক সময় নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে গায়ে বর্ম্মা এঁটে বসে থাকে। গাছে যে কাঁটা হয় এইজন্যেই, অনেক ছোট গাছে দেখবে আগা-গোড়া কাঁটাতে ভরা কিন্তু যে সব কাঁটা গাছ বড় হয় তারা যতদিন চারা থাকে ততদিন খুব কাঁটা কিন্তু বড় হয়ে গেলে উপরের ডালে আর কাঁটা থাকে না, নিচের ডালগুলোতে থেকে যায়। যেমন বেলগাছ। তোমরা ভাল করে যদি দেখ ত দেখতে পাবে ছাগল গরুতে যতটা মুখ যায় কেবল ততটা উঁচু পর্য্যন্তই তার খুব কাঁটা, তার উপরে কিন্তু আর কাঁটা নেই। কাঁটা ছাড়াও কোন কোন গাছ আরো সহজে নিজেদের বাঁচায়, অন্য উপায়ে। নিম গাছের পাতা এত তিত যে কোন জন্তু খায় না। পাতায় গন্ধর জন্যও অনেক গাছ গরু বাছুরের হাত থেকে রক্ষা পায়; লেবুগাছের পাতার এম্নি গন্ধ, আমাদের সেটা ভাল লাগে, কিন্তু গরু বাছুররা তা একেবারেই পছন্দ করে না, তারা কখনও লেবুগাছের পাতা খাবে না।

গাছের যেমন শত্রু আছে, বন্ধু কি কেউ নেই? তাদের কাছে শত্রুরা ঘেঁসতে না পায় তার যেমন ব্যবস্থা আছে, বন্ধুদের ডেকে অভ্যর্থনা করবার কি আয়োজন নেই? আছে বই কি। গাছের প্রধান বন্ধু হল মৌমাছিরা। এরা যেন ওদের বিয়ে দেবার পুরোহিত! মৌমাছিরা তাদের এই পুরোহিতের

কাজ না করলে অধিকাংশ গাছের বীজ হতে পারত না। আগেই অনেকবার বলেছি গাছেরা স্থানু, তারা নড়তে পারে না, কাজেই তারা বিয়ের জন্য কনে খুঁজতে পারে না। দূর থেকেই তাদের বিয়ে হয় আর সেই বিয়ে করিয়ে দেয় এই মৌমাছিরা। তারা একটা পুরুষ-ফুলের রেণু নিয়ে অন্য একটা মেয়ে-ফুলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে আসে। এই রকম করে একটা ফুলের রেণু আর একটা ফুলের সঙ্গে না মিশলে বীজ হয় না, তাই গাছেরা তাদের যে সব বন্ধু পোকা আছে, যাতে তারা আসে তার জন্য কত রকম আয়োজন করে, দেখলে আশ্চর্য্য মনে হয়। ফুলের কত রকম যে রং, কত সব মিষ্টি গন্ধ, সে আমাদের জন্য নয়—আমাদের কথা ভাববার তাদের সময় নেই—সে-সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন তাদের বন্ধুদের ডাক দেবার জন্যে। তারা কেবল বলছে "তোমরা আমার কাছে এস; দেখ, আমি কত সুন্দর! আমাকে না দেখতে পাও আমার মিষ্টি-গন্ধ অনেক দূর থেকে পেয়ে আমাকে চিনতে পারবে, আমি তোমাদের জন্যে তোমরা যে এত ভালবাস সেই মধু তৈরী করে রেখেছি তোমরা খেয়ে যাও আর ঐ সঙ্গে আমার একটুখানি উপকার করে দাও।" মৌমাছিরা এই ডাক পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের উপর গিয়া পড়ে। একবার এটা, একবার ওটা কত ফুলের থেকে মধু খেয়ে বেড়ায়, ও সেই সঙ্গে তাদের রেণু নিয়ে পরস্পরের গায়ে মাখিয়ে দেয়। যাতে মৌমাছিরা মধু খাবার জন্যে ফুলের মধ্যে ঢুক্‌লেই তাদের গায়ে রেণু লেগে যায়, তার জন্যে নানা রকম সুন্দর কৌশল আছে। তোমরা কোন ফুল দেখ্‌লেই এই কথাটা মনে রেখো। কোন্ ফুল মৌমাছিদের লোভ দেখাবার জন্যে ও নিজেদের রেণু তাদের গায়ে মাখিয়ে দেবার জন্যে কি রকম ব্যবস্থা করেছে, যদি অনুসন্ধান কর তবে অনেক জান্‌তে পারবে। আর একটী গাছের গল্প করে এবারকার মত গাছের কথা শেষ করব। এটী সত্য ঘটনা হলেও এত অদ্ভুত যে, তোমাদের হয়ত কেবল গল্প বলেই বিশ্বাস হবে। বাবলা জাতের এক রকম গাছ আছে তাদের গায়ে বেশ বড় বড় কাঁটা হয়। যে দেশে এই গাছ জন্মায় সেখানে এক রকম পিঁপড়ে আছে তারা খুব লড়িয়ে। তারা এই গাছের কাঁটার মধ্যে ফুটো করে বাসা বেঁধে থাকে। গাছরা পিঁপড়েদের শুধু বাসা বাঁধতে দেয় তা নয়, তাদের আহারের ব্যবস্থাও নিজে থেকে করে দিয়েছে। এই গাছের প্রত্যেক পাতার ডগায় একটু করে ছোট্ট পুঁটলির মত ঝুলতে থাকে, পিঁপড়েরা তাই খায়। গাছ যেমন তাদের থাকবার জায়গা ও খাবার জুগিয়েছে, পিঁপড়েরা তার পরিবর্ত্তে গাছের একটী মস্ত উপকার করে। সেইখানে আর এক জাতের পিঁপড়ে আছে তারা এই গাছের পরম শত্রু। যদি কখনও এই শত্রু পক্ষ থেকে গাছ আক্রমণ করতে আসে তখন গাছের পিঁশড়েরা তাদের তেড়ে গিয়ে ভীষণ যুদ্ধ করে তাদের ভাগিয়ে দেয়। পিঁপড়েদের লড়াই কখনও দেখেছ? সেও এক দেখবার মত জিনিষ, দল বেঁধে লড়াই করতে তারা খুব মজবুত। বাব্‌লা গাছের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝ্‌তে পার্‌বে গাছ আর জন্তুদের মধ্যে অনেক স্থলে কি রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে।

শ্রীরথীন্দ্র নাথ ঠাকুর

এবার ঈদে

মাহনূর বেগম (গ্রাঃ নং ১১৬৬)

রমজান মাসের পনেরদিন অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে নানা রংয়ের আশা বাসা বাঁধিতে লাগিল। মন্নু আমার মেজচাচার বড় মেয়ে। আমা অপেক্ষা বয়সে সে বার ঘণ্টার ছোট। নাম তার মনিরুন লেচ্ছা কিন্তু সকলে তাহাকে মন্দু নামেই জানে। আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব যেরূপ নিবিড়, অসদ্ভাবের আস্বাদ হইতেও সেইরূপে আমাদিগকে কোনদিন বঞ্চিত হইতে হয় নাই। আহার, বিহার ও শয়নের সঙ্গী সে আমার। মোট কথা সে ছাড়া আমি থাকি না আর আমি ছাড়া সে থাকে না। সে যে স্থানে উপস্থিত থাকে না আমার তথায় থাকিতে বা যোগ দিতে ভাল লাগে না।

এবার ঈদের সময় কি ভাবে ঈদের দিনকে পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিব, রাত্রে একতারের পর সেই লইয়া তাহার সঙ্গে নানা গবেষনা চলিত। অজ পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাস। কলিকাতায় যাইবার সুযোগ ভাগ্যে অতি অল্পই জুটে। কলিকাতায় যাওয়া আমাদিগের নিকট তীর্থ যাত্রার সমতুল্য। মন্দু একদিন বলিল, "এবার ঈদের দিনে মোটর যোগে কলিকাতায় যাওয়া যাক, নামাজের পর ঘর যাব, কলিকাতায় পৌছুতে আন্দাজ ২টা বাজিবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি দেখে সন্ধ্যায় সিনেমা দেখা যাবে।" মন্দুর প্রস্তাব আমার নিকট অত্যন্ত লোভনীয় হইলেও বিনা প্রতিবাদে তাহারই প্রস্তাবে সমর্থন করিব সে স্বভাব আমার নয়। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমি বলিলাম, "ঈদের দিনে ধর্ম্ম গর্হিত কার্য্য করা শোভা পায় না, সিনেমা দেখা ধর্ম্মে মানা, সেটা আবার ঈদের দিনে! লোকে শুনলে বলবে কি? তার চেয়ে আমার মতে শিবপুরে নূতন বউয়ের বাড়ী গিয়ে উঠি। সেখান হতে, শিবপুর বাগান দেখতে যাওয়া যাবে। সঙ্গে ষ্টোভ, কেটলী ইত্যাদি থাকবে। বেড়ানও হবে অথচ অর্দ্ধ বনভোজনেরও আমোদ পাওয়া যাবে।" মন্দু তো আমারই বোন! সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, "হুঁ! ঈদের দিনে বিদেশে গিয়ে রেধে খেতে যাওয়া! কোথায় খুসির দিনে দশজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঈদ মোবারক জানিয়ে মনের জড়তা দূর করবো, না হাতা, বেড়ি নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে যাব! বেশ

যদি সিনেমা দেখায় আপত্তি থাকে তা হলে ডানকুনির মাঠে নৌকা করে ঘোরা যাবে; বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর নৌকা ভ্রমণ কম লোভনীয় নয়। আব্দুলা, বেবী, আলতাফ ঈদের দুদিন পূর্ব্বে বাড়ী আসবে। বড়চাচা, সেজচাচা, ছোটচাচা সকলেই সে সময় ঘরে জমা হবেন। আব্দুলা ও আকবর আলি যদি সঙ্গে বন্দুক নেয় তা হলে নৌকায় ঘোরাও হবে অথচ হাঁস শিকারের আমোদও উপভোগ করা যাবে।" আগে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আব্দুলা ও বেবী আমার বড় চাচার বড় ছেলে ও মেয়ে আর আকবর মন্দুর বড় ভাই। ইহারা সকলেই কলিকাতায় পড়ে, ছুটির অবকাশে কখনও কখনও বাড়ী আসে। বড়চাচা, ছোট চাচা ও আমার বাবা কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করেন। আমার বাবা কর্ম্ম উপলক্ষে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। আব্দুলা ও বেবী আমার বাবার সঙ্গেই থাকেন। আলতাফ আমার ছোট ভাই সেও বাবার সঙ্গে থাকে। বড় চাচার সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বদরু থাকে। মন্দুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ কল্লে বলিলাম, "আব্দুলা, বেবী কবে আসবে তার ঠিক নাই, আগে হতেই কি কিছু স্থির করা যায়?" মন্দু উত্তর করিল, "ঈদের পূর্ব্বে তারা বাড়ী আসবেই যেখানেই থাক না কেন! কখনও যে বিষয়ের ব্যতিক্রম হয়নি সেটাই বা এবার ধরে নিতে যাবো কেন? সকলে বলেও গেছে তাই। না আসার কোন কারণ ত খুঁজে পাচ্ছি না।" নৌকা যোগে শিকারে যাইবার প্রস্তাবই বাটীর অন্যান্য সকলে অনুমোদন করিল। আমরাও ঈদের দিনের অপেক্ষায় দিন গুণিতে লাগিলাম। ইংরাজিতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "Man proposes God disposes." আমরাও ভবিষ্যতের যে সকল উজ্জ্বল চিত্র চিত্রিত করিতেছি, খোদা বোধ হয় নীরবে বসিয়া দেখিতেছেন এবং হাসিতেছেন।

ঈদের দিন যতই সন্নিকট হইতে লাগিল দাদির কর্ম্ম তৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দাদির অধিকাংশ পুত্র, পৌত্র, পৌত্রীগণ প্রবাসে। ঈদের সময় সকলেই গ্রামের পৈত্রিক গৃহে একত্রিত হন— কোন্ পুত্র, কি কি আহার্য্য অধিক ভালবাসেন সেই সকল বস্তু আহরণে দাদি সদাই ব্যস্ত। একবার বলিতেছেন, "মেজ বউ, সেমাইগুলা সব এসে গেছে, পোলাওয়ের চাউলগুলা ঝাড়া হয়েছে? দেখো যেন নষ্ট না হয়।" আবার ক্ষণেক পরে বলিতেছেন, "সেজ বউ, হাবার মা'র মোরগ আনবার কথা ছিল, এনেছে? খাবার দিয়ে তাদের ভাল করে ঢেকে রেখো, দেখো যেন পালিয়ে না যায়।" কখনও বা বলিতেছেন, "এনসান আলি এখনও কলিকাতা হতে ফিরল না মেয়েদের বাড়ী কাপড় সেমাই পাঠাতে দেরী হয়ে যাচ্ছে।" সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দাদির আর মুখের অবসর নাই। বহুদিন পর সকল পুত্র একত্রিত হইবেন। তাঁহাদের খাওয়াইয়া তৃপ্তি দান করিতে হইবে; অবহেলায় কোন সামগ্রী না ফাঁক যায়। মায়ের প্রাণ! সদাই ভাবেন তাঁহার অবর্ত্তমানে পুত্রেরা পেট পুরিয়া তৃপ্তির সহিত খাইতে পায় না। কোন্ পুত্রের কিরূপ সময় গৃহে আসিবার সম্ভাবনা সেই সকল প্রশ্ন বারংবার আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

ঈদের মাত্র চারদিন বাকি। মেজ চাচার কনিষ্ঠ কন্যা তাজ্নুর অকস্মাৎ জ্বর দেখা দিল। বয়স তার এখনও দুই বৎসর হয় নাই—ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কহিতে শিখিয়াছে মাত্র। বাড়ীর মধ্যে সেই একমাত্র ছোট মেয়ে। তাকে দখল করিবার জন্য আমাদের মধ্যে সদাই কাড়াকাড়ি। একবার তার মা লইতেছেন, একবার আমার মা লইতেছেন, একবার মন্দু, একবার আমি, কারুর আশা পূর্ণ হয় না। এ সময় তার জ্বরে আমাদের মনে বিমর্ষতার ছায়া পতিত হইল। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ভাবিলাম ঈদের দিন আরোগ্য লাভ করিবে।

বহু প্রত্যাশিত ঈদের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, একদিন মাত্র বাকি। মন্দুরও জ্বর দেখা দিল। শেষ রোজা সে ভাঙ্গেনি জ্বর গায়েই রোজা রাখিল। সন্ধ্যার সময় ঈদের চাঁদ দেখা দিয়াছে! ছেলেদের আনন্দ কোলাহলে গ্রাম মুখরিত। মন্দু আর আমি মুখোমুখি হইয়া বসিয়া ভাবিতেছি, আমাদের আশা কি বাস্তবরূপ ধারণ করিবে না। দুদিন পূর্ব্বে আব্দুলা, বেবি ও আলতাফের আসিবার কথা ছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদই নাই। গৃহের ছাদে উঠিয়া উৎকর্ণ হইয়া পথের পানে চাহিয়া দেখি, দূরে কোন অজানা মোটরের হর্ণ বাজিতে শুনিলেই ভাবি ঐ বুঝি উহারা আসিতেছে। দাদি একবার সদরে যাইতেছেন এবং একবার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। কোন পুত্রই এ পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই দেখিয়া বিষাদের ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি আট ঘটিকার সময় সদরে মোটরের হর্ণ শুনিয়া দৌড়াইয়া গিয়া দেখি বড় চাচা ও বদরু আসিয়াছেন। চাচাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আব্দুল্লা, বেবী, আলতাফ, বাবা এরা সব আসেনি কেন?" বড় চাচা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তারা আসেনি? বোধ হয় তোমার বাবা আসানসোল হতে কাল ফিরতে পারে নি, আস্‌তে রাত হতে পারে।" আশা ও আশঙ্কার মধ্যে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। দাদি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বাবা আসেন নাই দেখিয়া ঈদের পর্ব্বই দাদুর নিকট বৃথা বিবেচিত হইতে লাগিল। মনের খেদ আমাদের উপরই ক্রুদ্ধ হইয়া মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমরা ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ বিবেচনা করিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রতিকারের কোন উপায় নাই দেখিয়া দাদু বলিতে লাগিলেন, "কোন খাবার আয়োজন করিবার দরকার নাই; যে যার চুপ করে শুয়ে পড়োগে, ঈদের ভাত সাদা ভাত খেলেই হবে। পোলাও, কোরমা, সিমাই কিছু করো না। যাদের নিয়ে আমোদ করবো তারাই যদি না এলো এ সবে ফল কি বল?" দাদি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন "তারা আসে নি বলে কি কেউ আর আমোদ করতে পাবে না? তারা আসে ভাল না আসে, এদের নিয়েই ঈদ করতে হবে।"

ঈদের দিন প্রত্যুষে স্নান করিয়া চা পানান্তে কিরূপভাবে দিন অতিবাহিত করিব ভাবিতেছি এমন সময় বাহিরে মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইলাম। তখন বোধ হয় বেলা নয় ঘটিকা। বাহিরে আসিয়া দেখি—বাবা, আব্দুল্লা, বেবী, আলতাফ সকলেই উপস্থিত, ছোট চাচাকে দেখিতে পাইলাম না। বাবা অতিকষ্টে গাড়ি হইতে অবতরণ করিতেছেন। দাদু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী হল কেন?" বাবা ব্যথা কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "পায়ে বাতের বেদনা বেড়েছে সেইজন্য আসানসোল হতে ফিরতে পারি নি, কাল রাত্রি বারটার সময় কলিকাতায় আসি। ভোরেই বাড়ীর জন্য বেরিয়েছি।" দাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারা এলো না কেন বাবা?" সারা দাদির ছোট ছেলে। বাবা উত্তর বলিলেন, "সে ছুটি পায় নি।" আব্দুল্লা ও বেবীকে সঙ্গে লইয়া মন্দুর নিকট আসিলাম। সে তখন থারমোমিটার দিয়া জ্বর দেখিতেছিল। থারমোমিটার তাহার নিকট হইতে লইয়া দেখি জ্বর ১০৩ ডিগ্রি। মন্দুর ছোট ভাই ও বোন জ্বরে এপাশ ওপাশ করিতেছে। উহাদিগের বেদনা ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া আমার অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ঈদের আনন্দ উজ্জ্বল চিত্র এইখানে ম্লান হইয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া মন্দুর ললাটে হাত রাখিয়া বলিলাম, "ভাই, এবারের ঈদের উৎসব রোগীর সেবাতেই সাঙ্গ হোক্।"

চলন্তিকা

ইউরোপের মানচিত্রে ফিনল্যাণ্ডের অবস্থান কোথায় তোমরা জানো। ফিনল্যাণ্ডের পশ্চিমে সুইডেন ও পূবে সোভিয়েট রাশিয়া, উত্তরে লাপল্যাণ্ড ও আর্কটিক মহাসাগর। রাশিয়ার লেনিনগ্রাড থেকে ফিনল্যাণ্ডের দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর। ফিনল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে গেলে, তার ভৌগলিক অবস্থানটি ও তার আগের ইতিহাসটি ভাল রকম জানা চাই। রাশিয়া আজ ফিনল্যাণ্ডে প্রভুত্ব করতে চায়—ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সে রীতিমত যুদ্ধ চালিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপার নতুন কিছু নয়। সুইডেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রায় একশ' বছর রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের ওপর অনেক রকম জবরদস্তী করেছে। গত মহাযুদ্ধে এক সন্ধিসর্ত্তে ১৯১৮ সালে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু সর্ত্তে দাঁড়াল এই যে জার্ম্মাণী ফিনল্যাণ্ডের ওপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেল। অর্থাৎ প্রভুত্ব থেকে গেল—কেবল প্রভু বদলালেন। যা হোক জার্ম্মাণীকে ফিনল্যাণ্ডের ওপর প্রভুত্বের দাবী শীঘ্রই ছাড়তে হল এবং ১৯২০ সালে রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে চুক্তিমত ফিনল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা ফিরে পেল।

মাত্র কুড়ি বছর স্বাধীন থেকে ফিনল্যাণ্ড তার ভাগ্য দেবতার অভিশাপে আবার রাশিয়ার খপ্পরে পড়ল। অনেক দিন থেকে ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়াতে টানাটানি চলেছে। রাশিয়া বাল্টিক উপসাগরে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়—আরো অনেক কিছুই চায়—বাল্টিক পেলে রাশিয়া ওদিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে—শুধু জার্ম্মাণী নয়—ইংলণ্ডকেও সে তখন শাসাতে পারে। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড হটবার পাত্র নয়। অনেক রকম সন্ধি, অনেক রকম চুক্তি কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আসল কথা কোন মাঝামাঝি মিটমাট রাশিয়ান ভাল্লুক চায় না। যুদ্ধং দেহি বলে সে রুখে দাঁড়াল। ফিনল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য কোন দেশই তার সাহায্যে এল না। সত্যিকারের সাহায্য নিয়ে আসতে একমাত্র সুইডেন ছাড়া বোধ হয় তার আর কোন বন্ধু নেই ইউরোপে। সুইডেনের ক্ষমতাও অল্প।

গত ৩০শে নভেম্বর সকালে সোভিয়েট রাশিয়া জলে, স্থলে ও আকাশে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করলে। ফিনল্যাণ্ডের অনুরোধ—তার কোন চুক্তি, কোন ব্যবস্থা সে নিলেনা।

যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ফিনল্যাণ্ডে। উপকূলবর্ত্তী ফিনল্যাণ্ডের সহরগুলি বিধ্বস্ত হতে থাকল। সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে ফিনল্যাণ্ড অসীম সাহসে ও বীরত্বে নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়তে লাগল। আজ পর্য্যন্ত দুদলেই অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার বিরাট সেনাবাহিনীর কাছে ফিনল্যাণ্ড কতটুকু? ফিনল্যাণ্ডের ম্যানার হাইম লাইন রাশিয়া ভেঙ্গে ফেললে অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার এক অঙ্গ সে ভেঙ্গে দিলে। ফিনল্যাণ্ড অসাধারণ বীরত্বে যুদ্ধ করছে বটে কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই স্বাধীন ফিনল্যাণ্ড ইউরোপের ম্যাপ থেকে মুছে যাবে। একমাত্র উপায়—যদি কোন শক্তিশালী দেশ তাহাকে সত্যিকারের সাহায্য করে—যেমন ইংলণ্ড; ইংলণ্ড যদি ফিনল্যাণ্ডের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামে—তাহলে ফিনল্যাণ্ড বর্ত্তমানের মত যদি রক্ষা পায়। রাশিয়ার কি মতলব বোঝা মুস্কিল—তারা কি ফিনল্যাণ্ডে সাধারণতন্ত্র আনতে চায়, না নিছক প্রভুত্ব করাই তার মতলব? সমস্ত পৃথিবীতে রাশিয়া একটা তুমুল রহস্য! আশ্চর্য্য—ইউরোপের সমস্ত দেশগুলি এক রকম নির্ব্বাক হয়ে এই দুই অসমান দলের লড়াই দেখছে। সমস্ত ইউরোপ যেন বাজী খেলছে। যে জার্ম্মাণীর একদা ফিনল্যাণ্ডের ওপর শ্যেনচক্ষু ছিল আজ সেও নির্ব্বাক।

লণ্ডন থেকে রয়টারের এক খবরে প্রকাশ যে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শীঘ্রই সাহিত্যে ডক্টর উপাধি ভূষিত করবে। ইউরোপের এই যুদ্ধবিগ্রহের হাঙ্গামাতেও ইংলণ্ড রবীন্দ্রনাথকে যে এই সম্মান দিচ্ছে—এটা খুব গৌরবের কথা। ইংলণ্ডের সাহিত্যসেবী গুণী লোকেরা বোধহয় শতকরা রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী পড়ে শুধু ইংলণ্ড নয়—সমস্ত ইউরোপ মুগ্ধ হয়েছে। গীতাঞ্জলীর ঐশ্বর্য্যই রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ—নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের কবিগুরু ন'ন—তিনি বিশ্বকবি ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষির অন্যতম। নোবেল পুরস্কার পাবার আগে আমরা অনেকেই রবীন্দ্র প্রতিভা উপলব্ধি করতে পারি নি—তখন রবীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য আমরা দিতে পারি নি। রবীন্দ্রনাথ অভিমান করে একবার একথা বলেছিলেন। আজ আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আমরা ধন্য! অক্সফোর্ড রবীন্দ্রনাথকে উপাধিতে সম্মানিত করেছে বলে একথা বলছি না।। রবীন্দ্রনাথ আজ সমস্ত ভারতের গুরুদেব। মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এর বড় রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধহয় কিছু চান না।

রবীন্দ্রনাথের পরেই আর একজনকে মনে পড়ে কিন্তু তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে

নেই। তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র। তাঁর মৃত্যু যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ক্ষতিকর। বেঁচে থাকলে শরৎচন্দ্র নোবেল পুরস্কার পেলে আমরা আশ্চর্য্য হতাম না। কথাসাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মত দরদী লেখা আর আমরা দেখতে পাই না। রবীন্দ্রনাথ যেমন ঋষিতুল্য শরৎচন্দ্র তেমনি যেন আমাদের মধ্যের মানুষটি। গত ২রা মাঘ তাঁর স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎস্মৃতি সমিতির সম্পাদক হিসেবে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ তিন হাজার টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছেন। উপযুক্তভাবে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ১৫ হাজার টাকা আবশ্যক। আমরা আশা করি এই টাকা সমিতি শীঘ্রই সংগ্রহ করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন একটা স্থায়ীভাবে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

ভারতবর্ষের মত মৃতদেহ সৎকার করবার এত রকম প্রণালী বোধহয় আর কোন এক দেশে নাই। তার কারণ ভারতবর্ষ জাতিবহুল দেশ। সাধারণত মোটামুটি আমরা দেখতে পাই দুরকম উপায়ে মৃতদেহ সৎকার করা হয়—এক, দাহ করে আর দুই, কবর দিয়ে। এক দুই এর সংমিশ্রণও আছে। কলিকাতায় বৈদ্যুতিক উপায়ে দাহ করার ব্যবস্থা আছে। আর এক রকমভাবে সৎকার করে পার্শীরা—তারা মৃতদেহ একটা বিশেষ জায়গায়—খোলা অবস্থায় ফেলে রাখে আর শকুনিরা সে মৃতদেহ উদরাস্থ করে। পার্শীদের ধারণা মৃতদেহ শকুনিদের দান করে একটা উপকার করা হয়। ভারতবর্ষে অনেক অসভ্য জাতিদের মধ্যেও নানারকম মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা দেখা যায়। সম্প্রতি আমরা জেনেছি ময়ুরভঞ্জের বাথুরী বলে এক জাতি আছে—তারা কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতদেহ দাহ না করে—বনের অন্তরালে মৃতদেহ শুইয়ে তাকে ফেলে চলে আসে—রাত্রে বাঘ ভাল্লুক নেকড়ে মৃতদেহটি খেয়ে যায়। বাথুরীরা কিন্তু মানে না যে বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে যায়—তাদের বিশ্বাস যে মৃতদেহ দৈব উপায়ে অন্তর্ধান করে! ভারতবর্ষে এইভাবে মৃতদেহ সৎকার করে আমাদের জানা ছিল না। অবশ্য এটা অপূর্ব্ব কিছু না কারণ পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এরকম আরও অদ্ভুত (যেমন কোথাও গাছে মৃতদেহ বেঁধে বা ঝুলিয়ে রাখা হয়, কোথাও জলে বা সমুদ্রে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়—অনেক সময় হাঙ্গরের মুখে দেওয়া হয়) ব্যবস্থা আজও আছে। বইতে বাইরের দৃষ্টান্তই আমরা এতদিন পড়ে এসেছি কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যেই যে এক জাতি এরূপ ভাবে আজও সৎকার করছে তা আমরা এই প্রথম জানলাম। প্রাচীন ও আদিম ভারতবর্ষের অনেক কিছুই আমরা জানি না।

পরিচালিকা—দিদিভাই

আমার স্নেহের সোনার ভাই বোনেরা !

অনেক দিন পরে এলাম ভাই। ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—সেই ঝড়এ তোমাদের 'দিদিভাই'কে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর কি !—কিন্তু তোমাদের আহ্বানে তোমাদের স্নেহ ভালবাসা আমায় ধরে রাখলো। তোমরা ব্যস্ত হয়েছ খুব, পৌষএ আমার সাক্ষাৎ পাওনি আর মাঘে একেবারে রংমশালই পাওনি—কেন ? * এই প্রশ্ন তোমাদের প্রত্যেকের চিঠিতে। কেন এমন ঘটলো তার উত্তর তোমাদের সম্পাদক মহাশয়ের কাছে জানতে পারবে। তবে এইটুকু বলে রাখি—রংমশালের উপর দিয়ে একটা বিপ্লব চলে গেল,—এখন মেঘ কেটে গিয়েছে, তোমাদের আর ভয় ভাবনা বা কেন আবার গ্রাহক হলাম এর জন্য অনুশোচনা করবার কিছু রইলো না থাকবেও না। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চিঠি লিখতে আরম্ভ করো বুঝলে ?

এতদিন তোমাদের ছেড়ে আমারও কি একটুও ভাল লেগেছে ? এতগুলি মিষ্টি ছোট ছোট ভাই বোন পেয়ে এই বয়সে দেখনা আমিও যেন কচি হয়ে উঠেছি, হাতে কলমে ব্যাপারটা না ঘটলে আগে ভাবতেই পারতুম না—তোমাদের লেখার ভিতর তোমাদের দেখতে না পেলে এত মন কেমন করবে—এত খারাপ লাগবে। এখন বুঝতে পাচ্ছি তোমাদের ভালবাসা কত আন্তরিক। আচ্ছা আজ আর ওসব কথা যাক—চিঠিগুলোর উত্তর দিই এসো। কিন্তু আমার একটী অভিযোগ, যে ভাই বোনরা আমায় নিয়মিত লিখতো—তাদের লেখা আমি পাইনি কেন ?

সাধনা সরকার (গৌহাটী) ৭১৫

তোমার চিঠির সব কথার উত্তর উপরেই দিয়ে দিয়েছি ভাই। যা কিছু রাগ যেন এই চিঠি পড়েই চলে যায়। পরীক্ষা কেমন হলো ? আশীর্ব্বাদ করতে হবে না, ঠিক উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ভাই।

মোহাম্মদ গুলজার আলী (হাওড়া) ১৯৮৫

তোমার দু'টী চিঠি পেয়েছি ভাই, না রংমশাল নিভবার নয়,—আলোটা কম যা তোমাদের মনে

* মাঘের সংখ্যা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ছাপা হওয়াতে (বিলম্ব হওয়ার দরুণ) আমরা সময়মত দিদিভাইর চিঠির বাক্স চাইতে পারিনি—সঃ।

হচ্ছিল, ভালো করে চেয়ে দেখো সে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তোমার ম্যাজিকের কথা ভুলিনি ভাই, ম্যাজিকের আর সূচিপত্রের * কথা বলবো। কিন্তু যদি ভুলে যাই আর একবার মনে করিয়ে দিও—কেমন ?

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ৫৭৭

আড়ি করতে হবে না বোনটী, কোথায় যাবো তোমাদের ছেড়ে— ? না, না তোমরা পালিও না ভাই,—বাবাঃ এত রাগ করে নাকি ? পরীক্ষা ভাল হয়নি ? শরীর ভাল না হলে কিছু হয় না—আগে শরীরটা ভাল করো বুঝলে ? এ বিষয় অবহেলা করলে অনেক ক্ষতি সহ্য করতে হয় ভাই।

রেবা মিত্র (কলিকাতা) ৪৭৪

হলেই বা তুমি বুদ্ধ, গৌতম আর লক্ষ্মীর মা, তাহলেও এখানে স্থান ঠিক আছে। তোমার মত ক'জন আছে জিজ্ঞাসা করেছো, ক'জন ঠিক বলতে না পারলেও—আরো আছে, কাজেই তোমার চিন্তা নেই। তোমার অন্য চিঠিখানা পাশের বাড়ীতে ইন্দিরাদিকে পৌছে দিয়েছি, তিনি খুব খুসী হয়ে বলেছেন কাঠির বোনা তোমায় নিশ্চয় শেখাবেন—কিন্তু তাঁর দরজা এখন বন্ধ কিনা, তোমার যদি তাড়া থাকে যে ব্যবস্থা তুমি দিয়েছ তাই করবেন। আরও বলেছেন এ বছরের শীত তো চলে গেল—একটু দেরী হলে বোধ হয় ক্ষতি হবে না—তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। তোমার বন্ধুদের আমার আদর দিও।

সতীনাথ ভট্টাচার্য্য (নৈহাটী) ১৩০২

নতুন চিঠি, নতুন হবি তোমার এই বলছো তো ? চিঠিটা নতুন বটে—কিন্তু হবি ট্রামবাসের টিকিট জমানো—এটা কিন্তু পুরোণো হয়ে গেল ভাই। তোমার বাবার ও তোমার ধারণা রংমশালের উপর যা আছে—রংমশাল তা যেন রাখতে পারে এটাই বলো। তোমার প্রশ্ন অবশ্য জানাবে।

সন্ধ্যা ঘোষ (কালনা) ১৩২৯

তোমার আগের চিঠি পাইনি ভাই, ঝড়ে উড়ে গেছে বোধ হয়। যাক এখানা ঠিক পেয়েছি। রংমশালের বাৎসরিক দাম ২৷৷৹ কিন্তু ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। যারা যারা বই পাওনি তাঁদের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা হবে। জ্যোৎস্নাকে চিঠি লিখতে বলো, সন্ধ্যা হলে জ্যোৎস্নাকে না পেলে চলবে কেন বলো ?

মাহনুর (বড় তাজপুর) ১১৬৬

মাসনু ! তোমার প্রবন্ধের কি নাম ছিল জানিও, দপ্তরে খুঁজে দেখা হবে ভাই †। নতুনটার বিষয় এখনও বলতে পাচ্ছি না—পরে জানাবো। ভাল আছ তো সব ?

সুজিত ও বাণী (ধামরাই) ১৩০৪

সত্যি ভাই—প্রথম চিঠি পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। কে বলে ও কথা ? তোমরা আমার লক্ষ্মী ভাই বোন, একটু কেন সবটুকুই পাবে—রাগ করোনা ভাই। কবিতা এখনও দেখা হয়নি।

* চৈত্রে সমস্ত সূচিপত্র ছাপা হবে—সঃ।

† 'এবার ঈদে' এ মাসেই ছাপান হয়েছে—সঃ।

হিমানী রায় (কলিকাতা) ১২৬৪

পরীক্ষায় ফাষ্ট হয়েছ জেনে সুখী হলাম। আচ্ছা আমিই লেখনী বন্ধু হবো। তুমি অফিসে যদি লোক পাঠাও বই নিয়ে যাবে বা ডাক মাশুল পাঠাতেও পারো। বিরক্ত আমি হই না এত বলেছি ভাই আগে।

কিষণচাঁদ বর্ম্মন (বর্দ্ধমান) ১৩৬৩

তুমি যে পরিচয় দিয়েছ সেই পরিচয় হিসেবে যেটুকু চেনা দরকার তা আমি চিনি। লাহোর, রেঙ্গুন এই রকম দূর দূরান্তরে আমাদের অনেক গ্রাহক আছে।

মানস কুমার ঘোষ (দিল্লী) ১৩৪৯

মানস! দিদিভাই বলতে কি বোঝায় তুমি তা জানোনা—দিদিমা কি বড় বোন। কিন্তু তুমি কি রংমশালের চিঠিগুলো পড়ো? তাহলে এ প্রশ্ন করতে না। না রাগ করিনি ভাই, চিঠি লিখো।

সুজাতা সিংহ (দিনাপুর) ৯১৩

বহুদিন আগে তোমার কবিতালিপি পেয়েছিলাম—আজ পেয়েছি বিরক্তি ও বিদ্রূপপূর্ণ চিঠি, কিন্তু রাগ করিনি। যা কিছু ত্রুটী পেয়েছ, তা হয়েছে সত্য—কিন্তু আমাদেরও কম দুঃর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি—তবেই আবার রংমশাল পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে। যাক আশা করি এবার আর কিছু বলতে হবে না।

কমলা দাস (সিলেট) ৫৮১

তোমার ঠিকানার কথা বলা হয়েছে। না ভাই আমি কিছু মনে করিনি। বাণী আমায় আর লেখে না। মাঝে মাঝে খবর দিও।

অরুণ কুমার রায় (ভবানীপুর) ৯৮১

গ্রাহক নম্বর কার ভুল হয়েছে জানিনে তবে একজনের যে সন্দেহ নেই। বড় চিঠিতে বিপদে পড়িনা ভাই—তবে বড় উত্তর দিতে পারি না সেই যা বিপদ।

জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায় (আরা) ৯৩৭

তোমার সব কথার উত্তর আমার দেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়—। রংমশালের ত্রুটী দেখালে রাগ করার তো কিছু নেই ভাই—তবে আমাদের দিকের অবস্থাটাও একটু ভেবো।

আরতি চক্রবর্ত্তী

তোমার একটী চিঠিই পেলাম। লেখাগুলি খোজ করে পরের বার সব জানাতে পারবো আশা করি। রংমশাল ভাল হলে—ভাই বোনদেরই চকোলেট দেবে—? আর দিদিভাই কেউ নয় বুঝি?

আজ এই পর্য্যন্ত। তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা নিও। ইতি—শুভার্থিনী তোমাদের—

দিদিভাই

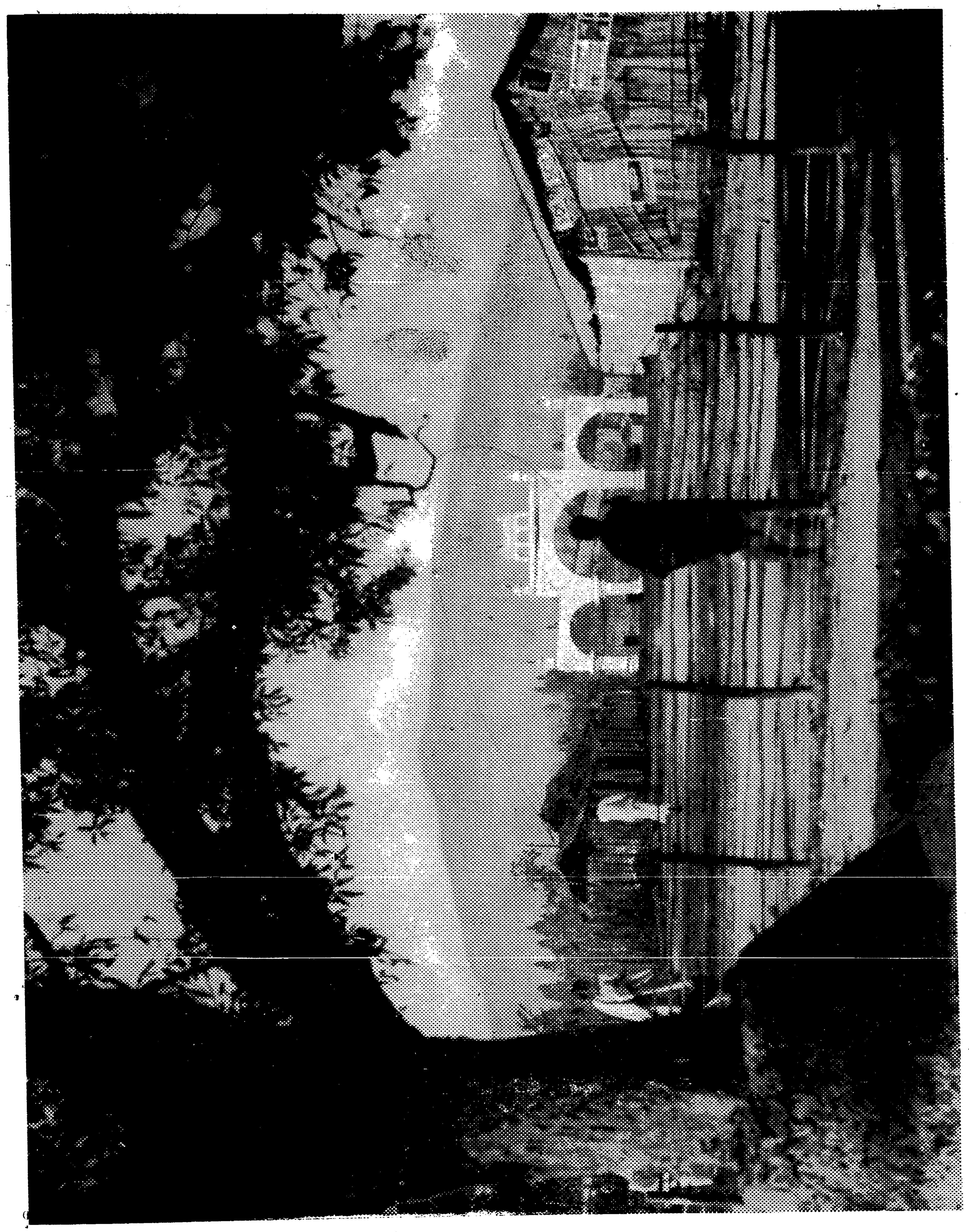

রামগড় কংগ্রেস নগর

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ | চৈত্র ১৩৪৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

চট্ জলদী কবিতা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—"আচ্ছা, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন তোর আমার ?"
—"আরে আমি কেন বলবো ? এসব কথা বলছে, লোকে আমেরিকার ;
চাকর মনিব প্রেথোক্ প্রেথোক্ থাকবেনা আর।"
—"তবে থাকবে কি ? বলে ফেল চট্ জলদি !"
—"সবাই মনিব ; তবে আর বলছি কি !
এসব কাগজে বেরিয়েছে, ছাপার অক্ষরে আমেরিকার।"
—"রোস্ বুঝে দেখি মাথা ঘুলিয়ে দিস্‌নে আমার,
তুই হলি মনিব, আমিও হলেম মনিব ;
বাবুরা তো মনিব আছেই, আমাদের তখন চাকরের কি হবে ?"
—"যেমন এখন হচ্ছে, তখনো তাই হবে
দুটো চাকর পৃথিবী থেকে কম হবে।"
—"সেতো তুই আমি মলেই হবে !"
—"আহা, ও কথা নয়, চাকর মনিব সম্পর্কই উঠে গেছে সেখানে, এখানেও যাবে।"
—"আগে সেখানের কথা ক', সেখানে জানিস্ বড় বড় কোম্পানি আছে।"

—"হুঃ !"

—"কোম্পানি আছে যখন, মালিক ও আছে তু তিন জন,
যেমন জমি জমার তিন সরিক, বুঝলি ত ?"

—"হুঃ !"

—"এখানেও যেমন জুম খাটে সেখানেও তেমনি লক্ষ জন এক এক কলে খাটে,
মাইনেও পায় মাসে মাসে হপ্তাতে হপ্তাতে ;
সেখানে সবাই কিছু মটর চালায় না, সাহেব ড্রাইভার চালায়,
হোটেলে সবাই খায়,
কেউ খাওয়ায়, কেউ রাঁধে,
ধোবি খানাতে ধোপা খাটে ;
জাহাজে কুলি খাটে, রাস্তায় ঝাড়ুদার খাটে ।"

—"হুঃ !"

—"হুঃ হুঃ করিসনে, তোর আমেরিকা কোথায় রইল তাই ক' ।"

—"বোম্বুয়ের ওপার !"
বোম্বুই আর কলিকাতার মধ্যে বিষ্ণুপুর,
সেখানে তোর আমেরিকার আমচুর—
তুলে রাখ গা ;
বিত্তে ফলাস্ না যাঃ,
কাজ আছে আমার ।

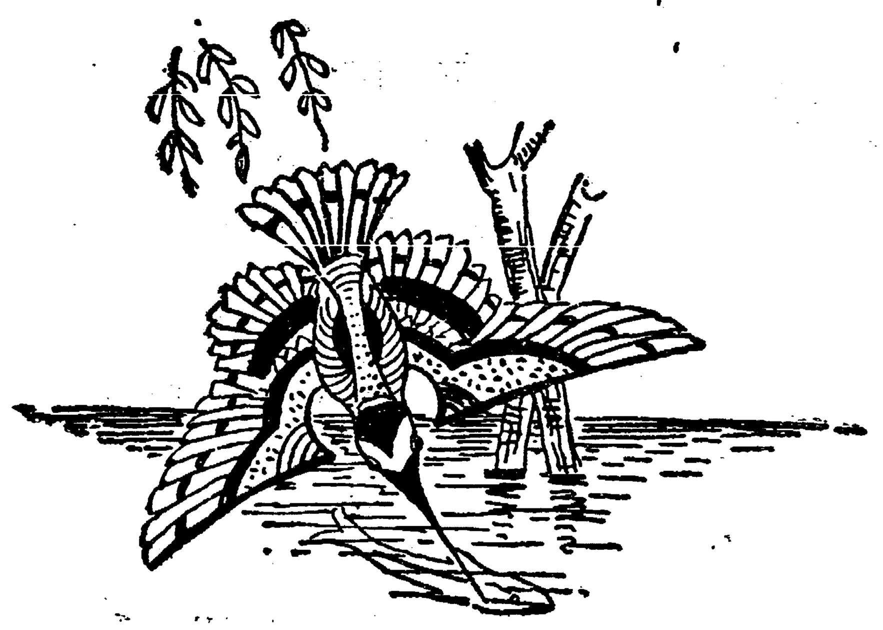

—ভৈরবানন্দের মাঠ—

সৌমিত্র শঙ্কর দাস গুপ্ত

রূপশ্রী নদীর তীরে দেবগড় নগর। রূপশ্রীর তুই তীরের সুন্দর সুশ্রীতার সঙ্গে দেবগড়ের অপরূপ রূপসৌন্দর্য্যের মিলন, সেখানকার সকল অধিবাসীর পক্ষেই একটা গর্ব্বের বিষয়। আকাশের নানা রঙের মেঘের খেলায় রূপশ্রী নদীর রূপপরিবর্ত্তন, রূপশ্রীর তীরে তীরে ধানের সবুজ, দূর শূন্যে নানা রকমের পাখীর আনন্দের খেলা, ভৈরবানন্দের মাঠের ওখানটায়—রূপশ্রী নদীর বাঁকে—বড় বড় শাখা-প্রশাখা নিয়ে বটগাছে নদীতে লুটায়ে পড়া—সব কিছুতেই এমন একটা আনন্দের সাড়া পাওয়া যায়, যা' সবাইয়ের প্রাণেই শেষ-হীন আনন্দের সন্ধান জানায়।......

কিন্তু এই দেবগড় নগরই একদিন ছিল কালো মেঘের ছায়ার মত ম্লান। লোকের প্রাণে উৎসাহ ছিলনা—তাদের আশা-শূন্য প্রাণ শত আনন্দের খোরাক পেয়েও, কিসের যেন অভাবে মুষ্ড়ে ছিল। কারো প্রাণে কোন একটা ইচ্ছার যদি ছোট দীপশিখা-ও জ্বলে উঠত তবে তখুনি তা' নিভে যেত তুরন্ত হাওয়ায়।

হ্যাঁ তুরন্তইত! সে-সময়কার দেবগড়ের রাজা রামাদিত্যকে কে না তুরন্ত বলবে? শুধুত তুরন্ত নয়—তার মত অতবড় অত্যাচারী রাজা দেবগড়ের ইতিহাসে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি! সেত বেশী দিনের কথা নয়, লোকের মুখে মুখে এখনও রামাদিত্যের কাহিনী বেঁচে আছে। তাঁর অত্যাচারের কাহিনী শুনলে ভয়ে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তা ছাড়া আরো একটা জিনিষ—তাঁর অপকীর্ত্তির জন্য রামাদিত্য ইতিহাসে চিরকালেই হয়ে' থাকবেন ঘৃণিত।

এই অত্যাচারীকে কি কোরে দমিয়ে দিয়ে দেবগড়কে দেবায়তন কোরে তোলা হ'ল, সেই ইতিহাসই আজকে তোমাদের শোনাব।

রামাদিত্য ছোটবেলা থেকে আনন্দ আর আদরে, খামখেয়ালীর ভাব নিয়ে বড় হয়েছিলেন। তাঁর বাবা আদিত্যের মারা যাবার পর যখন দেবগড় রাজত্বের প্রকাণ্ড সম্পত্তির আয় তাঁর হাতে এল, তখন অত টাকা পেয়ে তিনি যেন আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে' গেলেন। এই আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে' আর খেয়ালের বশে তিনি এত টাকা খরচ কোরে চললেন যে দেবগড়ের রাজত্বের আয়, আর তাঁর খরচ জুগিয়ে উঠতে পারলনা।

তখন প্রজাদের 'পর অত্যাচার সুরু হ'ল--কেন তারা অল্প কোরে রাজাকে টাকা দেয় যা' দু-দিনেই ফুরিয়ে যায় ? কেন তারা বেশী কোরে টাকা দেবেনা তাদের রাজাকে ? এমন-ই সব অন্যায় আব্দার রক্ষা কয়ার জন্য রামাদিত্য নিষ্ঠুরের মতই তাঁর প্রজাদের সঙ্গে ব্যবহার কোরতে লাগলেন।

এতে প্রজারা যত অবাক হ'ল না তার চেয়ে বেশী পেলে ভয়। তবু তারা ভাবলে, একা রাজা করবেন লক্ষ লোকের আনন্দ—আর তারা বেচারীরা কি হাঁ কোরে আকাশের দিকেই চেয়ে থাকবে ?

টাকা বেশী নিয়ে রামাদিত্য যদি তাঁর রাজত্বের নানা রকম উন্নতি সাধন করতেন, তবেত কোন কথাই উঠতনা—কিন্তু এমনভাবে শুধু নিজের জন্যেই সমস্ত অধিবাসীর কষ্টের রোজগার নষ্ট করাকে তারা ভাল চোখে নিলে না।

ভাল চোখে না নিলেও রাজার বিরুদ্ধে চট কোরে বিদ্রোহ করবার মত লোকের ছিল অভাব। তেমন সাহস আর কেউ নিজেতে আনতে পারছিল না। আনবেই বা কোত্থেকে—রাজা আবার মাইনে কোরে সেরা সেরা ডাকাত সর্দার আমদানী করলেন বিদেশ থেকে।

রাজার সে কি অসম্ভব ধূর্ত্ততা ! এই ডাকাতদের সম্বন্ধে সবাইকে তিনি বলতেন--এরা তাঁর দেহরক্ষী। কিন্তু এই দেহরক্ষীদের দিয়েই তিনি রাত্রে আসে-পাশের রাজার রাজত্ব থেকে হীরা-জহরৎ, মণি-মুক্তা লুণ্ঠন করে আনতেন! তাই তাঁর অত্যাচার শুধু ঘরেই আবদ্ধ ছিল না—দেশ-বিদেশের বহু লোককেই তা ভাবিত করে তুলে ছিল।

কিন্তু রামাদিত্য অদ্ভুত প্রকৃতির! যা অন্যকে করে ভাবিত ও দুঃখিত—তাতেই তাঁর মহানন্দ !

কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে—যা' ছাড়িয়ে গেলে যে ব্যাপার ঘটে, তা' মানুষের সহ্যের অতীত হয়েই দাঁড়ায়। রাজার এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে না পেরে একদিন দেবগড় রাজত্বের লোকেরা রূপশ্রী নদীর বাঁকের প্রকাণ্ড মাঠের নাম-করা কালী-সাধক ভৈরবানন্দের স্মরণ নিলে।

ভৈরবানন্দ দেবগড়ের অধিবাসীদের দুঃখের কাহিনী শুনে বললেন—তোদের ওপর যখন এত অত্যাচার চলেছে তখন তোদের দুঃখের কাহিনী আমি আমার মাকে একবার বলব। দেখি মা আমার কি বলে। তোরা দু-একদিন বাদে আমার কাছে খোঁজ নিস্—কিছু উপায় পেলে তোদের বলব।

দু-দিন বাদে অধিবাসীরা ভৈরবানন্দের কাছে গেলে তিনি বললেন—মা তোদের দুঃখের কথা শুনেছে, তার প্রতিকার হ'বে। কিন্তু তার জন্যে চাই তোদের মধ্যে বাছা-বাছা সেরা-সেরা বারজন বীরপুরুষ। তারা আমার কথা মত চললে দেবগড়ের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি।

অত বড় দেবগড় রাজত্বে বারজন বীরপুরুষের অভাব হ'ল না। দেবগড়ের বারজন বীরপুরুষ ভৈরবানন্দের কালী মন্দিরে আস্তানা নিলে। প্রথম দিন কিন্তু ভৈরবের প্রথম কথায় তারা চমকে উঠেছিল! ভৈরব বলেছিলেন—মা বলেছে তোদের রাজবাড়ীতে ডাকাতি ক'রতে হ'বে। তাই শুনে বীরপুরুষের দল বলেছিল—আমরা ত কোনদিন ডাকাতি করিনি—তাছাড়া রামাদিত্য এনেছেন দেশ-বিদেশের সেরা-সেরা ডাকাত সর্দ্দার; তাদের সঙ্গে কি আমাদের মত বারজন অনভিজ্ঞের পারা সম্ভব ?

ভৈরব হেসে বলেছিলেন—মা যখন বলেছে, তখন সবই সম্ভব। মা বলেছে তোদের কোনই বিপদ হ'বে না। ভৈরবের এই এক কথাতেই বারজনের প্রাণে কোথা থেকে যেন রাজ্যের সাহস এসে ভর করল। তারা বললে—আপনি আশ্বাস দিলে আমরা সবই পারি।

তারপর থেকেই হ'ল ভৈরবের ডাকাতের দলের ডাকাতির সুরু।

রামাদিত্যের ডাকাতেরা দেশ-বিদেশ থেকে নানা রকম ধন-রত্ন লুণ্ঠন কোরে আনে—পরদিনই দেখা যায় তাদের তহবিল একেবারেই শূন্য। এ-রকম ব্যাপার প্রতিদিনই ঘটতে লাগল। অথচ রামাদিত্যের ডাকাতের দল এর কোন হদিসই পেল না। রামাদিত্য অবাক হ'য়ে ভাবলেন--কোথাকার লোক তাঁর এই নাম-করা ডাকাত দলকে বেকুব বানিয়ে দিয়ে যায়! রাগে তাঁর সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল—এর প্রতিকারের উপায় খুঁজতে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন; কিন্তু ভৈরবের দলের ওপর তিনি কোনমতেই টেক্কা দিয়ে উঠতে পারলেন না। তিনি জানতেই পারলেন না কারা এই ডাকাতের দল! কোন অবসরে তারা এমন কাণ্ড কোরে যায়!

অথচ এই ডাকাতের দল তাঁর দেশের লোকেই। তারা রামাদিত্যের লুণ্ঠিত ধন-রত্নই আবার লুণ্ঠন কোরে ভৈরবের হাতে এনে দিত—ভৈরব তা থেকে দেবগড় রাজত্বের সমস্ত লোককে তাদের অভাব মত সাহায্য করতেন।

এমনিভাবে এক মাস কেটে গেল। রাজা রামাদিত্য ডাকাতের দলের কোনই খোঁজ পেলেন না। শেষে অন্য উপায় না দেখে একদিন তিনি ঘোষণা কোরে বসলেন যে, রাজ-বাড়ীর সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী ডাকাতদলের সর্দারের মাথা যে আনতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হ'বে।...

এ-ঘোষণা সবাই শুনলে—এমন কি দেবগড়ের বারজন বীরপুরুষ ডাকাতেরাও। ডাকাত সর্দারের মাথা পেলে রামাদিত্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন শুনে, ভৈরবের দলের সোমনাথ ডাকাতের রীতিমত লোভই হ'য়ে গেল। সে ভাবলে ব্যাপার ত মন্দ নয়! সামান্য সুযোগে খুব বড় ধনী হওয়া যাবে—এত লোভনীয় বটেই আর এ রকম সুযোগ পাওয়াইত দুষ্কর। সে ভাবলে একবার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পেলে পুরুষানুক্রমে জমিদারী চালে থাকা যাবে।

সোমনাথের পক্ষে এই লোভই হ'ল তার কাল। এই চিন্তাতে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—এবং শেষ পর্য্যন্ত ঠিক-ও কোরে ফেললে যে রাজার ঘোষণা অনুযায়ীই সে কাজ করবে। শুধু একটা কাজ করলেই এত বড় একটা মোটা দা মারতে পারবে, এই আশাতেই সে মশগুল হয়ে গেল।

রামাদিত্যের ঘোষণার একদিন বাদেই সোমনাথ তাঁর কাছে বলতে চলল যে, টাকা পেলে সে ডাকাত সর্দারের মাথা এনে দিতে পারবে।

সেদিনই কিন্তু সাধক ভৈরব তাঁর সাধনাবলে সমস্ত ব্যাপার এমনিতেই বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর এগারজন বীরপুরুষকে আর প্রধান শিষ্য বিক্রমকে ডেকে বললেন—আজ রাত্রে সোমনাথের হাতে আমার মৃত্যু আছে। সে আমাকে হত্যা করবে, কিন্তু তাকে তোরা বাধা দিতে পারবিনে। ভৈরবানন্দ কথাগুলো বলে হাসতে সুরু করলেন। একটু বাদে আবার তিনি বললেন—অর্থলোভে সে তোদের ডাকাতির কথা আজ রামাদিত্যকে খুলে বলতে চলেছে।

সবাই আপত্তির সুরে বললে—তা' যাই হোক্—সোমনাথ আপনাকে শেষ কোরে দেবে, আর আমরা চুপ কোরে থাকব এ ত কিছুতেই হ'তে পারে না।

ভৈরব এবার আদেশের স্বরে বললেন—আমি বলচি, তাকে তোরা বাধা দিবিনে। সে যা কোরে যাবে তা থেকেই দেবগড়ের শুভদিনের সূত্রপাত হ'বে।

আবার মুখে তাঁর স্বাভাবিক হাসি এনে ভৈরব বললেন—তা ছাড়া আমারত মৃত্যুর সময় হয়েছেই; তোরা আমার ভক্ত হয়ে' যদি মৃত্যুকে এত ভয় করিস্ তবে চলবে কি কোরে?

ভৈরবের এ নিদারুণ কথার কেউ আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেলনা। কিন্তু তারা ভেবে কুল পেলেনা, ভৈরবানন্দের মৃত্যুতে দেবগড়ের শুভদিনের সূচনা হয় কি কোরে!...

সেইদিনই রাত্রি-অন্ধকারে বিশ্বাস-ঘাতক সোমনাথ, দেবগড়ের বড় সাধক মহাত্মা ভৈরবানন্দের রক্তাক্ত মস্তক নিয়ে চলেছিল, রামাদিত্যের উদ্দেশে!...কিন্তু যতই সে রাজবাড়ীর

কাছে এগোতে লাগল ততই তার মন অনুশোচনায় ভরে উঠতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসে গেল তার মনে। সে অবাক হয়ে' ভাবলে—সে কোরেছে কি? সমস্ত দেবগড়ের কল্যাণকামী মহাপুরুষকে সে করেছে হত্যা, শুধু তার সামান্য স্বার্থের জন্য! পরের ঘটনা তার মনে ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল: এর পরেইত দেবগড়ে আবার চলবে রামাদিত্যের অমানুষিক অত্যাচার—আরো বেশী কোরেই হয়ত চলবে—তখন কোথায় পাবে দেবগড়ের লোকেরা তাদের এত আপনার ভৈরবানন্দকে? ভাবতে ভাবতে সোমনাথের দু'চোখ বেয়ে জলের বন্যা নেমে এল।

যা' হয়েছে তার প্রতিকার নেই—শত কান্নাতেও আর ভৈরবকে ফেরাতে পারবে না সোমনাথ। দুঃখে সোমনাথ একেবারে অভিভূত হয়ে' গেল—তার পা যেন আর চলছিল না। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যেন হাজার শক্তি এসে তার মনকে ভর করল। সে যেন কি ভেবে নিয়ে তাড়াতাড়িতে রাজবাড়ীতে ছুটে চলল। সেখানে পৌঁছেই দেখলে রামাদিত্য রয়েছেন তার প্রতীক্ষায়।

রামাদিত্য সোমনাথকে অভিবাদন জানালেন। সে যে এত সহজে কাজ সেরে আসবে তা' ভাবতেই পারেন নি। খুসী হয়ে তিনি বললেন—তা হ'লে মাথা আনতে পেরেছ! বেশ বেশ, এবার আমার ডাকাতের দলে ভিড়ে যাও। তোমার পুরস্কার ত তুমি পাচ্ছই—কিন্তু ডাকাতিতেও যে বখ্‌রা পাবে তাও কম লোভনীয় নয়।

সোমনাথ যেন রাজার কথা শেষ হবারই অপেক্ষায় ছিল। রাজার কথা শেষ হতেই হোঃ হোঃ করে সোমনাথ এত জোরে হেসে উঠল যে সমস্ত রাজপ্রাসাদ যেন কেঁপে উঠল, কেঁপে উঠল রাজার মন—তিনি একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বেশী নয়...ক' মুহূর্ত্ত সময়! নিমেষে খাপ থেকে তরোয়াল বের করে এক আঘাতেই রামাদিত্যকে শেষ কোরে সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার আপনার বুকেও সে বসিয়ে দিলে—তার সেই শাণিত রক্তাক্ত তরবারি।......

পরদিনই সমস্ত ঘটনার বিবরণ ছড়িয়ে গেল দেবগড় রাজত্বে। রামাদিত্যের মৃত্যু-কাহিনী সবাই যেমন আনন্দের সঙ্গে শুনলে, তেমনি ভৈরবের মৃত্যুতে সবাই চোখের জল ফেলতে লাগল। একই দিনে আনন্দ-বেদনায় দেবগড়ের লোক আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

* * * *

তার পরে যা' হয়ে থাকে। কিছুদিন বাদে—অধিবাসীদের শোকের মাত্রা একটু কমলে—দেবগড়ের রাজা কাকে করা যায় তা' ঠিক কোরে ফেললে অধিবাসীরাই। রামাদিত্যের সন্তান-সন্ততি ছিলনা কেউ। দেবগড়ের লোকের জন্যে এত কোরেছে ভৈরব—তাই সবাইর

সম্মতিক্রমে ভৈরবের প্রধান শিষ্য বিক্রমই হ'ল দেবগড়ের রাজা। বিক্রম ভৈরবের আদর্শ নিয়েই রাজা হ'লেন।

কিন্তু ভৈরবানন্দের স্মৃতিকেত বাঁচিয়ে রাখতে হ'বে। দেবগড়ের লোকেরা ঠিক করলে ভৈরবের কালীমন্দিরকে আরো খুব বড় ক'রতে হবে—হ'লও তাই। আর রূপশ্রী নদীর বাঁকের মাঠের নাম হ'ল ভৈরবানন্দের মাঠ। আজও ভৈরবের মৃত্যু দিনে ভৈরবানন্দের মাঠে সবাই দেবগড়ের মহাপুরুষের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা জানায়—আর কৃতজ্ঞতায় তাদের মন ভরে ওঠে। দেবগড়ের অধিবাসীরা ভাল কোরেই জানে, ভৈরবানন্দের অপুর্ব্ব আত্মত্যাগই দেবগড়ের সমৃদ্ধির মূল—দেবগড়ের সবাই তাই ভৈরবানন্দের মঠকে তীর্থস্থানের চেয়েও বড় ভাবে, আর ভৈরবকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

তাই বুঝি রূপশ্রী নদীর এত হাসি, দেবগড়ের দুই তীরে এত ঔজ্জ্বল্য আর তার অধিবাসীদের এত সমৃদ্ধি!

শীতে কাশ্মীর, কাশ্মীরে শীত

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

আবার যাত্রা। কোল্‌কাতা ছেড়ে অবধি ঝোল-ভাতের মুখ দেখি নি। দিনে দু তিন বার করে রুটি আর মাংস, তা' ছাড়া প্রচুর ফল, চা আর ডিম। এ দেশের এই ধরণের খাবারের গুণেই শরীর আমাদের চমৎকার তাজা রয়েছে। এতো ঘোরাঘুরির জন্যে একটুও ক্লান্ত আমরা হই নি। একটুও শরীর ম্যাজম্যাজে করা তন্দ্রার ভূত আমাদের পেয়ে বসে নি।

পথে আর বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই। সেই রুক্ষ পাহাড়, মাঝে মাঝে গুঁড়ো গুঁড়ো রুপোর মত উজ্জ্বল তুষার দেবদারুর পাতায় আর দেহে ছড়িয়ে পড়েছে, ঝিলামের সেই একটানা ঝিরঝির। পাহাড়ী নদী। পাহাড়ী মেয়ের মতই চঞ্চল, দুরন্ত। কখনো সে ক্লান্ত হয় না। পাথর থেকে পাথরে তার স্রোতের কঙ্কন বাজিয়ে সে নিজের খুসিতেই ছুটে চলেছে।

তখন প্রায় তিনটে হবে। একটা ভয়ানক ফাঁড়া আমাদের কাট্‌লো। গাড়ী আমাদের উঠছে। ডান দিকে এবার মোড় নিতে হবে। ইলেক্‌ট্রিক হর্ণ বাজিয়ে আমাদের শোফার ড্রাইভিং হুইল সামান্য বাঁকিয়েছে এমন সময় অকস্মাৎ বুলেটের মত তীব্র গতিতে একটা বাসকে ওমোড় থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখা গেল। সে হর্ণ দেয় নি। গাড়ী চালানোর ধরণ দেখেই সহজে বোঝা যায় গাড়ী তার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। কয়েকটা অদ্ভুত উত্তেজিত মুহূর্ত্ত। কিন্তু অদ্ভুত আমাদের চালকের উপস্থিত বুদ্ধি। ডান দিকে মোড় না নিয়ে বাঁদিকে সে গাড়ী চালালো। সাম্‌নেই কয়েকটা বড় পাথর। তারপরেই খাদ। হাজার দুই ফিট নিঃসন্দেহে হবে। গাড়ী সজোরে পাথরে ধাক্কা লাগলো। এ দিকে বাসটাও আমাদের গাড়ীর পেছনে বেজায় জোরে একটা ধাক্কা মেরেছে। শোফার প্রাণপণে ব্রেক্ করেছে। বিকট একটা ঝাঁকুনি। গাড়ীর ফ্রন্ট গ্লাশটা টুক্‌রো টুকুরো হয়ে ভেতরে ছিটিয়ে পড়েছে। সাম্‌নে যে কাশ্মীরি ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁর কপাল আর হাত অনেকটা কেটে গেল। আমাদেরও সামান্য কিছু কেটেছিল। তবে গরম জামাকাপড়ের জন্য বেঁচে গেলুম। বিশেষ কিছু ক্ষতি আমাদের হয়নি। গাড়ী থেকে আমরা নেমে পড়লুম। উত্তেজনায় আর ভয়ে তখনো বুক ঢিপ ঢিপ করছে। গাড়ী এত জোরে ধাক্কা দিয়েছিল যে বেশ বড়সড় গোছের পাথরের একটা চাঁই পাহাড়ের গা বেয়ে সজোরে গড়িয়ে পড়ছে। ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে লাগলুম। পাথরটা তখনো গড়াচ্ছে। আর একটু হলে আমরাই হয়তো খাদে ও ভাবে গড়াতুম।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য বাস্‌-ড্রাইভারের ব্যবহারে। আমাদের সম্মিলিত চীৎকার উপেক্ষা করে সে পালালো। দাঁড়ালো না। দেখলো না মানুষগুলো কি রকম জখম হল। বাসের নম্বর আমরা টুকে নিলুম। প্রথমে ভেবেছিলুম এ গাড়ী আর চল্‌বে না। কাছাকাছি কোনো গ্রামে গিয়েই আমাদের রাত

কাটাতে হবে। রাওলপিণ্ডি থেকে অন্ত গাড়ী আসতেও সময় লাগবে। আগামী কালের আগে নয়। কিন্তু গাড়ীটা বিশেষ রকম জখম হলেও একেবারে অচল হয় নি। আমাদের ক্ষতস্থানে টিঞ্চার আয়োডিন ঘসে সবাই মিলে টানাটানি করে তুবড়ে যাওয়া অংশগুলো খানিক সোজা করলুম যাতে কোনো রকমে কাজ চলে। শোফার এঞ্জিন ঠিক করলো। সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী হয়ে গেল।

আবার গাড়ী চল্‌লো। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হল সামনের ভাঙ্গা কাঁচটা নিয়ে। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে আসছে। শীতে চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগলো। ব্যালাক্লাভা ক্যাপগুলো সবটা টেনে দিতে বাধ্য হলুম। পরস্পরকে দেখে এমন হাসি পাচ্ছিল তখন। প্রথম যে পুলিশ ষ্টেশান পড়ল সেখানে খবর দিয়ে আর কোথাও না দাঁড়িয়ে সোজা আমরা চললুম। ইতিমধ্যেই দেরী হয়ে গেছে। পৌছুতে বেশ রাত হবে।

আবার তুষার পেতে লাগলুম। দিন মিলিয়ে যাচ্ছে। আলো কমে আসছে। নির্জ্জন পাহাড়ে নীল কুয়াষার ওড়না ক্রমশ টেনে দিচ্ছে। পাহাড়ে সন্ধ্যা নামতে লাগলো। যেন বিরাট একটা পাখী সমস্ত দিন ঘুরে ধীরে ধীরে ডানা মেলে দিয়ে বাসায় ফিবে আসছে। অপরিচিত পথ। অপরিচিত রাজ্য। স্তব্ধ, নির্ব্বাক তুষার। চুপচাপ। বেজায় চুপচাপ। পথে লোকজন একেবারেই নেই। জীবনের চিহ্ন নেই। গাছগুলোকে দেখলেও জীবন্ত বলে মনে হয় না। সারি সারি শীর্ণ কঙ্কাল রক্তহীন শ্বেত তুষারের দেশে নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত সেই সময়টা। মনে হয়, কোথায় যাচ্ছি জানি না। মনে হয় এই যাত্রার যেন শেষ নেই। যেন মানে নেই। তবু যেতে হবে। তবু দাঁড়ানো সম্ভব নয়। অকারণে মন খারাপ হয়ে যায়।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় আর একটা পাহাড়ী গ্রাম পেলুম। সেখানে গাড়ী একবার থামাতে হল এঞ্জিনে জল দেবার জন্যে। বেজায় ঠাণ্ডা। ঝুপঝুপ করে কুঁচিকুঁচি গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। তুষার বৃষ্টি? প্রথমে বিশ্বাসই হয় না। গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। বাইরে যাকে বলে কুকুরের নাকের মত ঠাণ্ডা। দেখতে দেখতে আমাদের ওভারকোট, টুপি, জুতো তুষারে ঢেকে গেল। মোটারটা সাদা হয়ে গিয়েছে। এমন নিঃশব্দে তুষার পড়ে। লোকজন কেউ নেই। এখন গরম কিছু খাওয়া দরকার। এখানে ভাল সরাইখানা নেই। তবু যেতে হল। ভালোই লাগলো। বেশ নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা। ওভারকোট থেকে তুষার ঝেড়ে আমরা আগুনের পাশে দড়ির খাটে বসলুম। ভাঙ্গা পেয়ালায় গরম চা এলো। কী বস্তু যে খেলুম তা জানি না। তবে অদ্ভুত ভালো লেগেছিল। ঝিমিয়ে পড়া রক্ত গরম পানীয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। আর সময় নষ্ট না করে গাড়ীতে উঠলুম।

হেড-লাইট জ্বালিয়ে বেশ জোরেই গাড়ী চল্‌লো। কারণ এই তুষারবৃষ্টি আরো জোরে নামলে পথের মধ্যে যে কোনো জায়গায় গাড়ী আটকে যাবে। তখন বিপদের অন্ত থাকবে না। ভাঙ্গা কাঁচের মধ্যে দিয়ে গাড়ীর মধ্যেও তুষার আসতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে শোফারের সামনের খানিকটা জায়গা ছেড়ে একটা পুরু কম্বল আমরা বেঁধে দিলুম। এতে খানিকটা আরাম পাওয়া গেল।

বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। এখান থেকে পাহাড়ের ওপর কাশ্মীরের সমতল জায়গা পাওয়া গেল। প্রায় চল্লিশ মাইল পথ এখনো বাকী, বিশেষ কোনো বাঁক আর নেই.

উঁচু-নীচু নেই। যা ওঠবার আমরা উঠে এসেছি। এখানে তুষার বৃষ্টি নেই। এখানকার আকাশ স্বচ্ছ, পরিষ্কার। অনেক তারা! ওপরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা আকাশ। গাড়ী চল্‌লো! বিশেষ কিছু দেখা যায় না। শুধু দু পাশের মাঠ ধপধপে শাদা। ধূ ধূ করছে তুষারের স্তব্ধ মরুভূমি। নির্ব্বাক, নির্ম্মম। সেখানে জীবন নেই। জীবনের সমারোহ নেই। মৃত্যুর মত শান্ত, কঠিন, নিশ্চুপ। রাত্রির স্তব্ধ কালো আকাশ এই তুষারের মুকুরে যেন নিজেকে দেখছে। তারার অস্পষ্ট আলো সেখানে পিছলে যাচ্ছে। স্পন্দন নেই, চাঞ্চল্য নেই, কোনো রকম অনুভূতিই সেখানে নেই। পৃথিবীর কোনো চাঞ্চল্যের ছায়া নেই সেখানে। সব কিছু সে যেন জয় করেছে। একটা নিষ্ঠুর গর্ব্বে এই তুষারের ধূ ধু মরুভূমি যেন আত্মস্থ, সমাধিস্থ।

প্রায় ঘণ্টা খানেক এই রকমে চললো। আমাদের আর কথা বলবার উৎসাহ নেই। শুধু গাড়ীর একটানা গোঙানি। এই শেষহীন শব্দ নিস্তব্ধতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

এবার অন্ধকারে এমন একটা দুটো ম্লান আলো দেখা যেতে লাগলো। ঐ শ্রীনগর সহর। সেই বিখ্যাত দেশ। আমরা যখন পৌছুলুম অন্ধকার যেন গাঢ় হয়ে গিয়েছে। কিছুই দেখা যায় না। আমাদের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা করার কথা ছিলো। তিনিই আমাদের এখানে এ কদিন থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু তাঁর আর দেখা পাওয়া গেল না। আমাদের দেরী দেখে হয়তো তিনি চলে গিয়েছেন।

অগত্যা আমাদের সহযাত্রীরা স্থানীয় এক হোটেলে নিয়ে এলেন আমাদের। সেই হোটেলে আমরাই একমাত্র আগন্তুক দেখলুম। বন্ধুরা আবার আগামী কাল আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। জিনিষ পত্র নামিয়ে সেই অপরিচিত হোটেলের ভেতরে আমরা চললুম। সামনেই মস্ত উঠোন। সেখানে কম করে শ খানেক পাঠান উবু হয়ে রেডিয়োয় খবর শুনছে। তাদের ভীড় ঠেলে দোতলায় এলুম। একটা খালি ঘর চাকরটা খুলে দিলো। অনেক দিন কেউ সেখানে ছিলো না। পরিষ্কার করা হয় নি। বহুকাল, ধুলো জমে রয়েছে। একটা ঘরে দুটো খাট আনিয়ে বিছানা পেতে ফেললুম। লোকটা বাথরুমে জল দিয়ে গেল। মুখ হাত ধুয়ে নিলুম। এ হোটেলে আবার খাবার পাওয়া যায়না। চাকরকে পয়সা দিলুম, কোথাকার এক রেস্তোরা থেকে খান কয়েক রুটি আর দু প্লেট মাংস সে নিয়ে এলো। তথাস্তু। পেট ভরে তাই খেলুম। ঘরের ভেতর হিটারে চাকরটা কাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিল। হাত পা খানিক সেঁকে, চারদিক ভাল করে বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম।

শীতে হাত-পা আড়ষ্ট। প্রচুর গরম জামা আর গরম মোজা পরেই শুয়েছি। তবু ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর যেন জ্বালা করছে। আলো নেভানো ঘর। ঘুম আসছে না। বেশ বুঝতে পারছি অন্যজন ঘুমোয় নি। তবু কথা বলার উৎসাহ নেই। এই কদিনে কত দেশ ঘুরেছি, প্রায় হাজার দুয়েক মাইল হবে। কোল্‌কাতা থেকে কত কত দূরে! মাঝে রয়েছে কত অরণ্য, কত গ্রাম-সহর-পাহাড়-নদী। কোথায় আমার সেই নিরিবিলি শোবার ঘর যার জান্‌লার নীচে সবুজ লতা ক্রমশ পাতার হাত-পা মেলে দেয়াল বেয়ে উঠছে! ফাল্গুন কোল্‌কাতায় এসেছে। সেখানে শীত আর নেই। দক্ষিণ সমুদ্রের নতুন হাওয়ায় সমস্ত সহর হয়তো আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পথে হাসিখুসি মানুষের ভীড়। আর আমরা এখন কোথায়? এক নির্জ্জন পাহাড়ী হোটেলের ঠাণ্ডা ঘরে। বাইরে তুষারবৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার আকাশ। তারারা মুখ লুকিয়েছে। কাল সকাল না হলে কিছুই বোঝা যাবে না। কাশ্মীর অন্ধকারের বোরখা পরে

লুকিয়ে রয়েছে। এখনো দেখা দেয়নি। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না আবার নতুন সূর্য্য আসে। সূর্য্য? কাল আবার সূর্য্য উঠবে কি? সেই সুন্দর নিটোল, উষ্ণ সূর্য্য?

বাইরে নিঃশব্দে তুষার বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরের হিটারে আগুন আর নেই। শীতে হাত-পা জ্বালা এখনো থামে নি। আগামী সকালের কথা ভাবতে লাগলুম. সামান্য তন্দ্রা আসছে। কে জানে কি বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে! কে জানে আমরা হতাস হব কি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাবো!

আমাদের শরীরের উত্তাপে বিছানার ভেতরটা চমৎকার গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু লেপের ওপরটা কন্‌কনে। রাত্রে মাঝে মাঝে সেখানে হাত পড়েছিল। যতবারই লেপের বাইরেটার সঙ্গে শরীরের কোনো অংশ ঠেকে যায় ততবারই চম্‌কে উঠি। যেন বরফ ছুঁলুম।

ঘুম ভাঙ্‌লো। লেপের ভেতর থেকে বেরুতেই ইচ্ছে করে না। কটা বাজে দেখা দরকার। বন্ধুকে বল্‌লুম, খুব করুণ করেই বল্‌লুম, "টেবিলের ওপর ঘড়িটা রয়েছে। দেখোনা ভাই কটা বাজে"।

একটু আগেই সে আমাকে বল্‌ছিলো, "আহা, এই অবস্থায় ঠোঁটের কাছে যদি কেউ গরম চা এনে দিতো!"—অতএব সে জেগেই ছিলো। কিন্তু আমার অনুরোধের পর তার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তার চোখ বুজে গেছে। তার নাক ডাকৃছে। সে সশব্দে ঘুমুচ্ছে!

বিছানা ছেড়ে অগত্যা আমাকেই উঠতে হল। শীতে কুঁকড়ে গিয়েছি। ঘরের চারদিকে ধূলো। বারান্দার দরজার ওপরে তুটো শাদা কাঁচ বসানো। দিনের আলো তার মধ্যে দিয়ে চুইয়ে আস্‌ছে। কত বেলা হয়েছে ভালো করে বোঝা যায় না। রোদ উঠেছে কি না তা-ও বুঝলুম না। ড্রেসিং-গাউনটা গায় গলিয়ে নিলুম। ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে সেটা। হিটারে আগুন নেই। হিটারও হিম।

ঘড়িতে তখন দেখি সোয়া আটটা। সোয়া আটটা? আমাদের যে সাড়ে আটটার মধ্যে হাউস-বোটের খোঁজে বেরুবার কথা ছিল! দরজা খুলে বাইরে গেলুম। ঘরের চেয়ে বারান্দায় আরো অনেক বেশী শীত। অপ্রত্যাশিত শীতের ঝাঁকুনিতে যেন নিতান্ত বোকা বনে গেলুম। শীতকালে কোল্‌কাতায় মেট্রো থেকে বাইরে বেরুলে যে রকম লাগে এ অনেকটা সেই ধরনেরই অভিজ্ঞতা। সমস্ত হোটেলটা হাঁ-হাঁ করছে। এক্কেবারেই ফাঁকা। ফ্যাকাশে আলোয়, শীতে আর ধূলোয় ঠিক যেন অনেক কালের পোড়ো ভাঙা হানাবাড়ী বলে মনে হয়। কেউ কোথাও নেই। দাঁত ঠক্‌ঠক্ করছে, তার মধ্যে দিয়ে কোন রকমে চীৎকার করে ডাকতে লাগলুম, "বোয়্, বোয়্"—কিন্তু যে স্বর বেরুলো তা শুনে নিজেরই হাসি পাচ্ছিল—ওই ব্যাঞ্জনবর্ণ আর স্বরবর্ণের মধ্যে একটা অনাবশ্যক কম্পিত সুরের ব্যবধান।

কিন্তু, কাকস্য পরিবেদনা। কোথাও কেউ নেই। এ তো বিষম জ্বালা হল দেখচি। কিন্তু তাকে না পেলে কোন উপায়ও নেই অতএব রবার্ট ব্রুসের প্রকৃত ছাত্রের মত অনর্গল চীৎকার করতে লাগলুম। বন্ধুবর লেপের তলায় ব্যাপারটা অনেকটা আঁচ করে নিয়েছে। আমাকে সে উপদেশ দিতে লাগলো, "ওহে, তোমার খেয়াল সুর ছেড়ে ভীমপলশ্রী কিংবা বাগেশ্রী ধর।"

বল্‌লুম, "যা অবস্থা দেখচি তাতে কোন সুরেই বর্ত্তমানে শ্রী-মানের দেখা পাওয়া যাবে না। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার মন্ত্র জানা থাকলে হয়তো কাজে লাগতো।"

"তা হলে শামুকের মত আবার বিছানায় ঢুকে পড়। আর এসো গলা ছেড়ে তুজনে সুর ভাঁজা

যাক। সকালবেলা গলা সাধার উত্তম সময়। আর এ'রকম সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার না-ও আস্‌তে পারে!"

ফিরবো কিনা ভাবছি। এমন সময় শ্রীমানের সাক্ষাৎ মিললো। হাতে তার দস্তানা, সমস্ত শরীরে পুরু কম্বলের জামা আর পা-জামা, মাথা আর কান একটা পুরু লোমশ টুপিতে ঢাকা। আমাকে দেখে একমুখ সে হাসলো, বল্‌লো, "গুড্-মর্ণিং সার," জিগগেস করলো, রাত্রে কি রকম ঘুম হয়েছিলো; কোন অসুবিধা হয়েছিল কি না। কোন রকম সৌজন্যের অভাব নেই।

বিছানার মধ্যে তখনো বন্ধুবর। সেখান থেকে তার সুললিত বিশুদ্ধ হিন্দীতে সে বল্‌লো, "এতক্ষণ কাঁহা ছিলে? ডাকাডাকি কর্‌তা হায়, ক্ষিদেয় পেট জ্বলতা হায়,—তুম্‌কো ক্যায়া মানুষ হায়? জল্‌দি গরম পানি আউর চা আর আণ্ডা আউর টোষ্ট আউর··· ······"

বল্‌লুম, "ওহে সংক্ষেপ কর। বেচারি গুলিয়ে ফেল্‌বে যে।"

"···আউর যা-যা পাওয়া যাতা-হায় সবকুছ বোলাও।" আমার বাধা উপেক্ষা করে সে তার কথা শেষ করলো।

লোকটা কি বুঝলো জানি না। আকর্ণ বিস্তৃত হেসে বললে, "বহুৎ আচ্ছা 'জুর।"

প্রায় ফুটন্ত গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এলুম। লোকটা চটপটে আছে। কোথা থেকে একটা ছোট টেবিল ক্লথ্ জোগাড় করে সে সকালের খানা প্রস্তুত করে রেখেছে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিলো। খাওয়া শেষ করে স্নান করার ইচ্ছে প্রকাশ কল্‌লুম।

"বহুৎ আচ্ছা, 'জুর।" মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লোকটা জানালো সব কিছু প্রস্তুত। এরপর স্নান। চারদিক বন্ধ করে প্রায়-ফুটন্ত জলে আবার স্নান। গায়ে ময়লা জমে ছিল। ভালো করে সাবান মেখে স্নান শেষ করলুম। কিন্তু সে-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। গায়ে জল ঢালতেই হুস্-হুস্ করে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো! রাশি রাশি অজস্র ধোঁয়া। প্রথমে ভয় হল। মনে হল, সত্যিই বুঝি উবে যাচ্ছি! কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোন চিহ্ন আমার থাকবে না। ধোঁয়া হয়ে যাবো বাষ্প হয়ে যাবো, পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবো।—এ বেশ ভুতুড়ে ব্যাপার যা হোক!

সমস্ত ঘর বাষ্পে ঢেকে গেছে। ভালো করে কিছু দেখাই যায় না। হাঁৎড়ে তোয়ালেটা খুঁজে গা মুছলুম। না এখনো বাষ্পীয় হই নি।

স্নান শেষ করে বাইরে এলুম। স্নানের পর কি অদ্ভুত সুন্দর লাগে। সেই ধারালো শীত আর নেই। সেই দাঁতে-দাঁত-লাগা, ঠক্-ঠক্ করে হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগা ভৌতিক শীত। সমস্ত শরীরে আশ্চর্য্য একটা চাঞ্চল্য। জল দেহ থেকে সমস্ত জড়তা ধুয়ে দিয়েছে। ঝরঝরে লাগছে। যেন গভীর ঘুম থেকে এই মাত্র জেগে উঠলুম।

এর পর আবার গরম জামা-কাপড়ের মধ্যে চঠপঠ ঢুকে পড়া। আবার হোল্ড-অল বাঁধা। সুটকেস সাজানো।

তখন ন'টা। হোটেল থেকে আমরা বাইরে এলুম। দিনের আলোয় এই প্রথম শ্রীনগরের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ওপরে কুয়াসা-জড়ানো থম্‌থমে মেঘলা আকাশ, মাঝে-মাঝে কন্‌কনে খেয়ালী হাওয়া রাস্তার পাশেই ফুটপাথের ওপর কয়েকজন এ-দেশী লোক আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে (শুধু নাক বার করে

রেখে) উঁচু হয়ে বসে গল্প-গুজোব করছে, কয়েকটা ছেলে গুলি খেলছে, একটা লোক গাধার পিঠে দুধের বোতল সাজিয়ে চলে গেল। দু'পাশে বাড়ী, পুরোণো আর ভাঙা আর বিবর্ণ। এই ধরণের সমস্ত দৃশ্য দিয়ে কাশ্মীর আমাদের অভ্যর্থনা করলো। সবাইকার কাছেই শুনেছিলুম শ্রীনগর সহরে আর যাই থাকুক শ্রীর একান্ত অভাব। সহর যেমন নোংরা তেমনি পুরোণো। কাশ্মীর মানে কোনমতেই শ্রীনগর নয়। তাই মনে-মনে আমরা খানিকটা প্রস্তুত ছিলুম। তবু এতটা প্রস্তুত ছিলুম না। একটু দমে গেলুম।

শ্রীনগর সহর কিন্তু অন্য পাহাড়ী সহরের চেয়ে অন্য রকম। পাহাড়ের ওপর এই সহর একেবারে সমতল। কোথাও উঠতে হয় না, নামতে হয় না। সত্যি করে বলতে কি চারদিকে পাহাড় না থাকলে মনে করাই কষ্টকর হত আমরা সমুদ্রের চেয়ে একাধিক হাজার ফিট ওপরে রয়েছি। লম্বা সমতল পিচের পথ, বড় বড় মাঠ, ঝিলামের জলে স্রোত নেই বললেই চলে। সমতল জায়গার সঙ্গে এতোটুকু তফাৎ এর নেই।

কিছু দূরে কয়েকটা টাঙা ছিলো। একটা টাঙা ভাড়া করলুম। বললুম আমাদের 'পাব্লিক্ ইনফর্মেশান্ বুরো'তে নিয়ে যাও। সেখানেই মিঃ জ'া কাজ করেন যাঁর অতিথি আমাদের হবার কথা ছিলো। অফিস বিশেষ দূরে নয়। পোষ্ট আফিসের পাশেই। তাড়াতাড়ি কয়েকটা চিঠি পোষ্ট করে আমরা মিঃ জ'ার খোঁজে গেলুম। আমাদের সৌভাগ্য, ভদ্রলোককে অফিসেই পাওয়া গেল। সহকর্ম্মীদের সঙ্গে তিনি হিটারে হাত-পা সেঁকছিলেন। নিজেরাই পরিচয় দিলুম। ভদ্রলোক শুধু লাফিয়ে উঠতে বাকী রাখলেন! আমাদের জন্যে তিনি নাকি গত তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছেন। গতকালও সন্ধ্যে সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত মোটার কোম্পানীতে তিনি ছিলেন। আমাদের জন্যে সব রকম ব্যবস্থাই প্রস্তুত; হাউসবোট থেকে, সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থেকে, সব কিছু।

আর সময় নষ্ট করা হল না। ভদ্রলোক তক্ষুণি ছুটির দরখাস্ত করে আমাদের সঙ্গে টাঙায় এসে উঠলেন। আমরা আপত্তি জানালুম। আমাদের জন্যে কেন তিনি অনর্থক অফিস কামাই করবেন। ভদ্রলোক সে কথা কানেই তুললেন না। আগেই বলেছি এ দেশের অতিথির আশ্চর্য্য সম্মান। আমরা তাঁর অতিথি। অতএব আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, ভালো-মন্দ, এক কথায় আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই ওপর।

সময় আমাদের কম। হোটেলেই তাই দ্বিপ্রহরিক আহার শেষ করে, বিল চুকিয়ে, মানপত্র নিয়ে আমরা আবার টাঙায় এসে উঠলুম। ভদ্রলোক টাঙা-ওলাকে বললেন য়ুরোপিয়ান ক্লাব ঘাটে যেতে। সেখানে আমাদের জন্যে হাউসবোট প্রস্তুত। এ সময়ে হাউসবোটে প্রায়ই ইলেকট্রিসিটি পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক অনেক কষ্টে সে ব্যবস্থা করেছেন, বললেন। পাবলিক ইন্‌ফরমেশান বুরো'র কাছেই য়ুরোপিয়ান ক্লাব ঘাট। টাঙা থেকে নেবে নদীর পাড়ে উঠলুম। আর চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

কাছেই ঝিলাম একটা মোড় নিয়েছে। স্থির, নিশ্চল সবুজ জল। এখানে হাউসবোটের ভীড় বিশেষ নেই। অন্য পারে নিষ্পত্র, ঋজু সারি সারি গাছ। তার পেছনে, অনেক দূরে স্বপ্নের মত তুষারের পাহাড়— এতো অস্পষ্ট যে প্রয়াস মেঘ বলে মনে হয়। বাঁ-দিকের তুষারের পাহাড় আরো কাছে, তাই অনেক স্পষ্ট। পাহাড়ের চূড়োয় চাম্‌চে করে কে যেন শাদা তুষার ঢেলে দিয়েছে, সেগুলো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আস্‌ছে।

আমাদের পেছনে আর একটা ছোটো পাহাড়। সেটাই সব চেয়ে কাছে। তার ওপর ছোট্ট শাদা একটি মন্দির; শঙ্করাচার্য্যের মন্দির। সেখানে উঠলে পাখীর দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত সহর দেখা যায়।

ঝিলামের ওপর হাউসবোটের জন্যে ভাড়া দিতে হয়। সব জায়গায় এই ভাড়া সমান নয়। এক-একটা ঘাটে এক এক রকম ভাড়া। এই য়ুরোপিয়ান ঘাট খুব ফাঁকা আর পরিষ্কার। সেজন্যে এখানকার ভাড়া বেশী।

ভদ্রলোক আঙুল তুলে দেখালেন আমাদের জন্যে যে হাউসবোটটা ঠিক হয়েছে। অন্য পারে সেটা রয়েছে। ধবধবে, শাদা। দেখলুম সেখান থেকে ছোট্ট একটা নৌকো নিঃশব্দে এ পারে আসছে। এ-ধরণের ছোটো-ছোটো নৌকোকে এখানে শিকারা বলে। ও শিকারা আমাদেরই জন্যে। ওতে চেপে পারাপার হতে হয়।

এখানে শিকারা খুব চলে। প্রত্যেক হাউসবোটের সঙ্গে শিকারা থাকে। তা' ছাড়া তরি-তরকারি, ফলমূল এই শিকারা করে বিক্রী করতে আনে। বেড়াবার জন্যে শিকারা ভাড়াও পাওয়া যায়। সেগুলো কিছু ভালো। বসার জায়গায় কুশান পাতা, ওপরে একটা চালও আছে। এ-দেশী ছেলে-বুড়ো সবাই শিকারা চালাতে অভ্যস্ত। দেখলুম নেহাৎ ছোট্ট শিকারায় তার চেয়েও বাচ্চা ছেলেমেয়ে একা একা অম্লান বদনে নদীর ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এতোটা অভ্যস্ত যে মনেই থাকে না তারা জলে না স্থলে রয়েছে।

আমাদের শিকারা এসে পারে আটকালো। জরির টুপি আর নীল সার্জ্জের গলাবন্ধ কোট ও ঢল্‌ঢলে পাজামা পরে বছর সাতাশ-আটাশের এ-দেশী এক যুবক ওপরে উঠে এলো। হাউসবোট এরই। নাম সুলতান। চমৎকার ইংরিজি বলতে পারে। হাউসবোটের সব লোকেরাই ভালো ইংরেজি জানে। প্রথমে বেশ আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। মজা লেগেছিল। যাক্, আর মারাত্মক হিন্দী বলতে হবে না।

আমরা হাউসবোটে উঠলুম। চমৎকার সাজানো হাউসবোট। বেশ বড়। প্রচুর জায়গা। গোটা তিনেক বেড-রুম, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম, স্টোর রুম, বাথরুম এতে আছে। প্রত্যেকটা ঘরই সুন্দর। ভালো ফার্ণিচার আর পুরু কারপেটে সাজানো। আমাদের মালপত্র দুটো বেড-রুমে তারা সাজিয়ে রাখলো। বিছানা পেতে দিলো। আমরা ড্রয়িং-রুমের সোফায় বসলুম। সুলতান হিটারে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। তারপর আমাদের জন্যে চা আনতে গেল।

সেই জীর্ণ ধূলিমলিন হোটেলের অন্ধকার ভূতুড়ে ঘরের পর ঝিলামের বুকে প্রথম শ্রেণীর বাংলোর মত সুন্দর হাউসবোট আমাদের এতো ভালো লাগলো! জানলার পর্দ্দা সরিয়ে আমরা দেখতে লাগলুম। তুষারের পাহাড়ে মাঝে মাঝে রোদ চমকাচ্ছে, আকাশে ব্যস্ত মেঘেরা দলে দলে কোথায় চলেছে, একদল পাখী উড়ে চলেছে কোথায়, সবুজ ঝিলাম, শান্ত, পাহাড়ের আর আকাশের ছায়া পড়েছে, এতো শান্ত জল আর এতো স্তব্ধ ছায়া কল্পনা করা যায় না, মাঝে মাঝে এক একটা শিকারা চিরচির করে তাদের চিরে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জোড়া লাগতে তাদের দেরী লাগে না। সত্যি, আশ্চর্য্য এই ঝিলাম, এই ছায়া। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। মনে হয় এটা বুঝি জল নয়, এটা বুঝি ছায়া নয়। অথচ পথে এই ঝিলামকেই দেখেছি। দুরন্ত, উচ্ছ্বসিত। হাসিতে আর চাঞ্চল্যে পাহাড়ী মেয়ের মত। কিন্তু এখানে তার ভঙ্গী বদলে গেছে।

এখানে সে যেন তার সমস্ত চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করে তেজানু হয়ে বসেছে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। এখানে সে নিষ্কম্প, সংযত, সমাহিত।

সুলতান ট্রেতে করে চা নিয়ে এলো। মিঃ জঁ চা তৈরী করতে লাগলেন। পাশেই বুক শেল্‌ফে হাউসবোটের ছোট্ট লাইব্রেরি। মজা লাগলো। বইগুলো পরীক্ষা করতে লাগলুম। এলোমেলো সব

তুষার বৃষ্টির পরে—কাশ্মীর।

বই। এখানে বাইবেল আছে, শেক্‌স্‌পীয়ার আছে, হাসির বই আছে, দীর্ঘ উপন্যাস আছে, ভ্রমণ-কাহিনী আছে, কুকুর সম্বন্ধে বই আছে, পাজল বুক আছে, আরো কত কী! ছোট্ট বুক্‌শেল্‌ফে সব ধরণের পাঠককে মোটামুটি খুসী করার মত বইয়ের অভাব নেই।

চা খেতে-খেতে আজকের প্রোগ্রাম ঠিক হল। এখন সাড়ে বারোটা। একটা নাগাদ মোটারে আমরা বেরিয়ে পড়বো। উলর লেক আর গুল্‌মার্গ দেখে সময় থাকলে সন্ধ্যেয় সহর দেখে, শপিং করে, শিকারা চড়ে বোটে ফিরবো। একটিও মুহূর্ত্ত নেই নষ্ট করার মত। সময় এতো কম। অথচ এতো দেখার জিনিষ। এবং সব জায়গাই এখান থেকে বেশ দূরে, মাইল পঁচিশ, ত্রিশ এবং আরো দূরে। [ক্রমশঃ

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ধারাবাহিক উপন্যাস

সুকুমার দে সরকার

বৈশাখী পূর্ণিমা—আমাদের যাত্রা সুরু। দিগন্ত ছড়ানো রৌদ্রময় দিন; শান্ত শিথিল। কালবৈশাখীর চিহ্নমাত্র নেই, হৃদয় ভরপুর। এমন কি দুই ভবঘুরে মামা আর উপেনবাবুর মনের চাপা উত্তেজনাও যেন আমি অনুভব করছিলাম। আমাদের অবস্থা অনেকটা থেমে থাকা চলমান এঞ্জিনের মত—রুদ্ধবেগে কম্পমান। তবু যাবার মুহূর্ত্তে, মুহূর্ত্তের জন্য কালবৈশাখীর কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল আমাদের মধ্যে।

ড্রয়ারটা খুলে মামা প্রায় চীৎকার করে উঠলেন "উপেন পুঁথির পাতাটা কোথায় গেল?"

উপেনবাবু বলে উঠলেন "অ্যাঁ?"

"মামা?" নীচু গলায় ভয়ে ভয়ে আমি বললাম, "কাল পদমপৎ এসেছিল, পুঁথির পাতাটা চাইতে। আমি দিয়ে দিয়েছি।"

এক মুহূর্ত্ত ঘরে অসহ্য নিস্তব্ধতা। তারপরে মামা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, "করেছিস কি হতভাগা?"

প্রথম বসন্ত বাতাসে বনের নিভৃত কোণে মাকড়সার জালের সূক্ষ্ম তন্তুগুলো যেমন কাঁপে, মামার মুখের কুঞ্চনগুলো কাঁপছিল তেমনি। সেদিকে চেয়ে আমার আর কথা বললে সাহস হোল না।

৩

উপেনবাবু ধীর স্বরে বললেন, "উত্তেজিত হয়ো না জয়দ্রথ ! আগে শোনা যাক !" তারপরে আমার দিকে ফিরে "কেন দিয়ে দিলে স্থরথ ? তুমি ত সব জানতে !"

নীচু স্বরে বললাম, "পুঁথির পাতার সবটা দিইনি আমি, ম্যাপটা কেটে রেখে দিয়েছি !"

আবার এক মুহূর্ত ঘরে সেই নিস্তব্ধতার কলরব। একটা গভীর ইদারায় একটা ঢিল ফেললে যেমন সেটার জলে গিয়ে আঘাত করতে খানিকটা সময় লাগে, আমার কথার অর্থ প্রথমটা ওঁদের অন্তস্থল স্পর্শ করতে তেমনি খানিকটা সময় নিল। পরমুহূর্ত্তে উপেনবাবু উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, "জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ ! তোমার ভাগ্নেকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য্য হচ্ছি। উঃ কি সহজ আর তীক্ষ্ন !"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না উপেন !" মামা গম্ভীর গলায় বললেন।

"বুঝতে পারছ না ? জলের মত সোজা। ম্যাপ ছাড়া পুঁথির পাতাটার কোন মুল্যই নেই, ওদিকে পাতাটা নিয়ে পদমপৎ ব্যস্ত থাকলে আমরা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়তে পারব। ও আমাদের দিকে নজর দিতে পারবে না।"

মামার চোখ দুটো ঈষৎ স্ফীত হোল। তারপরে তাঁর মুখ দিয়ে একটা সন্তুষ্ট ঘোঁৎকার বার হোল "হুঁ ! পদমপৎকে যদিও এত কাঁচা লোক আমি মনে করি না তবুও চেষ্টাটা বুদ্ধির কাজই হয়েছে।"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে মামা তাকালেন আমার দিকে। সাবধানতার খাতিরে আমরা সকলে এক সঙ্গে বাড়ী থেকে বার হইনি। উপেনবাবু আগের গাড়ীতে কলকাতায় চলে গেলেন। সেখানে আমাদের পর্ব্বতারোহণের সরঞ্জাম তিনি যোগাড় করে রেখেছিলেন। তার পরে রাত্রে আমি আর মামা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার মুহূর্ত্তে কোন অনুভূতিবশে মা হঠাৎ আমাকে বুকে চেপে ধরেছিলেন, তাঁর চোখের কোলটা চকচক করছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

ট্রেণ ছুটে চলেছে হুঁঙ্কার করে। দুপাশে মাঠ ঘাট বৃক্ষশ্রেণী ঘুরতে ঘুরতে পেছিয়ে যাচ্ছে। বৈশাখী ঘূর্ণি হাওয়া মাঠের মাঝে মাঝে পাগলামী সুরু করে দিচ্ছে। গাছের ছায়ায় গরু মহিষের দল প্রকাণ্ড শরীরগুলো এলিয়ে জাবর কাটছে, রাখাল ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তে। পৃথিবী বিশ্রান্ত, পৃথিবী শিথিল। শুধু যত উদ্দাম কল্পনা বাসা বেঁধেছে আমার মনে। গরম হাওয়ায় দৃশ্যমান জগৎ কাঁপছে, ঝিমঝিম করছে। আমার চোখে সবই নতুন সবই রঙীন, পৃথিবী ধীরে ধীরে তার বিস্ময় খুলে দিচ্ছে আমার চোখে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—এই, এই পৃথিবী একদিন পুরাণো হয়ে যায় মানুষের চোখে—ওই ঢেউ খেলান বিস্ময়, এই সর্পিল রাঙ্গামাটীর পথ, এই চোখ ভরা আলো ? আর কিছু না থাক পৃথিবীর এই পথের রহস্যই ত জীবন ভরিয়ে রাখতে পারে। মনের মধ্যের যাযাবর নর অতৃপ্ত উল্লাসে কলরব করে উঠেছে। নতুন দেশ, বিস্ময়কর মানুষ--আজও আজও পৃথিবী অজ্ঞাত !

একটা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে আমরা উঠেছিলাম; কামরাটা খালি। আমি বসেছিলাম জানালায়, মামা আর উপেনবাবু বার্থে গা ঢেলে দিয়েছিলেন। উপেনবাবুর মৃদু হাসির শব্দে পেছন ফিরতেই তিনি সস্মিত মুখে বললেন, "পৃথিবীটা ভারী আশ্চর্য্য না বাবাজী ! তোমার মনটা যদিও আজ আমাদের নেই তবুও পথের মায়া কাটল কই ? কোথায় এই বয়সে ঘরে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে কাটাব, না ছুটেছি সোনার মায়ার পেছনে।"

বললাম, "শুধু সোনার মায়া ?"

"আর কি ?"

"আবিস্কার ! নতুন দেশ অদ্ভুত মানুষ !"

মামা ঘোঁৎ করে উঠলেন, "ও সব বাজে ! অতিরঞ্জন প্রাচ্যের একটা দোষ, এখন সোনার পেছনে ছুটছি সোনা পেলেই আমি খুসী ! গাড়ীতে ওঠবার সময় ভাল করে দেখেছ উপেন ? কোন ভুটিয়া বা হুনিয়া পেছু নেয়নিত ?"

"দেখতে ত পাই নি।" উপেনবাবু বললেন।

"হুঁ ! সাবধানের মার নেই।" মামা পাশ ফিরে চোখ বুঝলেন।

ক্রমে আমিও দেহ এলিয়ে দিলাম। ট্রেণ যাত্রার একটা একঘেয়েমী আছে। সেই দোলা, সেই উর্দ্ধশ্বাসগতি, সেই লাইনে কাটাকুটি আর গতির সেই ধুয়ো—ঘট্ ঘট্ ঘট্টা ঘট। তার সঙ্গে স্থর মিলিয়ে ছড়া আওড়াতে ইচ্ছে করে আর ছড়া বলতে বলতে ঘুম আসে। ছড়ার সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার সম্বন্ধ। মনে পড়ে যায় মায়ের স্নিগ্ধ কোল। কোথায় চলেছি স্নেহনীড় ছেড়ে ? মরিচীকা যাত্রা ? কোথায় যাত্রার শেষ ? আর অজানা অবান্ধব দেশে কি অপেক্ষা করে আছে ? বিপদ না আবাহন ? জয় না পরাজয় ?

ঘট্ ঘট্ ঘট্টা ঘট...ঘুম, ঘুম···ঘুম ঘুম······

কখন খুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ বাঁ হাতের আঙ্গুলে একটা টান পড়ায় ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। মুখের ওপর একটা কালো ছায়া, ছায়াটার ফাঁকদিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে, মিট মিট। ট্রেণের গতি থেমে গেছে। পরমুহূর্ত্তেই চীৎকার করে উঠলাম আর ট্রেণটা নড়ে উঠে হুইশ্ল দিল। সে চীৎকারে ঢেকে গেল আমার চীৎকার।

"মামা ! মামা !" আবার চীৎকার করলাম। ট্রেণটা তখন চলতে স্থরু করেছে।

মামা আর উপেনবাবু একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন, "কি ? কি হয়েছে স্থরথ ?

"একটা মুখ-আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল।"

"তোর ওপর ? কে কেন ?"

"আমার আংটি ? হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে উঠলাম।

"কি আংটি ?

পদমপতের আংটির কথা বললাম।

"হুঁ !" মামা চিন্তিত স্বরে বললেন, "বলেছিলাম পদমপৎ কাঁচা লোক নয় !"

"কিন্তু উপেনবাবু বললেন, "যতদূর জানি পদমপৎ মিথ্যা কথা বলার লোক নয়। সে আংটি হাতে থাকতে কোন তীর্ব্বতি আক্রমণ করতে পারে না। লোকটা কোথায় ছিল ?"

"জানালা দিয়ে ভেতরে ঝুঁকে ?"

"কি রকম দেখতে ?"

আর একটা কালো বীভৎস মুখ আবার আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। অন্ধকারে স্পষ্ট তাকে দেখিনি এবং যা দেখেছিলাম, ভয়ের উত্তেজনায় তখন ভাববার সময় পাই নি। এখন উপেনবাবুর কথায় ভেবে দেখেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলাম,—মামা! মামা?"

"কি?"

"লোকটা···লোকটা···"

"কে? বলনা—"

"হরিদাস! তোমার চাকর!"

ক্রমশঃ

গোপন কথা

শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত

সে দেশের রাজার নিন্দা করবার যো নেই। ভা...রী ন্যায় বিচারক। এত চমৎকার তাঁর বিচার করবার প্রণালী যে বাদী ও প্রতিবাদী দুই তরফই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী ফিরত।

সেই রাজ্যে থাকে এক ঘর চাষী গৃহস্থ। বাপ ব্যাটা আর শ্বাশুড়ী বৌ।

বৌটী ভারী লক্ষ্মী—শান্ত—শিষ্ট, মুখটী বুজে ঘরের কাজ কর্ম্ম করে, একটী টুঁ শব্দ কখনও তার মুখ থেকে পাওয়া যায় না।

আর শ্বাশুড়ী! হাঁ তা...ভাল বৈকি! মার ধর করেন বৌকে এ কথা কেউ বলতে পারে না। তবে বৌ মানুষ—তাকে একটু শাসনে রাখা ভাল। তাকে যদি যখন তখন ভালটা মন্দটা খাওয়ান হয়, তা হলে স্বভাব বদ হয়ে যাবে, শেষে যখন তখন 'খাই খাই' করবে সেইজন্যই তিনি কোনও ভাল জিনিষ বৌকে দেন না যখন যেটুকু হয় স্বামী পুত্তুরকে দেন, আর নিজে একটু আধটু চেখে দেখেন, আর তাঁর ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কবে আছেন কবে নেই, তাই এটা সেটা মুখে দেন বৈত নয়।

একদিন গিন্নীর ছেলে জাল ফেলে প্রকাণ্ড একটা মাছ ধরেছে—সেইটা কাঁধে ফেলে হাসতে হাসতে মার কাছে এসে সে বললে—"দেখ মা কত বড় মাছ ধরেছি আজ খুব কসে খাব।

—এই বলে বাপ ব্যাটা দুজনে মাঠের কাজে চলে গেল, গিন্নীও আহ্নিক পূজো সেরে 'এটুকু সেটুকু' দিয়ে 'পিত্তি রক্ষে' করে বৌকে রান্না বান্না সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে যথা নিয়মে

পাড়া বেড়াতে বেরোলেন, বৌ ডাল ভাত চড়িয়ে মাছ কুটতে বসল। টাটকা জলজ্যান্ত মাছটা দেখে সেদিনে বৌটার বড্ড লোভ হল। বৌ মনে করল, 'শ্বাশুড়ীর যা ব্যবস্থা তাতে এত বড় মাছের এক টুকরোও হয়ত আমার বরাতে জুটবে না, তার চেয়ে এক কাজ করি, এখন ত কেউ কোথায়ও নেই—খানকতক মাছ ভেজে খেয়ে ফেলি যদি তা হলে ত কেউ দেখতে পাবে না।" যা মনে করা তাই কাজ! রান্নাঘরের এক পাশে বসে বৌ তৃপ্তি করে খেয়ে উঠোনে কুয়ো পাড়ে হাত ধুতে এসে দেখে সর্ব্বনাশ—

খিড়কী দুয়োর খোলা পেয়ে কাদের জানি ছাগল এসে উঠোনে যে ধান শুকোচ্ছিল সেগুলি পরমানন্দে খাচ্ছে। ছাগল দেখে ভয়ে বৌটীর আত্মা পুরুষ শুকিয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি আঁচলে হাত মুছে ছাগলকে মিনতি করে বলল—"ছাগলু! ঠাক্‌রোন্‌কে যেন একথা বলনা।"

ছাগল তার কথা ভ্রুক্ষেপও করল না।

বেচারা বৌ বারবার মিনতি করতে লাগল। ছাগল কিন্তু নির্ব্বিকার—ঘাড় নেড়ে নেড়ে মনের সুখে ধানই চিবুচ্ছে। বিপদ দেখে বৌ এবার তার একটী পা জড়িয়ে ধরে সেই উঠোনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। এদিকে শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রোন্ পাড়া বেড়ান সেরে—বড় মাছটার কোন পদ কখানি তিনি নিজে খাবেন তারই হিসেব করতে করতে আসছেন। এসে দেখেন ভাতের ফ্যান উথলে পড়ে উনুন নিভে গেছে, ডাল পুড়ে কালো হয়েছে, মাছের কতকগুলো কাঁচা, কতকগুলো ভাজা হয়েছে, মাছি ভ্যান ভ্যান করছে, আর একটা বেরাল মাছের ন্যাজাটা সাপটে ধরে কায়দা করবার চেষ্টা করছে।

বৌয়ের কোনও পাত্তা নেই।

ব্যাপার দেখে গিন্নী অবাক। বৌ গেল কোথায়? এদিক সেদিক উঁকি মেরে উঠোনে এসে দেখেন—কি কাণ্ড! তিনি কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ঠাওরে ঠাওরে দেখে ভাবলেন—বৌ যখন সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলে ছাগলের পা জড়িয়ে পড়ে আছে তখন ত এ ছাগল 'সামান্যি' নয়। করলেন কি—তিনিও অন্য পাটী ধরে সটাং শুয়ে পড়লেন।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেল। বাপ ও ব্যাটা মাঠের কাজ সেরে এক গা ঘেমে মুখ চোখ লাল করে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ী এল। এসে দেখে তাদের পা ধোবার গাড় গামছা বা দাওয়ায় বিছানা মাদুর পাখা কিছুই নেই।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে দুই জনে ইতি উতি চাইতেই সেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল। ব্যস! কিসের বা পা ধোওয়া, কিসের বা হাওয়া খাওয়া দুই জনে ছাগলের বাকী দুটী পা ধরে সেইখানে ভূমিষ্ঠ হল!

এম্নি করে সন্ধ্যা হল। ছাগলের পেট ভরে ধান খাওয়া হয়েছে, এবার ছাগল বাড়ী যেতে চায়, কিন্তু চার জনে এম্নি শক্ত করে তার পা ছেঁদে আছে যে তার চলৎ শক্তি রহিত। অগত্যা বেচারা পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগল।

তার চ্যাঁচানীতে হোক বা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই হোক ছাগলের মালিক সেখানে উপস্থিত। সে এসে ব্যাপার দেখে হতবুদ্ধি। লোকটা ছাগলটাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু তারা কিছুতেই ছাড়ে না। নিরুপায় হয়ে সে অগত্যা রাজদরবারে নালিশ করল।

ন্যায় বিচারক রাজা পাইক পেয়াদা পাঠালেন তাদের ধরে আনতে—এবং অবিলম্বে রাজ আজ্ঞা প্রতিপালিত হল।

রাজামশায় বুড়ো চাষা ও ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন তোমরা এর ছাগল আটক করে ছিলে?" বাপ ব্যাটা হাত জোড় করে বলল—"হুজুর আমরা খাটনা সেরে এসে দেখি ওরা শ্বাশুড়ী বৌ অমনভাবে পড়ে আছে, তাই হুজুর আমরাও করেছিলাম, কোনও মন্দ উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না।"

মহারাজ তখন শ্বাশুড়ীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলেন। শ্বাশুড়ী বললে—"ধর্ম্মাবতার! বৌ অমন করে পড়েছিল তাই আমিও অমন করেছিলাম।" রাজা তখন বৌকে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ কিছুতেই কথা কয় না—কেবল থরথর করে কাঁপে। রাজামশাই বিস্তর অভয় দেওয়ার পর সেই গোপন কথাটী বৌ বলল। রাজামশাই হেসে খুন; এই কথা?...এর জন্য এত ভয়!...তখনই রাজার আদেশে ঢ্যাঁঢরাদার বেরিয়ে পড়ল। সে পাড়ায় পাড়ায় ঢ্যাঁঢরা দিয়ে ফিরতে লাগল: ডুম্! ডুম্! ডুম্! শোন সবাই পাড়ার লোক: গেরস্তর বৌ চুরী করে মাছ খেয়েছে সে কথা যেন কেউ কাউকে বোলোনা।

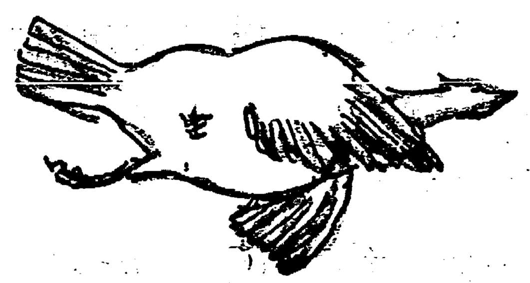

বিশ্বম্ভর পাঁড়ে

পতিত পাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী যাবে দরকারী কোন কাজে,
পূজার সময় ঠেলাঠেলির মাঝে;
তখন ট্রেনে-চড়া মানে—
যারা চড়ে তারাই জানে।
যে-প্যাসেঞ্জার সকাল বেলা ছাড়ে
উঠ্‌ল তাতেই—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

মাল-পত্তর বেশ গুছিয়ে নিয়ে,
বাক্সটাকে বাঙ্কে তুলে দিয়ে,
কম্বলটা বিছিয়ে নিয়ে,
খৈনী খানিক মুখে দিয়ে,
পড়লো শুয়ে—জায়গা পাছে কাড়ে।
চালাক খুবই—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

রাত আট্‌টায় মোগলসরাই যাবে,
সেইখানেতেই খাবার কিছু খাবে।
তারপরেতে গাড়ী ধরে,
এম্‌নি ধারা বিছ্‌না ক'রে,
ঘুম দিয়ে রাত কাটাবে নিঃসাড়ে।
ঠিক ক'রলো—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

ছাড়লো গাড়ী বাজ্‌লো যখন বাঁশি;
ফুট্‌লো মুখে নিশ্চয়তার হাসি।
তন্দ্রার ভান গেল ছুটে,
তড়াক্ ক'রে বস্‌লো উঠে,
আনন্দে তার গান চাপ্‌লো ঘাড়ে,
ছাড়লো গলা—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

সেদিন যে কী গ্রহের ছিল ফের,
পথের মাঝেই দেরী করলো ঢের;
মোগলসরায়েতে নেমে
শুনে, সে তো উঠ্‌লো ঘেমে
এক্‌সপ্রেস্‌টা এই বুঝি বা ছাড়ে!
হাঁক্‌ল 'কুলি'—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

'আপ্' কি 'ডাউন' না জেনে কিছুই,
ছুট্‌লো বেগে কুলির পিছু পিছুই।
ধড়ফড়িয়ে কুলি শেষে,
যে-কামরাতে দিল ঠেসে
সবাই ঘুমায়, অঙ্গ নাহি নাড়ে।
তাতেই ওঠে—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

এক দিকেতে বাঙ্ক যা ছিল খালি
তার উপরেই শয্যা দিল ঢালি।
কোনো মতে পেট ভরিয়ে,
বাক্সটাতে মাথা দিয়ে
শোবা মাত্র নাকের ডাকও বাড়ে।
দিল্লী চলে—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে।

সকালে তার ভাঙ্‌ল যখন ঘুম
দ্যাখে সবার মাল নামাবার ধূম।
শুনে সে তো হারায় দিশে;
এমন তারা হ'লো কিসে!
উঠ্‌লো যেথা—দিল্লী যাবার চাড়ে,
ফিরলো সেথায়—বিশ্বম্ভর পাঁড়ে॥

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

ধারাবাহিক উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

রঙ্গন সর্দ্দার খানিক বসে থাকে। আকাশ আগুন হয়, বালু তেতে ওঠে, তপ্ত মহাসমুদ্র জ্বলন্ত রূপোর মত উতাল দেয়।

রঙ্গন সর্দ্দারের মনে রহস্যের জালে গিঠের পর গিঠ পড়তে থাকে!

তখন, বেলা যখন তুপুর, রঙ্গন সর্দ্দারের পিছনে এক ক্রোশ তফাতের হিঙ্গল গাঁয়ে ঢোল নাকাড়া বেজে ওঠে, এক হাজার জেলে-বাড়ীতে এয়োরা শাঁখে ফুঁ দেয়, দিন তুপুরে তুয়ারে প্রদীপ জ্বালে, ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ গান গেয়ে ওঠে, "রাজা এসেছে রে তার রাণী নিয়ে সঙ্গে।"

কুঙ্কুম, বয়েস তার সতেরো, রঙ্গন সর্দ্দারের নাতনী, আলুথালুবেশে ছুটে আসে, খানিকটা হাঁপিয়ে নেয়, দম নেয়, তারপর বলে, "দাতু! ঘরে আয়! রাজা আর রাণী এলো যে।"

হুঁস ভেঙে রঙ্গন বলে, "রাজা রাণী— ?"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ!"

কিন্তু রঙ্গন সর্দ্দার আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কুঙ্কুম শুধোয়, "হ্যাঁরে দাতু, হাতে তোর এ কোন্ রাজার কৌটা, আর বালুতে এই লেখা তুই লিখেছিস?"

'হাতে তোর এ কোন্ রাজার কৌটো'—কথাটা রঙ্গন সর্দ্দারের রহস্য-অন্ধকার মনে

যেন একটা প্রদীপ জ্বেলে ধরে! 'কোন্ রাজার কৌটো'—কথাটা সে বারবার বিড়বিড় করে আওড়াতে থাকে। হিঙ্গল গাঁয়ে কোন্ রাজাকে শাঁখ বাজিয়ে তোলা হল ঘরে? এই নক্সাকাটা অপরূপ সুন্দর কৌটো, মহাসমুদ্র এই কৌটো উপহার দিল কি সেই রাজাকে? আর বালু তীরে এই যে রহস্য-লেখা, এ লেখা কি মহাসমুদ্রের চিঠি, এই নূতন রাজার কাছে?

রঙ্গন সর্দ্দার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, নক্সাকাটা কৌটোটা বগলে চেপে বলে, "চল্ যাই, রাজা রাণীর কাছে।"

মানুষের জীবনে, পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কখনো আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে! যার সঙ্গে যার আর দেখা হবার কথা নেই, হঠাৎ তাদের দেখা হয়ে যায়, সপ্তসমুদ্রের ঢেউয়ের শেষে মহারণ্যে অজগরের মাথায় জ্বলে সূর্য্যমণি, সহস্র যোজন দূরের রাজপুত্রকে এসে ধরা দেয় সেই মণি।

রঙ্গন সর্দ্দারের পাওয়া নক্সাকাটা কৌটো আর হিঙ্গলগাঁয়ের সমুদ্রতীরে কুড়িয়ে পাওয়া রাজারাণী, উভয়ের দেখা হয়ে গেল।

রাজারাণী ক্ষিতিভূষণ ও রঙ্গিলা। মহাসমুদ্রের ঢেউয়ে তারা ভেসে আসে হিঙ্গলগাঁয়ের উপকূলে।

রঙ্গন সর্দ্দারের হাত থেকে নক্সাকাটা কৌটোটা নিতে গিয়ে ক্ষিতিভূষণের হাত কেঁপে যায়! রঙ্গিলা রুদ্ধশ্বাসে বলে ওঠে, "অমরলতা পুঁথি! এ পুঁথি কালীভূষণের নৌকোয় তুলে দিয়েছিলুম! কালীভূষণ কোথায়!"

ক্ষিতিভূষণের বুক ভরে' ওঠে, চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। রঙ্গন সর্দ্দারের একটা হাত বজমুষ্টিতে চেপে ধরে' বলে, সর্দ্দার, এ কৌটো কোথায় পেলে!"

রঙ্গন সর্দ্দার রহস্যময় স্বরে বলে, "যেখানে লেখা আছে—কালীভূষণ মরল! কালীভূষণ বাঁচল!"

পাগলের মত ক্ষিতিভূষণ ছুটে চলে। সঙ্গে রঙিলা, আর হিঙ্গলগাঁয়ের জেলে-জেলেনীরা!

কিন্তু কোথায় সেই বালু রাশির উপর রহস্যময় লেখা! মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের জোয়ার এসে কখন মুছে দিয়ে গেছে।

ক্ষিতিভূষণ পাষাণের পুতুলের মত চুপ হয়ে যায়।

"কালীভূষণ কি আর নেই!" ক্ষিতিভূষণ উদাস স্বরে শুধোয়!

রঙিলা বলে, "না ক্ষিতিভূষণ, কালীভূষণ বাঁচল—রহস্যময় লেখা একথা বলছে।"

"কিন্তু কালীভূষণ মরল—রহস্যলিপি একথাও যে বলছে রঙিলা। মানুষ কি মরে কখনো বাঁচে?"

"কখনো কখনো বাঁচে বৈকি ক্ষিতিভূষণ।"

"যেমন?" ক্ষিতিভূষণ কঠোর।

"যেমন তুমি ছিলে বোম্বেটে, বোম্বেটে মরে গেছে, এখন তুমি ক্ষিতিভূষণ নূতন হয়ে বেঁচে উঠলে, অমরলতার তপস্যায় দীক্ষা হল তোমার!"

কালীভূষণের এই মৃত্যুর কথাই কি লিখেছে রহস্যলিপি? এই লিপি লিখেছে কে? সে কি কালীভূষণ? হায় মহাসমুদ্র! ঢেউয়ের আঙুল দিয়ে লেখা মুছে দিয়ে রহস্যকে মর্ম্মান্তিক করে তুলেছ তুমি? না হলে, হয়তো ক্ষিতিভূষণ সেই বালুরাশির উপরের লেখা দেখে বুঝতে পারত কালীভূষণের হাতের লেখা কি না!

রঙিলা ক্ষিতিভূষণের হাতটা আলগোছে ধরে' বলে, "কালীভূষণের হাতে অভিযান তুলে দিয়েছেন মহর্ষি। তার মৃত্যু নেই। ভেবোনা ক্ষিতিভূষণ!"

ক্ষিতিভূষণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "এই অমরলতার পুঁথি নিয়ে আমরা কী করব রঙিলা? মহর্ষির কাছে ফিরে যাবো।"

"না, এই পুঁথি নিয়ে আমরা কালীভূষণের জন্য অপেক্ষা করব। কিন্তু ঘরে বসে অপেক্ষা করা নয়। সবুজ দ্বীপ পঁচিশ বছর পরে মহাসমুদ্রে তলে চলে যাবে—উঠতে তারপর আরো পঁচিশ বছর। এসো, আমরা সবুজ দ্বীপে পাড়ি জমাই। সেখানে কালীভূষণের আসার পথ চেয়ে বসে' থাকি। সে এলে তাকে পথ ছেড়ে দিই।"

"যদি না আসে কালীভূষণ—কখনোও যদি না আসে?"

"তা হতে পারে না—তাহলে মহর্ষি মিছে, অমরলতা মিছে।"

[ক্রমশঃ

আলোকের দান

মাষ্টার তারা

ঘুম ভাঙ্গতেই এক ঝলক ভোরের আলো মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়ে ছুটে এসে জানিয়ে দিল তার আগমন বার্ত্তা,—চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে জানালা দিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম......কি সুন্দর ফুলগুলি......। লাল, নীল, হলদে! ভারী সুন্দর, না? রাত্রির অন্ধকারে ওরা যে কিরকম ছিল তা কেউ জানতে পারে নি, কিন্তু দিনের আলো ফুটতেই দেখছতো—কিরকম ওরা খুসীতে ভরে উঠেছে—? ওদের খুসীর কথা আমরাও বুঝতে পারছি—কে বুঝিয়ে দিচ্ছে? —আলো! রাত্রির অন্ধকারে এই পৃথিবী যখন ঢাকা ছিল তখন কে জানতো সে এতো সুন্দর, সে এতো উপভোগ্য। কিন্তু বহু দূরের বার্ত্তা নিয়ে আলোক দূত এসে যখন পৃথিবীর দুয়ারে হানা দিল—তার স্পর্শে, তার প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই হ'ল যখন দর্শনীয়, তখন আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের এই পৃথিবী কত অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভরা।

—ওই যে দূরে নদীর ধারে আগাছার সঙ্গে দু'একটী কাশ-ফুল ফুটে রয়েছে, তার মধ্যেও কত না সৌন্দর্য্য লুকান রয়েছে। কিন্তু যার প্রভাবে এরা এতো রমনীয়, সেই আলো, তাকে দেখেছ কি? না, সে দেখা দেয় না, আলোর আলোকিত পদার্থই আমরা দেখি—কিন্তু আলোক-কে দেখা দেখা যায় না। নিজেকে গোপন রেখে সবাইকে প্রকাশ করাই ওর স্বভাব।

আলোক এসেছে অ-নে-ক দূর থেকে খু-উ-ব দ্রুতগামী গাড়ী চড়ে, এসেছে সূর্য্যোলোকের বার্ত্তা নিয়ে, বহু জ্যোতিস্কের বার্ত্তা নিয়ে আর তোমার পৃথিবীর বার্ত্তা নিয়ে—কিন্তু কি করেই বা সে এল, কোথা হতেই বা সে এল, ওর পরিচয়ই বা কি? এ প্রশ্ন তোমাদের মনে আজ যেমন জেগেছে, শত শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন ঋষিদের মনেও একদিন তা অমনি জেগেছিল। তাঁরা বলতেন আলোক হচ্ছে একটি গতি, যে আলোর তেজ আর ঔজ্জল্য যত বেশী সে আলো তত দূর পর্য্যন্ত বেশী যায়।—যায় তো? কিন্তু কি যায়? মনীষী নিউটন এর উত্তর দিলেন, তিনি বললেন—আলো হচ্ছে বিশ্বের একটি শক্তি। কোন বস্তুর ওপর আলো পড়লে আলো থেকে এবং তার শক্তির প্রভাবে সেই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ছুটে এসে আমাদের চক্ষু পটে আঘাত করে, আর আমাদের দৃষ্টিকে ও অবাধ স্থানকে ভরিয়ে তুললেই সেখানে আলোর অনুভূতি প্রকাশ পায়।

চোখের বিচারে আলোককে সাদা বলে মনে হলেও সাত রঙের মিলনে তার জন্ম। একটি তেশিরে কাঁচ বা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মিকে যেতে দিলে দেখবে যে তার সাদা রঙ ভেঙ্গে সাত রঙ হয়ে পড়েছে—বেগুনী, ঘননীল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা ও লাল। এই বর্ণ সপ্তকের নামই বর্ণালী।

আকাশে রামধনু দেখা দিল। তখনও হাসি কান্নার মত সামান্য বিষ্টি পড়ছে, আর সূর্য্য ও মেঘের

আড়ালে ঢাকা নেই। সূর্য্যের ঠিক অপর দিককার আকাশে ঝলমলে রামধনু উঠেছে। সেইজন্য তখনকার সময়টা হবে সকাল না হয় বিকেল। এটা হয় কেন জান—? সূর্য্যের আলো বৃষ্টিকণার মধ্য দিয়ে সাঁতারে পার হবার সময় ভেঙ্গে সাত রঙে পরিণত হয়, আর সেই সাত রঙ প্রতিফলিত হয় আকাশের অপর প্রান্তের মেঘের কোলে রামধনু হয়ে।

দিনের আলোতে বাগানে দেখছ তো কত রঙের ফুল ফুটে রয়েছে—ফুলটি লাল, পাতাটি সবুজ, ফলটি হলদে, এরকম কেন হয় ? আমরা জানি সূর্য্যের সাদা রঙে—সাতটি রঙ লুকানো রয়েছে,—গাছের ফুলটির ওপর সূর্য্য-আলো যখন গিয়ে আঘাত করলো, তখন ফুলটির আণুবিক ধর্ম অনুযায়ী সাত রঙকটির মধ্যে লাল রঙটি ছাড়া বাকী সব কটি রঙ আত্মসাৎ করে ফেললো, অবশিষ্ট লাল রঙটি ছিটকে এসে আমাদের চোখে লালের অনুভূতি জাগালো। সবুজ পাতাটিও বাকী দুটি রঙ নিয়ে ছেঁকে সবুজ রঙটিকে ফিরিয়ে দিলো, ফলটি হলদে রঙটিকে প্রত্যাপান করলো। এই রকমে নানান জিনিষ নানান রঙের আমরা দেখি। ধর যে আলোতে লাল, সবুজ ও হলদে রঙ নেই—সেই আলোটি যদি গাছটির ওপর গিয়ে পড়ে—তাহলে ঐ ফুল, পাতা ও ফল কোন রঙকেই ফিরাতে পারবে না—ওদের রঙ তখন হবে কালো। এই জন্য দিনের বেলায় অনেক জিনিষকে যে রঙের দেখায়, রাত্রের আলোতে তা দেখায় না। তোমরা সচরাচর যে সমস্ত রঙ দেখে থাক তা আসলে হচ্ছে মাত্র চারিটি,—এদেরি নানান অনুপাতে মেশাবার ফলে নানান রঙ্এর সৃষ্টি হয়। আমাদের দেহ ও মনের ওপর আলোর এই রঙ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

নীল—বর্ণ সপ্তকে তলার দিকে এর স্থান, এর ওয়েভ লেঙ্থ (রঙএর ঢেউ এর মাপ) সবচেয়ে ছোট মাত্র $\frac{১}{৬৬০০০}$ ইঞ্চি ; এর গতিও সবচেয়ে বেশী বক্র, এইজন্য পৃথিবীতে আসবার সময় বায়ুকণা একে গ্রাস করতে পারে না, তাই আকাশ নীল—। এর দিকে চাইলে মন জুড়িয়ে যায়—একটি শান্ত, শীতল ভাবের পরিচায়ক ; তাই কি আকাশের দিকে চাইলে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে ?

লাল—বর্ণ সপ্তকের সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গ যুক্ত বর্ণ, এর ওয়েভ লেঙ্থ $\frac{১}{৩৩০০০}$ ইঞ্চি ; তীব্র জীবনের লক্ষণ—একটি কর্ম চাঞ্চল্যের পরিচায়ক, তাই কি আমাদের রক্তের রঙ লাল, পশুরা লালকে দেখলে তাইজন্য কি চঞ্চল হয়ে ওঠে ?

হলদে—নতুন উৎসাহ ও তীব্র কর্ম প্রেরণা আনে, শীতের পর বসন্তের আগমনে আমাদের দেশে বাসন্তী রঙের এত প্রচলন তাইজন্য কি—তাই কি নানান অনুষ্ঠানে হলুদের এত ব্যবহার ?

সবুজ—হলদে ও নীলের মিলনে এর জন্ম, হলদের ঔজ্জ্বল্য আর নীলের স্নিগ্ধতায় এর সৃষ্টি হয়েছে, এ পেয়েছে একটি চোখ জুড়ান ভাব, অথচ প্রাণে একটি উৎসাহের সাড়া এনে দেয়।

ঘন নীল—লালের তীব্রতা ও নীলের প্রশান্তির কোলে এর জন্ম—একটি স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক। এর দিকে চাইলে মনে একটি শূন্যতা ও থমথমে ভাবের সৃষ্টি করে, যেন প্রলয়ের পূর্বলক্ষণ।

কমলা—হলদে ও লালের মিলনে এর জন্ম, লালের তীব্রতা ও হলদের কর্মব্যস্ততার ছোঁয়াচ লেগে এ হয়ে উঠেছে—অশান্ত, কিন্তু উত্তেজনা, ও বিশ্রাম জানে না, একটি হাল্কা ছলছলে ভাবের সৃষ্টি করে।

সাদা—প্রশান্ত পবিত্র ও অনাড়ম্বর ভাবের পরিচায়ক,—এর অভাব বলে কিছুই নেই, এ আত্মসাৎ করতে জানে না—আলো পড়লে তার সব কটি রঙকেই ফিরিয়ে দেয়, এর যেন সব সাধ মিটে গিয়ে

একটি পরিপূর্ণ শান্তি এসেছে। বাড়ীর ঘর দোরে চুণ মাখাবার ব্যবস্থা থাকায় বায়রে তাতে কম আর ঘরে বেশী আলো হয়। ছাতার কাপড়ের রঙ কালো না হয়ে সাদা হলেই ভাল হত। সাদা খুব ঠাণ্ডা ; বিশ্বস্রষ্টার নিয়মে তাই কি বয়বৃদ্ধের মাথার চুল সাদা, তুষার এত ঠাণ্ডা ?

কালো—বিজ্ঞানে বলে কালোর কোন রঙ নেই, কালোর সকল রঙের অভাব,—একটা বিরাট রিক্ততা একে ঘিরে রয়েছে। এতো বড় বুভুক্ষু যে কোন রঙ এসে পড়লেই তার সবটিকে সে আত্মসাৎ করে নেয়, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। সূর্য্যের আলো এতে এসে পড়লে না পারে পার হতে, না পারে ফিরে আসতে, তাকে বন্দী করে, তার সমস্ত শক্তি আত্মসাৎ করে ও নিজে শক্তিমান হতে চায়। তাই কি কালো পর্ব্বত ও লোহার এতো শক্তি ?

চীনে বাদাম

শ্রীকান্ত

‘চিনে বাদাম কে নিবিরে’ কে যায় পথে হেঁকে,
এক পয়সার নে কিনে ভাই বাদামওয়ালায় ডেকে।
‘চাইরে বাদাম’ সন্ধ্যা বেলায় রাস্তা-ভরা সুর
ভাজা বাদাম হাল্কা সোয়াদ কড়কড়ে মুড়মুড়।
চীনের বুদ্ধি চিনে-বাদাম ? বুদ্ধি বলিহারী
এই মুলুকের মাটিতে হয় চীনেবাদাম ভারি।
দুই ঋতুতে দুইটী ফসল জাহাজ আছে ঘাটে
টঙ্কা ফেলে বাদাম নেবে দেশবিদেশের হাটে।
বোম্বেওলা মাদ্রাজীরা চালান দিয়ে মাল
বাদাম বেচে, মূল্য লুটে দালান দেবে কাল।
লক্ষ্মীছাড়া বাংলা মুলুক বুদ্ধি ছাড়া ঢং
বিদেশ থেকে বাদাম কিনি আমরা যেন সং।
এই দেশে শোন্ মাটির তলে লুকিয়ে আছে টাকা
চীনে বাদাম চাষ করে তোল ফসল ঝাঁকা ঝাঁকা।
বাদাম গাছের শিকড় ভরা আছে মাটির মুঠা
পোড়ো জমি ফলাও করে মিটায় মাটির ক্ষুধা।
চীনে বাদাম দে বুনে রে ফলটা পাবি হাতে
দেখিস কি ধন লুকিয়ে আছে চীনে বাদামটাতে ॥

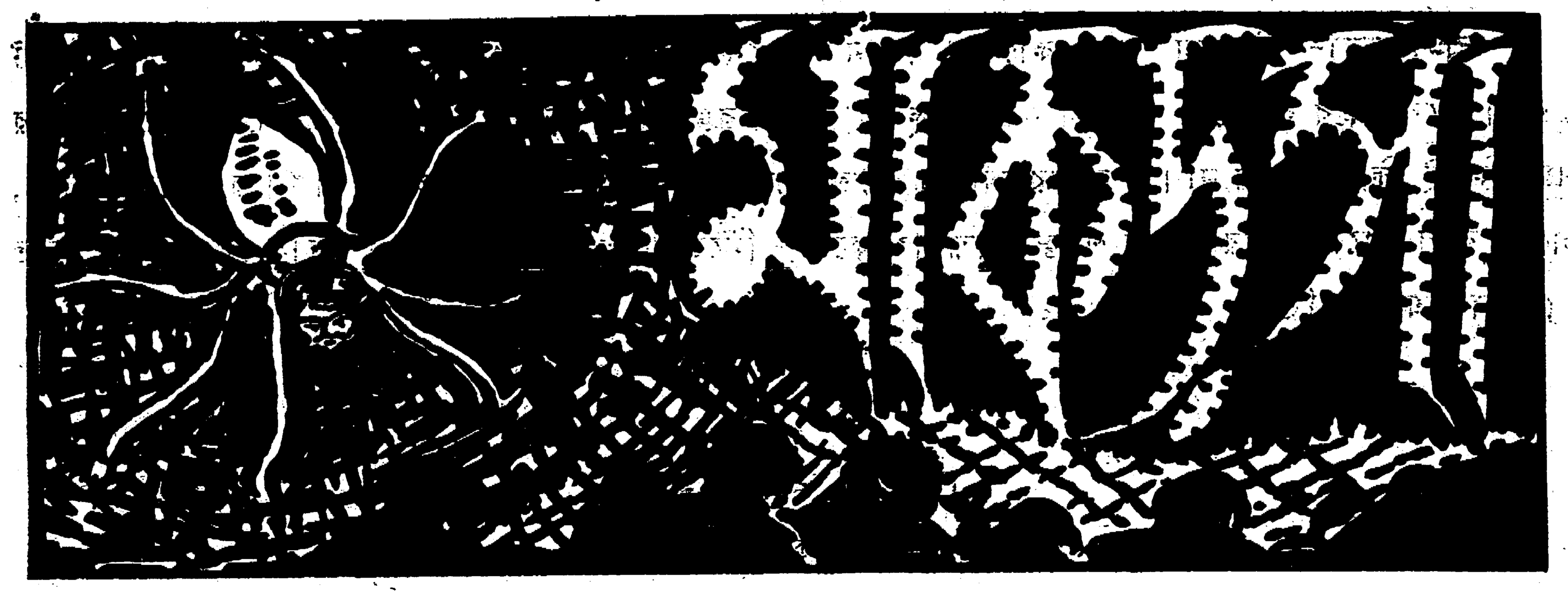

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ধারাবাহিক উপন্যাস

রজত সেন

চাবি !

জহর যেন স্বপ্ন দেখছে !

তার চার পাশে কলরব, রাস্তায় গাড়ী আর মোটারের শব্দ সমস্ত তার কাছে মনে হল স্বপ্ন। কিসের এ চাবি ? এ-চাবি নিয়ে কি তার দরকার ? গণেশ বাবু তাকে এটা দিয়েছেন কেন ? কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তার সমস্ত চিন্তার সূত্র জট পাকিয়ে যাচ্ছে, ভালো করে, ধারাবাহিক ভাবে সে কিছুই ভাবতে পারছে না ; নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে চাবিটা সে ঢুকিয়ে রাখলে পকেটে।

গণেশ তাকে আকর্ষণ করে বললে, 'কি হে ! বোকার মত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো ? চল, চা খাবে ? ক্ষিধে পেয়েছে ?'

জহর উত্তর দিলে না, শিবু বললে, 'বেশ ! চলুন !'

চা খাচ্ছিলো তারা নিঃশব্দে ! কারুর মুখে কোন কথা নেই।

'তোমরা সবাই চুপচাপ যে আজকে ?' উৎসাহিত কণ্ঠে গণেশ বললে, 'কথাবার্ত্তা বলছো না যে ? আজকের কাগজ দেখেছো ?'

সে জানতো খবরের কাগজ তারা পড়ে না কেউই ; যদি না ভালো খেলাধূলোর ব্যাপার কিছু থাকে !

'না, দেখি নি', জহর বললে, তার মনের মধ্যে যে-সব কথা ভীড় করছে অনবরত, সে-সব কথা সে ভুলতে চায়, জোর করে দূরে ঠেলে রাখতে চায় সে ভাবনা।

'ভারি মজার এক খবর বেরিয়েছে,' গণেশ বললে, 'বিলেতে একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—তাকে যে ধরতে পারবে সে নিজে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবে। বিজ্ঞাপনটা অবশ্য পুলিশের উদ্দেশ্যে ! সে আবার স্পষ্ট করে লিখেও দিয়েছে কোন কোন দিন কোথায় কোথায় সে চুরি করবে ! কি সাহস বলতো ?'

'বাজে খবর !' বঙ্কিম বললে, 'বোধ হয় মজা করবার জন্যে খবরের কাগজে ও-রকম একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে !'

'না হে ! ওরা মিথ্যে বাহাদুরি করে না !' গণেশ একটা সিগারেট ধরালো, 'লোকটা প্রথমে সিকাগোতে, তারপর প্যারিসে ক্রমাগতঃ কয়েকটি দুঃসাহসী চুরি করে এখন লণ্ডনে এসেছে ! আমেরিকার পুলিশকে নাকের জলে চোখের জলে করে তবে সে পালিয়ে এসেছিলো প্যারিসে ! অথচ এমন রাস্তা ছিলো না যেখানে তার ফোটো এবং তাকে ধরতে পারলে পুরস্কারের বিজ্ঞাপন না ছিলো ! পুলিশের তীক্ষ্নদৃষ্টি এড়িয়ে কেমন করে সে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাবো একবার !'

শিবু আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে আছে গণেশের মুখের দিকে। জহর আর বঙ্কিমের মুখ দেখে মনে হল না তারা খুব বেশী আশ্চর্য্য হয়েছে গল্পটা শুনে ; ডিটেকটিভ উপন্যাসে অমন বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা তারা পড়েছে। তবু দূর দেশের সেই অজ্ঞাতনামা, দুঃসাহসিক ডাকাতের উদ্দেশে তারা আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারলে না।

'আমাদের অত সাহস নেই,' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গণেশ বললে, 'যাই তোমরা বল। সামান্য ছোট-খাটো ব্যাপারেই আমাদের হাতপা ঘামে, মাথা ঝিমঝিম করে। কৈ দেখি চাবিখানা জহর !'

চারপাশে একবার তাকিয়ে সে চাবিখানা টেবলের ওপর রাখলে। গণেশ চাবিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'একটু দুঃসাহসের কাজ বৈকি ? পারবে কি তুমি ?'

চা খেয়ে আর বিলেতের অজ্ঞাতনামা ডাকাতের গল্প শুনে জহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। 'না পারবার কি আছে ?' প্রায় তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বললে।

'বেশ ! বেশ !' গণেশ তার পিঠে কয়েকটি মৃদু চাটি মেরে বললে, 'কিন্তু মৎলব ঠিক করেছো ?'

'কাল দুপুর বেলা !' শান্ত কণ্ঠে জহর বললে।

গণেশ বিস্মিত হল। দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার আগেই জহর পুনরায় বললে, 'কাল মা গড়পাড়ে যাবেন দুপুর বেলা, বাড়ী ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে, আমার শরীর ভালো নেই বলে স্কুলে যাবো না। দুপুরের দিকে—'

'তাই ত বলি—' বাধা দিয়ে গণেশ বললে, 'দুপুরে তুমি থাকবে বাড়ী, অথচ সিন্ধুক খুলে বাইরের লোক এসে টাকা কড়ি নিয়ে গেল আর তুমি মোটেই টের পেলে না ?'

জহর এই সম্ভাবনা ভেবে দেখেনি আগে, তবু সে বললে, 'বাবা আমায় কোন দিন সন্দেহ করেন নি !'

'তাতে কি ? কোনদিন সন্দেহ করেন নি বলে আজও করবেন না এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া ভেবো না তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছো। এই বয়সেই ছেলেরা দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে সেটা তোমার বাবা জানেন না ভেবো না। না, স্কুলে তুমি আসবে, তোমাদের টিফিন হয় কটার সময় ?'

'দেড়টা।'

'কতক্ষণের জন্যে ?'

'আধঘণ্টা !'

'বেশ ঠিক ঐ সময়েই তোমার কাজ সারতে হবে, স্কুল থেকে তোমাদের বাড়ী পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট, আবার ফিরতে পাঁচ মিনিট, আরও কুড়ি মিনিট তোমার হাতে থাকে, ঐ কুড়ি মিনিটে তোমায় কাজ করতে হবে। তোমার মা গড়পাড়ে যাবেন ক'টার সময় ?'

'এই খেয়ে দেয়ে—এগারোটা সাড়ে এগারোটা এমন সময়।'

'বেশ, বাড়ীতে আর কে কে আছে ?'

'একটি ঠাকুর আর একটি চাকর।'

'দেড়টার সময় ওরা খেতে বসে, খাওয়া হয়ে গেলে ঠাকুর চলে যায়, চাকর বাসন মাজতে বসে, প্রায় তুটো আড়াইটার সময় সে শুতে যায়, সিঁড়ির নীচেই সে শোয়, যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়।'

'ঐ হচ্ছে তোমার সময়। কিন্তু মনে থাকে যেন ঠাকুর বা চাকর তোমায় যেন কেউ দেখতে না পায়।'

জহর বিনা-উত্তেজনায় গণেশের প্রত্যেকটি কথা শুনলে।

'যদি তুমি অন্য সময়ে ক্লাস পালিয়ে বাড়ী যাও, তোমার বাবা স্কুলে খোঁজ করবেন, প্রত্যেকটি ক্লাসে তুমি উপস্থিত ছিলে কিনা। বেশ, কালকেই। জানো তো কথা আছে—শুভ-কাজে বিলম্ব করতে নেই।'

চা-পানের পর ওরা যে-যার বাড়ী ফিরলো।

টিফিনের বেল বাজবার সঙ্গে সঙ্গে জহর উঠে পড়লো, সার্টের পকেটে চাবিখানা সে সকাল থেকেই আঁকড়ে ধরেছে, তার নরম হাতে চাবিখানার সম্পূর্ণ একটা দাগ বোধ হয় বসে গেছে।

বঙ্কিম আর শিবু প্রায় ছুটতে ছুটতে তার সঙ্গে স্কুলের গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে এলো।

'ভয় নেই কিছু !' বঙ্কিম তাকে সাহস দিলে।

রাস্তাটুকু কেমন করে এলো সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

'ভয় কিসের ?' জহর বললে।

রাড়ীর কাছেই গণেশ বাবুকে ঘুরতে দেখে তার সাহস হল, হৃদপিণ্ডের উদ্দাম চলাচল খানিকটা সহজ হয়ে এলো।

'আমি অপেক্ষা করছি এখানে, কোন ভাবনা নেই।' গণেশ বললে।

বাড়ীর দরজাটা ভেজানো ছিলো। জহর হাত দিয়ে একটু ফাঁক করে দেখলে : ভেতর দিকে ঠাকুর-চাকরের কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছিলো, বোধ হয় তারা খেতে বসেছে।

জহর নিঃশব্দে, কম্পিত বক্ষে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। বারান্দায় এসে দেখলো নীচে, ওদের খাওয়া তখনও শেষ হয় নি।

ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

তার হৃদপিণ্ডটা বোধ হয় উত্তেজনায় ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু আর সময় নেই, প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার কাছে মূল্যবান।

ট্রাঙ্কের তালায় চাবি লাগিয়ে ঘোরাতেই ক্লিক্ করে একটা শব্দ হল। সে-শব্দে জহর চমকে উঠে পেছিয়ে এলো এক পা। ট্রাঙ্কের তালা তুলেই বাঁ ধারে কাশ্মীরী সালটার ভাঁজের মধ্যে সিন্ধুকের চাবি। যন্ত্র-চালিতের মত সে সিন্ধুকের কাছে নীচু হয়ে বসে চাবি ঢোকালে। ডালা খুলে সে ভেতরে হাত ঢোকালে, তার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, অনেক চেষ্টা করেও সে কাঁপুনি থামাতে পারছে না।

সিন্ধুকের মধ্যে একটা ছোট ড্রয়ার ছিল ; প্রত্যেকটি চাবি জহরের পরিচিত। ড্রয়ারের টানা খুলেই সে নোটের তাড়া টেনে বার করলো, একশ' টাকার তুটি বাণ্ডিল, দশ টাকার গোটা পাঁচেক ! নিজের রুমালটা পকেট থেকে বার করে সে সব কটা নোটের তাড়া রুমালে বেঁধে নিলে ; তারপর ড্রয়ারটা বন্ধ করলে, একবার টেনে দেখলে বন্ধ হয়েছে কিনা ! সিন্ধুকের ডালাটা বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়ালো, চাবির ছোট তোড়াটা সালের ভাঁজের মধ্যে সন্তর্পণে রেখে সে ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করলে। টেনে দেখলে বন্ধ হয়েছে কিনা !

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলে জহর কোথাও কোন জিনিষ সন্দেহজনক ভাবে ছড়িয়ে আছে কিনা ! না, সব ঠিক আছে ! রুমালের ছোট পোঁটলাটা নিয়ে সে অতি সন্তর্পণে দরজার খিল খুললে ; কেউ নেই কোথাও।

সিঁড়ি দিয়ে সে নামতে যাবে নীচের দিকে এমন সময় দরজা বন্ধ করবার শব্দ হ'ল। সর্ব্বনাশ ! কেউ কি ঢুকছে বাড়ীতে ? তার বাবা ? মা ?

জহর উপর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখলে, সব নিস্তব্ধ ! আবার সে বারান্দায় এলো, দেখলো নীচে। চাকরটা নীচের উঠোনেই বাসন মাজতে বসেছে ! বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর বেরিয়ে গেল। কিন্তু ও-বেটা আজকে আবার উঠোনে বাসন মাজতে বসেছে কেন ? সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরুতে গেলেই তাকে দেখে ফেলবে।

জহর নামলো সিঁড়ি দিয়ে। ঠিক ! বেরোতে গেলেই দেখা যাবে ; সে যদি ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায় তা হলে তাকে দেখে ওর সন্দেহ হবে, স্কুল থেকে তুপুর বেলা সে কি কাজে বাড়ী এসেছে ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জহর ঘামতে লাগলো। হাতে তার রুমালের পুঁটলী। যে কোন মুহূর্ত্তেই বাড়ীর মধ্যে লোক আসতে পারে ! কত লোক ! তাদের অসংখ্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে কেউ কিছু না কিছু দরকারে এসে পড়তে পারে ! কি করবে সে বুঝতে পারলে না।

হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো। জহর দাঁড়ালো শক্ত হয়ে। সর্ব্বনাশ ! বোধ হয় তার বাবা এসেছেন। কিন্তু বাবাই যদি আসেন তা হলে কড়া নাড়বেন কেন ? দরজাটা তো খোলাই রয়েছে !

বাসন-মাজা বন্ধ রেখে চাকর দরজার কাছে এগিয়ে এলো।

'ওহে ! সতেরোর এক নম্বরটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারো ?' গণেশ বাবুর গলা। হ্যাঁ গণেশ বাবুর গলা !

চাকর পাঁচু বললে, 'হ্যা বাবু এই যে বাড়ীর পাশ দিয়ে গলিটা গেছে—ওধারে গিয়েই পাবেন।'

সতেরোর এক শিবুদের বাড়ী। তাদের বাড়ীর পেছনেই। গণেশ বাবু শিবুদের বাড়ী ত চেনেন, ব্যাপার কি ?

নিশ্বাস বন্ধ করে জহর দাঁড়িয়ে রইলো।

'এসো না ভাই, বাড়ী একবার দেখিয়ে দিয়ে যাও না!' গণেশ বাবু বললেন।

এবারে জহর বুঝতে পেরেছে ব্যাপার! তার দেরী দেখে গণেশবাবু তার বিপদ বুঝতে পেরেছেন।

পাঁচু বাইরে গেল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, 'আসুন বাবু!' সে গণেশকে বললে।

পাঁচুর পেছনে পেছনে গণেশ তাদের গলির মধ্যে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই জহর রাস্তায় নেমে ছুট দিলে।

কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারলে; এমন ভাবে তাকে ছুটতে দেখলে পাড়ার লোকে ভাববে কি ? কেউ হয় তো বিকেলে এসে তার বাবাকেও বলে দিতে পারে! বলা যায় না কিছু।

ধীরে ধীরে সে চলতে লাগল।

স্কুলের কাছে এসে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

টিফিন শেষ হয়েছে, ঘন্টা বাজছে! যাক্! তার দেরী হয়নি তা হ'লে।

এখনও দু' এক মিনিট সে দেরী করতে পারে।

সে অপেক্ষা করতে লাগলো গণেশবাবুর জন্যে স্কুলের একটু দূরে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গণেশকে দেখা গেল—ছুটতে ছুটতে আসছে।

গণেশ কাছে আসতে শিবু তার হাতে পুঁটলীটা দিয়ে বললে, 'নিন! আমার ক্লাশের দেরী হয়ে যাচ্ছে! এই যে চাবিটা!'

গণেশ তার প্রকাণ্ড পাঞ্জাবীর পকেটে পুঁটলীটা সাবধানে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'তোমার সাহস আছে।'

[ক্রমশঃ

খবর

আগামী বৈশাখে রংমশাল নতুন গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিত্রে ও নানা নতুনত্বে নতুন বছরের উপহারোপযোগী হয়ে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই তোমাদের হাতে পৌছবে। শিশুসাহিত্য সম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের নতুন লেখা তোমরা পাবে। আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও রংমশালে আহ্বান করেছি। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় চৌধুরী ও রংমশালের তোমাদের প্রিয় লেখক-লেখিকাদের লেখাও থাকবে। মোটকথা, রংমশাল নববর্ষের আনন্দ নিয়ে তোমাদের হাতে পৌছবে।

ভারতের শেষ সীমানায়

শ্রীশামুক

একটি ছোট দল তৈরী হ'ল দিল্লিতে। অনেকদিন ধরেই নোটন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিল, নাকিসুরে আবদার, আমল দিইনি। এবারে মরিয়া। অনশন ব্রত করবে। জলও নয়। একলা নোটন্ হলেও বা রক্ষা ছিল, বাদল, খুকু ও রাজু যোগ দিল। কোথাও বেড়াতে যেতে হবে। আমরা শুধু কজন, আর কেউ নয়।

বাদল ভারতবর্ষের ম্যাপ নিয়ে বসলো, স্থান নির্ব্বাচনে। কত দেশ বিদেশের নাম—সব দেখতে গেলে একটানা বছরখানেক লাগতে পারে। নোটনের গলা চড়লো সবচেয়ে বেশী আর যত উৎকট কল্পনা এই নোটনের। বল্ল ভারতের একটি শেষ সীমানায় যেতে হবে। তাও আবার কোথা, হয় কুমারীকা আর নয়তো ঐ যে দন্ত-স-এর শেষ কোনটা পশ্চিমে—দেখি দেখি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি—ঐ যে লেখা আছে—দ্বারকা।

নোটনকে ভালোবাসি খুব কিন্তু একটু রাগ হ'ল। কাছাকাছি কোথায় গেলেই হয় না ভারতের শেষ সীমানা! ঐ রকমই মেয়ে ও। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর আর নয় তো সমুদ্রের একেবারে ধারে দাঁড়ায় ও ভারী মজা পায়। করি কি, রাজী হতে হ'ল। হ্যাঁ—দ্বারকাই। গোল বাঁধালেন সেজকাকা। বল্লেন—একটি দিন থাকতে পাবে। এই সব ডানপিটে ছেলেমেয়েদের সামলাতে পারবে ? ডুবে মরতে কতক্ষণ ? তাই-তাই। পূজোর ছুটী যেদিন আরম্ভ সেদিনই।

সত্যি বড় নুতন লাগলো কাথীয়াওয়াড় দেশটি। মরুভুমি ছাড়া আর কি ? বালি আর বালি, ধূ-ধূ করছে, শুকনো খটখটে, চুপ চাপ নিঝুম। ট্রেনের জানলার পাশে বসে মনটায় তখন কেমন একটা উদাস ভাব এসে যায়। চোখ জ্বালা করে চেয়ে চেয়ে। মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের বা ফণিমনসার বেড়া দেওয়া খেত খামার,—চোখ জুড়োয় তার গাঢ় সবুজ রং এ। বাংলাদেশের গাছপালার চেয়ে এরা যেন বেশী সবুজ, এমনি ত' মনে হয়। সূর্য্য ডোবে ডোবে। ওটা কি ? সমুদ্র ? ঐ আরব সাগর ? আ-হা—একসঙ্গে ভারী গলার আওয়াজ বেরিয়ে আসে। সুন্দর! এত সুন্দর, আনন্দে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে—হারিয়ে গেল সমুদ্র আবার শুধু বালি।

অন্ধকারে ট্রেন থামলো। ধর্ম্মশালা ছাড়া গতি কি—চল ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালায় নেমে ওদের সব মুখ যদি একবার দেখতে। যেন বিকালে খেলবার সময় জোর করে পড়তে বসানো হয়েছে। কোন উৎসাহ নেই। ব্যাপার কি? থাকবো না এখানে—কোথায় যাবে—একেবারে সমুদ্রের ধারে—সেখানে যে ধর্ম্মশালা নেই—নাই থাক। সুতরাং আস্তানা থাক বা না থাক সমুদ্রের ধারটুকু চাই, বালির উপর বসে সমস্ত রাত কাটাতে হয় সে-ভি আচ্ছা। ভাল কথা। কিছু জলযোগ করে মাল পত্তর ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া হ'ল। দেড় মাইল দূরে সমুদ্র—খবর নিলাম।

নাকের সোজা গিয়ে দেখি সমুদ্রের ধারে মাত্র খান চারেক বাড়ী। সব অন্ধকার, একটি ছাড়া। করি কি? দেখলাম যত ভাবনা আমারই। অন্য সকলে সেই নিস্তুতি অন্ধকারে অবাক হয়ে চেয়ে আছে সামনের দিকে—যেখানে ঢেউ এর পর ঢেউ আছড়াচ্ছে মেঘের গর্জ্জনে, আর সাদা সাদা ফেণার সারি দৌড়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট স্বপ্নের মত।

আলো জ্বালা বাড়ীর দিকে এগিয়ে ভয়ে দরজায় ঘা দিলাম। একটি বুড়ো ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মোটা সোটা লম্বা চেহারা আর এক ঝুড়ি মুখঢাকা গোঁপ। ঢোক গিলে জানালাম আমাদের আবেদন। পরিচয়ে জানলাম তিনি স্কুলের হেডমাষ্টার। এবারে বেত আনবেন নাকি? সপাং? ভারী ভদ্রলোক কিন্তু—জীবনে ভুলবো না। কথা শুনে এত মজা পেলেন যে সে কি হাসি—প্রাণ-খোলা, ঝরঝরে হাসি। বল্লেন—সাবাস্—এই ত' চাই। আমার বাড়ীতে থাকতে চাও এস আর নয় ত' ঐ যে একেবারে সমুদ্রের কিনারাতে ছোট বাড়ী দেখছো ওর চাবি আমার কাছে।

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লাম, পায়ে মাথা ঠুকতে ইচ্ছা হচ্ছিল। পরে নোটন বলেছে যে ঐ ঝুড়ো গোঁপে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করবার তার ইচ্ছা হয়েছিল। কি দুষ্টু দেখ। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে একটি হ্যারিকেন ও চাবি নিয়ে বিদায় নিলাম। খাওয়ার পর কত রাত পর্য্যন্ত বসে রইলাম খোলা বারান্দায়। ঢেউয়ের খেলা দেখে দেখে আশ মিটছিল না। কত গল্প হ'ল মজার মজার। লাইট হাউসের ঘোরা-আলো হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল বারবার মনের উপর। এ যেন মায়াপুরী।

পরের দিন সে কি ব্যস্ত! এতটুকু অবসর নেই। কত রকমের খেলা। বালুর উপর কেল্লা, বাগানবাড়ী, কলকাতা সহর, দিল্লী এই সব তৈরী করতে আর ভাঙ্গতে অনেক সময় গেল। তারপর সকলে চোখ বুজিয়ে—একজন গিয়ে বালুর ভিতর একটা জিনিষ লুকিয়ে এল—খুঁজে বার কর। বালির উপর ওয়ার্ড-মেকিং। দৌড়ানো, জোরে হাঁটা, কাঁকড়া ধরা কত কি! তারপরে স্নান। আঃ সে কি স্ফূর্ত্তি—হুস্ থাকে না কতক্ষণ নাইছি। রাজুর তোয়ালে সটান পাতালপুরী—বাদলের কত মিনতি বরুণদেবের কাছে—উদ্ধার হ'ল না তবু। খুকু আর নোটন বালিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে কান্নার মত শব্দ করতে লাগলো, চোখে জল—হেসে হেসে পেট ব্যথা করছে তবু হাসি থামছে না।

ইক্‌মিকের ভাত খেয়ে মাথায় গামছা কি রুমাল বেঁধে বেরুনো হ'ল ঝিনুক কুড়োতে। সাগরের জল এখন অনেক দূরে সরে গেছে আর জেগে উঠেছে কাল বড় বড় পাথরের চাই। কি অদ্ভুত! এ সব জলের নীচে ছিল স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। কত রং বেরংএর সুন্দর ঝিনুক! শুধু কুড়োনো নয় প্রত্যেক রকমের এক একটি নাম দিতে হবে আবার। সময় নিলেও ভারী মজা লাগছিল। শুনবে দু'চারটা নাম? যেমন—সবুজপরী, শঙ্খচিল, অষ্টাবক্রমুনি, জাপানী পাখা, চিতাবাঘ—এই রকম।

একটি দুর্ঘটনা হতে হতে হয়নি—ভগবানের দয়ায়! ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে অনেক দূর এগিয়ে গেছি পাথরের উপর, এক হাটু জল। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফাটলের মধ্যে বেশী সুন্দর আর বড় ঝিনুক। জলকে নাড়া না দিয়ে আগে দেখে নেওয়া কোথায় কি আছে, তারপর হাত ডুবিয়ে তুলে নেওয়া। এক জায়গায় নোটন বল্ল, দেখ কত বড় একটা বাদামী শাঁখ। সত্যিই ত'—বলার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে কাপড় সামলে নোটন অন্য হাত বাড়িয়েছে। পালিয়ে আয় পালিয়ে আয় বলছি—সকলকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ঠুলে কোন রকমে সরিয়ে আনলাম। তারপর সাবধানে পা ফেলে গিয়ে দেখি—যা দেখেছি ঠিকই—একটি কাল মোটা সাপ চক্র উঁচিয়ে গর্ত্তের মধ্যে বসে। সকলকে আস্তে ডেকে দেখালাম। কিন্তু নোটনের ঐ শাঁখটি চাই-ই-চাই। আমার হাত শক্ত করে ধরে বল্ল—আমার ভয় করবে না চল একটা লাটি দিয়ে ওকে তাড়িয়ে তুলে নি শাঁখটা। অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করলাম।

রাত্রে ষ্টেশনে ফিরতে হ'ল। সকলেই একই কথা ভাবছিলাম—একটি দিন—আরো একটি দিন যদি থাকতে পেতাম।

শ্রীইন্দিরা দেবী

স্নেহের ছোট বোনেরা আমার—

আমাকে বোধহয় তোমরা ভুলেই গেছ, নয় ? কিন্তু স্থানাভাবের জন্য আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই, অবশ্য আমাদের দেখা এই কালী কলমে বা ছাপার অক্ষরের ভিতর যাই বলো। এই কয় মাসের ভিতর তোমরা আমায় অনেকে চিঠি দিয়েছ কিন্তু জান বোধহয়—রংমশালের উপর দিয়ে অনেক বিপ্লব গেল—এবং আমারও স্থানাভাব ঘটলো। এবার তোমাদের দিদিভাই বল্লেন তাঁর স্থানটা আমায় দিয়ে—পুরাণো সম্বন্ধটা একবার রং করে নিতে। যাই হোক—তোমাদের চিঠিগুলি আমি সব পেয়েছি ভাই। সম্প্রতি রেবা মিত্র বলে যে একটী বোন চিঠি দিয়েছে তাও পেয়েছি। রেবা ! এবার তোমার কথামতই কতকগুলি কাঠির বোনার নমুনা আমি দিচ্ছি। আমার মনে হয় এতে একা তোমার নয়—আমার আরও অনেক বোনের সুবিধা হবে। তোমাদের নিকট থেকে যে চিঠি আমি পাই তার অধিকাংশ চিঠিতেই সেলাই বলবার জন্য অনুরোধ থাকে। ভোট নিয়ে দেখলাম—এই সেলাই শেখানোর অনুরোধই বেশী হচ্ছে। তাই আমার ব্যবস্থারও সেই মত হলো।

শীত চলে গেলেও তোড় জোড় করে বসে আর অবসর সময় টুকুতে সেলাই করতে করতে আবার শীত এসে যাবে—তাই কয়েকটা প্যাটার্ণ ই দিলুম।

'মঞ্জিল' প্যাটার্ণ—

এতে ফ্রকের উপরিভাগ, খেলার সোয়েটার, টুপি আর কোট বুনলে ভাল দেখায়।

প্রথমে ঘর তুলে এক লাইন সোজা বুনতে হবে। (এই প্যাটার্ণে জোড়া ঘর সুবিধার হয়) উল্টো বুনতে হবে। তৃতীয় লাইনে একটী সোজা একটী উল্টো বুনে কাঠিটা শেষ করবে। চতুর্থ কাঠি—এক লাইন সোজা বুনবে। পঞ্চম কাঠি একটা সোজা একটা উল্‌টো বুনে লাইন শেষ হবে। তার পরের লাইনও একটা সোজা একটা উল্‌টো—পরের লাইন সোজা।

এই বোনার দু' পিঠে দু' রকম প্যাটার্ণ পরে—তাতে উল্‌টো সোজা বোঝা যায় না। এই মঞ্জিল বোনার প্যাটার্ণ।

নারকেল ফুল—

প্রথমে ঘর তুলে এক লাইন সোজা, দ্বিতীয় লাইন উল্‌টো, তৃতীয় লাইন সমস্ত জোড়া ঘর বুনবে। চতুর্থ লাইন একঘর সোজা বুনে তার পাশের দিক থেকে একটী ঘর তুলে, কাটিতে উঠিয়ে আবার তাকে বুনতে হবে। পরে পঞ্চম লাইনে এক লাইন সোজা এক লাইন উল্‌টো। এই প্যাটার্ণে, ছোট মেয়েদের টুপি, ফ্রক বেনিয়ান—তৈরী করলে ভাল হয়।

ডবল হানিকোম্ব প্যাটার্ণ—

প্রথমে ঘর তুলে এক লাইন কর্সিকা বোনা হবে, পরে উল্‌টো দিকে এই বোনার প্যাটার্ণ আরম্ভ হবে।

কেলবমাত্র প্রথমে দু'টী ঘর সোজা বুনে সামনে এনে একটী ঘর তুলে নিয়ে পরে একঘর জোড়া বুনবে। এই রকম করে দ্বিতীয় লাইন শেষ করে, তৃতীয় লাইন দু'টী সোজা ও একটী ঘর না বুনে অন্য কাঠিতে তুলে নেবে। তৃতীয় লাইন এই রকম বুনে শেষ করবে। কাঠির প্রথম এবং শেষের দিকে যদি সোজা ঘর একটী দুটীর বেশী হয় তাহলে সেও সোজা বুনে নিয়ে জোড়ার ঘরে জোড়া বুনতে হবে—না হলে প্যাটার্ণের গোলমাল হবে।

তোমরা বুঝতে পারলে কি না বা কোনও অসুবিধে হলো কিনা আমায় জানিও। আমি পরে 'জিগ্‌জ্যাগ' এবং অন্যান্য প্যাটার্ণ তোমাদের দেবো অবশ্য এর পরে তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে তা বলতে পারিনা। যাহোক তোমরা কি সেলাই শিখতে চাও এবং অন্য বিষয় কিছু জানতে চাও কিনা আমায় লিখো—আমি সাধ্যমত ব্যবস্থা করবো। আমার ভালবাসা তোমরা নিও।

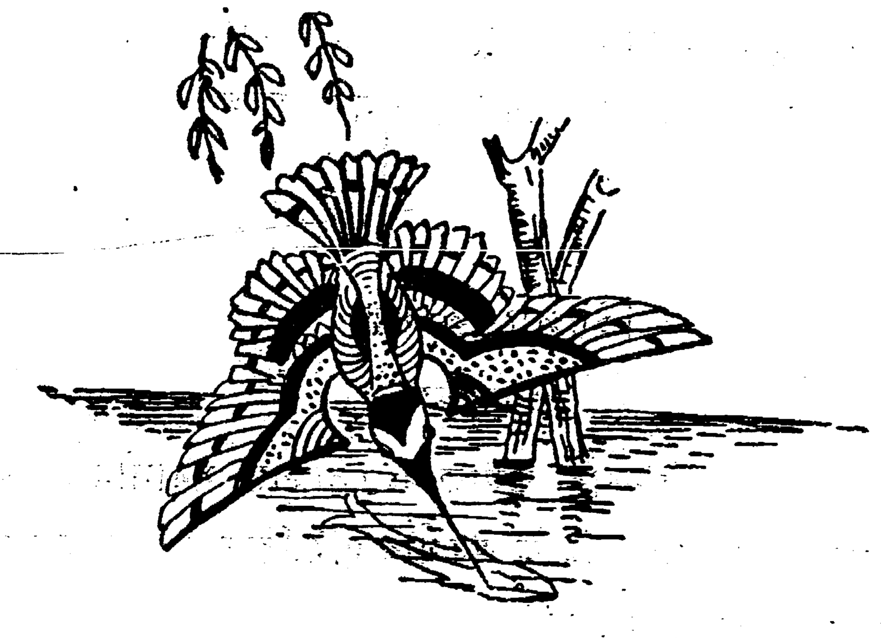

গ্রাহক নং ১১০৯

দাদুর দুধের বাটি

(স্বপ্নিকা)

আনোয়ারা বেগম

যুদ্ধের ভয়ে বাবা আমাদের দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন! ছ' বছর পরে এবার দেশে গেলাম। ছ' বছর বয়সেই একবার এসে তিনমাস থেকে গেছলাম। দাদামশায় আমাকে বড্ড ভাল বাসতেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে না বসলে তাঁর খাওয়ার তৃপ্তিই হোত না। আমিও প্রসাদের লোভে কখনও তাঁর খাবার সময় অনুপস্থিত হতাম না।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে দাতুর ঘরে গেলাম। দাতু দুধ খাচ্ছিলেন আর চোখ বুঁজে ঝিমুচ্ছিলেন। আমার সাড়া পেয়ে বাটিটা এগিয়ে দিলেন। আমি সেটা নিয়ে শ্রান্তি দূর করবার জন্য পাশের চেয়ারটায় বসে চুমুক দিলাম। দাতু মিষ্টি বেশী খান। গাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। বাটিটা রাখবার আগেই চোখটা জড়িয়ে আসল ঘুমে।

কিছুক্ষণ পরে দাতু বললেন—চল্ নেলী থিয়েটার শুনে আসি। গ্রামের ছেলেরা এবার নাকি নতুন প্লে করছে। গেলাম। একটি ছেলে সমাদর করে একেবারে আগে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। জোগাড় ক'রে প্রোগ্রামও একটা দিয়ে গেল। একটু পরেই ড্রপসিন উঠল। প্রোগ্রামটায় চোখ বুলিয়ে সামনে তাকালাম।—

হিটলারের স্বপ্ন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। স্থান জার্ম্মানী। হিটলার ড্রইংরুমে সোফায় সমাসীন। কপালের রেখায় চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে দরজার দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন কাউকে প্রত্যাশা করছেন, এমন সময় চঞ্চল পদে গোয়েরিংএর প্রবেশ।

হিটলার। ষ্ট্যালিন রাজি হোল?

গো। রাজি কী হতে চায়! বলে এই সেদিন পর্য্যন্ত কয়েক শো কে নরকে পাঠালাম। আর স্থান নেই। এত শিগগির পাসপোর্টও জোগাড় করা যাবেনা তবে হিটলার যদি মাশুলটা দিয়ে দেয় তবে তার উপকারটুকু করতে আপত্তি নেই।

হি। যাক, একটা মস্ত বড় চিন্তা দূর হোল। আমি জানি ও গুঁফে বড় পাকা দালাল কিছু মুনাফা না স্বীকার করলে হাঁ বলান সহজ নয় ওর মুখ থেকে। ছেলে বেলায় খেলতে কম মারবেল নেয়নি বাগে পেয়ে। পোলাণ্ডটা যদি দখলে আসে তবে ওকে না হয় ও দিকটা ছেড়ে দেব।

গো। দেখবেন ও আবার হাতটা লম্বা করে না বসে। আসবার সময় শেকহ্যাণ্ড করতে যা ঝাকুনি দিয়েছে মনে হল পোলাণ্ডের সবটুকুনই আমার হাত থেকে ঝেড়ে নিতে চায়। আমিও এমন টিপুনি দিয়ে দিলাম যে হাতটা গুটিয়ে নিতে সময় পেল না।

হি। হ্যাঁ ও বড় ধড়িবাজ। তবে ওকে আপাততঃ তোয়াজে রাখতে হবে। এদিকে ইংরেজ আর ফরাসীরা জোট পাকাচ্ছে। ওরা আমায় কোন দিনই সুনজরে দেখতে পারে না। ক' বছর গম বড্ড কম হচ্ছে। দেওয়ানজী খবর দিল পোলাণ্ডে নাকি আবাদটা ভালই হয় তাই ওটা আমার চাই-ই। এতদিন চেয়ে দেখলাম। ব্যাটারা মুখের কথা ত শুনবে না। যত সব পাখা গজানর দল! 'মুসো' কি বললে?

গো। সে আলবেনিয়া চষবার বন্দোবস্ত করছে। তাই ভারী ব্যস্ত। বলল ভেবে দেখি, দরকার হ'লে পরে খবর দিও; যা পারি করব তখন।

এমন সময় বাহিরে সৈন্যগণ হিটলারের জয়ধ্বনি করে উঠল। জানালা দিয়ে দেখলেন সব তৈরী গোয়েরিংকে বললেন—সর্দ্দারকে ওদের নিয়ে এগুতে বল আমি চুলটা আঁচড়ে পরে আসছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য। পোলাণ্ড। পোলরা বীর বিক্রমে বাঁধা দিচ্ছে কিন্তু জার্ম্মান গোলার কাছে টিকতে পারছে না। খিড়কি দিয়ে অনেককেই রুমানিয়ায় চালান দেওয়া হ'ল। ও দিকে ষ্ট্যালিন ব্যাপারটা কতদূর গড়াল দেখবার জন্য সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে হাজির। পোলরা বেগতিক দেখে পোঁটলা ফেলে পগার পার হ'ল।

ষ্ট্যালিন। ব্যাপার কি দাদা? বড় যে শোরগোল শুনছি পুজোর সময় পাঁটা বলির বাজনার মত। প্রসাদ পাব ত?

হি। (কাষ্ট হাসিয়া) তবে দাদা মাথাটা তুমি নাও বেশ তেল আছে। এ দিকটা আমার থাক। দাঁতটা আবার কন্‌কন্ করছে ওটা এখন চিবতে পারব না বোধ হয়।

ষ্ট্যা। মাংস খেয়ে অরুচি ভাই। মাথার খানিকটা না হয় তোমাকে দিচ্ছি। একটু মাছের ব্যবস্থা করে দাও না?

হি। বাল্টিক পুকুরের পূব দিকটা নাওনা। খান কয়েক ডিঙ্গি বেশ রাখতে পারবে।

ষ্ট্যা। কাণ্ডজ্ঞানহীনরা (স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়ানরা) আবার আপত্তি জানাচ্ছে। এতে আপত্তির কি আছে? তুমিই বল?

হি। ওদের আবার বুদ্ধি আছে? বুদ্ধি থাকলে পোলরাই কি অত মার খেত? গোয়ার্ত্তুমি করলেই ত হয় না।

তৃতীয় দৃশ্য। ইংলণ্ড। চেম্বারলেনের বৈঠকখানা। ফরাসী দূত চিন্তাক্লিষ্ট মুখে আসীন। দাঁতে ব্রাশ চালাতে চালাতে সমরলেন (চেম্বারলেন) প্রবেশ করলেন।

ফ, দূ। এখনও দাদা দাঁত ঘসছেন? ওদিকে যে হিটলার শেষ করে ফেলল। পোলাণ্ড ত বাঁচল না দাদা। এত ভরসা দিলাম। আহা বেচারা!

স। তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন! নিজের মাথাটা সামাল ক'রে ত পরের মাথা বাঁচাবে? খালি মাথায় পরের বিবাদে মাথা গলালে যদি তোমার মাথায়ই একটা চাঁটি বসিয়ে দেয় তবে টাক ফাটতে কতক্ষণ?

ফ, দূ। (টাকে হাত বুলিয়ে) তা ত বটেই; তা ত বটেই।

স। শোন। পোলাণ্ডকে পরে পারি বাঁচাব। এখন দেশে গিয়ে চটপট সেজেগুজে সীমানায় যেয়ে একটু পাঁয়তারা ভাঁজ। ব্যাটা যে উঠোনে আসার জোগাড় করে ফেলল। শেষে কি ঘরে পুরে তালা মেরে দেবে নাকি? আমার আসতে যদি একটু বিলম্ব হয় কিছু মনে ক'র না। কাল থেকে বাতটা আবার বেড়েছে।

ফ, দূ। যাই। তুমি কিন্তু বেশী দেরি করনা। জানই ত একলা ওর সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় ভয় করে। যে গুণ্ডার মত চেহারা।

স। দেরী হবে কেন? তবে বাতের জন্যই......

ফ, দূ। জান বাঁ'চলে বাত পরে সারিয়ো। ওরা নাকি 'পিগক্রাইট' না কি বসিয়েছে। আমাদের ব্যাটা 'পিগ' মনে করেছে যে ভয় দেখিয়ে তাড়াবে? গামলাকে (গ্যামেলিন) পাঠিয়ে এসেছি। পাকা লোক। ওর কাছে বাহাদুরি খাটবে না।

স। তবে যাও ওদিকে দেখগে। আমি এলুম বলে।

চতুর্থ দৃশ্য। গামলা সারক্রুকেন পর্য্যন্ত দখল করেছে। হিটলার বাঁকা চোখে একবার দেখে পোলাণ্ড ঘুরে আসতে গেলেন শিকারটার বন্দোবস্ত করতে। ফিরে এসে দেখেন গামলা গড়াতে গড়াতে বেশ এগিয়ে আসছে। হাঁক দিতে সর্দ্দার ছুটে এল।

হি। এখনও হাঁ করে দেখছ কি? যত লোক লাগে নিয়ে যাও। গামলাকে চিৎ করা চাই-ই। আমি পরে আসছি। সার ব্রুকেন ততক্ষণে রি-দখল ক'রো গিয়ে। আমি আরও লোকজন নিয়ে.........

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ডলি ভাত খেতে ডাকছে। দাঁতুর দুধের খালি বাটি তখনও হাতে, তলায় কালো কি জিনিষ পড়ে আছে। মা দেখে বলল—তুই ওই দুধ খেয়েছিলি বুঝি? জানিস নে তোর দাতুর আফিম চড়ানর অভ্যাস আছে?

"রসুনে জ্বর"

শ্রীরণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার

(গ্রাঃ ১২০৮)

টুনু আমাদের ভারী চালাক ছেলে। কে বল্‌বে ছ' বছর বয়স তার, বুদ্ধি আর কথাবার্ত্তা ঠিক বুড়োদের মত! টুনু বাড়ীর কাছাকাছি একটা স্কুলে সবে ভর্ত্তি হয়েছে। সে পড়ে ক্লাস ওয়ান্‌এ। কিন্তু

ক্লাস ওয়ান্‌এ পড়ে বলে তার বোধ হয় একটু লজ্জা করে। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তার দুটো ছোট ছোট আঙ্গুল উঁচু করে বলে, 'টু কেলাস'! এই টুনুকে কেউ যে কখনো ঠকাতে পারবে না এই রকম সার্টিফিকেটও তার আছে অনেক। টুনু বুদ্ধিমান বলে ক্লাসে খুব খাতির আছে তার।

এহেন টুনুও যে অন্য একজনকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠক্‌বে তা বোধ হয় সে ভাবতেই পারেনি। টুনু রোজ দরওয়ানের কাছে গল্প শোনে। সে রসুন বগলে দিয়ে জ্বর তৈরীর গল্পও দরওয়ানের কাছে শুনেছিল। গল্প শোনার পরে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ভাবলে: "বাঃ এম্নি করে জ্বর করলে ত মন্দ হয় না। আঙ্গুর, বেদানা, কমলালেবুও খাওরা যায় আর ইস্কুলেও যেতে হয় না।" তারপরই সে রসুনের অনুসন্ধান করতে লাগল। শেষে একদিন কাঁচের আলমারীতে রসুনের সন্ধান পেলে। সে দরওয়ান তেওয়ারীর কাছ থেকে রসুন সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সেই সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলে ঠিকই রসুন। শুধু রসুনটার গন্ধ নেই। অনেক পরীক্ষার পর সে ঠিক করলে কতগুলোর গন্ধ থাকে না এটা বোধ হয় তাই হবে।

তারপর টুনু বগলে রসুন দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। স্কুলের সময় প্রায় হয়ে এল, তবু টুনুর সাড়াশব্দ নেই দেখে ঠাকুমা ঘরে এসে দেখলেন টুনু শুয়ে। ঠাকুমা অবাক্ হয়ে বল্লেন: "কিরে তুই এখানে শুয়ে আছিস্ যে?" টুনুর কোন সাড়া নেই, শেষে অনেক ডাকাডাকির পর বল্লে: 'আমার অসুখ করেছে।' ঠাকুমা গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন: "কৈ বাপু গা ত গরম নয়, তা যদি কাঠিতে ওঠে। আমি তোর মাকে ডাক্‌ছি।"

এমন সময় মা এলেন। তিনি এসে থার্ম্মোমিটর দিতে গিয়ে দেখলেন কি একটা যেন ঠেক্‌ছে। তারপর সেটা হাত দিয়ে বার করে দেখেন তাঁর কৃষ্ণনগরে কেনা মাটির একটা রসুন। তিনি ত' হেসেই খুন। ততক্ষণে টুনু পগার পার।

বাসন্তীকা

সুরেখা বসু

(গ্রাঃ নম্বর ১০৪৬)

মধুর রঙে রঙিয়ে দিয়ে ফাগুন আবার এসেছে
পূর্ব্বাকাশে রবির আলো সোনার হাসি হেসেছে
অঙ্গে ধরার লাগিল আবার
নব যৌবন পুলক জোয়ার
বকুল বনে কুঞ্জবনে আগমনী সুর বেজেছে
বিরহী বুকে সোনার কমলে দলগুলি তার মেলেছে॥

অলকে যে গো লাগিল হাওয়া স্বপন মাখান
বনের বুকে কিসের ভাষা পরাণ মাতাল
আকাশ মাঝে কি সুর বাজে
বিফল করে সকল কাজে
নূপুর ধ্বনি কেমন যেন আবেগ মেখেছে
উত্তরীয় উড়িয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে॥

চলন্তিকা

তোমরা যুদ্ধের খবর নিশ্চয় খুব মন দিয়ে পড়ছ। সকাল বেলায় উঠে কাগজ দেখ কোথায় 'গ্রাফ্ স্পী'র মত জাহাজ ধরা পড়লো কিংবা কটা জাহাজ কাবু হ'লো সাবমেরিনে। আর যেদিন গরম গরম খবর না থাকে, সেদিন ভাবো—দূর ছাই এর নাম কি যুদ্ধ! কিন্তু এই সেদিন এর-নাম-কি-যুদ্ধর দৈনিক খরচ হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল, দিনে প্রায় ৭০,০০০ টাকা যুদ্ধের খরচ শুধু গ্রেটব্রিটেনেরই—অন্যান্য দেশের মিলিয়ে তাহলে কত হবে কে জানে?

এবারকার যুদ্ধের কথা বলতে গেলে আমাদের গত মহাসমরের কথা মনে পড়ে যায়। গত মহাযুদ্ধে মোটামুটি খরচ হয়েছিল কত জান?—৩৫০,০০০,০০০,০০০ ডলার অর্থাৎ ৯১০,০০০,০০০,০০০ টাকা! খরচের অঙ্কগুলি এত বেশী যে শূন্যগুলোর মধ্যে পথ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। অতএব পরিমাণটা বোঝবার জন্য দেখা যাক এ টাকাটা দিয়ে কি করা যেত:

প্রথমতঃ এই টাকাতে আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ার প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ বিঘা জমি আর ৩,৫০০ ডলার মূল্যের বাড়ী হতে পারত।

তারপর ওই দেশগুলোর যে সমস্ত সহরে ২০০,০০০ কিংবা তার বেশী লোক-সংখ্যা আছে তাদের প্রত্যেকটিতে ১0,000,000 খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেত!

ঐ ছাড়া আরো কি কি হত শোন—

ওদের প্রত্যেক সহরের জন্য ৫,000,000 ডলার খরচে একটি করে লাইব্রেরী খোলা চলত, চিরজীবনের জন্য ৫0,000 শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীদের এবং ২৫00 শুশ্রূষাকারিনীদের ৫0,000 ডলার বার্ষিক বেতন দেওয়া সম্ভব হত—আর ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন সব কিছু জিনিষ কেনা যেত!

আজকাল ছিপছিপে রোগা হওয়াটাই ফ্যাশন। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায় রোগা হওয়ার নানা বিচিত্র বিজ্ঞাপন। কিন্তু এযুগেও এমন লোক আছে যারা

মোটা হবার সাধনা করে। আমি অবিশ্যি রোগাপটকাদের মোটা হওয়ার কথা বলছি না। আমি বলছি তোমার আমার মত যারা সত্যিকারের মোটা তাদের কথা। এঁরা কিন্তু তোমার আমার মত মোটা হওয়ার জন্য লজ্জা পান না বরঞ্চ বেশ গর্ব্ব অনুভব করেন। সম্প্রতি একজন পর্ত্তুগীজ কুস্তীগীর নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে স্থূলতম লোক বলে দাবী করেছেন। এর ওজন বাহান্ন ষ্টোন অর্থাৎ ৯ মনের ওপর। —এ কথা শুনে কিন্তু ভারী ঘাবড়ে গেছেন জঁা ব্যানা (Jean Banna) প্যারিসের এক হোটেলের স্বত্বাধিকারী—এঁর ওজন ত্রিশ ষ্টোন অর্থাৎ প্রায় ৫ মণ দশ সের—এই ওজনেই তিনি ওই গৌরবের অধিকারী হতে চেয়েছিলেন। তবে জঁ্যা বানার পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে তাঁর বিপুলত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত—কারণ লোকটি মাথায় ছোট, গলা ২২ ইঞ্চি কোমরের বেড় আর হাতের বেড় পাঁচ ফিট আর দুফিট! বেচারী ট্রামে উঠতে পান না,—না, না ট্রাম কণ্ডাক্টার উঠতে দেয় না নয়—ট্রামের দরজায় তাঁরই বিপুল পরিধি ঢুকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।—

পৃথিবীর সবচেয়ে বিপুলকায়া দম্পতি হলেন শ্রীমান এবং শ্রীমতী বার্ণে ওয়ার্থ। বার্ণের ওজন ৪৯ ষ্টোন তাঁর ছোটখাট স্ত্রীটির ওজন মোটে ২৬½ ষ্টোন—বড্ডই রোগা না? বার্ণে লম্বায় ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি আর কোমর মাত্র ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি! আমরা তাড়াতাড়ি বিদেশ যেতে হলে দোকান থেকে চটপট জিনিষপত্র কিনে নিই—বার্ণের কিন্তু তা হবার জো নেই তাকে টাই পর্য্যন্ত আলাদা তৈরী করাতে হয়!

রাশিয়া-ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ থামল। গত ১৩ই মার্চ্চ বেলা এগারটার সময় রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে একটা মিটমাট হয়ে গেল ও রাশিয়া-ফিনল্যাণ্ড সীমান্তগুলি আপাততঃ কামানের গর্জ্জন থেকে নিস্তব্ধ হল। অনেকদিন থেকেই দুপক্ষে একটা মিটমাটের আয়োজন চলছিল বটে কিন্তু রাশিয়ার দাবীগুলি ফিনল্যাণ্ড স্বীকার করতে পারছিল না। পরিশেষে, রাশিয়ার আক্রমণে হতবিধ্বস্ত হয়ে ফিনল্যাণ্ড একটা মিটমাটে স্বীকৃত হতে একরকম বাধ্য হল। না হলে উপায় ছিল না—না হলে ফিনল্যাণ্ড ইউরোপের ম্যাপ থেকে লোপ পেয়ে যেত। রাশিয়ার বিপুল সেনাবাহিনীর সম্মুখে ফিনল্যাণ্ড যে একলা নিজেকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল—এটাই আশ্চর্য্য। যা হোক—রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ১৩ই মার্চ্চ মিটমাটের চুক্তি দুপক্ষ মেনে নিলে। এই চুক্তিমত রাশিয়াকে ফিনল্যাণ্ডের দিয়ে দিতে হবে—

১। কারলিয়ান যোজক
২। লাডোগা হ্রদের তীরদেশ

৩। হাংগো প্রদেশ ত্রিশ বছরের জন্য

৪। উত্তর উপকূলে ফিনল্যাণ্ডে কোন জাহাজ বা এরোপ্লেন বাহিনী থাকবে না

৫। ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে ফিনিশ সেনাদলকে নতুন সীমান্তে যেতে হবে

৬। পেতসামো দিয়ে নরওয়েতে রাশিয়ার গতিবিধি স্বাধীন থাকবে

অর্থাৎ রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের আবার নতুন করে সীমান্ত তৈরী হবে। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের যে সীমান্ত সৃষ্টি হয়ে আবার ভাঙ্গা হয়েছিল—আজকের চুক্তিমত নতুন সীমান্ত সেই ১৭২১ খৃষ্টাব্দে সীমান্তের পুর্ণসৃষ্টি। যোগ করলে দেখা যাবে যে ফিনল্যাণ্ডের দশ-ভাগের একভাগ রাশিয়ার দখলে আসবে। এই যুদ্ধে দুপক্ষেরই বহু ক্ষতি হয়েছে কিন্তু জিৎ ও লাভ হল শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ারই। তাহলেও—ফিনল্যাণ্ডের অসীম বীরত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গত ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৯ সালে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নিয়মিত কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা একেবারেই হয় নি। রাশিয়া হঠাৎ অতর্কিতে হেলসিঙ্কির ওপর আকাশ থেকে বোমা বর্ষন করতে সুরু করে। তারপর শীতের জমা বরফের মধ্যে, এখানে সেখানে সুরু হ'ল হত্যাকাণ্ড এই দুই অসমান দলে। তিনমাস তেরদিন ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলে ১৩ই মার্চ্চ যুদ্ধ থামল। কিন্তু যুদ্ধ সত্যি থামল কি না কে জানে? আবার হয়ত যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। ইউরোপে আজও যুদ্ধ থামেনি। ইংলণ্ড-ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধের রেশ আজও নিষ্ঠুর ভাবে চলেছে। তারপর রাশিয়া-ফিনল্যাণ্ডের মিটমাট এখনও শেষ স্তরে পৌঁছায়নি। পৌঁছালেও দুর্ব্বল ফিনল্যাণ্ডের ওপর শত্রুদের শ্যেনচক্ষু বেশ লোলুপ হয়ে থাকবে।

সে দিন লণ্ডনে কাক্সটন হলে এক হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। ঘটনাটি যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অদ্ভুত। এবং পাগল মাথা খারাপ না হলে এমন কাজ কেউ করে না। লণ্ডনে কাক্সটন হলে এক মিটিং হচ্ছিল। এই মিটিংএর সভাপতি ছিলেন লর্ড জেটল্যাণ্ড—যিনি ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট। মিটিংএ বক্তা ছিলেন—স্যার পারসি সাইক্স্—ইনি আফগানিস্থান সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করছিলেন। লণ্ডনের আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন—তন্মধ্যে ছিলেন স্যার মাইকেল ডায়ার—পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর, স্যার লুই ডেন (পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর) ও লর্ড ল্যামিংটন (বম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর)—এ ছাড়া আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভার মধ্যে সবশুদ্ধ কম করে

চারিশত লোক ছিল। মিটিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটি ভারতবর্ষীয় সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে বারবার চারবার গুলি করে। ফলে সভায় মাইকেল ডায়ার তৎক্ষণাৎ পড়ে যান ও তাঁর মৃত্যু হয়। লর্ড জেটল্যাণ্ডেরও গায়ে গুলি লাগে—তিনি চেয়ারে বসে পড়েন, স্যার লুই ও লর্ড লামিংটন তাঁরাও হাতে আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই খুনী মাথাখারাপ ভারতবর্ষীয় লোকটিকে ধরে ফেলা হ'ল। লোকটির নাম উদ্ধম সিং তার বয়েস ৩৭ হবে। আর সে নাকি একজন ইনজিনীয়ার—মাস সাতেক হল ইংলণ্ডে এসেছে। আশ্চর্য্য! লোকটাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে নাকি বলেছে—আমি খুন করতে চাইনি।

১৯০৯ সালে লণ্ডনে এইরকম আর একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল—যখন স্যার উইলিয়ম কারজন উইলি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা হন।

নূতন ধাঁধা

(১)

স্কুলের সর্দ্দার ছেলে গোপাল বিকেলে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় তার কতকগুলি সহপাঠি এল এবং প্রত্যেকে একটা করে প্রশ্ন করল—বুদ্ধিমান গোপাল এক কথায় তার উত্তর দিল। তোমরা পার? এই দশটি প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর হবে।

১। ভাই তোর হাতে ও কি আংটি?
২। মদনের পদবীটা কি?
৩। চিঠিটা নিরাপদে পাঠাবার জন্য কি করি বলত?
৪। তোর প্রতিবেশীর দোরে বেলিফরা কি করছিল?
৫। হাঁ ভাই কাল কি পড়ছিল?
৬। এটা ছেঁচবার উপায় কি?
৭। মন্টুর বাবা কি যেন বিদেশী মাছ এনেছেন—কি তার নাম?
৮। আচ্ছা ভাই 'স্বভাব' কথাটার প্রতিশব্দ কি?
৯। 'প্রবৃত্ত হওয়া'কে ছোট কথায় কি বলা চলতে পারে?
১০। 'চরিত্র' শব্দটার অন্য নাম কি?

(২)

বারোটি কথা তৈরী করতে হবে—মাত্র তিন অক্ষরের প্রত্যেকটি কথা। এই বারোটি কথার শেষের অক্ষর যথাক্রমে—ত, আ, দ, বী, ভ, লা, ণী, চা, ক্ষ, ণ, কা, জা এখন প্রথম দুটি অক্ষর প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই হবে। এমন দুটি অক্ষর খুঁজে বার কর প্রত্যেক বারই যার সঙ্গে ঐ শেষের অক্ষরগুলি এক একটি করে জুড়লে এক একটি ভিন্ন অর্থ হবে। আগের দুটি অক্ষর কোন রকম অদল বদল করতে পাবে না। বলত ঐ দুটি অক্ষর কি হবে? আর প্রত্যেক কথাটির মানেও বলা চাই।

উত্তর পাঠাবার, শেষ তারিখ ৩০শে চৈত্র

গত দুমাসের শব্দচৌকি ও ধাঁধার উত্তর এখনও সব না পাওয়াতে এবং উত্তর পাঠাবার সময় থাকাতে আমরা এবার আর নতুন শব্দচৌকি দিলাম না। বৈশাখ মাসে শব্দচৌকি ও ধাঁধার উত্তর, উত্তর দাতাদের নাম ও নতুন শব্দচৌকি প্রকাশিত হবে।